বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ
প্রকাশিত ষাণ্মাসিক পত্রিকা

নবপর্যায়

শিক্ষা দর্পণ

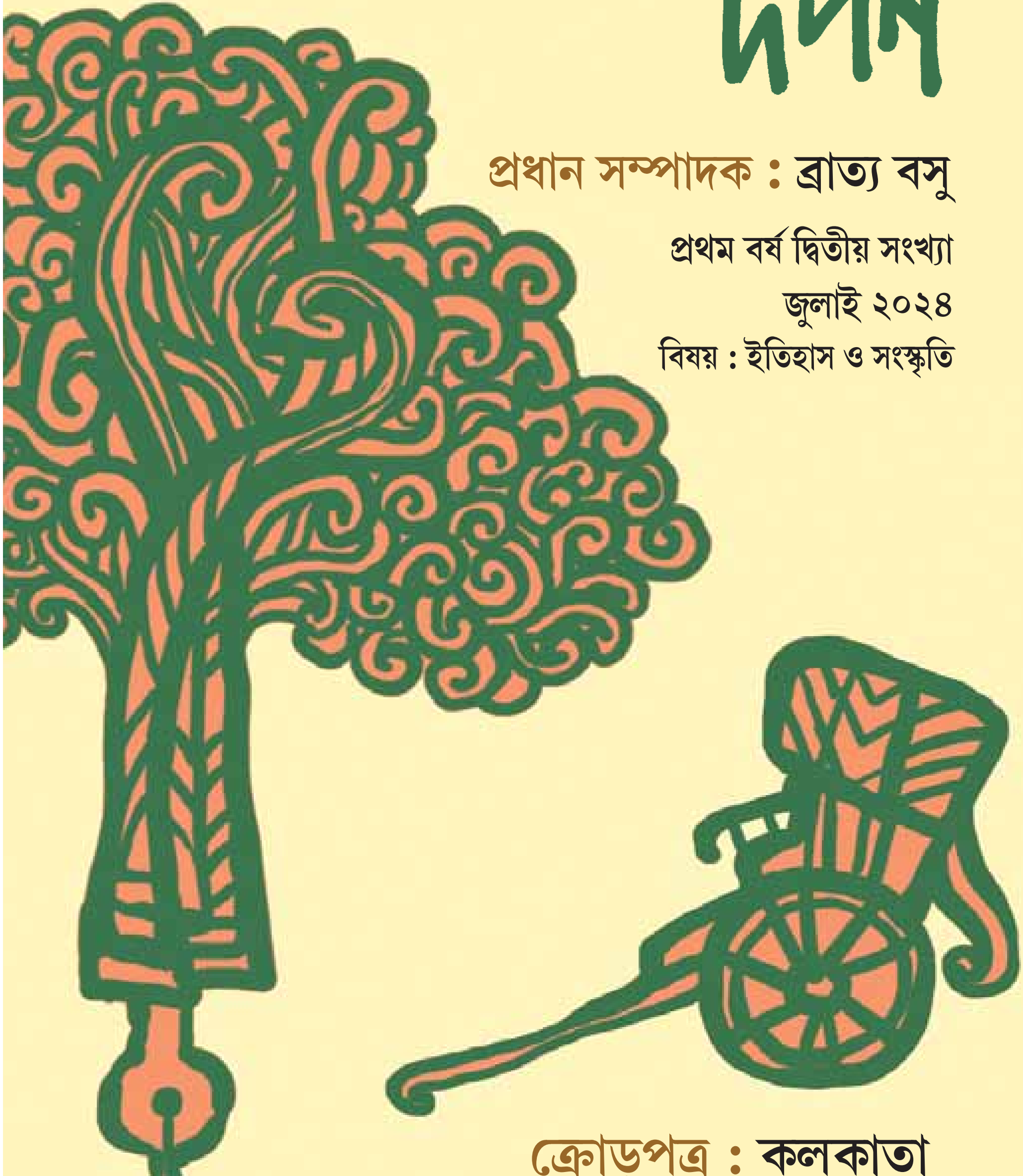

প্রধান সম্পাদক : ব্রাত্য বসু

প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা
জুলাই ২০২৪

বিষয় : ইতিহাস ও সংস্কৃতি

ক্রোড়পত্র : কলকাতা

নবপর্যায়

শিক্ষা দর্পণ

প্রথম বর্ষ। দ্বিতীয় সংখ্যা। জুলাই ২০২৪

বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক

ব্রাত্য বসু

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কার্যনির্বাহী সম্পাদক

স্বাতী গুহ

অমিতাভ দাস

সম্পাদকমণ্ডলী

বিনোদ কুমার, শুভ্র চক্রবর্তী (সদস্য সচিব),
উদয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ ঘোষ, প্রচেত গুপ্ত,
সুমিত চক্রবর্তী, অভীক মজুমদার, সম্রাজ্ঞী বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Nabaparyay *Shikshadarpan*
(Volume I, Issue II)
A Bi-annual Journal
Published by
The Departments of School and Higher Education
Government of West Bengal

Chief Editor
Bratya Basu

নামাঙ্কন
কৃষ্ণেন্দু চাকী

প্রচ্ছদ
সৌরীশ মিত্র

কপি এডিটিং
রাজীব চক্রবর্তী

[ব্যাক কভারের ছবিটি আন্তর্জাল থেকে প্রাপ্ত]

অরূপ সেনগুপ্ত, মহাধ্যক্ষ, বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক বিকাশ ভবন, অষ্টম তল (ইস্ট ব্লক), কলকাতা-৯১ থেকে প্রকাশিত।
দূরভাষ : ০৩৩-৩২৬২ ৪৬৭৮

বিনিময় : ৩০০ টাকা

সূচি

প্রধান সম্পাদকের কলমে

বিষয় ।। **ইতিহাস ও সংস্কৃতি**

সুকান্ত চৌধুরী । বাঙালি জীবনে ইংরেজি ৩

দীপেশ চক্রবর্তী । ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থান নাকি গণতন্ত্রেরই পৃথিবীজোড়া অবক্ষয়? ১৬

মৈত্রীশ ঘটক । আত্মপরিচয় ও ইতিহাস ২৩

রণবীর সমাদ্দার । চিরায়ত বাংলা ৩৩

কুমার রাণা । বিপর্যয়ের কাল ও ক্ষিতিমোহন সেনের শিক্ষা ৪৯

জয়ন্ত সেনগুপ্ত । মহাফেজখানার সংস্কৃতি ৬০

ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী । বই-সংস্কৃতি ৭৩

অনুপ ধর । মন-মননের অ-মৌলায়ন ও প্রাকৃতায়ন ৮০

সংযুক্তা দাশগুপ্ত । ভারতের পূর্বাঞ্চলে আদিবাসী আঞ্চলিক ইতিহাস ৮৭

সাবিহা হক । নারীর আত্মকথন ও একটি দেশের পথ পরিক্রমা : নূরজাহান বোস-এর *আগুনমুখার মেয়ে* ৯৯

ঋতজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় । কলকাতা চলন্তিকা: ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও সমকালীন সমাজ (১৯১১-১৯৩১) ১১৫

শিমূল সেন । অপরের সংস্কৃতি ১২৭

ক্রোড়পত্র ।। **কলকাতা**

সুগত বসু । সংস্কৃতির ছোঁওয়া, ইতিহাসের ছায়া:
কলকাতায় বড়ো হয়ে ওঠা ১৪১

অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। জলের শহর, কলের শহর
(অলংকরণ : সারনাথ ব্যানার্জি) ১৪৭

সুরঞ্জন দাস । কলকাতার গুন্ডাদের জগৎ: পুলিশ
নথির ভিত্তিতে ফিরে দেখা ১৫৬

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য । কলকাতার রেস্তোরাঁ : কাল, আজ, কাল ১৭০

রন্তিদেব মৈত্র । অন্তরঙ্গ বৈঠক ও জলসার খোঁজে এক যুবক ১৮৩

অরুণ নাগ । পুরোনো কলকাতার দিশি সমাজ ১৯৩

কৃষ্ণপ্রিয় দাশগুপ্ত । কলকাতার নেশাড়ু ও পানাড়ু ২০০

স্নেহাশিস সুর। কলকাতায় সাংবাদিকতা : সেকাল থেকে একাল ২৪৫

সুমিত চক্রবর্তী । এলা-দি, বালিগঞ্জ, আর ইন্টেলেকচুয়াল
কলকাতার মেজাজ ২৬১

বরুণ চট্টোপাধ্যায় । কলকাতার গিলে করা হাড় :
একটি পদ্যের বেত্তান্ত ২৭৬

অর্ণব সাহা। উনিশ শতকের কলকাতায় বটতলার বই ২৯৩

পরিচয় পাত্র । কলকাতার ফিল্ম সোসাইটি :
ইতিহাসের অবসান? ৩১২

শুভ্রাংশু রায় । খেলার কলকাতা, কলকাতায় খেলা ৩২০

পিনাকী রায় । কলকাতার বিনোদন ৩৩৭

প্রধান সম্পাদকের কলমে

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয়শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের মুখপত্র *শিক্ষাদর্পণ*। সারস্বতচর্চার বিভিন্ন অভিমুখে মনন ও মেধাকে মূলধন করে ভাবনার প্রসারণ ঘটাতে ও চিন্তার খোরাক যোগাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে পত্রিকা।

তাই, প্রথম সংখ্যা থেকেই বিষয়ে, আকারে, প্রকারে নবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে *শিক্ষাদর্পণ*।

ষান্মাসিক এই পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটি প্রতিশ্রুত সময়েই প্রকাশিত হতে চলেছে। এ সংখ্যার বিষয় ভাবনা- 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি'। কোনও বিশেষ দেশ-কালের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক জীবনের দিকে একবগ্গা দৃষ্টি নয়, বরং এর বিপ্রতীপে একটি বৃহৎ প্রেক্ষাপটই অন্বিষ্ট ছিল আমাদের। যে ইতিহাস আত্মপরিচয়ের, কিংবা ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থান, চিরায়ত বাংলা কিংবা বাঙালি জীবনে ইংরেজি থেকে শুরু করে মহাফেজখানার সংস্কৃতি, কিংবা অপরের সংস্কৃতি কীভাবে মন ও মননের প্রাকৃতায়ন ঘটিয়ে চলেছে অবিরত, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন পৃথিবী বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ ও গবেষকরা।

শিক্ষাদর্পণ-এর এই সংখ্যার ক্রোড়পত্র 'কলকাতা'। যে শহর জানে আমাদের অনেকের প্রথম সবকিছু, সেই শহরের অস্থিমজ্জা ছেনে-ঘেঁটে আলো আর অন্ধকারের গভীরে থাকা রংগুলিকে আবারও নতুন করে চেনাবে

ক্রোড়পত্রের প্রবন্ধগুলি। ব্যক্তিগত কথা, স্মৃতি-কাতরতা, নতুন শহরের ভাঁজে পুরোনো আমেজ আর আড্ডা শহরটিকে নিয়ে নতুন করে পাঠককে ভাবাবেই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উজ্জ্বল উপস্থিতি ও নিরলস আনুকূল্য *শিক্ষাদর্পণ* পত্রিকাকে প্রযোজনা করে চলেছে। আমরা নিশ্চিত আগামী সমস্ত পরিকল্পনায় ও কাজে তাঁর উপদেশনা আমাদের পাথেয় হবে।

যান্মাসিক *শিক্ষাদর্পণ* বৃহত্তর পাঠকের কাছে সংগ্রহযোগ্য একটি সংখ্যা হিসেবে আবারও আদৃত হবে বলেই আমার বিশ্বাস। নবপর্যায়ে এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা পাঠকমহলে যে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে, তা আমাদের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করেছে। পরবর্তী সমস্ত সংখ্যাই এভাবে হয়ে উঠুক গবেষক, পাঠকের আগ্রহের বিষয়, যোগাযোগের নিরন্তর সেতু।

ব্রাত্য বসু

২৬.০৭.২০২৪

ইতিহাস
ও
সংস্কৃতি

বাঙালি জীবনে ইংরেজি

সুকান্ত চৌধুরী

বঙ্গভূমির প্রথম ইংরেজিনবিশ না ছিলেন বিদ্বান সমাজের না অভিজাত শ্রেণির। তাঁর নাম রতন সরকার, আদি পেশা রজক। ইংরেজদের দোভাষী হিসেবে কাজ শুরু করে ক্রমশ খাতির জমিয়ে তিনি প্রচুর অর্থ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সময়টা ছিল ১৬৮০ নাগাদ অর্থাৎ ব্রিটিশ কলকাতা প্রতিষ্ঠার আগে।

আঠারো শতকে কলকাতা ও বাংলার অন্যত্র কিছু ইংরেজি স্কুল গড়ে ওঠে, ইংরেজ, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ও ক্রমে ভারতীয়দের জন্য। তার কিছু দাতব্য বা মিশনারি প্রতিষ্ঠান, কিছু চালাতেন সাহেব বা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, কিছু বাঙালিরা। এই স্কুলগুলিতে উচ্চবর্গীয় বঙ্গসন্তানেরা অবশ্যই পড়ত— যেমন উনিশ শতকের গোড়ায় দ্বারকানাথ-সহ ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা গেছেন শেরবোর্ন সাহেবের স্কুলে। ডিরোজিও পড়েছিলেন ড্রামন্ড সাহেবের 'ধরমতলা অ্যাকাডেমি'তে। কিন্তু মধ্যবিত্ত ও সাধারণ ঘরের ছেলেরাও ইংরেজ রাজত্বে উন্নতির আশায় তার ভাষাটা শিখত, স্কুলে ও স্কুলের বাইরে। গরিব ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষার জন্য কলকাতায় ও মফস্বলে আরও কিছু প্রচেষ্টা হয়েছিল। ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগ তো সর্বজনবিদিত: তাঁর পালকির পিছনে গরিব ছেলেরা দৌড়াত, ভাঙা ইংরেজিতে তাঁর স্কুলে ভর্তির আর্জি জানিয়ে। বালক বিদ্যাসাগরকেও 'হের সাহেবের স্কুল'-এ ভর্তির কথা উঠেছিল। শুভার্থীরা পরামর্শ দিয়েছিলেন, ইংরেজিটা 'মোটামুটি শিখিতে পারিলেও, অনেক কাজ দেখিবেক, ... সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে ও সাহেবদের বড় বড় দোকানে

অনায়াসে কর্ম্ম করিতে পারিবেক।'[১] ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগ্যিস অন্যরকম ভেবেছিলেন।

এই 'মোটামুটি শেখার' কৌতূহলকর বিবরণ আছে রাজনারায়ণ বসুর *সেকাল আর একাল* এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*-এ। *সেকাল আর একাল*-এ যান্ত্রিক মুখস্থবিদ্যা এবং বাংলা বাগ্‌ধারার অন্ধ ইংরেজি অনুকরণের দৃষ্টান্তগুলি একাধারে মজাদার ও ভীতিপ্রদ। সেই ইংরেজি পড়াত যে 'স্কুল-মাষ্টর' তাদের 'উচ্চারণ কদাকার, শিক্ষাপ্রণালী অপকৃষ্ট'।[২] এমন ইংরেজি পাঠের উদ্দেশ্য একটাই, সাহেবদের জমানায় চাকরি লাভ। এর মধ্যেই যাদের মেধা ছিল ও ভালো শিক্ষক জুটেছিল, তাদের ইংরেজি কেবল শুদ্ধ নয়, কার্যকর ও আকর্ষণীয় হতে পেরেছে।

বাঙালিদের মধ্যে প্রথম সার্থক ইংরেজি রচয়িতা কে? অবশ্যই রামমোহন। তাঁর বাংলা পড়তে গিয়ে আধুনিক পাঠক থেকে থেকে হোঁচট খান, কিন্তু লর্ড অ্যামহার্স্টকে লেখা তাঁর ওজস্বী ইংরেজি পত্রে কোথাও টক্কর নেই। রামমোহন বিদ্যালয়ে ইংরেজি শেখেননি; ভাষাটা আয়ত্ত করেছেন কর্মজীবনে, বিশেষত উপরওয়ালা ও সুহৃদ ডিগবি সাহেবের কল্যাণে।

এদিকে ১৭৮৪-তে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয়েছে, পাশ্চাত্য বিদ্যার আলো বাংলার আকাশে দেখা দিয়েছে। বাঙালি বুঝতে শুরু করেছে— রামমোহন (ও তারপর বিদ্যাসাগর) অবশ্যই বিশেষ করে— যে ইংরেজি পড়লে সওদাগরি আপিসের গণ্ডী ছাড়িয়ে বিদ্যার অসীম দিগন্ত খুলে যাবে। অর্থাৎ জ্ঞানের বাহন বা মাধ্যম হিসাবে বাঙালি মনে ইংরেজির প্রতিষ্ঠা তখন থেকেই শুরু। রামমোহন প্রথম পাশ্চাত্য বিদ্যার সংস্পর্শে আসেন আরবি ভাষার মাধ্যমে, আরবিতেই প্রথম অ্যারিস্টটল পড়েন। কিন্তু তিনি বিলক্ষণ বোঝেন, এই বিদ্যা জাতির জীবনে অঙ্গীভূত করতে ইংরেজিই একমাত্র পথ। সে কথাটা তিনি অ্যামহার্স্টকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, সফল হননি।

ফলে এক উলট পুরাণ ঘটল: ইংরেজ কোম্পানি স্থাপন করল সংস্কৃত আর আরবি-ফারসির শিক্ষাকেন্দ্র, আর ভারতীয় উদ্যোগে ও হেয়ারের মতো কতিপয় ইংরেজের সমর্থনে ১৮১৭-তে গড়ে উঠল ইংরেজি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজ। ব্রিটিশ সরকার অবশেষে নীতি পরিবর্তন করে ইংরেজিকে প্রাধান্য দিল ১৮৩৫-এ লর্ড বেন্টিংকের শাসনকালে। সেই নীতির পক্ষে জোর সওয়াল করলেন অ্যালেক্সান্ডার ডাফ, তাঁর *New Era of the English Language*

and English Literature in India রচনায়। ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রসঙ্গে ডাফের চেয়ে মেকলের নামই বেশি উল্লেখিত, কিন্তু ডাফের ক্ষুদ্র গ্রন্থটি অনেক বিশদ ও সুচিন্তিত, যদিও ধর্মান্তরের অভিপ্রায়দুষ্ট।

ইংরেজি শিক্ষা বলতে ভাষা শিক্ষা এবং ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চা দুটোই বোঝাচ্ছি— ডাফের কথায়, 'the dissemination of European knowledge through the medium of the English language'।[৩] ডাফ স্পষ্ট বলছেন, এই বিদ্যাচর্চার সূচনা ব্রিটিশ সরকারের প্রচেষ্টায় হয়নি, হয়েছে হিন্দু কলেজ স্থাপনের ফলে। তার শুভ ও উৎকট প্রকাশ দুই-ই একাধারে দেখা গেল হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের সবচেয়ে বিতর্কিত পরিণতি ইয়ং বেঙ্গলের কৃষ্টিতে। উৎকট প্রকাশের পরাকাষ্ঠা ঘটল ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি মদ-মাংস সহ ইংরেজের জীবনযাত্রা ও দৃষ্টিভঙ্গির তরল অনুকরণে, এবং সেটা হাতিয়ার করে নতুন শ্রেণিগৌরবে। তার বিধ্বংসী ব্যঙ্গ দীনবন্ধুর *সধবার একাদশী*-তে নিমচাঁদের বিজাতীয় বোলচাল, ইংরেজি সাহিত্যের আলটপকা উদ্ধৃতি আর মাতাল প্রলাপে।

কৃষ্ণদাস পাল তাঁর ইয়ং বেঙ্গলের দীর্ঘ প্রশস্তিতে বলছেন, ইয়ং বেঙ্গলের মধ্যে গোড়ায় এমন ধারা দেখা গিয়েছিল ঠিকই: 'They used to extol the English to the skies, and see in the British Government the traits of All-Perfection. They used to breathe a spirit of hostility to men of their color.'[৪] এ তো ঠিক মেকলের কল্পলব্ধ দিশি সাহেবের বাস্তবায়ন: 'a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect'।[৫] তবে ১৮৫৬-তে লিখতে বসে কৃষ্ণদাস বলছেন, সে দিন গেছে। তাঁর সমকালীন ইয়ং বেঙ্গলের আছে প্রগাঢ় দেশাভিমান। এখানেও কিন্তু প্রশ্নের অবকাশ আছে। বঙ্গীয় যুবসমাজের 'informed and enlightened souls' উদ্বুদ্ধ হচ্ছে রবার্ট ব্রুস, জন হ্যাম্পডেন, ওয়াশিংটন, জেফারসন প্রমুখের দৃষ্টান্তে। এমন চেতনা কি একশো ভাগ স্বাধীন? তার দেশাত্মবোধে কি পরনির্ভরতার কিছু মিশেল আছে? নাকি বিদেশি কৃষ্টিকে সে আত্মস্থ করতে চাইছে এক অভিনব বিশুদ্ধতার আশায়?

উত্তরের খোঁজে দেখা যাক ধুতি-চাদর-চটি শোভিত অথচ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'য়ুরোপীয় মহাজনদের সহিত তুলনীয়'[৬] যুগন্ধর পুরুষটিকে। রামমোহনের মতো পুরোপুরি না হোক, বিদ্যাসাগরও বলতে গেলে ইংরেজি শিখেছিলেন

ছাত্রজীবনের পরে। তারপর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে রচনা করলেন চূড়ান্ত বৈপ্লবিক এক ভাষানীতি। তার প্রথম কটি বাক্যই তাঁর চিন্তার নির্যাস বহন করছে:

1. The creation of an enlightened Bengali Literature should be the first object of those who are entrusted with the superintendence of Education in Bengal.
2. Such a Literature cannot be formed by the exertions of those who are not competent to collect the materials from European sources and to dress them in elegant expressive idiomatic Bengali.
3. An elegant, expressive and idiomatic Bengali style cannot be at the command of those who are not good Sanscrit scholars. Hence the necessity of making Sanscrit scholars well versed in the English language and literature. ...
5. It is very clear then that if the students of the Sanscrit College be made familiar with English Literature, they will prove the best and ablest contributors to an enlightened Bengali Literature.[৭]

সংস্কৃত আর ইংরেজির যুগ্ম উত্তরাধিকার সমৃদ্ধ করবে বাংলা ভাষাকে। Literature বলতে এখানে কেবল সাহিত্য নয়, সে যুগের প্রচলন অনুসারে ভাষায় সবরকম রচনা বোঝাচ্ছে।

ভাবলেও রোমাঞ্চ হয়, এই 'ত্রিভাষা নীতি' তখন থেকে ধারাবাহিকভাবে অনুসৃত হলে ভারতের জ্ঞানচর্চা ও মননের পরিমণ্ডল আজ কোন্ তুঙ্গে পৌঁছত। মেকলের ভূত আমাদের শিক্ষাচিন্তার ঘাড়ে চেপে সেই সম্ভাবনা বানচাল করেছে। তবু দুই শতক ধরে অশেষ অসার ও ভ্রান্ত প্রকাশ সত্ত্বেও এক নিবিড়ভাবে দ্বিভাষিক শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তাও জোর গলায় স্বীকার করতে হয়।

এই বিবর্তন দীর্ঘ ও বহুমাত্রিক। রাজনারায়ণ সেকালের বেঢপ ইংরেজি পাঠের বিবরণ দিয়ে বলছেন, 'ইংরাজী শিক্ষার এই দুর্দশা হিন্দু-কালেজ সংস্থাপিত হইলে বিমোচিত হইল'।[৮] বিমোচন রাতারাতি ঘটে থাকতে পারে না। ধরে নেওয়া যায়, পেটের দায়ে ও সামাজিক উন্নতির আশায় গরিব ও অনগ্রসর শ্রেণির সেই অপটু ইংরেজি চর্চাও হিন্দু কলেজের শিক্ষাকাণ্ডের পাশাপাশি চলেছে, আস্তে আস্তে কমেছে সাধারণ সমাজে শিক্ষার প্রসারের ফলে। ইংরেজি

ক্রমায়িতভাবে ছড়িয়ে পড়েছে বাঙালির জীবন ও মননের ব্যাপক ভূমি জুড়ে, আবার আদৌ প্রবেশ করেনি আরও বিশাল ক্ষেত্রে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে শতাধিক বছর ইংরেজি শিক্ষার সবচেয়ে প্রচলিত উপক্রমণিকা ছিল প্যারীচরণ সরকারের *ফার্স্ট বুক অভ রিডিং* (ও পরবর্তী আরও পাঁচটি ভাগ)। প্যারীচরণের কীর্তি আজও উপযুক্ত স্বীকৃতি পায়নি। বইটির শিরোনামে 'for Native Children' শব্দগুলি আজ বিসদৃশ ঠেকে, কিন্তু তার নেপথ্যে আছে দরদ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। এ বইয়ের আগে ভারতীয় ছাত্রেরা ইংরেজি শিখত ইংল্যান্ডের শিশুদের জন্য লেখা প্রাইমার থেকে। তার বদলে যে শিশুর মাতৃভাষা ইংরেজি নয়, তার কথা ভেবে প্যারীচরণ লিখলেন ধ্বনিভিত্তিক পদ্ধতিতে (phonic system) সুপরিকল্পিত প্রবেশপুস্তক, জুড়ে দিলেন শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশাবলি। আরও আশ্চর্য কথা, কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের শিক্ষক প্রসন্নকুমার গুপ্ত এক অভিনব নমুনা-নির্দিষ্ট সমীক্ষা (controlled case study) করে বইটির উপকারিতা প্রতিষ্ঠা করলেন। পরবর্তী একাধিক সমীক্ষায় তা নতুন করে প্রত্যয়িত হয়।[৯]

শোনা যায় প্যারীচরণ নাকি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলোচনা করে এই ইংরেজি উপক্রমণিকা লেখেন, বিদ্যাসাগর লেখেন বাংলার জন্য। গল্পটা হয়তো সঠিক নয়, কিন্তু বৃহত্তর দৃষ্টিতে *ফার্স্ট বুক* অবশ্যই বিদ্যাসাগরের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাপ্রণালীর অঙ্গ। এই সিঁড়ি বেয়েই বাংলার যুবসমাজের এক অংশ— অবশ্যই ক্ষুদ্র অংশ, উপরন্তু প্রায় সকলেই পুরুষ— প্রবেশ করল উচ্চতর বিদ্যার খাসমহলে। অবধারিতভাবে ইংরেজি হল উচ্চশিক্ষার একমাত্র বাহন।

এই উন্নীত পাঠের মস্ত মডেল হিন্দু কলেজের পাঠ্যক্রম। (ড্রামন্ড সাহেবের অ্যাকাডেমির মতো দু-একটি স্কুলে তার পূর্বাভাস দেখা যাবে।) প্রথম যুগে হিন্দু কলেজে ছাত্রেরা ভর্তি হত নেহাত বালক বয়সে। সেখান থেকে ধাপে ধাপে তারা পৌঁছত ইংরেজি সাহিত্যের শিখরে। পড়ত শেক্সপিয়রের অনেকগুলি নাটক, যার কতকগুলি যে কোনও যুগে যে কোনও পাঠ্যক্রমেই বিরল। (দেড়শো বছর বাদে এই প্রবন্ধকারের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ইংরেজি ক্লাসে তার অর্ধেকও পড়তে হয়নি।) এই সাহিত্যপাঠের পোক্ত ভিত গাঁথা হল ১৮৩৬-এ, ডাকসাইটে অধ্যাপক ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন সম্পাদিত *Selections from the British Poets* নামে বিশাল সংকলনে। প্রচুর ইংরেজি রচনার পাশাপাশি তাতে ছিল অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্যের বেশ কিছু নিদর্শন।

কোন্ ছাত্র তার কতটা পড়ত তা অনুমানের বিষয়। তবে বলা চলে, এই সংকলনই বাংলায় (এবং ভারতের অন্যত্র) ইংরেজি সাহিত্যপাঠের রূপরেখা নির্দিষ্ট করে দিল, আর তা করল যথেষ্ট ব্যাপকভাবে। এও বলতে হয়, তার পর থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক পাঠ্যসূচিতে সেই পরিধি ক্রমশ সংকুচিত হয়ে এসেছে; কিন্তু সবটাই রয়ে গেছে উৎসাহী ছাত্রের গোচরে, পাশ্চাত্য সাহিত্যপাঠের বিপুল সম্ভাবনা নির্দেশ করে।

মেকলীয় নীতির প্রভাবে (ও ভারতের শিক্ষিত এলিটের প্রবল সমর্থনে) আধুনিক ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় ধরেই নেওয়া হল যে শিক্ষিত মানুষমাত্রে অল্পবিস্তর ইংরেজি জানবে। (এই ধারণা আজও সমাজ আঁকড়ে আছে, যদিও বাস্তব চিত্র উত্তরোত্তর অন্যরকম বলছে, বলতে বাধ্য।) ভালোমন্দ রকমফেরে ইংরেজি অধিষ্ঠিত হল যেমন এলিট তেমনি যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষাপ্রাপ্ত সাধারণ মানুষের জীবিকা ও মননের জগতে— অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যে, কখনও মোড়ক, কখনও ভিতরের আসল সামগ্রী হয়ে। অন্যভাবে বললে, ইংরেজি হয়ে উঠল বাঙালি তথা ভারতীয়ের অভীষ্টলাভের চাবিকাঠি: যে-সে চাবি নয়, সব দরজা খোলে এমন সর্বংসহায়ক 'মাস্টার কি'। একদিকে সমাজের উচ্চবর্গের (এবং মুষ্টিমেয় অন্য মানুষের) কাছে সত্যিই উঁচুদরের, এমনকি সৃষ্টিশীল ইংরেজি চর্চার পথ খুলে গেল। সেই পথেরও বিস্তর শাখা-প্রশাখা। কিছু বাঙালি রাজভাষা কাজে লাগিয়ে ঔপনিবেশিক শাসক ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর ছত্রছায়া লাভ করল, পদস্থ আমলা থেকে কনিষ্ঠ কেরানি সব স্তরে। অপর কিছু বাঙালি দেশভর ছড়িয়ে পড়ল তথাকথিত 'বিদ্বান' পেশা ধরে— চিকিৎসক, অধ্যাপক, আইনজীবী, প্রযুক্তিবিদ। অর্থাৎ কেবল বাংলায় নয়, ঔপনিবেশিক ভারত জুড়ে যে নব্য এলিটের উদয় হল, বাঙালি তাতে একটু অতিরিক্ত জায়গাই দখল করল: হাতিয়ার সেই ইংরেজি শিক্ষা। সর্বোপরি সেই শিক্ষাপুষ্ট একটা অংশ নিতান্ত বৌদ্ধিক প্রেরণাতেই পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও কৃষ্টির চর্চা করতে লাগল।

এর ফলে একটা উদ্দীপক অঘটন ঘটল: ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য থেকে বাঙালি ছিনিয়ে আনল স্বাধীন চিন্তা ও বিদ্যাভ্যাসের সূত্র। তার এক দৃশ্যমান প্রকাশ, উনিশ শতকের অগ্রভাগ থেকেই কলকাতা ও অন্যত্র বহু আলোচনাচক্র ও বক্তৃতাসভার পত্তন: তাদের আলোচ্য বিষয়ে যতই বৈচিত্র্য থাক, ভিত্তি ছিল নবলব্ধ ইংরেজি শিক্ষা। আরও গভীর ও স্থায়ী প্রকাশ অবশ্যই বাংলার নবজাগরণের সাহিত্য ও চিন্তায়।

যেখানে এত প্রয়োগ, এত অভিব্যক্তি, সেখানে প্রতিক্রিয়া ও মানসিক যোগও নানাবিধ হতে বাধ্য। স্বীকার করতেই হবে, যেখানে ইংরেজি জীবিকার সহায় মাত্র, সেখানে তা বহির্বাটির অতিথি, বিজাতীয়তার বাধা কাটিয়ে বাঙালির অন্দরমহলে ঢোকেনি। এ যেন alienation of labour বা শ্রমিকের বিচ্ছিন্নতাবোধের এক অভিনব প্রকাশ। ভাষার সঙ্গে এখানে বাঙালির যোগ কেবল কর্মক্ষেত্রের যন্ত্র বা উপলক্ষ্য হিসেবে; সেই কর্মকাণ্ড থেকে তার নিজের কোনও গভীরতর সন্তুষ্টি সে প্রত্যাশা করছে না। ১৯১৫ সালে 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন: 'আমাদের বিলাতী বিদ্যাটা কেমন ইস্কুলের জিনিস হইয়া সাইনবোর্ডে টাঙানো থাকে, আমাদের জীবনের ভিতরের সামগ্রী হইয়া যায় না। তাই পশ্চিমের শিক্ষায় যে ভালো জিনিস আছে তার অনেকখানি আমাদের নোটবুকেই আছে; সে কী চিন্তায়, কী কাজে ফলিয়া উঠিতে চায় না।'[১০]

লক্ষণীয় যে রবীন্দ্রনাথ কেবল ইংরেজি ভাষাশিক্ষা নয়, ইংরেজির মাধ্যমে প্রাপ্তব্য সমস্ত জ্ঞান ও মননের কথা বলছেন। আগেই বলেছি, ভারতে ইংরেজিচর্চায় এই দুটি ধারা আলাদা করা যায় না। কিন্তু একেবারেই 'ফলিয়া উঠিতে' চায়নি, তাই বা বলি কী করে? উনিশ শতক থেকেই ইংরেজি শিক্ষার প্রাণদায়ী নির্যাস বাঙালি (ও অন্যান্য ভারতীয়) সমাজ ও চিন্তা সিঞ্চন করেছে, ফসল ফলিয়েছে। এই প্রাপ্তির কয়েকটি দিক অতি সংক্ষেপে ছুঁয়ে যাচ্ছি।

সোজাসুজি প্রকাশ বাঙালির ইংরেজি সাহিত্যপাঠে। তার সবচেয়ে চর্চিত ধারা বিশ শতক জুড়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের কিছু কিংবদন্তী অধ্যাপকের অবদান, হ্যারিংটন হিউ মেলভিল পার্সিভাল থেকে (হ্যাঁ, ইনি ছিলেন চট্টগ্রামের বাঙালি) প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও তারকনাথ সেন হয়ে অরুণকুমার দাশগুপ্ত পর্যন্ত। এই প্রবন্ধকার সেই ধারায় লালিত ও পুষ্টিত, সে ঋণ শোধ হবার নয়। তবু বলতে হয়, পাশাপাশি আর কিছু বিদ্বানের অবদান বাঙালির কাছে যথার্থ স্বীকৃতি পায়নি, আন্তর্জাতিক মহলে যদিও পেয়েছে খানিক বেশিই, গ্রন্থ প্রকাশের ফলে। বিশেষভাবে স্মরণীয় মোহিনীমোহন ভট্টাচার্যের স্পেনসর ও রেনেসাঁস যুগ নিয়ে গবেষণা, এবং শৈলেন্দ্রকুমার সেনের শেক্সপিয়রের পাঠতত্ত্বের অনুসন্ধান। উপযুক্ত স্বীকৃতি পাননি প্রেসিডেন্সির বাইরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কিছু অসামান্য শিক্ষক, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ও নীরেন্দ্রনাথ রায় থেকে জ্যোতি ভট্টাচার্য পর্যন্ত। (সমকক্ষ কারও নাম বাদ পড়ে থাকলে পাঠক মার্জনা করবেন।) আর অবশ্যই স্মরণীয়

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, বিশেষ করে এইজন্য যে এঁদের লেখনীর বিচরণ একাধারে ইংরেজি ও বাংলা, এমনকি সংস্কৃতের ভূমিতে। (এ কথা জ্যোতি ভট্টাচার্য সম্বন্ধেও খাটে।)

সরাসরি ইংরেজিচর্চার কথা একটু বিস্তারেই লিখলাম। পাশ্চাত্য বিদ্যার অন্যান্য ক্ষেত্র নিয়ে অনধিকার চর্চা করব না, যদিও সেখানে বাঙালির অবদান বহুগুণ বেশি। (যথেষ্ট কিনা, এবং যথেষ্ট স্বীকৃতি পেয়েছে কিনা, সে বিচার যাঁরা সম্যক জানেন তাঁরা করবেন।) বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় অবস্থিত বাঙালি বিজ্ঞানীরা বিশ্বস্বীকৃতি পেয়েছেন। কেউ কেউ আজও পাচ্ছেন, যদিও বিশ্বায়নের যুগের ভিন্ন প্রেক্ষিতে হয়তো তা অতটা নজর কাড়ছে না। তাঁদের অবদান নিয়ে কোনও কথা বলা আমার পক্ষে হবে চরম ধৃষ্টতা। তার চেয়ে আমার আলোচনায় প্রাসঙ্গিক আর একটা বিষয় দেখা যাক।

বিশ শতকের প্রথমার্ধের উজ্জ্বলতম বাঙালি বিজ্ঞানীদের প্রায় সকলেই স্কুলে পড়েছেন বাংলা মাধ্যমে। আমার জ্ঞানত একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হলেন জগদীশচন্দ্র। তাঁদের উত্তরসুরিদের অধিকাংশের সম্বন্ধেও এ কথা খাটে, দেশে বা বিদেশে যেখানেই তাঁরা পরে প্রতিষ্ঠালাভ করে থাকুন। তার সহজ কারণ, বিজ্ঞানের মূল চর্চার বস্তু ভাষাভিত্তিক নয়। তবু তা অবশ্যই ভাষায়িত, এবং সেই ভাষাটা প্রায়শ ইংরেজি। ইংরেজিকে তাঁদের বিদ্যাচর্চার বাহন হিসেবে এই কৃতী মানুষেরা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেছেন ও করছেন। এখানে বিশেষভাবেই দেখা যাচ্ছে, আধুনিক বাঙালির জ্ঞানচর্চার মাটি খুঁড়লে উঠে আসছে ইংরেজির অন্তর্মৃত্তিকা, উপরের ভাষা ইংরেজি বাংলা যাই হোক না কেন।

আমার পুরো আলোচনা থেকে আরও বেরিয়ে আসছে একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র: বঙ্গীয় (বা যে কোনও ভারতীয়) সমাজে ইংরেজির স্থান ও প্রভাব কেবল ইংরেজি ভাষায় লেখা নথিপত্র ও সাহিত্য থেকে বোঝা যাবে না। প্রধান সাক্ষ্য মিলবে ঔপনিবেশিক ও উত্তর-উপনিবেশ কালে ভারতীয় ভাষায় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার সার্বিক বিবর্তনে। মেকলের নজর এড়িয়ে ভারতে ইংরেজি ভাষা এক ভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তা বিদ্যাসাগরের স্বপ্ন পুরোপুরি সার্থক না করুক, দেশজ ভাষা ও কৃষ্টির সঙ্গে মিলে একটা যৌগিক রসায়ন অবশ্যই সাধন করেছে। 'শিক্ষার বাহন'-এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গাযমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে

বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে।'[১১] এখানে রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য বিষয় উচ্চশিক্ষার মাধ্যম, তাই এই সংযোগটাকে তিনি ভবিষ্যতে প্রক্ষিপ্ত করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে সেই সংযোগ ততদিনে আংশিক ও অসমঞ্জস হলেও রীতিমতো বিদ্যমান, রবীন্দ্রনাথের নিজের সাহিত্যকীর্তিই তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

রবীন্দ্রনাথের আগে এসেছেন মাইকেল, এসেছেন বঙ্কিম। এসেছেন আরও কত রচনাকার, সকলের আলোচনার জন্য চাই আলাদা প্রবন্ধ। এই দুজনকেই দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক। আর সত্যিই তো, সে যুগেও এঁরাই সমসাময়িকদের সামনে অভিনব দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন।

মাইকেলের দৃষ্টান্ত বিশেষভাবে স্বকীয়, অননুকরণীয়। তার কারণ মাইকেল তাঁর অবদানকে কেবল বিষয়বস্তু, রচনাকৌশল বা সংরূপে আবদ্ধ রাখেননি, বাংলা ভাষাটাকেই পুনরাবিষ্কার করেছেন ইংরেজির আলোয়, কখনও যেন প্রায় বাংলায় ইংরেজি লিখেছেন; অথচ তাতে বাংলার ধর্ম ক্ষুণ্ণ হয়নি, সার্থক হয়েছে, ইংরেজিও নতুন মাত্রা পেয়েছে বাংলার ভূমিতে। বলতে ইচ্ছে করে, মাইকেলের ইংরেজি ভাষায় পারদর্শিতার সবচেয়ে উজ্জ্বল নিদর্শন *মেঘনাদবধকাব্য*। ইয়ং বেঙ্গলের নতুন আমদানি সেখানে ভারতের নিজস্ব সম্পদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে আশ্চর্য নতুন রসায়নে। ইংরেজি আর বাংলার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কাঙ্ক্ষিত গঙ্গাযমুনার সঙ্গম যদি কোথাও একেবারে মৌলিক স্তরে ঘটে থাকে, তা মাইকেলের অমিত্রাক্ষরে।

অত নাটকীয়ভাবে না হলেও বাঙালির আহরিত ইংরেজি সাহিত্যের সৃষ্টিশীল রূপান্তর ঘটেছে বঙ্কিমের উপন্যাসে, যেমন আরও ব্যাপক পাশ্চাত্য চিন্তার দেশোপযোগী রূপান্তর তাঁর (এবং অক্ষয়কুমার বা রমেশচন্দ্র প্রমুখের) অন্য গদ্যসাহিত্যে। এখানে তার বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই, প্রয়োজনও নেই: বাংলার নবজাগরণের চিন্তা ও সাহিত্য জুড়ে দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। আর এক বিরাট উদ্ভাবন বাংলার যাত্রার সঙ্গে সমধর্মী পাশ্চাত্য নাটক অঙ্গীভূত করে নতুন নাট্যমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। বিশেষ করে শেক্সপিয়রের উপস্থিতি কিছু নাটকে স্পষ্ট, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল, এই পুরো নাট্যরীতিতে ফল্গুধারার মতো শেক্সপিয়রের রস ও নাট্যশৈলী বহমান, যদিও অধিকাংশ নাটকে সরাসরি শেক্সপিয়রীয় উপাদান আদৌ নেই।

রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যতিক্রমী প্রতিভা থেকে কোনও সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না, তাঁর আলোচনা থাক। কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর প্রথম প্রজন্মের কবি-সাহিত্যিকদের ভিতরেও মূলত ইংরেজির মাধ্যমে সঞ্চারিত এক অভিনব কসমোপলিটানিজম দেখা যায়। সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দের মতো কবি বা মানিক ও সতীনাথের মতো ঔপন্যাসিকের পাশ্চাত্য সাহিত্যচেতনা প্রশ্নাতীত, তারাশঙ্কর বা জীবনানন্দে আরও প্রচ্ছন্ন কিন্তু হয়তো আরও নিবিড়। জীবনানন্দের যে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত হয়েছে, তাতে আছে তাঁর স্বরচিত ইংরেজি কবিতা এবং গোটা পঞ্চাশ খাতা ভরে ডায়ারিধর্মী ইংরেজি রচনা। বিশ শতকের মাঝামাঝি বাংলা গ্রুপ থিয়েটারেও দেখা গেছে পাশ্চাত্যের ব্যাপক ও আধুনিক প্রভাব, শেক্সপিয়রীয় ধারা পরিত্যাগ করে। অনুরূপ প্রসার দেখা গেছে সত্যজিৎ রায়ের ও কিছুমাত্রায় অন্যদের চলচ্চিত্রে। এই পর্যায়ে যে নাটক বা ছায়াছবিগুলি সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করেছে তাদের ভাষা প্রায়ই ইংরেজি নয়, কিন্তু বাঙালি সেখানে পৌঁছেছে ইংরেজি চর্চা থেকেই যাত্রা শুরু করে।

আজকের বাংলা সাহিত্য, নাটক বা ছায়াছবি নানা গুণে সমৃদ্ধ, কিন্তু তাতে এই কসমোপলিটানিজম তেমন মিলবে না। (দু-চারটি ব্যতিক্রম থাকতে পারে।) বাংলার সব শিল্পরূপই আজ অনেকটা আত্মবদ্ধ: পাশ্চাত্যের যে যে উপাদান আগে থেকেই গৃহীত হয়েছে, তার বাইরে আর তেমন তাকাচ্ছে না। এই প্রবণতার মূলে আছে স্বাধীনতার পর বাংলা আর ইংরেজির মধ্যে এক নতুন সমীকরণ, রবীন্দ্র-বর্ণিত গঙ্গাযমুনার সঙ্গমের বদলে মুক্তবেণী।

আগেই বলেছি, স্বাধীনতার আগে শিক্ষা-সংস্কৃতিতে ইংরেজি আর বাংলার সহাবস্থান মোটামুটি স্বীকৃত ছিল। সেটা সম্ভব হয়েছে কারণ মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম বাদে সে যুগে শিক্ষাব্যবস্থা আবদ্ধ ছিল সমাজের ক্ষুদ্র অংশে, অল্পবিস্তর উচ্চাভিলাষী ও সুযোগপ্রাপ্ত শ্রেণিতে। সর্বজনীন শিক্ষায় ভারতের খতিয়ান আজও হতাশাব্যঞ্জক; তবু স্বাধীনতার পর শিক্ষার যে ব্যাপক প্রসার ঘটল, তাতে পাঠ্যক্রমে যাই লেখা থাক, সকলের কাছে কার্যকরভাবে এই দ্বিভাষিক শিক্ষাদান কঠিন হয়ে পড়ল, ভাষায়-ভাষায় সংযোগের রাশ আলগা হল। ফলে উচ্চকোটির (প্রায়ই উচ্চবর্ণের) শিক্ষিত শ্রেণি তাদের সন্তানদের সরিয়ে নিতে লাগল ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলে। এমন স্কুল কিন্তু বিশ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত

তেমন প্রসার লাভ করেনি। ইংরেজির বিশিষ্ট পণ্ডিতেরাও বাংলা স্কুলে লেখাপড়া করেছেন; তবে সেখানে ইংরেজির একটা বিশেষ স্থান ছিল— কেবল একটা আলাদা বিষয় হিসেবে নয়, সবরকম বিদ্যাচর্চার ভিত্তি হিসেবে।

এক কথায়, অশেষ অসাম্য ও অসঙ্গতি সত্ত্বেও আগের শিক্ষাব্যবস্থায় বাংলা আর ইংরেজি চর্চার গতি ছিল একমুখী ও সংহত। এখন তার বদলে বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে। বঙ্গসমাজে (এবং ভারতের প্রায় সর্বত্র) উদয় হয়েছে নতুন দুই একভাষী শ্রেণির। একটি কেবল মাতৃভাষাতেই স্বচ্ছন্দ (এক প্রজন্ম আগে এদের বৃহদংশ আদৌ শিক্ষার সুযোগ পেত না); অপরটির মাতৃভাষায় খানিক দখল থাকতে পারে, নাও পারে, স্বাচ্ছন্দ্য কেবল ইংরেজিতে। সফলভাবে দ্বিভাষিক এমনকি বহুভাষিক ব্যক্তি এখনও প্রচুর কিন্তু উত্তরোত্তর কমে আসছে, যেমন সংখ্যায় তেমন প্রভাবে। রাষ্ট্রের জীবনে যে আদর্শগত পরিবর্তন ঘটে চলেছে, এই সংকোচন একাধারে তার অন্যতম হেতু ও পরিণাম। ভারতে ইংরেজিচর্চার ভিত ছিল দৃঢ়ভাবে দ্বিভাষিক। সেই ভিত আজ নড়বড়ে হয়ে পড়েছে।

অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও সর্বজনীন স্কুলশিক্ষায় ইংরেজির গ্রহণ-বর্জন, সাপলুডোর ওঠানামা কয়েক দফা দেখা গেছে। বাম আমলে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি বর্জন ঘিরে প্রবল বিতণ্ডা বেধেছিল। প্রাথমিকে ইংরেজি আবার ফিরে এসেছে, সরকারি বিদ্যায়তনের পাশাপাশি মফস্সলে, এমনকি গ্রামাঞ্চলেও দেখা দিয়েছে প্রচুর অসরকারি ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল। কোনও কিছুর ফলেই যে সাধারণ ঘরের বঙ্গসন্তানের ইংরেজিতে দখল বা স্বাচ্ছন্দ্য বেড়েছে এমন বলার সময় আসেনি, আসবে কিনা নিতান্ত অনিশ্চিত। এদিকে উচ্চবিত্তের সন্তানের জন্য গড়ে উঠেছে অত্যন্ত মহার্ঘ ও অল্পবিস্তর সমাজবিচ্ছিন্ন একগুচ্ছ প্রতিষ্ঠান, পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল থেকে ভিন্ন চরিত্রের। সেখানে আজকের জাতীয়তাবাদের দাবি মেনে হয়তো বাংলা পড়ানো হচ্ছে (যদিও প্রায়ই প্রাধান্য পাচ্ছে হিন্দি), কিন্তু ইংরেজির সঙ্গে তার মেলবন্ধন ঘটছে না।

সব মিলিয়ে এই রাজ্যের মাটিতে নানা ঢঙে নানা মাত্রায় ইংরেজি পড়ানো হচ্ছে বটে, কিন্তু প্রায়ই ফলপ্রসূভাবে নয়। যেটুকু ফলপ্রসূ তারও পুরো উপকার রাজ্যে বর্তাচ্ছে না, কারণ সেই ইংরেজিনবিশেরা রাজ্যের বা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাদের হিসেবে ধরলে ইংরেজিতে দক্ষ ও স্বচ্ছন্দ বাঙালির সংখ্যা হয়তো আগের চেয়ে কম নয়, বরং বেশি; কিন্তু শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে তাল রেখে যেভাবে বাড়ার কথা ছিল তা বাড়েনি, শ্রেণিনির্বিশেষে ছড়িয়ে পড়েনি,

বাড়েনি বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে ইংরেজি চর্চার সংযোগ। রাজ্যের সীমার মধ্যে ইংরেজির ফলপ্রসূ চর্চা নিশ্চিত করতে অনেক কিছু ভাবতে হবে করতে হবে, এবং অবশ্যই তা হতে হবে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে সামগ্রিক চিন্তার একটা অঙ্গ হিসেবে।

বিশ্বায়নের ফলে দু-একটি নজরকাড়া উদ্ভাবন নিশ্চয় ঘটেছে। দেশে দেশে প্রবাসী বাঙালিরা নিজেদের জীবনে ইংরেজির সঙ্গে মাতৃভাষার নতুন সংযোগ স্থাপন করছেন। তাতে ইংরেজির খুব একটা রকমফের ঘটছে না; বরং ঘটছে বাঙালি লেখকের ইংরেজি রচনায়, যেখানে বাংলা ভাষা ইংরেজির উপর বৈচিত্র্যময় প্রভাব ফেলছে, ইংরেজির নতুন সম্ভাবনা ফুটিয়ে তুলছে। সবার আগে নাম করতে হয় অমিতাভ ঘোষের। বাঙালি জীবনের নানা দিক তিনি ইংরেজির সূক্ষ্ম রকমফেরে ফুটিয়ে তুলছেন। *দ্য হাংগ্রি টাইড* উপন্যাসে বনবিবির উপাখ্যানের যে রূপান্তর সৃষ্টি করেছেন, বলতে ইচ্ছে করে তা ইংরেজিতে বাংলা লেখা।[১২] মাইকেল যে দুই ভাষার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন, হালকা চালে সীমিত পরিসরে কি এখানে তার উলটোটা দেখা যাচ্ছে? যদি যায়, বিশ্বের ভাষা-রাজনীতিতে তা কী ইঙ্গিত বহন করছে?

আজ বঙ্গভূমিতে ইংরেজির আকাশে নানা ঔজ্জ্বল্যের অনেক নক্ষত্র, অনেক গ্রহের ফের। ঔপনিবেশিক আমলে বঙ্গীয় সমাজে ইংরেজির স্থান বিচিত্র ও বিভক্ত হলেও একটা ছকে বাঁধা পড়েছিল। সেই ছক আজ অবধারিতভাবে ভেঙে গেছে কিন্তু নতুন কোনও বিন্যাস ফুটে ওঠেনি। ইংরেজির গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই, অথচ তা সোজাসুজি গ্রহণ করতেও নানা বাধা। এই পরিস্থিতির মধ্য থেকেই পথ খুঁজে নিতে হবে, খোঁজা হচ্ছেও বিক্ষিপ্তভাবে। নতুন কোনও চিত্র ফুটে ওঠে কিনা, আমরা তা দেখার অপেক্ষায়।

তথ্যসূত্র

[১] 'বিদ্যাসাগর চরিত', *বিদ্যাসাগর রচনাসমগ্র*, স: রঞ্জন চক্রবর্তী প্রমুখ, ১ম খণ্ড ২য় ভাগ, মেদিনীপুর: বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮, পৃ: ৪৪০।

[২] রাজনারায়ণ বসু, *সেকাল ও একাল*, স: স্বপন বসু, কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন, ১৪১৪/ ২০০৭, পৃ: ৩৪।

[৩] Alexander Duff, *New Era of the English Language and English Literature in India*, Edinburgh: John Johnstone, 1837, p.16.

[৪] Kristo Doss Paul, 'Young Bengal Vindicated', *Derozio Remembered,* ed. Sakti Sadhan Mukhopadhyay, Kolkata: Derozio Commemoration Committee, 2008, p. 126.

[৫] Thamos Babington Macaulay, *Speeches: with His Minute on Indian Education,* ed. G.M. Young, London: Oxford University Press, 1935, p. 359.

[৬] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিদ্যাসাগরচরিত', *চারিত্রপূজা; রবীন্দ্র-রচনাবলী,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১১শ খণ্ড, ১৩৯৬/১৯৮৯, পৃ: ১৭৪।

[৭] *প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর,* স: বিমান বসু, কলকাতা: বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি, ১৯৬০, পৃ: ৩৮১।

[৮] রাজনারায়ণ বসু, *সেকাল ও একাল* (পূর্বোল্লেখিত), পৃ: ৩৭।

[৯] দ্র: নবকৃষ্ণ ঘোষ, *প্যারীচরণ সরকার (জীবনবৃত্তান্ত),* কলকাতা: সাহিত্য সেবক সমিতি, ১৩০৯/১৯০২, পৃ: ৮০-৮৩।

[১০] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষার বাহন', *পরিচয়; রবীন্দ্র-রচনাবলী,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩শ খণ্ড, ১৩৯৭/১৯৯০, পৃ: ৫৪০।

[১১] তদেব, পৃ: ৫৪৫।

[১২] Ghosh, Amitav, *The Hungry Tide,* Delhi: Ravi Dayal, 2004, pp. 354-60.

ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থান নাকি গণতন্ত্রেরই পৃথিবীজোড়া অবক্ষয়?

দীপেশ চক্রবর্তী

আমরা কি সত্যিই আবার ফ্যাসিবাদের যুগে এসে পড়ছি? অনেকেই 'হ্যাঁ' বলেন এর উত্তরে। তাঁরা বিশ্বরাজনীতির অঙ্গনে অনেক লক্ষণের দিকে আমাদের নজর টানেন: নানান দেশে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, ব্যক্তিপূজার বা একনায়কতন্ত্রের প্রবণতা, সমালোচনার বা প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ, মিডিয়ার বশংবদতা, সংখ্যালঘু বা অভিবাসী বা 'শরণার্থী' কোনও সম্প্রদায়কে 'অপর' হিসেবে কল্পনা করে তাঁদের হেনস্থা করা, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, আর ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠীর কিছু অংশের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের দহরম-মহরম, ইত্যাদি। এই লক্ষণগুলো দেখলে মনেই হতে পারে যে আমরা হয়তো বা কোনও নয়া-ফ্যাসিবাদের যুগে এসে পড়ছি।

কিন্তু গত শতাব্দীর ফ্যাসিবাদী রাজনীতির লক্ষণ আজ নানান দেশের রাজনীতিতে খুঁজে পেলেও পৃথিবীর রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে একটি বড়ো ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ মেলে না। এখন তো আর পৃথিবীতে দুটো ভাগ নেই, যে বলব এক দল দেশ ফ্যাসিবাদের পক্ষে, আর আরেক দল দেশ তাদের বিরুদ্ধে। সেই ছবিটা নেই যা দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল যেন 'দানবের' সঙ্গে সংগ্রামের জন্য মানুষ 'ঘরে ঘরে' প্রস্তুত হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্যাসিবাদী ও নাৎসিবাদী শক্তির সঙ্গে লড়াই করেছে যে সব দেশ, সেই সব দেশকে— যেমন যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন— তাদের নানান সাম্রাজ্যবাদী অতীত ও ভবিষ্যৎ থাকা সত্ত্বেও আমরা গণতান্ত্রিক (ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে, সমাজতান্ত্রিক) শক্তির প্রতিভূ বলে ধরে নিয়ে ফ্যাসিবাদের বিরোধী একটি শিবির বলে ভেবেছি। যুদ্ধ-পরবর্তী কালে ঠান্ডা

যুদ্ধের সময়ে পৃথিবীকে রাজনৈতিকভাবে অনেক সময়েই মানুষ দুভাবে ভাগ করে দেখেছে — তা সে গণতান্ত্রিক-বনাম-স্বৈরতান্ত্রিক-সর্বনিয়ন্ত্রক (totalitarian) রাষ্ট্রের ভাগ বা সমাজতান্ত্রিক-বনাম-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভাগ, যাই হোক না কেন।

ঠান্ডা যুদ্ধ পৃথিবীকে দুভাগে ভাগ করতে চাইলেও, বুদ্ধিজীবীরা ধরে নিতেন ফ্যাসিবাদ পরাজিত। পৃথিবীজোড়া রাজনীতিতে সমস্ত ফাটল সত্ত্বেও চিন্তাবিদরা মনে করতেন ফ্যাসিবাদ-বিরোধী শক্তির বা শিবিরের জয় হয়েছে। এই সময়েই ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের উদ্ভব আর আফ্রিকায়, এশিয়ায়, নানান দেশে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার অবসান। ১৯৬০-এর দশকে আমেরিকায় কালো মানুষদের নাগরিক অধিকার অর্জনের সংগ্রাম, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ায় আদিবাসী মানুষের সীমিত হলেও কিছুটা স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন, আর ভিয়েতনামের সাধারণ মানুষের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াই— সব মিলিয়ে সেকালে এটা মনে হওয়া কিছু বিস্ময়কর ছিল না, যেন সারা দুনিয়া জুড়ে এক গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ দেখছি। এই যুগেই হানা আরেন্ডটের মতো দার্শনিকের মনে হয়েছিল, রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন দ্বন্দ্বের যুগ এসেছে: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সর্বনিয়ন্ত্রক (totalitarian) রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব।

আজ চিন, রুশ দেশ, তুরস্ক, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, দেখলে অনেক নেতাই আমাদের নজরে পড়বেন যাঁদের রাজনীতির ধরনটা এমন, যে আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তাঁরা যেন ভোটাভুটির কাঠামো অবলম্বন করেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর আক্রমণ চালান। কেবল ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথাই ভাবুন। কুশ্রী ভাষা, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এসে-পড়া দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষের প্রতি— স্মরণে রাখবেন যে এমন মানুষদের 'সস্তা' শ্রমের ওপরেই আমেরিকার অর্থনীতির নানান দিক নির্ভর করে— তাঁর প্রায় বর্ণবিদ্বেষী ব্যবহার, করোনার অতিমারির সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর অবৈজ্ঞানিক মনোভাব ইত্যাদি জেনেও মার্কিন দেশের নেতারা ও বুদ্ধিজীবীরা হয়তো বা ২০২০ সাল পর্যন্তও— আমেরিকার রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও— তাঁদের দেশটিকে গণতন্ত্রের পীঠস্থান মনে করতেন। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প ভোটে হেরে যাবার পর ২০২১ সালের ৬ই জানুয়ারি তাঁর হাজার দুয়েক সমর্থক হোয়াইট হাউসের ওপরে— ট্রাম্প সাহেবের প্রচ্ছন্ন উৎসাহেই— যে তাণ্ডব চালালেন, তা ছিল আমেরিকার ইতিহাসে অকল্পনীয়। ট্রাম্প সাহেবের বিরুদ্ধে আজ ৯১টি মামলা চলছে, অভিযোগ সবই গুরুতর: জালিয়াতি, টাকাপয়সা নয়-ছয় করা থেকে যৌন হেনস্থা ও সেই খবর চাপা দেবার জন্য

তাঁর নির্বাচন-প্রক্রিয়া চলার সময় অন্যকে পয়সা দেওয়া। অভিযোগ প্রমাণ হলে তাঁর জেল হওয়াই স্বাভাবিক। অথচ আজ শুনি ট্রাম্প ব্যতীত রিপাবলিকান পার্টির ভোটের বাজারে গতি নেই। যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, ট্রাম্প আবার মার্কিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে আসতে পারেন সামনের বছর। অন্তত একটি কথা পরিষ্কার: মার্কিন দেশের অনেক, অনেক মানুষের কাছে প্রতিপক্ষের সম্পর্কে ট্রাম্পের কুৎসিত ভাষা, তাঁর বিরুদ্ধে একানব্বইটি অভিযোগে কিছু এসে যায় না; তাঁরা মনে করেন যে তাদের দেশটা ভুল লোকেদের হাতে চলে গেছে, শুধু ট্রাম্পই আমেরিকার হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে পারবেন।

এটা শুধু আমেরিকার দৃষ্টান্ত দিলাম। বিশ্ব জুড়ে আজ অন্য অনেক দেশেই এই অবস্থা। এর কারণ কী, তা বোঝা শক্ত। কিন্তু আমার নিজের আমেরিকান অভিজ্ঞতায় দেখা এই অবস্থার কতগুলো সাধারণ লক্ষণ প্রথমে কিছু বলি। বলা বাহুল্য, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা খুবই সীমিত। এবং সেই অভিজ্ঞতা আমেরিকার একটি শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবিকীবিদ্যার বিভাগে আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর পড়ানোর সূত্রে আহরিত ও প্রতিসরিত। খুবই সীমিত অভিজ্ঞতা সন্দেহ নেই, কিন্তু হয়তো আত্মপক্ষ সমর্থনে দু-একটি কথা বলতে পারি। প্রথমটি একেবারেই ব্যক্তিগত। আমার দৈনন্দিন জীবন কাটে আমেরিকায়। চাই বা না চাই, আজ আমেরিকান সমাজের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাই আমার দৈনন্দিনের অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয়ত, আমেরিকাকে গণতন্ত্রের আধুনিক ইতিহাসে প্রাচীনতম বলে ধরা হয়। সেইরকম একটি দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গড়াই হয়েছিল এমন সব প্রতিষ্ঠান হিসেবে, যেখানে গণতান্ত্রিক মনোভাবের যা হল একটি প্রাথমিক শর্ত— বাক্‌স্বাধীনতা ও ভিন্ন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা— সেই শর্তটি, রোজকার জীবনে মান্যতা পাবে। আজ তিরিশ বছরের শেষে এসে দেখছি এই পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই পরমতসহিষ্ণুতা কমছে— আর শুধু মৌখিক সহিষ্ণুতা নয়, ভিন্ন মতের উপস্থিতিকে মূল্য দেবার, সাক্ষ্য ও প্রমাণভিত্তিক যুক্তির কাঠামো গড়ে তোলার যে মানসিকতাকে চিন্তাচর্চার ক্ষেত্রে একটি মৌলিক প্রয়োজন বলে মনে হয়, তারও যেন পরিসর ছোট হয়ে আসছে। এই মূল্যবোধগুলো ছিল সবই উদারনৈতিক-গণতান্ত্রিক চিন্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আজ যেন তারই একটি সার্বিক সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বড়ো ছবিটা হয়তো আরও পরিষ্কার। খোদ তথাকথিত উদারনৈতিক-গণতান্ত্রিক (liberal-democratic) দেশগুলোতে গত তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে উদারনীতিবাদ (liberalism) নিয়ে হতাশা জমে উঠেছে।

এটা বলা যায় ইংরিজিভাষী দেশগুলোতে ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিক থেকেই শুরু হয়েছে। চিনে যখন মাওবাদের প্রতিপত্তি শেষ ও ভারতের 'বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ' স্তব্ধপ্রায়; ভিয়েতনাম যে যুদ্ধে জিতে সমাজতন্ত্রের দিকেই দৃঢ়ভাবে পা বাড়াবে, যখন এমন কোনও লক্ষণ নেই; আমেরিকা-ইংল্যান্ডে রোনাল্ড রেগ্যান ও ম্যাগি থ্যাচার নয়া-উদারবাদী চিন্তার পথ ধরে 'উন্মুক্ত' বাজার-অর্থনীতির স্বার্থে তাঁদের দেশে প্রতিষ্ঠিত পুরোনো শিল্পগুলো ও শ্রমিক-সংগঠনগুলো যখন ধ্বংস করছেন; এমত অবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ল এবং ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা সাহেব ঘোষণা করে দিলেন যে, মানুষ তার ইতিহাসের টারমিনাসে পৌঁছে গেছে। তা সত্ত্বেও নব্বইয়ের দশকে একটা অদ্ভুত পৃথিবীতে এসে আমরা পৌঁছলাম যেখানে মিডিয়া গ্লোবাল হচ্ছে ঠিকই আর পুঁজিরও আইনি-বেআইনি চলাচল বেড়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে এসেছে আরও তীব্র অর্থনৈতিক শ্রেণি-বৈষম্য ও সামাজিক অনিশ্চয়তা। যে সব দেশে আইনি-বেআইনি ধনতন্ত্রের আরও রমরমা হল (চিন ও ভারতকে এই হিসেবে রাখছি), সেখানেও সেই ফুকুয়ামা-কথিত ইতিহাসের শেষ স্টপে পৌঁছে মানুষের মনোভাবটা কিন্তু ঠিক এইরকম হল না যে, তাঁরা যেন এবার পথের ক্লান্তি ভুলে ধনতন্ত্র-মায়ের স্নেহভরা কোলে চেপে সবাই শীতল হবেন! হলেন যে না, তার বিস্ফোরক পরিচয় নিয়ে এল জিহাদি ইসলাম, ২০০১ সালে মার্কিন দেশে সেই ১১ই সেপ্টেম্বরের অভূতপূর্বভাবে আল-কায়দার আক্রমণ ও ধ্বংসলীলা। পৃথিবীর সর্বত্র আমাদের জীবনটাই বদলে গেল।

আমি যখন ১৯৯৪-৯৫ নাগাদ অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে আসলাম, এসে দেখি আমার মানবিকীবিদ্যার সহকর্মীদের মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক ও ছুরির-ধারালো-দিকের মতো বিষয় হল উদারনীতিবাদের সমালোচনা বা ক্রিটিক। সেই ক্রিটিকের মধ্যে বাজারমুখী অর্থনীতির যেমন সমালোচনা ছিল, তেমনি ছিল সত্তর-আশি-নব্বই-এর দশকের শিক্ষাগুরু ফরাসি দার্শনিক ফুকো, লাকাঁ প্রমুখের চিন্তার প্ররোচনা। আমার সাবল্টার্ন স্টাডিজের তাত্ত্বিক বন্ধুরাও তখন অনেকটা সেইদিকে ঝুঁকে পড়েছেন। যে সব উদারনৈতিক ধারণা এক সময়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি বলে মনে হত, আজ যেন তাদের চিন্তার সম্পদ সম্পূর্ণ নিঃশেষিত, এমন একটা বোধ চারিদিকে।

একদিকে গ্লোবাল-হওয়া পৃথিবীতে মানুষের নতুন নতুন চাহিদা ও স্বপ্ন তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে অনেকেরই সেই সব চাহিদা মিটছে না। চারপাশে জমে-ওঠা নানানরকম ক্ষোভ, অথচ তা মেটানোর যথেষ্ট উপায় নেই। এরই

মধ্যে এসে পড়ল সামাজিক মাধ্যম: ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ। আরও পরে আসবে টুইটার/এক্সহ্যান্ডল, ইন্সটাগ্রাম ইত্যাদি। পাঠকদের মনে থাকবে ২০১০ সালের সেই 'আরব বসন্তের' কথা, যখন ফেসবুকের মাধ্যমে প্রতিবাদী মানুষের জমায়েত হওয়ার ফলে একটি প্রত্যাশা ছড়িয়ে পড়ল ভাবুক মহলে: হয়তো বা সামাজিক মাধ্যমই পারবে— নানান সরকারি বাধা এড়িয়ে— ক্ষুব্ধ জনতাকে নতুন কোনও গণতন্ত্রের স্বাদ এনে দিতে। সরকার চাইলেও তথ্য লুকোতে পারবে না, জনতার হাতে অস্ত্র হবে সামাজিক মাধ্যম।

এখন পেছন ফিরে দেখে মনে হয় যে, এই ভাবনাতেও একটি বিসমিল্লায় গলদ ছিল। ক্ষোভের রাজনীতি কি গণতন্ত্রের পরিসর বাড়ায়, না কমিয়ে আনে? বিরোধী কণ্ঠের জন্য জায়গা না হলে, সাক্ষ্য-প্রমাণ-যুক্তির জন্য জায়গা না হলে, ন্যায়ের আকাঙ্ক্ষার কি কোনও গণতান্ত্রিক প্রকাশ হয়? গণতন্ত্রে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় ধৈর্য লাগে। এই ধৈর্যের শর্তগুলোই আজ আমাদের জীবন থেকে অন্তর্হিত। প্রযুক্তির বৈপ্লবিক পরিবর্তন কর্মরত মানুষের জীবন আরও ব্যস্ত করে দিয়েছে— আজকের অনলাইন দোকানপাট করা, ওটিটিতে সিনেমা দেখা সেই কর্মব্যস্ততার স্বাক্ষর বহন করে। দ্বিতীয়ত, সামাজিক মাধ্যমের বাইনারি (লাইক/ডিসলাইক) পদ্ধতি মতামতকে সাদা-কালোয় ভাগ করতে থাকে। তথ্য যাচাইয়ের চাইতেও ঝোঁক বেশি পড়ে মতামতের ওপরে। তাই সামাজিক মাধ্যমে আলোচনার চেয়েও বিশ্রী গালাগালি, মিথ্যের ছড়াছড়ি। বঞ্চিত, ক্ষুব্ধ, রাগী মানুষেরা বিশ্বাসও করেন না যে প্রচলিত বিচারব্যবস্থায় কোনও ন্যায় বিচার পাওয়া যায়। তাঁরা মনে করেন ক্ষমতাবানের কব্জা-করা বিচারব্যবস্থার কাজই হল বর্তমান সামাজিক বৈষম্য ও অন্যায়গুলোকে জিইয়ে রাখা। ক্ষুধাতুর শিশু যেমন 'চায় না স্বরাজ', ক্ষুব্ধ মানুষও তেমনি তাঁর ক্রোধের ও অপমানের অনুভূতির চাপে বিচারব্যবস্থার বাদ-প্রতিবাদ-যুক্তি-প্রতিযুক্তি-সাক্ষ্যপ্রমাণ ইত্যাদির জন্য অপেক্ষা করতে নারাজ। সে চায় এক প্রকারের কাজির বিচার, ইনস্ট্যান্ট কফির মতো ইনস্ট্যান্ট জাস্টিস।

ক্রমে ক্রমে দেখলাম যে আমেরিকায় ও অন্যত্র তাই-ই হল। প্রথমে সিনেমার জগতে ও পরে অন্যত্র অনেক প্রগতিশীল আন্দোলনে দাবি উঠল যে, প্রতিষ্ঠিত বিচার ব্যবস্থায় যেহেতু বিচার পাওয়া যায় না বা পেলেও তা ক্ষমতাবানদেরই রক্ষা করে, সুতরাং সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে সত্য উদ্ঘাটন করার প্রয়োজন নেই। যদি কোনও ক্ষমতাবানের বিরুদ্ধে কোনও কম-ক্ষমতার মানুষ অভিযোগ আনেন যে, তিনি সেই ক্ষমতাবানের হাতে নিগৃহীত বা হেনস্থা হয়েছেন, তাহলে প্রাথমিকভাবে ধরেই

নিতে হবে যে সেই ক্ষমতাবান মানুষটিই দোষী। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে শাস্তি দিতে হবে! বলা হল, কেউ নিজেকে অন্য কারুর victim ঘোষণা করলেই the victim must be believed, তিনি যে প্রকৃতই victim, এটি প্রমাণ করার কোনও প্রয়োজন নেই। এখন প্রতিষ্ঠানগতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে সত্যিই কোনও ক্ষমতা নেই যে এই রকম কাজির বিচার অনুষ্ঠিত করা যায়। ফলে চোখের ওপর একটি শাস্তির পদ্ধতি উদ্ভূত হয়ে ছড়িয়ে পড়তে দেখলাম— আমেরিকার ভাষায় তাকে বলে 'ক্যানসেল কালচার,' অর্থাৎ অভিযুক্ত মানুষটির (আমরা যাকে বলি) ধোপা-নাপিত বন্ধ করে দেওয়া বা তাঁকে সামাজিকভাবে বয়কট করা। বলা বাহুল্য, সামাজিক মাধ্যমের সাহায্য ভিন্ন এই পদ্ধতির বাস্তবায়ন অসম্ভব, তাই সামাজিক মাধ্যমের যে নঞর্থক ক্ষমতার পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি — যে এর দ্বারা সত্য-মিথ্যে যথেচ্ছ প্রচার করে, কুশ্রী কথা বলে, আমাদের ষড় রিপুর প্রায় সব কটিকেই ব্যবহার করে যে-কোনও মানুষের 'সুনাম' বা 'সম্মান' ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া যায় (আমেরিকায় এর নাম reputational damage) — সেই ক্ষমতারই পূর্ণ প্রকাশ হল এই ধরনের আন্দোলনে। অবাক হয়ে দেখলাম, শুধু অভিযোগেই— কোনও প্রাতিষ্ঠানিক বিচার ছাড়াই— কত লোকের মাথা পড়ল কাটা!

প্রথমে ভেবেছিলাম, 'ক্যানসেল কালচার' হয়তো শুধু প্রগতিশীল আন্দোলনগুলির অস্ত্র। ক্রমশ দেখলাম, তা নয়। আমেরিকান বাক্স্বাধীনতার মন্দির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাক্স্বাধীনতার ওপরেই চাপ বাড়ছে। শুধু প্রগতিশীল দিক থেকে বাড়ছে, তা নয়। আজ তথাকথিত দক্ষিণপন্থীরাও তাঁদের মতো করে 'ক্যানসেল কালচার'-এর ব্যবহার করেন। গত বৎসর ফ্লোরিডা ইউনিভারসিটিতে বক্তৃতা করতে গিয়ে শুনি প্রাদেশিক সরকার আইন করে diversity কথাটি বেআইনি করে দিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ আর তা কোনও প্রাতিষ্ঠানিক কাজে ব্যবহার করতে পারবেন না। ট্রাম্প সাহেব ক্ষমতায় এলে নিশ্চয়ই এরকম আরও দেখব। আর ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন সংঘাতকে কেন্দ্র করে ক্যানসেল কালচার দুপক্ষেরই অস্ত্র এ দেশে। পড়ছি যে, নিউ ইয়র্কে প্যালেস্টাইন-এর সমর্থনে কথা বলার জন্য এক ছাত্রের চাকরির 'অফার' ক্যানসেল হয়ে গেছে; জেরুসালেমবাসী এক ইহুদি লেখকের ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের আরবদের প্রতি সহানুভূতিশীল একটি বইয়ের আলোচনা দেখছি নানান জায়গায় ক্যানসেল হয়ে গেছে; আবার দেখলাম এই যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু ইজরায়েলি শিক্ষক আমেরিকায় একটি সম্মেলনে যোগদান করতে পারলেন না, তাঁদের

ক্যানসেল করা হয়েছে; ধনী ইহুদিরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ভয় দেখাচ্ছেন 'ইহুদি-বিরোধী' কথা ক্যাম্পাসে হলে তাঁরা তাঁদের অর্থনৈতিক অনুদান বন্ধ করে দেবেন; সেদিন জার্মানি থেকে এক বন্ধু ফোনে বললেন, আর যাই করো, ইজরায়েলের কোনও প্রকাশ্যে সমালোচনা কোরো না, তাহলে তোমাকে জার্মানিতে আমন্ত্রণ করতে পারব না— সর্বত্রই ক্যানসেল কালচার!

এমন দাবি করি না যে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে যা দেখছি, কল-কারখানা বা কোম্পানিতে তাই-ই হচ্ছে। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে বাক্‌স্বাধীনতার ওপরে আক্রমণ যে ক্রমশই বাড়ছে তা নিয়ে সন্দেহ করার কারণ দেখি না। অথচ মানুষের মধ্যে নানান ক্ষোভ, তার বিস্ফোরণও দেখি। মনে হয় যেন আজকের অধৈর্য, ক্ষুব্ধ মানুষ— যে মানুষ বিচার ব্যবস্থায়, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় নানান বোধগম্য কারণেই হয়তো আস্থা হারিয়েছেন— সেই মানুষই যেন তাঁদের ধৈর্যহীন তাৎক্ষণিক বিচারের দাবিতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের গোড়ায় আঘাত হানছেন। আমি কতগুলো মার্কিনি উদাহরণ দিলাম, কিন্তু পাঠক তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য উদাহরণও স্মরণ করতে পারবেন। ছোটোবেলায় সলিল চৌধুরীর লেখা সিনেমার গান শুনতাম: 'ভগবান ঘুরিয়েছে লাট্টু, মানুষ হারিয়েছে লেত্তি, সব সত্যি'! এখন কথাটা খুব ঠিক মনে হয়। পৃথিবীর ইতিহাস দেখলে দেখবেন গত পঞ্চাশ বছরে অনেক মানুষের হাতে অনেক পয়সা এসেছে। ভোগী মানুষের সংখ্যা আজ বেশির ভাগ পাশ্চাত্যের বাইরে। অনেক মানুষের চোখেই আজ ভোগী জীবনের স্বপ্নের অঞ্জনঘোর। আবার এই ভোগী জীবনের স্বপ্ন মানুষের এক তৃতীয়াংশের জন্য শুধু স্বপ্নই থেকে যায়। ওদিকে প্রযুক্তির বিপ্লব আর অনেক মানুষের ভোগাকাঙ্ক্ষা গোটা পৃথিবীতেই নিয়ে আসছে এক পরিবেশগত বিপর্যয়। এমন অবস্থায় পড়ে অনেক মানুষ যদি অস্থিরচিত্ত হয়ে মনে করেন কোনও এক 'লৌহ মানব' রাজনৈতিক নেতা হিসেবে অবতীর্ণ হয়ে তাঁদেরকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করবেন, তাহলে তাঁদের সেই আশার উৎস কোথায় তা যেমন বুঝতে অসুবিধে হয় না, তেমনি বুঝতে অসুবিধে হয় না কেন আজকের এই সময় অনেক চিন্তককে ইয়োরোপীয় ইতিহাসের ১৯৩০ বা ১৯৪০-এর দশক দুটির কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। কিন্তু আমার বক্তব্য এটাই যে আজকের এই ইতিহাসের সন্ধিক্ষণকে আমরা কেবল ইতিহাসের একটি পুনরাবৃত্তির মুহূর্ত বলে ভাবলে আমাদের বর্তমান সংকটকে ভুল বুঝব। নানান দেশে নানান সমান্তরাল প্রক্রিয়ার ফলে গণতন্ত্র আজ বিপন্ন। বিপদ আসছে বাইরে থেকে নয়, ভেতর থেকেই।

আত্মপরিচয় ও ইতিহাস

মৈত্রীশ ঘটক

১

ওয়াশিংটন ডিসি-র ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ অ্যাফ্রিকান-অ্যামেরিকান হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচারে গিয়েছিলাম সম্প্রতি; চোখ টানল এক হলঘরের দেওয়ালে খোদাই করা জেমস্ বল্ডউইনের একটি উক্তি: ‘‘ইতিহাসের অমোঘ যে টান, তার কারণ হল আমরা তাকে নিজেদের ভিতরে বহন করে চলি, নানানভাবে অচেতনে তা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে, আর আমাদের সমস্ত কাজের ভিতরেই আছে তার অনিবার্য উপস্থিতি’’।

কথাটা আমায় নাড়া দিল, কিন্তু একটা প্রশ্ন মাথার ভিতরে ঘুরপাক খেতেই থাকল : কোন্ ইতিহাস, কার ইতিহাস? ভিতরে ভিতরে আমরা বহুধা ইতিহাস বহন করি—কোন্ ইতিহাস মনে রাখব, কীভাবেই বা তাকে বিশ্লেষণ করব, এসবে কি আমাদের সত্যিই কোনও নিয়ন্ত্রণ আছে?

দাস-জাহাজ থেকে ওয়াইট হাউজ পর্যন্ত অ্যাফ্রিকান-অ্যামেরিকানদের অভাবনীয় ঐতিহাসিক যাত্রার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য এই সংগ্রহশালা। অভিজ্ঞতাটা সুখকর নয়; যন্ত্রণাদায়কও। কিন্তু দাসত্ব, তারপর দাসত্বমোচন হয়ে ১৯৬০-এর নাগরিক অধিকার আন্দোলন পর্যন্ত অ্যাফ্রিকান-অ্যামেরিকানদের যে যাত্রাটা, তা আবার অনুপ্রেরণাও জাগায় বটে। আবার পরবর্তীকালে ডোনাল্ড ট্রাম্পের উত্থান এবং আমেরিকা তথা বিশ্বজুড়ে দক্ষিণপন্থী জনমোহিনী রাজনীতির রমরমা মনে করিয়ে দেয়, সেই যাত্রাপথ ঠিক কতটা দুর্গম, এবং মার্টিন লুথার কিং-এর সেই স্বপ্ন—যেখানে তাঁর সন্তান-সন্ততিকে একদিন গায়ের রং দিয়ে বিচার না-করে শুধুমাত্র

চরিত্র দিয়ে বিচার করা হবে—তা পূরণ হতে এখনও কতটা চড়াই-উৎরাই বাকি আছে।

আমি অ্যামেরিকান নই, যদিও এক দশকেরও বেশি সময় আমি সেখানে পড়াশোনা এবং অধ্যাপনা করেছি। আমি অশ্বেতকায় হলেও অ্যামেরিকায় আমার আত্মপরিচয় দক্ষিণ এশীয় বা ভারতীয়, কৃষ্ণত্ব বা 'ব্ল্যাকনেস' অ্যামেরিকায় যে ঐতিহাসিক এবং সামাজিক যে আত্মপরিচয় বহন করে তা আমার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এই ইতিহাস আমায় ধাক্কা দিয়েছিল। যার কারণ একদিকে স্রেফ গায়ের রঙের উপর ভিত্তি করে একটা গোটা জনগোষ্ঠীর উপর অনাচারের বিষয়টা, আবার তার বিরুদ্ধে সংঘটিত সেই জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক মুক্তিসংগ্রামও (যাতে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে মানুষ যোগ দিয়েছিলেন)। কলকাতায় বাম-উদারপন্থী জলহাওয়ায় বড়ো হয়েছি আমি, মনে আছে, আমার বাবা বসার ঘরে মার্টিন লুথার কিং-এর একটি ফ্রেম-বাঁধানো ছবি টাঙিয়েছিলেন, তাঁর সুবিখ্যাত ''আই হ্যাভ আ ড্রিম'' উক্তি-সহ। স্পষ্টতই, ওয়াশিংটন ডিসি-র ওই সংগ্রহশালা দেখে আমার যে প্রতিক্রিয়া হয়, তার পিছনে সাম্য ও ন্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত যে পরিবেশে আমি বড়ো হয়েছি তার প্রভাব অনেকটাই ছিল।

কিন্তু এই অভিজ্ঞতা আমায় আরও একটা জিনিস নিয়ে ভাবিয়ে তুলেছিল—আত্মপরিচয় ও ইতিহাসের মধ্যে যে সম্পর্কটা। অ্যাফ্রিকান-অ্যামেরিকানদের জন্য দাসত্ব, এবং পরবর্তীকালে বিভাজন এবং বৈষম্যের দীর্ঘ ইতিহাসটি তাঁদের জাতিগত সত্তাটিকে আত্মপরিচয়ের একদম অনিবার্য অঙ্গ করে তুলেছে—কেউ যদি নিজে সেভাবে না-ও দেখতে চান, বাকি সমাজ তাঁকে কিছুতেই ভুলতে দেবে না। তাহলে আমাদের আত্মপরিচয়ই কি একভাবে বেঁধে দিচ্ছে না আমাদের ইতিহাসকে দেখার দৃষ্টিকোণ—বিশেষ করে কার ইতিহাস, কোন ইতিহাসকে আমরা গুরুত্ব দেব, সেই বিষয়টা? প্রশ্নটি শুধু এই ক্ষেত্রে নয়, সর্বত্রই প্রযোজ্য—সমকালীন ভারতের ক্ষেত্রেও। সেই প্রসঙ্গে পরে আসছি।

২

আইডেন্টিটি অ্যান্ড ভায়োলেন্স: দ্য ইলিউশন অফ ডেস্টিনি (২০০৬) বইয়ে অমর্ত্য সেন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে আত্মপরিচয় সহজাতভাবেই বহুমাত্রিক। আত্মপরিচয়ের এই মূলগত বহুত্ব বা বহুমাত্রিক প্রকৃতির একটি উদাহরণ দিয়ে শুরু করছেন তিনি: 'একজন ব্যক্তি অনায়াসে একইসঙ্গে হতে পারেন ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে উদ্ভূত মার্কিন নাগরিক, আফ্রিকান পূর্বপুরুষের বংশধর, খ্রিস্টান,

উদারমনস্ক, নারী, নিরামিষাশী, দূরপাল্লার দৌড়ে দক্ষ, ইতিহাসবিদ, স্কুলশিক্ষক, ঔপন্যাসিক, নারীবাদী, বিসমকামী এবং সমকামীদের অধিকারে বিশ্বাসী, নাট্যামোদী, পরিবেশ আন্দোলনকর্মী, টেনিসভক্ত, জ্যাজ সঙ্গীতশিল্পী, এবং এমন একজন যিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে মহাবিশ্বে কোথাও না কোথাও বুদ্ধিমান প্রাণীরা আছে, এবং তাদের সঙ্গে আশু কথোপকথনে যাওয়া প্রয়োজন (আর সেটা ইংরেজি ভাষায় হলেই ভালো)।'

বস্তুতই, ব্যক্তিমানুষের আত্মপরিচয়ের নানান মাত্রা থাকে; যেমন— লিঙ্গ, জাতি, সম্প্রদায়, দেশ, কোথায় বেড়ে উঠেছেন, তাঁর ভাষা, পেশা, পছন্দ-অপছন্দ, আগ্রহের বিষয়, এবং রাজনৈতিক মতামত। সহজ কথায় বললে, আমাদের মধ্যে অনেক 'আমি' থাকে— আমাদের পরিচিতি এই সব পরিচিতিগুলো মিলিয়ে, কোনোটিকে বাদ দিয়ে নয়। সেন বলছেন: 'এই সমস্ত যৌথতা, যাদের মধ্যে এই মানুষটি একইসঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন, তারা সবাই মিলে তাঁর আত্মপরিচয় গড়ে তোলে। এদের কোনওটিকেই তাঁর একমাত্র পরিচয় বলে ধরা বা কোনও একটি যৌথতার সদস্য বলে তাঁকে দাগিয়ে দেওয়া যায় না। আমাদের আত্মপরিচয় যেহেতু অনিবার্যভাবেই বহুস্তরীয়, তাই কোনো নির্দিষ্ট পরিসরে আমরা আমাদের এই বিভিন্ন ধরনের অনুষঙ্গ ও আত্মতার মধ্যে কোনটিকে আমরা তুলনায় বেশি গুরুত্ব দেব সেটা আমাদের ঠিক করে নিতে হয়।'

তাঁর এই তাত্ত্বিক কাঠামো একাধিক প্রশ্ন তুলে দিয়ে যায়।

প্রথমত, এই বিভিন্ন পরিচয়গুলির মধ্যে কোন্‌টি আমাদের কাছে প্রধান আর কোন্‌টি গৌণ, তার কি কোনও ক্রমবিন্যাস করা সম্ভব? সেটা কীসের ওপরে নির্ভর করবে? খানিকটা সেটা আমরা কোথায় আছি, কার সঙ্গে আছি, এবং কী করছি তার ওপর নির্ভর করবে। বস্তুত, আমরা যদি একা একা একটি দ্বীপে গিয়ে বাস করতাম তবে আমাদের আত্মপরিচয় হয়তো শুধুই নির্ভর করবে আমরা কী করছি তার উপর (যেমন, আমি খাদ্যের সন্ধান করছি, নাকি বই পড়ছি, নাকি সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে স্মৃতিচারণ করছি)। স্কুলের বা কলেজের বন্ধুর সাথে দেখা হলে তখন আমাদের অন্য পরিচিতি ছাপিয়ে সেই যৌথ পরিচিতিই প্রাধান্য পায়। আবার বিদেশে আমরা ভারতীয় সেই পরিচিতি অনেক সময় প্রাধান্য পায়, কারণ দেশের মধ্যে সেই পরিচয় তো সবারই, তাই টিভিতে ক্রিকেট খেলা দেখার সময় বা বিদেশনীতি আলোচনার সময় ছাড়া তার খুব একটা তাৎপর্য থাকে না। কিন্তু তাহলেও, আরেকটু তলিয়ে ভাবলে আমাদের

ব্যক্তিপরিচয়ের যে প্রধান মাত্রাগুলো সেগুলোর নির্ধারণে কোন্ কোন্ উপাদানের ভূমিকা বেশি, তার কিন্তু সহজ উত্তর নেই।

দ্বিতীয়ত, প্রতিটি মানুষের আত্মপরিচয়ের যদি এতগুলি আলাদা আলাদা মাত্রা থেকে থাকে, তবে এমন একটা সাধারণ জায়গা কোথায় যেখানে সবাই সবার সঙ্গে আলাপে যেতে পারে? আমরা যখন কথা বলছি, তখন কোন্ 'আমি' কথা বলছে কোন্ 'আপনি'-র সঙ্গে? সেখানে একটা পন্থা হল সমন্বয়ী : আমাদের মধ্যে কোন্ সত্তাগুলো এক, তাতে মনোযোগ দেওয়া। আবার অন্য একটা পন্থা হল ভিন্নতাপন্থী : আমাদের মধ্যে ফারাক কিসে কিসে, সেটাকে গুরুত্ব দেওয়া (তা স্বাচ্ছল্য হতে পারে, ভাষা হতে পারে, ধর্ম হতে পারে আবার কবিতা ভালো লাগে কিনা তা নিয়ে হতে পারে)। প্রথমটির ক্ষেত্রে কথা গড়াবে অনেকদূর আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে খুব একটা না। ভিন্নতাপন্থী মানেই যে খারাপ তা নয়— অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও নিজেকে আলাদা রাখা যেতেই পারে (এখানে 'নির্জনতম' কবি জীবনানন্দ দাশের উদাহরণ ভাবা যেতে পারে)। সমস্যার শুরু তখনই যখন আমাদের অন্য সব পরিচিতিগুলোকে ছাপিয়ে একটিকেই প্রাধান্য পায়, সে আমরা চাই বা না চাই (যেমন, অমর্ত্য সেনের এই উদাহরণের মানুষটির নারীত্ব বা কৃষ্ণত্ব বা খ্রিস্টানত্ব)। এখানে ক্ষমতার অসাম্যের একটা বড়ো ভূমিকা আছে আর তাই ভিন্নতাপন্থী পরিচয়ের রাজনীতির একটা সদর্থক ভূমিকাও আছে — বিভিন্ন দেশে ও কালে প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষজনকে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার দিতে সক্ষম হয়েছে, যার মধ্যে অ্যামেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের বা আমাদের দেশে দলিতদের বা নারীদের সমান অধিকারের সংগ্রাম পড়ে।

তৃতীয়ত, মানুষ কোন্ ধরনের ইতিহাসের সঙ্গে একাত্ম বোধ করবে, ঐতিহ্য হিসেবে ধারণ করবে তাহলে? একজন আফ্রিকান-অ্যামেরিকান মানুষ কি শুধু তাঁর মার্কিন নাগরিকত্বের ইতিহাসকেই মাথায় রাখবেন, নাকি ধারণ করবেন দাসত্ব, বিভাজন এবং নাগরিক অধিকার আন্দোলনের ইতিহাসটিকে? দুটোই সম্ভবত, কিন্তু তাদের মধ্যে কোন্ ইতিহাসটি তাঁর কাছে মুখ্য? যদি-বা তাঁরা সেই 'সার্বিক' মার্কিনি ইতিহাসকেই বহন করতে চান, তবুও কি তাঁর জাতিসত্তা, এবং এককালে যে তাঁর মতো মানুষদের সমান চোখে দেখা হত না সেই বিষয়গুলি তাঁর ইতিহাসচেতনাকে প্রভাবিত করবে না?

এইরকম প্রশ্ন আমাদের যে কাউকে করা যেতে পারে: যেমন— এই আমি, কলকাতা ও বহরমপুরে বড়ো হয়েছি, উচ্চশিক্ষার জন্য দিল্লিতে থেকেছি কিছুকাল, ডক্টরেটের পড়াশোনা এবং আমার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিসূত্রে এক দশকের

উপর কাটিয়েছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, এবং এখন লন্ডনে থাকি দুই দশকের বেশি— আমার ব্যক্তিগত ইতিহাস তথা যেসব অঞ্চলে ও দেশে আমি থেকেছি তাদের ইতিহাসের কোন্ কোন্ সূত্রগুলিকে আমি সচেতনভাবে মুখ্য বলে ধরব? আমি কি সেইসব প্রবাসী অশ্বেতাঙ্গ মানুষদের কথাও ভাবব যাঁরা এমন সব দেশে থেকেছেন, পড়াশোনা ও কাজকর্ম করেছেন যেখানে তাঁরা সংখ্যালঘু— ঠিক আমারই মতো? আমি অর্থনীতিবিদ, কাজেই আমার বিদ্যাচর্চার ধারাটির ইতিহাস এবং সেই ধারায় আমার কাজ যে বিন্দুতে পড়ে— সেটাও কি আমার ইতিহাস, আমার ঐতিহ্যের অঙ্গ?

৩

আমার মনে হয়, ইতিহাস এবং আমাদের আত্মতা পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, এবং ইতিহাসের বিভিন্ন সংস্করণ ও মাত্রাগুলির সঙ্গে আত্মপরিচয়ের বিভিন্ন সংস্করণ ও মাত্রাগুলির মধ্যে নানা বিচিত্রভাবে আদান-প্রদান ঘটে থাকে। এই প্রভাব বিস্তারের চরিত্র উভমুখী— আত্মপরিচয় ইতিহাসকে প্রভাবিত করে, আবার ইতিহাসও প্রভাবিত করে আত্মপরিচয়কে।

আমাদের আত্মপরিচয় কী রূপ নেবে তা নির্ভর করে আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ইতিহাস, তথা যেসব বৃহত্তর গোষ্ঠীতে আমরা নিজেদের সম্পৃক্ত বলে মনে করি তাদের ইতিহাসের উপরেও। এই গোষ্ঠীগুলি স্থানীয় হতে পারে, আঞ্চলিক বা জাতীয় হতে পারে, আন্তর্জাতিকও হতে পারে। একইভাবে, এই একাত্মতা ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় সীমারেখা ছাড়িয়ে ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, জাতিগত, বর্ণগত, লিঙ্গগত, সামাজিক, কিংবা অর্থনৈতিক পরিচয়ের যোগসূত্রেও গাঁথা হয়ে থাকতে পারে। যদি আর একটু গভীরে গিয়ে দেখা যায়, এই একাত্মতার ভিত্তি হতে পারে আমাদের পেশাগত পরিচয়, শিক্ষাগত স্তর, যেসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমরা সংযুক্ত, আমাদের রাজনৈতিক বা মতাদর্শগত ঝোঁক, সাংস্কৃতিক রুচি, আমাদের পছন্দ-অপছন্দ, ভালো লাগার কাজও।

হ্যাঁ, আত্মপরিচয় মূলগতভাবে বহুস্তরীয়ই, কিন্তু তা অমোঘ ভাগ্যলিখন নয়— এখানে আমাদের নির্বাচনের একটা স্বাধীনতা নিশ্চিতভাবেই আছে, যদিও তা সব গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়— তার মাত্রা ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। আমাদের কোন্ নির্বাচন তবে এই বহুবর্ণ আত্মতাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখেও পরস্পরের সঙ্গে সমস্তরীয় একটা সংলাপের জায়গায় নিয়ে আসতে পারঙ্গম? এর কোনও সহজ উত্তর নেই।

আমাদের মধ্যে যা-কিছু একরকম তার স্বীকৃতি দিয়েই শুরুটা হওয়া দরকার, কিন্তু যে আলাদা আলাদা ইতিহাসগুলি আমাদের অনন্য করে তোলে, তাদের যথাযথ মর্যাদা ও স্থান দেওয়াটাও প্রয়োজন। রাজনীতিতে, অথচ, বিশ্বজনীনতার দৃষ্টিকোণটি একেবারেই বিরল। এমনকি ভূতপূর্ব সমাজবাদী বা কমিউনিস্ট দলগুলি, বা বর্তমানকালের বাম-ঘেঁষা রাজনৈতিক দল যাদের সাংগঠনিক ভিত্তিই হল সর্বজনীনতা—তারাও প্রায়শই বিদেশনীতি বা অভিবাসনের মতো বিষয়গুলিতে জাতীয়তাবাদী বা ধর্মীয় পরিচয়ভিত্তিক অবস্থান নিয়ে থাকে (উদাহরণ: লেবার পার্টির একাংশের তরফে ব্রেক্সিটের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ)। তবে এর বিপরীত অভিমুখের উদাহরণও আছে: অ্যাফ্রিকান-অ্যামেরিকানদের সংগ্রামের বিষয়টিতে ফিরে গেলে, ম্যালকম এক্স প্রাথমিকভাবে নাগরিক অধিকার আন্দোলনে অ-কৃষ্ণাঙ্গদের যোগ দিতে না দেওয়ার সংকীর্ণ অবস্থান রাখলেও, ধীরে ধীরে এ বিষয়ে অনেক বেশি উদারমনস্ক হয়ে উঠেছিলেন।

উপরন্তু, আমাদের আত্মপরিচয় পাথরে খোদাই করা নয়। আমাদের জীবন তথা ব্যক্তিগত ও যৌথ ইতিহাসগুলি যেহেতু মূলগতভাবেই বহুস্তরীয়, তাই জীবনের নানা পর্যায়ে আমাদের আত্মপরিচয়ের আলাদা আলাদা দিক তুলনায় বেশি বা কম গুরুত্ব পাবে, এবং সেইমতো আমাদের আত্মপরিচয় বিকশিত হতে থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক (কখনো কখনো তা সম্পূর্ণ বদলেও যেতে পারে, ধরুন যখন কারও রাজনৈতিক মতাদর্শ পালটে যায়, কেউ ধর্মান্তরিত হন, বা অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন)। এই সমস্ত আলাদা আলাদা পরিচয়গুলি আমাদের মননে একই সঙ্গে বাস করে, এবং নানান মুহূর্তে নানান ধরনের পরিচয় আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নানারকমের অভিঘাতে — কোনও ঘটনা, কোনও নির্দিষ্ট মানুষের সঙ্গে কথোপকথন, আমরা সেই মুহূর্তে কোথায় আছি, নির্দিষ্ট কোনও অভিজ্ঞতার প্রভাবে উঠে আসা নির্দিষ্ট কোনও স্মৃতি, আর কখনো কখনো, স্রেফ সমাপতনে।

৪

আমি বলব, আত্মপরিচয়ের এই বহুস্তরীয় চরিত্র নিহিতভাবেই এই আলাদা আলাদা ইতিহাসগুলির বহুস্তরীয় চরিত্রের সঙ্গে বাঁধা পড়ে আছে। এইসব ইতিহাসগুলি থেকে কয়েকটি নির্দিষ্ট বয়ান ছেঁকে তুলে নিলে আমাদের একধরনের পরিচয়কে অন্য পরিচয়গুলির উপরে রাখা হয়ে যায়, এবং একইভাবে, কোনও একটি পরিচয়ের সঙ্গে অতিরিক্ত একাত্মতা আমাদের ইতিহাসকে দেখার একটা অত্যন্ত একপেশে দৃষ্টিকোণের দিকে ঠেলে দেয়।

দার্শনিক জর্জ সান্তায়ানা যেমন বলেছেন, যারা অতীত মনে রাখতে পারে না, তাদের অভিশাপ হল অতীতের পুনরাবৃত্তি করা। আমাদের পটভূমিতে এই বাক্যকে ফেলে দেখলে বলা যায় : যারা ইতিহাস ভুলে যায় তাদের অভিশাপ হল ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করা। আবার এটাও বলা যায়, অতীতেই আটকে আছে যারা, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির অভিশাপ লেগে আছে তাদের মাথাতেও। ইতিহাসের ছাঁটকাট করে তৈরি করা একটা সংস্করণে যদি 'বিদেশি' হানাদারদের আক্রমণে আমাদের 'আসল' সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেছে এমন একটা বয়ান তুলে ধরা হয়, তবে যাদের ইতিহাস সেই 'হানাদারদের' সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বেশি সম্পৃক্ত, তাদের নিজেদের লোক ভাবতে আমাদের অসুবিধা হয় বেশি। আত্মপরিচয়কে এভাবে সংকীর্ণ করে দেওয়ার মাধ্যমে ইতিহাসের একটা খণ্ডিত এবং প্রায়শই ক্ষতিকারক পাঠ তৈরি হয়— যেখানে কোনও এক গোষ্ঠী সর্বদেশে-সর্বকালে অন্যদের হাতে শোষিত হয়েছে বলে দাগিয়ে দেওয়া যায়— এবং তা আত্মপরিচয়ের এই সংকীর্ণতাকেই আরও জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

তবুও, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রখ্যাত কবিতা 'হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে'-র সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি দেখি ('হেথায় আর্য, হেথা অনার্য/হেথায় দ্রাবিড়, চীন—/ শক-হুন-দল পাঠান মোগল/এক দেহে হল লীন।/পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার,/সেথা হতে সবে আনে উপহার,/দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে / যাবে না ফিরে,/এই ভারতের মহামানবের/ সাগরতীরে'), তবে দেখতে পাব যে মানবসত্তার নানান ধারার নানান ইতিহাসের সম্মেলনে যে সর্বজনীন আত্মপরিচয়ের সৃষ্টি হচ্ছে তা তার খণ্ডগুলির যোগফলের থেকে অনেক, অনেক বড়ো; যেখানে আলাদা আলাদা মানবগোষ্ঠী তাদের ভিন্নতা সত্ত্বেও এক বিরাট বহমান ধারার অংশ হিসেবে পরস্পরের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে।

এই দৃষ্টিকোণ আমাদের মনে পড়াবে, আমাদের ইতিহাসে এমন বহু পর্যায় আছে যেখানে এই আলাদা আলাদা সংস্কৃতিগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়ে ভারতীয়ত্বের এমন একটা ধারণা তৈরি করেছে যা অনন্য— যা কোনও একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী থেকে সরাসরি উদ্ভূত বলে কোনওমতেই ধরা যায় না।

গত দশ বছরে ভারতের ইতিহাসের সংখ্যাগরিষ্ঠতাভিত্তিক এবং সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণগুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এর অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। একদম সাম্প্রতিক একটা ধরা যাক। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধীকে ভর্ৎসনা করেছেন মধ্যযুগে মুঘলরা

হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার করেছিল তা মনে না রাখার জন্য। এখন ১০২৬ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ গজনি যখন সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করে নির্বিচার লুঠতরাজ এবং হত্যালীলা চালিয়েছিল, বা যখন মুঘলরা এইধরনের অত্যাচার করেছিল, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে এই অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তার এক হাজার বছর পরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ তার জন্যে দায়ী হবে কেন? কেন প্রতি মুহূর্তে তাঁদের ভারতীয়ত্বের পরীক্ষা দিতে হবে এবং যেকোনো মুহূর্তে তাঁদের ওপর হামলা হতে পারে সেই আশঙ্কায় থাকতে হবে?

এইভাবে কেটেছেঁটে ইতিহাস পাঠ করা এবং আত্মপরিচয়কে সংকীর্ণ একটা জায়গায় নামিয়ে আনলে আমাদের মনন একটা নিম্নগামী ঘূর্ণির মধ্যে আটকে পড়ে যায়। বেছে বেছে শুধু নিজেদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অন্যায় খুঁজে বের করে, তারপর একটা নির্দিষ্ট পরিচয়ের মধ্যে নিজের সবটুকু আত্মতাকে ভরে দিয়ে, সেই পরিচয়ের বাইরে থাকা সমস্ত 'অপর'কে অস্বস্তিকর এবং বিপজ্জনক হিসেবে দেখার অভ্যাস গেড়ে বসে।

৫

আসলে এই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক আত্মপরিচয়গুলি এক-একটা দুষ্টচক্র; এদের প্রসূত সংঘাত তৈরি করে হিংসা এবং অন্যায়ের আরও নতুন নতুন ইতিহাস, আরও জমাট হয় সাম্প্রদায়িক আত্মতার বিষ। আর দুষ্টচক্রের সবথেকে বড়ো সমস্যা হল, এর থেকে বেরোতে হলে একটা বিরাট জোরের ধাক্কা দরকার যা এই পুরো বয়ানটাকে সম্পূর্ণ আলাদা একটা গতিপথে নিয়ে যেতে পারবে।

এই দুষ্টচক্রের ধারণাটা আরেকটু তলিয়ে ভাবা যাক। দুটি প্রবণতা যদি পরস্পরকে বাড়িয়ে দিতে থাকে তাহলে গোটা প্রক্রিয়াটার মাঝামাঝি থিতানোর কোনো সম্ভাবনা নেই, হয় সবনিম্ন নয়তো সর্বোচ্চ মাত্রায় গিয়ে থামবে, অর্থাৎ ভারসাম্য পাবে। অর্থবিদ্যায় দুষ্টচক্রের ধ্রুপদী উদাহরণ দারিদ্র্য নিয়ে—দারিদ্র্য যত বাড়বে আয়ের সবটাই ব্যয় হয়ে যাবার প্রবণতাও যদি বাড়ে তাহলে আস্তে আস্তে সঞ্চয় করে দারিদ্র্যমুক্তির সম্ভাবনা তত কমবে— তাই অতিদরিদ্র ও সম্পন্ন এই দুই শ্রেণির মানুষের প্রাধান্য দেখা যাবে। সেরকম সংকীর্ণ আত্মপরিচয় এবং তাকে সমর্থন করে এমন ইতিহাসচর্চার পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে এর থেকে বেরোবার পথও বন্ধ হতে থাকবে।

এখানে দুটি প্রক্রিয়া কাজ করছে। একটা হল যাকে মনোবিজ্ঞানে বলে কনফার্মেশন বায়াস বা একপেশে যাচাই করার প্রবণতা— আমাদের বিশ্বাসের স্বপক্ষে তথ্যপ্রমাণ আমাদের বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়। আর অন্যটি হল, সমমনস্ক

লোকের সাথে মেলামেশা করার প্রবণতা, যার ফলে আমাদের মতামতগুলো একটা প্রতিধ্বনিকক্ষে আটক পড়ে যায়। ফলে, সামাজিকস্তরে মতামত ও বিশ্বাসের একটা মেরুকরণ হয়ে যায় এবং দুই পক্ষের মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটা অবিশ্বাস এবং সহানুভূতিহীন মনোভাব গড়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে যতুটুকু মেলামেশা হয় তাতে এই পারস্পরিক বীতরাগ বাড়তেই থাকে।

এবার ভেবে দেখুন কোনো চিন্তাশীল এবং বিবেকবান মানুষের কথা যিনি কোনো কারণে নিজস্ব চিন্তার জগতে এই আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। তিনি যদি খোলাখুলিভাবে নিজের মতপ্রকাশ করেন, তাহলে উভয়-সংকটে পড়তে পারেন। আপাতভাবে নিজের পক্ষের কোনো কথা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তখন তাঁকে তকমা দেওয়া হবে ‘ঘরের শত্রু বিভীষণ’ বা ‘দেশদ্রোহী’ বা ‘ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী’। আবার পুরোপুরি অন্যপক্ষের সব বক্তব্যের সাথে সহমত না হলে তিনি আপাতদৃষ্টিতে যে গোষ্ঠীর মধ্যে পড়েন, সেই পরিচয়ের দিকে আঙুল তোলা হবে, বলা হবে উনি তো বলবেনই, আসলে তো তলে তলে গোষ্ঠী-আনুগত্য থেকে বেরোতে পারেননি। মানুষমাত্রেই সামাজিক জীব, তাই তাঁর প্রবণতা হবে চুপ করে যাওয়া বা বিতর্কে না-জড়ানো।

তাই শেষ পর্যন্ত যে মতামতগুলো সবচেয়ে জোরের সাথে শোনা যাবে, সেগুলো সত্যিই চরমপন্থী হবে, কারণ তাঁদের এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সমস্যা নেই। এবং এটা যত হবে ততই মধ্যপন্থী কণ্ঠগুলো আরও চুপ হয়ে যাবে। এখানেও একটা দুষ্টচক্র কাজ করছে যার ফল হবে মতামতের মেরুকরণ। তাতে ক্ষতি হল, যদি সবাই খোলাখুলি আলোচনা করতেন তাহলে অনেকে হয়তো তাঁদের মত খানিকটা পাল্টাতেন এবং এই আদান-প্রদানে হয়তো একটা সহিষ্ণুতর সামাজিক বাতাবরণ তৈরি হতে পারত, সেই সম্ভাবনা আস্তে আস্তে হারিয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, আপনার বিশ্বাস যাই হোক-না কেন, বিভিন্ন মতামত শুনলে নিজের বোঝার জায়গাটা অনেক মজবুত হতে পারত, সেটার সম্ভাবনাও কমে আসবে।

এই ধরনের মেরুকরণ শুধু ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা নয়, যে-কোনও মতাদর্শগত বিষয়ে হতে পারে। যেমন ধরুন সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় সংকটের পেছনে কী কারণ ছিল সেই আলোচনায় অর্থনৈতিক পরিসরে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের সমস্যার কথা বললেই যদি আপনাকে নয়া-উদারবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী বলে সমালোচনা শোনার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে আপনি চুপ করেই থাকবেন কিন্তু এর ফলে ক্ষতি হবে যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা বন্ধ হয়ে যাবে এবং যাঁরা তা

সত্ত্বেও মতপ্রকাশ করবেন তাঁদের মত সত্যিই খানিকটা উগ্র বাম নয়তো উগ্র দক্ষিণপন্থী হবে।

এই মেরুকরণের সাথে আত্মপরিচিতির সংকীর্ণতা এবং ইতিহাসের একপেশে আখ্যানে আবদ্ধ থাকার প্রবণতাগুলো যোগ করলে, দুষ্টচক্রের ছবিটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। কিন্তু এইভাবে দেখলে এটাও বোঝা যায় যে বিকল্প একটা ভারসাম্যবিন্দুও সম্ভব, যেখানে আমরা নিজস্ব সংকীর্ণ আত্মপরিচিতির ঊর্ধ্বে উঠে অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইতিহাস এবং বর্তমান জগৎকে দেখতে চেষ্টা করি। তাতেও কিছু মানুষ হয়তো চরম মত পোষণ করবেন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ হয়তো আরও প্রসারিত আত্মপরিচিতি এবং ইতিহাসের বহুত্ববাদী আখ্যান গ্রহণ করবেন।

৬

ইতিহাস আমাদের সবার উপরেই ছাপ রেখে যায়। কিন্তু তার ফাঁদে আটকে পড়লে বিপদ। ইতিহাস এবং আমাদের আত্মপরিচয়— উভয়েরই যে বহুস্তরীয় চরিত্র, তা মাথায় রাখলে তবেই সম্পূর্ণ অজ্ঞতা এবং গভীর অথচ সংকীর্ণ সচেতনতার দ্বৈত ফাঁদ এড়াতে সক্ষম হব আমরা।

কীভাবে এটা করা সম্ভব তা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। হয়তো সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহতা সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলে একটা আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া শুরু হবে। হয়তো একটা চরম বিপর্যয় লাগবে এই দুষ্টচক্র ভাঙতে। হয়তো এটা একটা দীর্ঘমেয়াদি কাজ, যার শুরু হওয়া দরকার শিশুদের আমরা যে ইতিহাস শেখাচ্ছি তার মধ্যে দিয়ে একটা সর্বজনীন ইতিহাস ও আত্মতার বোধ গড়ে তোলার মাধ্যমে, তিরিশ ও চল্লিশের দশকে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ এবং প্রগতিশীল লেখক আন্দোলন যে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করেছিল, খানিকটা সেই ধাঁচে। ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক দক্ষিণপন্থা বহুবছর ধরে ভারতে এবং বিশ্বের অন্যত্র যে কাজটা করে চলেছে, তার থেকে খুব কিছু আলাদা নয় এই কাজটা। এর মূল নির্যাস বিখ্যাত একটি কবিতার বহুল-উদ্ধৃত একটি পঙ্‌ক্তিকে সামান্য বদলে বলা যেতে পারে : 'যেথা পরিচয়ের প্রাচীর/ আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী/বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি'।

[কৃতজ্ঞতা স্বীকার: লেখাটির প্রাথমিক খসড়া পড়ে মনীষিতা দাশ ও প্রতীচী প্রিয়ংবদা মন্তব্য করেছেন এবং দ্যুতি মুখোপাধ্যায় লেখাটির প্রস্তুতিতে সাহায্য করেছেন। সেমন্তী ঘোষের সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি। এঁদের সাহায্য কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি, যদিও বক্তব্যের দায় সম্পূর্ণ আমার।]

চিরায়ত বাংলা

রণবীর সমাদ্দার

[২০১১ সালে অশোক সেনের অনুরোধে *বারোমাস* পত্রিকায় 'চিরায়ত বাংলা' নামে তিন পাতার একটা ছোট প্রবন্ধ লিখেছিলাম। মনে নেই, কোনও একটা কারণে কাজী আবদুল ওদুদের *শাশ্বত বঙ্গ* বইটিকে অবলম্বন করে কিছু কথা ভাবছিলাম, মূলত বাঙালির ইতিহাসবোধ ও ঐতিহাসিক সংস্কৃতি নিয়ে। ওদুদের *শাশ্বত বঙ্গ* পড়ি তার বহুবছর আগে, সম্ভবত ১৯৭১/৭২-এ। রাষ্ট্রীয় অতিথিশালায় থাকাকালীন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে একজন আমায় বইটা উপহার দেন। কলেজ স্ট্রিটের পুরোনো দোকানের বই। মলাট ছিল এক পরিষ্কার হলুদ কাগজের। ভেতরে বইটা অক্ষত। উপহার দিয়ে বলেছিলেন, 'তোমরা তো এসব বই পড়বে না! এতে তোমরা যে সব কথা শুনতে, পড়তে ভালোবাসো, সেই শব্দগুলো 'শ্রেণি', 'শ্রেণি সংগ্রাম' ইত্যাদি নেই। কিন্তু, বইটা পড়ো, ভালো লাগবে।' আমার বয়স তখন বাইশ অথবা তেইশ। কাজেই ওই ভূমিকা শুনে ভাবলাম, পড়ার তাড়া কিছু নেই। মনে আছে, কিছু মাস বাদে বইটা পড়ে, তার ভাষা ও রচনাভঙ্গি আমাকে তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট করেছিল। বুঝেছিলাম, এই বই দেশ, জাতি, তার ইতিহাস ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত অন্য এক জগতের হাতছানি দেয়। তার দীর্ঘ তিন দশক পরে আমার অগ্রজপ্রতিম প্রিয় বন্ধু আনিসুজ্জামানের সঙ্গে *শাশ্বত বঙ্গ* নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ হয়েছিল। ইতিমধ্যে আনিসুজ্জামানের *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* ও *স্বরূপের সন্ধানে* পড়ার সুযোগ হয়েছে। প্রশ্ন করেছিলাম, তাঁর এই দুই প্রখ্যাত বইয়ের পেছনে *শাশ্বত বঙ্গ* এবং বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের প্রভাব নিয়ে। এখনও মনে আছে আনিসুজ্জামানের সংক্ষিপ্ত উত্তর। বলেছিলেন, বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের প্রভাব

শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের ওপর সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু ওদুদ ও তাঁর *শাশ্বত বঙ্গের* প্রভাব এখনও আমরা ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারিনি। কথাটা মাথায় ছিল। ২০১৩-১৪ সালে সুযোগ এল 'ঘরে বাইরে বাঙালি' নামক এক আলোচনাচক্রে কিছু বলার। সেই সুবাদে *বারোমাস* পত্রিকায় প্রকাশিত ওই ছোট লেখাকে বড় করে 'ইটার্নাল বেঙ্গল' নামে এক প্রবন্ধ ইংরেজিতে লিখি। আজকের এই লেখা তাই এক অর্থে চিরায়ত ধারণাকে বোঝার আমার তৃতীয় চেষ্টা। আনিসুজ্জামান মারা গেছেন তিন বছরের বেশি। চিরায়ত নিয়ে আলোচনার জন্য তাঁর কাছে ফিরে যাবার আর সুযোগ সেই। মনে পড়ছে, ওঁর স্বভাবসুলভ স্মিত হাসি এবং মন্তব্য, তাহলে সমাজ পরিবর্তন নিয়ে ভাবতে ভাবতে চিরায়তের কথাও ভাবতে হচ্ছে?]

১

আধুনিক বাংলার ইতিহাসে এই প্রশ্ন বারবার উঠেছে, বাঙালি বলতে কী বোঝায়? বাঙালি হওয়ার অর্থ কী? বারংবার এই প্রশ্নের আবির্ভাব হয়তো ইঙ্গিত দেয়, যে এই প্রশ্নকে বোঝা যাবে শুধু ইতিহাসেরই আঙ্গিকে। নইলে, বারবার এই অনুসন্ধান কেন? এই অনুসন্ধানের ইতিহাস কী? এই অনুসন্ধান কি এক সংস্কৃতির সমস্যা, না কি এক ঐতিহাসিক প্রশ্ন? কী সেই ইতিহাস যা ফিরে ফিরে বাঙালিকে প্ররোচিত করেছে ভাবতে যে তারা কারা? তারা কি নিজেদের ইতিহাস যথেষ্ট জানে? এবং যে ইতিহাস তারা জানে সেই ইতিহাসের অর্থ বা তাৎপর্য কী? এইভাবে বাঙালির আত্মপরিচয় এবং আত্মজ্ঞান এক ইতিহাস সংক্রান্ত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এককথায়, কী এই ইতিহাস যা বাঙালির সত্তা ও সত্তাগঠনের প্রক্রিয়াকে একাকার করে দিয়েছে? ইতিহাস অনুসন্ধানকে করেছে সংস্কৃতির অন্তর্গত বা সাংস্কৃতিক আখ্যানের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান? কাজী আবদুল ওদুদের রচনাসংকলন *শাশ্বত বঙ্গ* ওই সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক প্রশ্নের এক বিখ্যাত অভিব্যক্তি। আমার এই লেখা *শাশ্বত বঙ্গ* বইটি নিয়ে নয়। কিন্তু ওদুদের লেখা সংস্কৃতি-ইতিহাস নিয়ে ভাবনার পটভূমিরূপে আজও প্রাসঙ্গিক।

শাশ্বত বঙ্গ প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে ১৯৫১ সালে। এই প্রবন্ধ সংকলনে কিছু লেখা ওদুদের অন্যান্য প্রখ্যাত রচনা থেকে নেওয়া। যেমন 'হিন্দু মুসলমানের বিরোধ' অথবা 'সমাজ ও সাহিত্য'। *শাশ্বত বঙ্গ* গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকের নানা সৃজনশীল চিন্তার ছাপ বহন করে। ওদুদ মুসলিম সাহিত্য সমাজের একজন অগ্রপথিক। পুথিতে আবদ্ধ মুসলিম সমাজের অন্তরের জ্বালা এবং যন্ত্রণা এবং তার থেকে মুক্তির উপায় ওদুদকে ভাবিয়ে তুলেছিল। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য,

সমাজের ইতিহাস, রাজনীতি এবং সমকালীন সম্প্রদায় ও সমাজের প্রকৃতি—এই সব বিষয় নানাভাবে কখনও এককভাবে কখনও মিলেমিশে, *শাশ্বত বঙ্গে* এসেছে। পুরাতনের কাঁটাছেড়া হয়েছে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে। সংবেদনশীল মন নিয়ে ওদুদ সমাজের রক্ষণশীলতা ও কূপমণ্ডূকতা থেকে বেরিয়ে আবার পথ হাতড়েছেন। আধুনিকতার গর্বে ইতিহাসবোধ ত্যাগ করে উন্নাসিক হননি। যে ইতিহাস ওদুদ আঁকার চেষ্টা করেছেন, সে এক বিশেষ সংস্কৃতির ফসল। শুধু 'বুদ্ধির মুক্তি' বললে কম হবে। কারণ, বুদ্ধির মুক্তি অভিযান শুধু এক অন্য ভবিষ্যৎ অর্জনের উদ্দেশ্যে চালিত হবে না, অথবা বলা যায় যে, লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে যদি মুক্তবুদ্ধি খুঁজে পায় বাংলার শাশ্বত চরিত্রকে। এই শাশ্বত চরিত্র আবার নিহিত সমস্যাদীর্ণ বাঙালি সমাজের এগিয়ে যাওয়ার চিরন্তন প্রয়াসের মধ্যে। *শাশ্বত বঙ্গ* তাই ঐতিহাসিক বোধের দিক থেকে খানিকটা প্রহেলিকাময়। আধুনিক হব শাশ্বতকে বুঝে, আত্মোপলব্ধির মধ্যে দিয়েই পথ কেটে এগিয়ে যাওয়া। শাশ্বত বঙ্গের চেতনা একই সঙ্গে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক।

এই কথাটা ধাঁধার মতো লাগলেও হয়তো অত প্রহেলিকাময় নয়। রেমন্ড উইলিয়াম্‌স তাঁর প্রখ্যাত *কিওয়ার্ডস* (*Keywords : A Vocabulary of Culture and Society*, 1976)-এ লিখেছিলেন, কালচার বা সংস্কৃতি শব্দটা প্রায় একটা ফাঁকা শব্দ। যদি বলা যায়, এগ্রিকালচার (কৃষিকর্ম), হর্টিকালচার (উদ্ভিদ চাষের বিদ্যা) অথবা পিসিকালচার (মৎস্যচাষ) তাহলে কালচারের অর্থ স্পষ্ট হয়। অর্থাৎ কালচারকে হতে হয় এক ধরনের বা একাধিক ধরনের প্রয়োগের সমাহার। উইলিয়াম্‌স আরও বলেছিলেন, মার্কিনি সমাজতত্ত্বের দাপটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে কালচারের এই দ্যোতনা সর্বগ্রাসী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় সংস্কৃতি ও কৃষ্টি—এই দুই শব্দের পার্থক্য এইজন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

যাইহোক, ইতিহাসকে দেখার ভঙ্গি একধরনের সাংস্কৃতিক প্রয়াস। এক বিশেষ সাংস্কৃতিক অন্বেষা কখনও কখনও ইতিহাস চর্চার রূপ গ্রহণ করে।

শাশ্বতের সন্ধান, বা শাশ্বত বঙ্গের সন্ধান এই সব কারণে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক।

এই যুগ্ম সন্ধানের পথ ধরে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকগুলিতে তাই আত্মবিশ্লেষণের আলো পড়ল নবাবি আমলের অবসানের পরবর্তী এক শতাব্দীকালের ওপর। এই এক শতাব্দীর স্মৃতি পরবর্তী যুগের বাঙালির কাছে অতি কথা, কলঙ্ক, দুর্ভিক্ষ, হত্যালীলা, অশান্তি এবং

রাজরোষ দ্বারা চিহ্নিত। আধুনিকতার আবাহন হল এই সময়ে। বলা চলে, এই পরিবেশ বাঙালিকে আত্মপরিচয় সন্ধানে প্রবৃত্ত করল। তাই পরবর্তীকালে বাঙালি ভাবনায় যুগপরিবর্তন ও যুগসংকটের মর্মার্থ নিয়ে প্রশ্ন জেগেছে। যে হিংসাপূর্ণ উত্তরণ বাংলায় এল, তা বাঙালির কাছে তাৎপর্য বহন করেছে।

চিরায়ত বাংলার ভাবনার বৈশিষ্ট্যের খানিকটা আন্দাজ উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর অনুসন্ধানের মধ্যে রয়েছে।

২

বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি পরিচিত ধারা আছে। এই ইতিহাস বাংলার ভাষা, শিল্প, সংস্কৃতি, স্বাধীন চিন্তাশক্তি এবং সভাসমিতি গঠনের কাহিনিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। সম্ভবত রামমোহন এবং ইয়ং বেঙ্গল দিয়ে এই গৌরবগাথার শুরু এবং রবীন্দ্রনাথে এসে এই ধারার শেষ। হয়তো নাটক, সিনেমা ইত্যাদিতে এই গৌরবগাথা রবীন্দ্র পরবর্তীকালে কিছুটা এগিয়েছিল। এই ধরনের ভাবনার কিছু সংস্করণে ধর্ম, জাতি, বর্ণ, গ্রামীণ ও বিভিন্ন লোকায়ত সংস্কৃতি এবং আচার— এইসব নিয়ে আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। কিন্তু মোটের ওপর, রামমোহন দিয়ে বাংলার আধুনিক পরিচয়ের আরম্ভ, মধ্যপর্যায়ে বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথে এই পরিচয়ের চরম বিকাশ। তারপর এই গৌরবগাথার যবনিকা।

কিছু ব্যতিক্রমের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় যে মোটের উপর এই হল বাঙালির স্বকীয় ও অনন্য ইতিহাস।

এহেন ইতিহাসের বিশিষ্ট দিকগুলি হল, সাহিত্যে রোমান্টিকতার গভীর প্রভাব। তাই শিল্প, লেখাপত্র এবং ভাবনায় প্রকৃতি ও নিসর্গের দৃঢ় উপস্থিতি। ঔপনিবেশিক বাস্তবতা আমাদের বর্তমানকে বিপর্যয়ের গহ্বরে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু আমরা বাঁচব নান্দনিক উপায়ে। ইতিহাসে আমরা পরাস্ত হতে পারি, কিন্তু জীবনবোধ, বোধশক্তি এবং নান্দনিক স্পৃহাকে সম্বল করে আমরা বাস্তবের দৈন্যকে অতিক্রম করতে সক্ষম। জীবন ও ইতিহাসকে সমালোচনা করার ক্ষমতা, সাহস এবং শৈলী আমরা আহরণ করি নান্দনিক উৎস থেকে। বর্তমানকে বোঝার জন্য নান্দনিক বোধ হল আমাদের সম্বল বা পাথেয়। মঙ্গলকাব্য বা বৈষ্ণবপদাবলি বাঙালির চিরায়তবোধে রসদ জোগায়। এই ধরনের এক বিশেষ বোধ দিয়ে বাঙালি বাংলার অতীতকে বুঝতে চেয়েছে। দুটি দিক নজরে পড়ার মতো। এক, বাংলার এক সম্পূর্ণ ইতিহাস তৈরির সাধনা। দুই, এই সাধনা সংস্কৃতি-মনস্কতায় চিহ্নিত।

দীনেশচন্দ্র সেনের দুখণ্ডের *বৃহৎ বঙ্গ* (১৯৩৫) এই উদ্দেশ্যের জন্য যথেষ্ট হয়নি। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার—এই সব মহারথীরা বাঙালি পরিচিতির এক সঠিক ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। ব্রিটিশ কর্মচারী প্রশাসক এবং কলমচিদের লেখাপত্র বাঙালিকে ঠেলে নিয়ে যায় একই সঙ্গে আঞ্চলিক ইতিহাস প্রণয়নের পথে। হেনরি বেভারিজের সুন্দরবন ও বাখরগঞ্জের ইতিহাস সতীশচন্দ্র মিত্রকে অনুপ্রাণিত করেছিল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *যশোর খুলনার ইতিহাস* প্রণয়ন করতে (দুখণ্ডে: ১৯১৪, ১৯২২)। তবু লক্ষ করার মতো যে, আঞ্চলিক সংঘর্ষ ও আঞ্চলিক সামাজিক দ্বন্দ্ব এই সব রচনায় ফুটে উঠলেও, মূল কাঠামো ছিল বাংলার সার্বিক ইতিহাস প্রকল্পের আদলে। পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ইতিহাসের অভাব পূর্ণ হয়েছে সাংস্কৃতিক আখ্যান দিয়ে। দ্বন্দ্বের স্থান নিয়েছে সমন্বয়। সম্ভবত এই ধরনের এক আঞ্চলিক চৈতন্যের ওপর ভিত্তি করে বাঙালি এগিয়েছে এক পূর্ণাবয়ব বাঙালির ইতিহাস সম্পাদনায়। এই ইতিহাসবোধের সর্বোত্তম নিদর্শন নীহাররঞ্জন রায়ের *বাঙালির ইতিহাস : আদিপর্ব* (১৯৪৯)।

এই যাত্রায় দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। সংশয় ছিল এই ধরনের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনার উপযুক্ত পথ কী? বাঙালির ইতিহাস না বাংলার ইতিহাস, বাংলা নামক ভূখণ্ড, যা এক দীর্ঘ সময় ধরে প্রেসিডেন্সি ডিভিশন নামে পরিচিত একটি প্রশাসনিক ইউনিট ছিল, তাই কি বাংলা? জাতি, বর্ণ, ভাষা, অঞ্চল, দেশত্যাগ ও দেশান্তরী হওয়ার আখ্যান এইসব বিষয় বাংলার পূর্ণাবয়ব আবিষ্কারের ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রশ্নরূপে আবির্ভূত হল। বাঙালি কি নৃতত্ত্বগতভাবে এক স্বতন্ত্র জাতি? বাংলায় যারা এসেছে যুগে যুগে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যারা থেকে গেল, তারা কি বাঙালি হয়ে উঠল? রমাপ্রসাদ চন্দ এবং অনেকে নতুনভাবে বাংলা ও বাঙালিকে চেনার জন্য উদ্যোগী হলেন। সবচেয়ে কঠিন দ্বিধা হল: বাঙালির ইতিহাস যদি আত্মানুসন্ধানের ইতিহাস হয় এবং এই নিরন্তর আত্মানুসন্ধানই যদি বাঙালি চৈতন্যের প্রধান উপাদান হয়, তবে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রবর্তনের দুর্যোগকালে, সেই ভীষণ উত্তরণকে ঘিরে কেন বাঙালির ভবিষ্যৎ এবং ভবিতব্য আবর্তিত হয়েছে? বাংলা চিরায়ত হবে কী করে, যদি বাঙালির আত্মানুসন্ধান ১৯৫৭ থেকে ১৮৫৭ এই একশো বছরের ধোঁয়াশার রুদ্ধদ্বারে বারবার ধাক্কা খেতে থাকে? যাকে আমরা নবজাগরণ বলি, তা আমাদের আত্মানুসন্ধানের দ্বৈততার সব ধরনের চিহ্ন বহন করেছে। এই নবজাগরণ একদিকে চিরায়ত বাংলাকে খুঁজে পাওয়ার প্রয়াস, অন্য দিকে পরিবর্তন অথবা উত্তরণের যুগের

দ্বিধা-দ্বন্দ্বে বিক্ষত। স্বভাবত উত্তরণ নিয়ে ভাবনা চিরায়ত বাংলার ভাবনার অন্যরূপ হয়ে বাঙালি ভাবনায় আজও রয়ে গেছে।

ওদুদের *শাশ্বত বঙ্গ* এই দ্বন্দ্বে দীর্ণ। এই দ্বিধা ওদুদের শাশ্বত বঙ্গের ধারণাকে ভঙ্গুর করেছে আবার মহীয়ানও করেছে। চিন্তার মহত্ত্ব শাশ্বতের ধারণার মহত্ত্বের উপর ভর করে দাঁড়িয়েছে।

নবাবি আমল থেকে ঔপনিবেশিক যুগে উত্তরণে বাংলার চরম ক্ষতি হল। বাংলা আধুনিক হল। কিন্তু উত্তরণের সেই বিয়োগান্ত কাহিনি বাঙালির সঙ্গী হয়ে রইল। আধুনিকতার মূলে উত্তরণের সেই বিয়োগান্ত কাহিনি কীভাবে আধুনিকতার অঙ্গ হয়ে গেল ওদুদ তা বারবার স্মরণ করেছিলেন। চিরায়ত বাংলার কল্পনা ও কাহিনি এই দুই ভাবনাকে অবলম্বন করে বাঙালির ইতিহাসবোধ তার রূপ গ্রহণ করেছে। এই চিরায়তের সৃষ্টি মধ্যযুগের মরমিয়া সাহিত্য থেকে, যা হিন্দু-মুসলমান ভেদ ও সম্পর্ককে অতিক্রম করে এক বহমান ভাষা ও মানসের আভাস দেয়। ঔপনিবেশিক যুগের প্রবর্তনে বাংলায় দুর্ভিক্ষ, অরাজকতা ও এক সর্বব্যাপী সংকটের মধ্য দিয়ে বাংলার সার্বভৌম সত্তা চলে গেল। *সিয়ার-উল-মুতাক্ষরিণ*-এর বারবার উল্লেখ করে ওদুদ বলেছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে পুরো ঊনবিংশ শতাব্দী বাঙালি মুসলমানের দুর্যোগের কাল। রামমোহনের ভাবনা বাঙালি মুসলমানের কানে পৌঁছায়নি। গোটা শতাব্দী লেগেছে চৈতন্যের প্রত্যাবর্তনে। মুসলমান জাগরণে চিরায়ত বাংলাও ফিরবে। গোটা বাংলা ফিরে আসবে এই চৈতন্যমন্থনের মধ্য দিয়ে। বাংলার শাশ্বতরূপও ফিরবে।

শাশ্বতবোধের প্রত্যাবর্তনের কাহিনি যুগপৎ ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক। সংস্কৃতির আধার ছাড়া এই কাহিনি বোঝা যাবে না। কিন্তু, এই শ্বাশত রূপ বোঝা যাবে শুধু উত্তরণের ইতিহাসের মাঝেই। এ যেন এক নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়া। যত আমরা ইতিহাসের কথা ভাবি, ততই ইতিহাস আমাদের ছুঁড়ে দেয় সংস্কৃতির অবোধ্য, হেঁয়ালিভরা জগতে। আর যত আমরা সংস্কৃতির প্রহেলিকাকে বোঝার চেষ্টা করি ততই আমরা ধাক্কা খেয়ে ফেরত আসি ইতিহাসের মাঝে। সম্ভবত একেই দার্শনিক আডোরনো বলেছিলেন 'নেগেটিভ ডায়ালেকটিক্স', নঞর্থক দ্বান্দ্বিকতা।

৩

দুটি উপাদান বাঙালি চৈতন্যে এই নিরন্তর প্রতিঘাতের মূলে কাজ করেছে। এক, মৃত্যু নিয়ে বাঙালির জীবনবোধ অর্থাৎ বাঙালির মৃত্যুবোধ বা মৃত্যুভাবনা।

দুই, জাতি নির্ণয় সম্পর্কে বাঙালির দোদুল্যমানতা। এই দুই উপাদানেরই আবির্ভাব হয়েছে উপরে উল্লেখিত যুগান্তর অথবা পরিবর্তনের কালকে অবলম্বন করে।

মৃত্যুবোধ বাঙালি মানসে রোমান্টিকতা থেকে এক সমালোচনামূলক এবং সংশয়বাদীবোধে উত্তরণে সাহায্য করেছিল। যদিও স্বীকার করে নেওয়া উচিত যে এই উত্তরণও রোমান্টিক হয়ে রইল। সংশয়বাদী চিন্তা ও চিন্তাবিদরাও পরিণত হলেন স্মৃতিকথার অ্যাখ্যানে। বাঙালির মৃত্যুবোধ তাই নান্দনিকতায় চিহ্নিত। সে যাই হোক, মাইকেল মধুসূদনের *মেঘনাদবধ কাব্যে* এই মৃত্যুবোধের গম্ভীর ঘোষণা। তারপর নবীন সেনের *পলাশীর যুদ্ধ* (১৮৭৫), বঙ্কিমচন্দ্রের *রাজসিংহ* (১৮৮২), রমেশচন্দ্র দত্তের *রাজপুত জীবন সন্ধ্যা* (১৮৭৯) এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র *সিরাজদ্দৌল্লা* (১৮৯৬) বাঙালিকে উপলব্ধিতে সাহায্য করেছিল যে, ট্র্যাজেডি বাদ দিয়ে রোমান্স হয় না। জীবনবোধ থেকে যায় অসম্পূর্ণ। ইতিহাসে বাঙালি থাকবে ব্যর্থ জাতি হিসেবে। জীবনাদর্শ অনুসন্ধানে বারংবার বাঙালিকে মরতে হবে। তবু এই মৃত্যু বরণেই তার গৌরব, তা ইতিহাসে বাঙালি যতই ব্যর্থ হোক না কেন। ইতিহাসে বিফলতা বাঙালি অতিক্রম করবে, বিসর্জন, মৃত্যুবরণ এবং অমরত্বের মাধ্যমে। ঐতিহাসিক বাস্তবের উত্তর, বা হয়তো বলা উচিত প্রতিকল্পরূপে গড়ে উঠল বাঙালির নান্দনিক বোধ। নান্দনিক ক্ষমতা বাস্তবায়িত হল রাজনৈতিক অক্ষমতার পরিপূরকরূপে। যত ভাঙন এল বাঙালির জীবনে, ততই মনে হল বাংলা চিরায়ত।

বাঙালির মৃত্যুবোধের গভীরতার শেষ এখানে নয়। পলাশির যুদ্ধের পরে রাজ্যপাট পরিবর্তনের উল্লেখ আমি আগেই করেছি। স্বাধীন নবাবের মৃত্যু, মন্বন্তর, নৈরাজ্য, কৃষকবিদ্রোহ এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিত্তিতে এক নতুন ধরনের ভূস্বামী প্রথা এবং এরই মাঝে ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা ও প্রসার, এবং একই সঙ্গে পশ্চিমি যুক্তিবাদের মায়াবী উপস্থিতি— সব মিলিয়ে এই কাল যেন বাঙালির কাছে এক অতল গহ্বর, এক অন্তহীন কৃষ্ণক্ষেত্র। এর স্বরূপ উপলব্ধির জন্য বাঙালি মানস পুনরধ্যয়ন করেছে সৈয়দ গোলাম হোসেন তাবাতাবাই-এর *সিয়ার-উল-মুতাক্ষরিণ* (১৭৮১-তে প্রথম ইংরেজি অনুবাদ) এবং গোলাম হোসেন জায়েদপুরির *রিয়াজ-উস্-সালাতিন*-কে (১৭৮৮)। যুগ পরিবর্তনের আখ্যান দিতে গিয়ে তাবাতাবাই বলেছেন, সিরাজকে মরতেই হত। জ্ঞানালোক সজ্জিত ব্রিটিশ শাসনের জন্য বলি দিতে হত পুরোনো শাসকের জীবন। সমগ্র সমাজের উৎসর্গ নয়। বাংলায় কোনও মির্জা গালিব ছিলেন না। যিনি এই

পরিবর্তনের জটিল দ্যোতনা সামনে আনবেন। তবে তাবাতাবাই লিখলেন, স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার মরণ হল পরিবর্তনের রথাশ্বের তলায়। তাবাতাবাই তির্যক মন্তব্য করেছেন, নতুন মুদ্রা প্রচলন, পুরোনো নৃপতিকে হত্যা, যুদ্ধজয় এবং সৈন্যবাহিনীর জন্য নতুন পতাকা—এ সব দিয়েই রাজ্যপাটের পরিবর্তন হয়। নইলে সার্বভৌমত্বের প্রতীক প্রজাবর্গ চিনবে কী করে?

এই কি ছিল মৃত্যুর তাৎপর্য এবং ব্যাখ্যা? সত্যি কথা যদি স্বীকার করতে হয়, বাঙালি মানসে মৃত্যুর তাৎপর্য অনুভূত ও স্বীকৃত হয়েছে ধীরে ধীরে। সিরাজকে নিয়ে বাঙালির কম ঝক্কি হয়নি। *আনন্দমঠ* স্মরণ করুন। সার্বভৌমত্বের হস্তান্তর ও উত্তরণকে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেক হেঁয়ালি করতে হয়েছিল। যুদ্ধের প্রাক্মুহূর্তে বিদ্রোহী যখন বলছেন, 'ত্বরা করো। রণক্ষেত্রে আমরা প্রাণ দিই', তখন উপদেশ এসেছে, মৃত্যুর কথা আমরা পরে বলব। বরং এখন এসো, বলি 'বন্দে মাতরম্'। কিন্তু, কে এই মাতা? আমরা ভাবি দেশমাতৃকা। কিন্তু, তা নয়। বরং দুই উজ্জ্বল দ্যুতিময় মূর্তি। বিসর্জন হাত ধরে আসে প্রতিষ্ঠার। রূপ পরিবর্তনে এই ছিল ধর্ম, এই এখন তার অবয়ব, এই রূপ তিনি নেবেন। বঙ্কিম লিখেছেন,

> মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরিলেন। কি অপূর্ব শোভা! সেই গম্ভীর বিষ্ণুমন্দিরে প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্তির সম্মুখে, ক্ষীণালোকে সেই মহাপ্রতিভাপূর্ণ দুই পুরুষমূর্তি শোভিত— একে অন্যের হাত ধরিয়াছেন। কে কাহাকে ধরিয়াছে— ধর্ম আসিয়া কর্মকে ধরিয়াছে। বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে, কল্যাণী আসিয়া শান্তিকে ধরিয়াছে। এই সত্যানন্দ শান্তি; এই মহাপুরুষ কল্যাণী। সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিসর্জন। বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।

বঙ্কিম বলেছেন, রূপান্তরের এই রেখাচিত্রে বিদ্রোহী সত্যানন্দ ভীত হলেন। মৃত্যু এবং পটপরিবর্তনের তাৎপর্য বুঝতে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি লেখকরা তাবাতাবাই-এর আখ্যান *সিয়ার-উল-মুতাক্ষরিণ*-এ বারবার ফিরেছেন। তাবাতাবাইকে তাঁরা অস্বীকার করতে পারেননি, আবার মানতেও পারেননি। সিরাজের মৃত্যু স্বাধীনতার মৃত্যু, বাংলার পতন, বাঙালির বিপর্যয়। অথচ, সিরাজকে তাঁরা কাছেও টানতে পারেননি। এ আলোচনা বিশদভাবে করার স্থান এটা নয়। কিন্তু লক্ষ করার মতো, সেই যুগের বর্ণনা বাঙালি লেখকরা, বঙ্কিম হোন বা ওদুদ হোন, দিয়েছেন এক দরদী মন নিয়ে। ওদুদ 'সম্মোহিত মুসলমান' এবং 'হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক' এই দুই বিখ্যাত প্রবন্ধে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন *সিয়ার-উল-মুতাক্ষরিণ*-এর কথা। মুসলমানের বিপর্যয় শুধু

এক সম্প্রদায়ের বিপর্যয় নয়। বাঙালির বিপর্যয়। জমিদারি প্রথার প্রবর্তন এবং হান্টারের রিপোর্টকে অবলম্বন করে বাঙালি মুসলমানের শুধু আত্মপ্রলাপ, উঠে দাঁড়ানোর আত্মশক্তি নেই। অথচ পুরোনো সম্মান, মর্যাদা এবং সমান পরিচিতির যুগগত ইংরেজের গোলামিকে মনে হচ্ছে হিন্দুর কাছে গোলামি।

বাঙালি মুসলমানের এই বিপর্যয়বোধ সমগ্র বাঙালি সমাজে ছড়িয়েছিল। গোবিন্দ সামন্ত নামে রায়তের জীবনও ছিল বিপর্যয়ের কাহিনি। রেভারেন্ড লালবিহারী দে লিখেছিলেন, অজানা জ্বরে, বর্ধমান শহরে, বাড়ি থেকে অনেক দূরে সহায় সম্বলহীন গোবিন্দ সামন্ত মরে পড়েছিল। এই বিপর্যয়বোধ বাঙালি চেতনায় এক গভীর হতাশা এবং মমতা— দুয়েরই উদ্রেক করেছে। বিশেষত মুসলমানের কথা বলতে গিয়ে ওদুদ লিখেছিলেন, বাঙালি মুসলমান সম্মোহিত।

হিন্দু-মুসলমান বিরোধ শাশ্বত বঙ্গের ধারণাকে এইভাবে আকর্ষণীয় ও ভঙ্গুর করেছে। বিরোধ ও মিলন সমন্বিত এই চিরায়ত রূপ আঁকতে নিপুণ শৈলীর প্রয়োজন। হিন্দু-মুসলমান বিরোধের আলোচনার ভিত্তিরূপে কাজ করেছে দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক অধীনতা বা দাসত্বের অতিকথা। বুদ্ধির জয়যাত্রায় মগ্ন হতে গিয়ে *সিয়ার-উল-মুতাক্ষরিণ*-এর কথা তাই ফিরে এসেছে। পট পরিবর্তনের আখ্যান নতুন ব্যঞ্জনা পেয়েছে। তার কারণ, ওই পটপরিবর্তন বাঙালিমানসের রূপ পরিবর্তনেরও এক আখ্যান।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বিপ্লবী বাঙালি মৃত্যুকে নবপর্যায়ে চিনল। বিপ্লবীদের মুখপত্র *যুগান্তর-এ* মৃত্যুবরণের আলোচনা নতুন মাত্রা পেল। মরণের তাৎপর্য তুলে ধরা হল নবজীবনের আবশ্যিক শর্তরূপে। ‘যোগক্ষ্যাপা’ নামে এক পত্র লেখক *যুগান্তর*কে জানালেন, কেন আত্মাবিষ্কারের পথে বাঙালির মৃত্যুবরণ প্রয়োজন ; কেনই বা বাঙালির আত্মাবিষ্কার দেশের স্বাধীনতার প্রয়াসের এক অঙ্গ। বঙ্কিমচন্দ্রের *কৃষ্ণচরিত্র*-র কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করুন। এই বিশাল রচনায় বঙ্কিম কৃষ্ণের অসময়, স্বেচ্ছামৃত্যুর কথা লিখেছেন। এই মৃত্যু অসময় কেন? তার কারণ কৃষ্ণের সমগ্র জীবন হল একটি ‘চরিত্রে’র আবির্ভাব এবং বিবর্তন। এই চরিত্র হল বিচক্ষণতা এবং অনুশীলনের ক্ষমতা।

অনুশীলনের তত্ত্ব হল এক নৈতিক-আধ্যাত্মিক-নান্দনিক পথের ইঙ্গিত। মৃত্যুর তাৎপর্যের সম্পূর্ণ উপলব্ধি হতে পারে এই নৈতিক-আধ্যাত্মিক-নান্দনিক পথে। এই পথকে বাদ দিয়ে হিংসা অর্থহীন। প্রত্যক্ষ দলীয় রাজনীতি, অথবা রাজ্যপাট দখলের রাজনীতি নয়; রাজনৈতিক উদ্যমের পেছনে নৈতিক নান্দনিক

বোধ চাই। অর্থাৎ, এক জীবনদর্শন চাই। রবীন্দ্রনাথসহ সব বাঙালি চিন্তাবিদেরই তাই প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে বিরক্তি বা অনাসক্তি ছিল। রবীন্দ্রনাথের বিবিধ রচনায় মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে নিখাদরূপে, পবিত্র থেকে পবিত্রতর ব্যঞ্জনায়। 'কাব্যে উপেক্ষিতা'য় (১৯০০) যে চলে গেল, পাঠকের বা দর্শকের আড়ালে গিয়ে যার সমাপ্তি হল। তার কী হবে? মরণকে অন্যত্র তিনি বলেছেন বন্ধু। জীবনের নিত্যতা এবং নিশ্চয়তার বিরুদ্ধে মরণ হল অনিশ্চয়তা, অজ্ঞেয়। জীবনের আনন্দ তার বৈপরীত্য খুঁজে পাবে মৃত্যুতে, মৃত্যুর বিষাদে। দাসত্বের বিরুদ্ধে বাস্তবতা হল মৃত্যু। পঙ্কিল কালের অবসান হয় মৃত্যুতে। এইভাবে মৃত্যুর নানা ব্যঞ্জনায় সৌন্দর্যের প্রতিভাস। মৃত্যুকে তাই বীভৎস ভেবো না। ফাঁসির মঞ্চে যেতে হবে এমনভাবে যার নান্দনিক রেশ থেকে যায়। বাংলা হল চিরায়ত কারণ নান্দনিক চিহ্নে তার জীবন পূর্ণ। নান্দনিক হল সুন্দর। এই সৌন্দর্যই হল চিরায়ত উপস্থিতির উৎস। বাঙালির অবচেতন নিয়ে গবেষকরা ভেবে ভেবে অশান্ত হয়ে উঠুন। কিন্তু বাঙালির ইতিহাস ভাবনার এই বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়বেই; জীবন প্রতিস্থাপিত হয়েছে মৃত্যুর কামনায়। রূঢ় বাস্তবতার স্থানান্তর দুর্জ্ঞেয় মরণে। কঠোরতা স্থান ছেড়ে দিয়েছে সৌন্দর্যের বাসনাতে।

ওদুদ একেই বলেছেন 'সম্মোহিত বাঙালি'।

তবু একটা সমস্যা থেকেই যায়। নান্দনিক ক্ষমতা যদি নান্দনিক সার্বভৌমত্ব বা স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের ইঙ্গিত করে, তবু তা দিয়ে এক সার্বিক, বা দেশগত সার্বভৌমত্বের প্রশ্নকে এড়ানো যাবে না। সার্বভৌমত্বের সার্বিক সত্তার প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। সাধনা, অনুশীলন, কর্ম— যে তিনটি প্রয়োজনের উল্লেখ আমরা *কৃষ্ণচরিত্র*-এ ঘুরে ফিরে পাই, তা কি যথেষ্ট হবে এই সার্বিক সার্বভৌমত্ব অর্জনে? সাত কোটি বাঙালি কি 'বাঙালিত্ব' থেকে বড়ো হয়ে মানুষ হবে? কীভাবে আত্মপরিচয় সন্ধান ও পুনর্গঠন যাত্রা— এই দ্বৈত থেকে বাঙালি মুক্তি পাবে? মৃত্যু ও ত্যাগ কি এক নতুন দিশার সন্ধান জুগিয়ে এই অসহনীয় দ্বৈত থেকে বাঙালিকে মুক্ত করবে?

এবং তাই যদি হত, তবে সিরাজের মৃত্যু ইতিহাসের বন্ধ দুয়ার খুলতে ব্যর্থ হল কেন? 'সিরাজউদ্‌দৌলা' কি বাঙালি? তার চরিত্র কি বিচক্ষণতা এবং অনুশীলনের প্রতীক? বাঙালি সিরাজ নিয়ে ভেবে মরেছে। সিরাজকে আপন করতে পারেনি। দূর করে দিতেও পারেনি। যুগ পরিবর্তনের যন্ত্রণায় বাঙালি স্থবির। বঙ্কিম লিখেছিলেন, অনুশীলনের অর্থ হল 'উপযুক্ত কর্ম বা লক্ষ্যাভিমুখিন

অনুষ্ঠান'। কিন্তু, এই লক্ষ্য কী? তার নির্ধারণের পথ কী? সম্ভবত কূটতর্ক ভেবে বঙ্কিম এর উত্তর থেকে বিরত থেকেছেন।

এই রকম নানা দ্বন্দ্বে এবং দোলাচলে বাঙালি অস্তিত্বের একাধিক শতাব্দী অতিক্রান্ত। এই দোলাচল হল জীবনকে অভ্যর্থনা এবং মৃত্যুকে বরণ। রাজনীতির আকর্ষণ এবং নান্দনিক মূল্যবোধ। এবং চিন্তা ও অনুশীলনের মাঝে সত্যকে আবিষ্কারের চেষ্টা। এই দোলাচলের মাঝে জীবনকে মনে হয় ভঙ্গুর। বাঙালির জীবন ভঙ্গুর। চরিত্র ভঙ্গুর। রবীন্দ্রনাথের মহত্তম চরিত্র গোরা ভঙ্গুর। মহান চরিত্ররা আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হবেন। দেশের স্বাধীনতালাভের কোনো নির্দিষ্ট পথের সাফল্যের নিশ্চয়তা নেই। মৃত্যু, হতাশা, যবনিকাপাত— যে কোনো সময়ে জীবনের মহত্ত্ব কেড়ে নিতে পারে। এই অনিশ্চিয়তার সাগরে পাড়ি দেওয়া যায় নান্দনিক সম্পদকে সম্বল করে। নান্দনিক রসদ দিয়ে জীবন, ধর্ম, সত্য— এই সব কিছুর বহুমাত্রিকতা এবং ভঙ্গুরতাকে সামলানো যায়।

প্রকৃতি আছে, সত্য আছে, মার্কসবাদ আছে, রাজনীতি আছে, সমিতি আছে। কিন্তু এর কোনোটাই একমাত্রিক নয়, বহুমাত্রিক। এই বহুমাত্রিকরূপে লোকপ্রিয় ধারণাই হল চিরায়ত বাংলা বা শাশ্বত বঙ্গ।

৪

বাঙালির স্বরূপ সন্ধানের দ্বিতীয় দিকটি হল বাঙালির ইতিহাসে জাতি (রাজনৈতিক এবং নৃত্তত্বগত দুই অর্থে) হয়ে ওঠার সম্ভাবনাকে ঘিরে। স্বাধীন জাতি, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। আর মোটামুটি এই ইতিহাস শিক্ষিত বাঙালির জানা। কিন্তু যে দিকটা নিয়ে আমরা অত ভাবি না বা ভাবলে অস্বস্তি হয়, তাকে এড়িয়ে যেতে চাই, তা হল নৃগোষ্ঠী অর্থে বাঙালির জাতি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। আমরা বলি বটে এ হল নৃতত্ত্বগতভাবে জাতি হয়ে ওঠা এবং স্বাধীন জাতি হয়ে ওঠার ইতিহাস পূর্বোক্ত ইতিহাস থেকে আলাদা। কিন্তু প্রায় সর্বত্র লক্ষ করা যায় এই দুয়ের আন্তঃসম্পর্ক। একসময় যা মনে করা হত নৃতত্ত্বগত উপাদান, আজ তার স্থান নিয়েছে সাংস্কৃতিক উপাদান। তোমার খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, সাংসাররীতি, ধর্ম, এবং অবশ্যই চামড়ার রং ঠিক করবে তোমার জাতি কী? সংস্কৃতির দিক থেকে যত আমরা সংঘবদ্ধ হব, তত আমরা দাবি করতে পারব, আমরা এক স্বতন্ত্র জাতি, স্বতন্ত্র নৃগোষ্ঠী। সার্বভৌমত্ব আমাদের অধিকার। জাতি শব্দটির এই দুই অর্থ অথবা তাৎপর্য পৃথক কিন্তু প্রায়শ মিলেমিশে যায়। ঐতিহাসিকদের মাথা খারাপ করে দেয়। তাঁরা নিজেরাই

সন্দিহান হয়ে ওঠেন। তাঁরা একটি জাতির কোন্ ইতিহাস লিখছেন? চিরায়ত বাংলার কল্পনার ইতিহাসেও এই যন্ত্রণা থেকে গেছে।

আমরা জানি, এক সময় বাঙালির আত্মচৈতন্য সংশয়াকুল হয়ে উঠেছিল এই চিন্তায় যে, বাঙালিকে স্বাধীন হতে গেলে স্বাধীন জাতি বা স্বতন্ত্র জাতি হতে হবে। প্রশ্ন উঠেছিল, বাঙালি কতটা মিশ্র জাতি? বাঙালি যদি মিশ্র জাতি হয়, তবে বাঙালি কি কখনও এক নৃতত্ত্বগতভাবে সংহত জাতি হয়ে উঠতে পারবে? এই ধরনের চিন্তার পেছনে রিসলির অবদান থাকলেও বাঙালির নিজস্ব চৈতন্যগত সংশয় ও জিজ্ঞাসাও কম ছিল না। রমাপ্রসাদ চন্দ, বিনয় সরকার এবং আরও অনেকে এই অনুসন্ধান ব্রতী হয়েছিলেন। নীহাররঞ্জন রায় প্রশ্নটির অস্তিত্ব স্বীকার করে তারপর দক্ষতায় তাকে এড়িয়ে গেছেন। বলেছেন, বাঙালির মিশ্র উৎপত্তি। কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হয়নি।

ঔপনিবেশিক বিজয়ের পর বাঙালি চিনল, বিদেশি জাতি বলতে কী বোঝায় বা কারা? বঙ্কিমচন্দ্র সারাজীবন চেষ্টা করেছিলেন এর উত্তর দিতে। ইংরেজ যদি বিদেশি জাতি হয়, গৌরবর্ণ যদি বিদেশি জাতি পরিচিতির লক্ষণ হয়, তবে কৃষ্ণচর্ম জনজাতি অথবা অন্যধর্মাবলম্বী মানুষ যেমন মুসলমান, তারা কি বিদেশি জাতির একজন মানুষ?

বাংলা যদি জাতি পরিচয়কে ঘিরে অন্তর্দীর্ণতায় জর্জরিত থাকে, তবে তা চিরায়ত হবে কী করে, বা হল কী করে?

সিপাহি বিদ্রোহ ও ওয়াহবি বিদ্রোহের পরের কিছু দশকে বাংলার গ্রামে গ্রামে এই দুই বিদ্রোহের অনুরণন শোনা যেত। *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* বইয়ে আবুল মনসুর আহ্‌মদ লিখেছেন যে ওয়াহবি প্রচারকরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেও বাংলার গ্রামে গিয়ে স্বাধীনতার কথা বলেছেন। কাজেই সিরাজ কী আমাদের শাসক, এর উত্তর নানাভাবে এসেছে। সৈয়দ গোলাম হোসেন সিরাজ সম্পর্কে যা লিখেছিলেন, তা কি বাঙালির চরিত্রহনন?

এই আলোচনায় আমরা দুটি শব্দের প্রভূত উল্লেখ পাই: বিধর্মী এবং জাতি।

বিধর্মী কে? ওদুদ সংকলিত *ব্যবহারিক শব্দ কোষ* (১৯৫৩)-এ বলা আছে 'বিধর্মী' শব্দের তাৎপর্য হল যার বিপরীত ধর্ম। 'বিধর্ম' অধর্ম নয়, অর্থাৎ পাপ নয় বা ধর্মের পবিত্রতা নষ্ট করা নয়। তাহলে বিধর্মীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা কি অধর্ম? সিরাজ বিধর্মী। কিন্তু বিধর্মীকে স্বীকৃতি দান কি অধর্মের কাজ? এইভাবে জাতির সংহতি রচনার পথে এক বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়াল জাতির সংজ্ঞা

নিরূপণের প্রশ্ন। জাতি কি এক নৃতত্ত্বগতভাবে সংহত জনগোষ্ঠী? সেই প্রশ্নে ফিরে চলুন যা দিয়ে চিরায়তের সন্ধানের সূচনা। ভাষা, ভূখণ্ড, ইতিহাস— এ সবের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বাঙালি জানতে চেয়েছে, যা শাশ্বত বঙ্গের উপলব্ধিতে সাহায্য করবে। যেন, এই সবের এক অন্তর্নিহিত অর্থ আছে, যার উপলব্ধিতে বাঙালির আত্মচৈতন্য হবে। এই দোলাচল বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র— সবার লেখায় আছে। এই দোলাচলের স্পষ্টতর ছাপ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, আক্রম খাঁ, আবুল মনসুর আহমদ, হুমায়ুন কবীর, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কাজী আবদুল ওদুদ— এঁদের লেখায়। রবীন্দ্রনাথে এই দোলাচলের উপস্থিতি সর্বাধিক। কারণ এঁরা নৃতত্ত্বগতভাবে জাতি-ধারণার ফাঁদে পড়তে চাননি। অথচ পাঠকের রূঢ় বাস্তবতার সামনে এদের ভাবতে হয়েছে, কীভাবে বাঙালির এই বহুগত অস্তিত্বের মর্ম বোঝা যাবে? কীভাবে বাংলার ও বাঙালির অতীত উন্মোচিত হবে?

ওদুদের *শাশ্বত বঙ্গে* ফিরে চলুন। ওদুদের অন্যতম অনুসন্ধান ছিল, সামাজিক ভেদের চরিত্র বুঝতে গিয়ে কীভাবে জাতিসর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এড়ানো যায়। হিন্দু মুসলমান যদি দুটি একক হয়, যার সমষ্টিতে বাঙালি সমাজ, ওদুদ প্রশ্ন করেছিলেন, মুসলমান ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় কি একটি একক? তাহলে মুসলমান সমাজের মধ্যে 'মারফতপন্থী' এবং 'আলেমপন্থী'দের মাঝে পার্থক্য ও বিরোধ কেন? অথবা, শাক্ত ও বৈষ্ণবদের মধ্যে? অতএব, ভাবা উচিত। একটি ধর্মাবলম্বী সমাজ হিসাবে হিন্দু অথবা মুসলমান সমাজের সার্বভৌমত্বের দাবি কতটা ন্যায্য বা যুক্তিসঙ্গত? দেশভাগের বিয়োগান্ত পরিণতি বোঝার ক্ষেত্রে বাঙালি মানসে এইসব নিদারুণ প্রশ্ন ফিরে এসেছিল এবং আলোচনা জটিলতর আকার ধারণ করেছিল। সে আলোচনা অবশ্য স্বতন্ত্র এবং এই অবসরে সম্ভব নয়।

শুধু এইটুকু বলা যায়, শাশ্বত বঙ্গের সন্ধানই হল শাশ্বত। এই সন্ধান আবহমান কাল জুড়ে চলেছে এবং এটাই হল চিরায়ত বাংলা। এই চিরায়ত বাংলার আকর্ষণ বাঙালির কাছে অমোঘ এবং অনস্বীকার্য। কারণ চিরায়ত রূপ বলে যদি কিছু থাকে, তা পরিবর্তনের ঘাত প্রতিঘাত বারংবার চিহ্নিত হয়ে পুনরাবির্ভূত হয়েছে। ইতিহাস বাঙালির ভবিতব্যকে যদি ভঙ্গুর এবং একটি নির্দিষ্ট কালের অধীন করে থাকে, ফসল হিসেবে আমাদের সামনে হাজির করে থাকে বাঙালিকে এক ক্ষীণজীবী, ভঙ্গুর জাতি রূপে, তার প্রত্যুত্তরে বাঙালি বেছে নিয়েছে নান্দনিক আত্মপরিচয়।

৫

সংক্ষেপে, বাঙালির এক অনন্য সত্তা রাজনীতি ও নান্দনিক বোধ— দুয়েরই সাধারণ বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। রাজনীতি এবং নান্দনিক অস্তিত্বের পার্থক্য আবির্ভূত হয়েছে একটি বাস্তবরূপে, একই সঙ্গে এই পার্থক্য অবচেতন প্রসূত। অথবা বলতে পারেন, নান্দনিকবোধ বাংলাকে চিরায়ত করেছে নানা পার্থক্য সত্ত্বেও এবং নানা পার্থক্যের সঙ্গে সংগ্রাম ও বোঝাপড়া করে। ফলে রাজনীতির পরীক্ষা হয়েছে নান্দনিক আয়নায়; নান্দনিকের পরীক্ষা হয়েছে রাজনীতির কষ্টিপাথরে। বাস্তব সম্পর্কে চিরস্থায়ী অসন্তোষ বাঙালিকে ঠেলেছে কল্পলোকে। কল্পনা ও কল্পকথা উচ্চমর্যাদা পেয়েছে বাঙালি আসরে। সে মর্যাদা এতটাই উচ্চ যে রাজনীতির বিচার সর্বদা হয়েছে আদর্শের বিচারে। কল্পস্বর্গের নিরিখে। কল্পস্বর্গের আকর্ষণ বাঙালিকে উৎসাহিত করেছে বাঁচতে, সময় সময় মৃত্যুবরণ করতে।

মুনশি আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের (১৮৬৯-১৯৫৩) কথা স্মরণ করুন। বাঙালি পুথির সংগ্রাহক আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের কাছে বাঙালি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। তাঁর সংগৃহীত পুথির প্রকাশনার ভূমিকায় ব্যোমকেশ মুস্তাফি লিখেছিলেন, আবদুল করিম একজন মুসলমান। হিন্দু বাড়িতে তার প্রবেশাধিকার ছিল না, অথবা হিন্দুবাড়ি সংলগ্ন গলি দিয়ে যাওয়ার অধিকার ছিল না। তবু যদি তাঁর কানে যেত যে কোনও এক হিন্দু বাড়িতে একটি মূল্যবান পুথি আছে, সেই বাড়ির দরজায় পৌঁছে ভিক্ষুকের মতো বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেন মুনশি আবদুল করিম পুথিটি চাক্ষুষ করার আশায়। সরস্বতী পূজার সময় পুথিরও পূজা হয় এবং পুথিকে বাইরে আনা হয়। কিন্তু সেই পুণ্য দিনে মুসলমানদের ওই সব পুথি স্পর্শ করতে দেওয়া হয় না। তাই অনেকে তাঁকে পুথিগুলি দেখতে পর্যন্ত দিত না। কেউ কেউ অবশ্য আবদুল করিমের একান্ত অনুরোধে পুথি দেখতে দিতেন, স্পর্শ করতে নয়। তাঁরাই পাতা উলটে দিতেন যাতে করিম পড়তে পারেন। এইভাবে তিনি পাতাগুলো পড়ে টুকে নিতেন এবং ওই সব পুথির বিবরণ লিখে গেছেন।

আবদুল করিম নিজে লিখেছেন, আমরা সেই যুগের শুকতারা এবং সান্ধ্যতারা যখন মুসলমানেরা বাংলা ভাষায় আধুনিক সাহিত্যচর্চা শুরু করল। কিন্তু আমি এই আধুনিক সাহিত্যকর্মীদের দল থেকে সরে গিয়েছিলাম। বাকিরা যখন আরবি, ফারসি, আর তুর্কি ভাইদের জীবন ও কর্ম বাংলা ভাষায় সবার সামনে আনছিল, আমি পাড়াপ্রতিবেশীদের সাহিত্যকর্ম সংগ্রহ করতে

লাগলাম। আমার ভাবনা ছিল সোজা। আমি যদি আমার নিজের লোকজনের জীবন ও কর্ম জানতে পারি, তাহলে অন্য দেশের লোকদের জীবন ও কর্ম জেনে কী হবে?

এই একই ভাবনা নিজস্ব অননুকরণীয় ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের কালে উল্লেখ করেছিল এই বলে, কে আমাদের মধ্যে সন্দেহের বীজ বপন করতে পারে এবং পূর্ব ও পশ্চিমকে ভাগ করতে পারে? কোন্ শক্তি বাংলাকে ভাগ করবে, যদি ভালোবাসা ও প্রীতির শক্তি আমাদের রক্ষা করে? কবির ভাষায়, যেখানে আমাদের শক্তি সেখানে আমাদের দৃঢ়তা। যেখানে আমাদের কর্তব্য সেখানে আমাদের সচেতনতা, আমাদের দায়িত্ববোধ। যেক্ষেত্রে আমাদের আত্মীয়তা রয়েছে সেক্ষেত্রে আমাদের থাকবে বিশ্বাস ও আস্থা। আমরা কখনও হতাশ ও অসুখী হব না। আমরা কখনও বলব না যে সরকার বাহাদুরের এক খোঁচায় আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। তাই যদি হয়, তবে কেউ আমাদের রক্ষা করতে সমর্থ হবে না। চালাকি অথবা সরকারের সৌজন্যপ্রাপ্ত কোনও সুবিধে দিয়ে আত্মরক্ষা হয় না।

এই আত্মশক্তি ও আত্মোপলব্ধিই হয়তো চিরায়ত বাংলার রসদ। আবার বলি, বাস্তবের রূঢ়াঘাতে হয়তো এই আত্মশক্তির কামনাকে কল্পস্বর্গ মনে হয়। কিন্তু আত্মশক্তির উৎসাহকে কে অস্বীকার করতে পারে? ওদুদ নিজে অবশ্য সতর্ক করেছিলেন। উৎসাহ যেন উন্মাদনায় পরিণত না হয়। তবে, কল্পস্বর্গের অভিযানে উৎসাহ ও উন্মাদনার বশে সূক্ষ্ম পার্থক্য রেখা কি সবসময় বজায় থাকে? বাংলার সাম্প্রতিক ইতিহাসে এই সূক্ষ্ম পার্থক্যরেখা কখনও কখনও বজায় থাকেনি।

আত্মশক্তির উৎসাহ ও উন্মাদনার দোলাচল বহু সময় এক দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। তবু বাংলার এই কল্পনা নিয়ে বন্দিরা কারাদশা কাটিয়েছেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ঔপনিবেশিক কালে ফাঁসির মঞ্চে গেছেন, যে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদ, সশস্ত্রপন্থা এবং উন্মাদনাকে ধিক্কার দিয়েছেন, সেই রবীন্দ্রনাথকেই জাতির আপন বলে বরণ করেছে আপামর বাঙালি।

এইভাবে গড়ে উঠেছে জাতির লোকপ্রিয় রূপ অথবা বলা চলে জাতিভাবনার জনপ্রিয় ভিত্তি, যা বারবার ব্যাপক গণতান্ত্রিক মানসিকতার উত্থান ঘটিয়েছে। এটা কি শুধু মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি নির্ভর কাহিনি? সমর সেনের ভাষায়, বাবুবৃত্তান্ত? সংস্কৃতির বাবুবৃত্তান্ত? হয়তো খানিকটা তাই। তবু এটুকু বলব,

শাশ্বতকে নিয়ে ভাবনার মধ্যে লোকভাবনায় থাকে জীবনকে চিরায়ত করার ইচ্ছে। মৃত্যুকে নতুন ভঙ্গিতে দেখা যায়। পরিবর্তন এবং উত্তরণকে বোঝার আশ্বাস থাকে। এগুলো সম্ভব হয় এবং এগুলো সম্ভব করে তোলে, এক বিশেষ জীবনচর্যার প্রতিশ্রুতি। কাজী আবদুল ওদুদ একেই বলেছিলেন শাশ্বত বঙ্গ। বাংলার রাজনৈতিক বোধের সংকীর্ণতা কাটাতে গেলে আজ গভীর থেকে রসদ পেতে হবে। টেনে আনতে হবে, যে বোধ দিয়ে জীবনের নানা দিকের প্রতিশ্রুতি উপলব্ধি করা যায়। যে জীবনবোধে এক সর্বাঙ্গীণ ভাষায় উদ্বুদ্ধ হওয়া যায়, তার অনেকটাই কল্পনায় প্রোথিত।

নিত্যনৈমিত্তকতার বিরুদ্ধে কল্পনার আকর্ষণ চিরায়ত বাংলার ধারণাকে রসদ জুগিয়েছে। এই ধারণাই কুশ্রী ও সংকীর্ণ সামাজিক বাস্তবতাকে ছাপিয়ে যেতে সাহায্য করে। আত্মধিক্কার, আত্মশ্লাঘা এবং আত্মাভিমান থেকে বেরোতে হলে বাঙালিকে হয়তো শাশ্বত বঙ্গের কল্পনায় ফিরতে হবে। এই কল্পনাকে বলা যায় এক ধরনের সত্তা। কিন্তু এই সত্তার রহস্যের পুরোটাই রয়েছে সত্তা হয়ে ওঠার কাহিনির মধ্যে। চিরায়তের কাহিনি পাওয়া যাবে আমাদের নিত্যনৈমিত্তিকতার সম্মুখীন হবার এক বিশিষ্ট জীবনভঙ্গির মধ্যে। কিনু গোয়ালার গলিতে জন্মালেও অথবা হরিপদ কেরানির ভবিতব্য নিয়ে এ জগতে এলেও অন্যলোকের কথা ভাবা সম্ভব। এক বিশিষ্ট জীবনবোধে অনুপ্রাণিত হওয়া যায়। তারই নাম চিরায়ত বাংলা।

এই বোধের এক লোকায়তিক রূপ আছে। লোকায়তিক উপলব্ধি না থাকলে বাংলা চিরায়ত হত না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রতি বাঙালির আকর্ষণের এই হল এক বড়ো কারণ। আজ এক লোকায়তিক প্রশাসন যখন নানা দিক থেকে কঠিন প্রশ্নে জর্জরিত, তখন তারও কাছে ঊনবিংশ শতাব্দী পাথেয় রূপে দেখা দিয়েছে। বাংলার পুনর্গঠনের যাত্রায় সন্ধান করতে হচ্ছে বাংলার স্বরূপকে। লোকায়তিক বাংলা চিরায়ত বঙ্গের অনুসন্ধানরত।

এই দ্বান্দ্বিক অস্তিত্ব আমাদের বিড়ম্বনা এবং পাথেয়-দুইই। বলা চলে রাজনীতি যত লোকায়তিক হবে, ততই তার রূপরেখা নির্ধারণে চিরায়ত বাংলার স্বরূপ সন্ধান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এটা হয়তো বাঙালি ইতিহাসের এক বিধি যে লোকায়তকে ক্রমাগত খুঁজতে হয় শাশ্বতের মর্মবাণী।

বিপর্যয়ের কাল ও ক্ষিতিমোহন সেনের শিক্ষা

কুমার রাণা

এক

বাংলার সংস্কৃতি বিপন্ন, এ আশঙ্কা খুবই বাস্তব। অনেক সময়ই পরিবর্তনকেই বিপন্নতা বলে ধরে নেওয়া হয়। তারপর আস্তে আস্তে লোকে সেই পরিবর্তনগুলো মেনে নেয়। কিন্তু, গত কয়েক বছরে পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে তার চরিত্র আলাদা। এই পরিবর্তনগুলো খুব স্বাভাবিকভাবে আসছে না, আনা হচ্ছে রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে। যেমন রামনবমী অথবা হনুমানজয়ন্তী। বাংলার কোনও প্রান্তেই, কোনওকালে এই প্রদর্শনটি ছিল না। কয়েক বছর ধরে সোৎসাহ দলীয় উদ্যোগে এগুলিকে যুদ্ধোন্মাদের ভীতিপ্রদর্শনের ভঙ্গিতে নিয়ে আসা হচ্ছে। সামাজিক সৌজন্যে, যুগ যুগ ধরে চলে আসা নমস্কারের জায়গা নিচ্ছে জয় শ্রীরাম, রণহুংকার। এক কথায় বাংলাকে তার আপন অন্তর থেকেই উৎখাত করার চেষ্টা চলছে। সে অন্তরের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একই সঙ্গে মানুষে মানুষে প্রেম ও সখ্য, এবং চিন্তার জগতে প্রখর প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

তাহলে কীভাবে এই পরিবর্তনটি হল? বাংলার মানুষ তার মাথার ওপর কৃত্রিমভাবে চাপিয়ে দেওয়া এরকম একটা সাংস্কৃতিক প্রদর্শনকে মেনে নিল কেন? কেন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রটি রাজনৈতিক প্রতিপত্তি লাভের আখড়া হয়ে উঠল—বিনা প্রতিবাদে? এটা কি আকস্মিক? না কি এর ভিত্তিভূমি অনেকদিন ধরেই তৈরি হয়ে চলেছিল?

রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, ‘ভারতবর্ষ তার আপন নিষ্ঠুর ইতিহাসের হাতে আঘাতের পর আঘাত পেয়েছে, তার মর্মগ্রন্থি বারবার বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে, দৈন্য

এবং মানে সে জর্জর, কিন্তু ইতিহাস-বিস্মৃত সেই যুগের সেই কীর্তি এতকাল লোকশিক্ষার অবাধ জলসেক প্রণালীকে নানা ধারায় পূর্ণ ও সচল করে রেখেছে।'[১] যে-সময় রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাস ধ্বনিত হচ্ছে, সেই সময়টা ভারতের ইতিহাসে এক বিরাট দুর্বিপাকের কাল—ইংরেজ শাসন দেশবাসীকে শুধু পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি, তাদের সত্তা, তাদের অন্তঃকরণকে খণ্ড খণ্ড করে দিয়েছে। এই অনৈক্য-উৎপাদনে ইংরেজ শাসকরা যে জিনিসটাতে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিল তা হল হিন্দু-মুসলমান বিভেদ। দুষ্প্রচেষ্টা সফলও হল। দেশভাগের প্রাক্কালে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের রূপটি কেমন ছিল? অমর্ত্য সেনের স্মৃতিচারণায় :

> আমার কৈশোরের কিছু ভয়ানক স্মৃতিকে ঘিরে রয়েছে চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ের বিভেদের রাজনীতি।...উদার ভারতীয় হঠাৎ বিনা প্রশ্নে হয়ে গেল সংকীর্ণ হিন্দু ও নিখাদ মুসলমান। এক যুক্তিহীন আচরণ দিয়ে মানুষ আবিষ্কার করল তার নতুন বিভেদকামী, আক্রমণাত্মক পরিচয়, ভুলে গেল যে, বৈচিত্র্যই ভারতের সাংস্কৃতিক মূল শক্তি। এই বিস্মৃতির ফলাফল গণহত্যা।[২]

ভয়াবহ বিদ্বেষ ও হিংসার পরিণতি শুধু দেশভাগেই সীমাবদ্ধ রইল না, ইংরেজ দেশ ছেড়ে চলে যাবার পর তা অন্য একদিকে মোড় নিল। স্বাধীনতার প্রাক্কালে যা ছিল হিন্দু-মুসলমানের সংঘাত, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে তা রূপ পেল বর্তমান ভারতকে সংগত কারণেই নিজের দেশ মনে করে এ-দেশেই থেকে যাওয়া মুসলমানদের ওপর আঘাতের পর আঘাতের শৃঙ্খলায়। অমর্ত্য সেনের স্মৃতিচারণে যে ঘটনার কথাটা পাচ্ছি, সেটা ঘটে ১৯৪৩ সালে। তার অর্ধদশক পরে তাঁকে লিখতে হচ্ছে, 'অসাম্প্রদায়িক ও বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী—এবং অবিশ্বাসী—সকলের প্রতি সহিষ্ণু ভারতীয় রাষ্ট্রের যে ধারণাটি স্বাধীনতার পর থেকেই নির্মিত হয়ে এসেছে, উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক একটি গোষ্ঠী সেটির উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে'[৩], এবং ২০১৭ সালে অবস্থাটা এতটাই ভয়াবহ যে, 'সেটাতো মোটামুটি গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের তলায় পড়ে যাওয়া বলতে পারি।'[৪] এর পরের ঘটনাবলি আরও হিংস্র, আরও নৃশংস, এবং বাস্তবিকই ভারতকে মুসলমান-শূন্য করার উদ্যোগ। গুজরাট (২০০২), মীরাট (২০১৪), দিল্লির (২০২০) মতো বড়ো আকারের সংগঠিত মুসলমান-বিধ্বংসী আক্রমণগুলোর পাশাপাশি চলছে লাভ-জেহাদ, গো-মাংস, হিজাব ইত্যাদির নাম করে দেশের নানা প্রান্তে 'সংগঠিতভাবে মুসলমান-নিধন চলছে।'[৫]

পরিস্থিতিটা যে এত ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে সে-বিষয়ে দেশের রাজনেতা বা বিদ্যাজীবী শ্রেণি কি আঁচ করতে পারেননি? তাঁরা হয়তো ভেবেছিলেন, স্বাধীন হয়ে গেলাম, ব্রিটিশ চলে গেল, অতএব সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষও দূর হয়ে গিয়ে হিন্দু-মুসলিম-শিখ-ইশাই, সব ভারতীয় ভাই-ভাই রব তুলে ভারত এগিয়ে যাবে। স্বাধীনতার মাত্র আট বছর আগে আরএসএস প্রধান সদাশিব মাধব গোলওয়ালকরের *উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইনড* বইতে সরাসরি জার্মান ফ্যাসিবাদের অনুসরণ করার আস্ফালনটাকেও গুরুত্ব দেওয়া হল না। তাঁর দাবি, দেশে বাস করতে হলে সবাইকে হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাষা আয়ত্ত করতে হবে, হিন্দুদের অধীনস্থ থাকতে হবে, ইত্যাদি। স্বাধীনতার মাত্র তিন বছর পর, হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক মহান্ত দিগ্বিজয় নাথের 'হিন্দু মহাসভা যদি ক্ষমতা দখল করে তাহলে পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে মুসলমানদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হবে',[৬] এমনতরো হুমকি শুনেও স্বাধীন ভারতের নির্মাণে মুসলমান-বিদ্বেষী বিষকে দূর করার জন্য চিন্তার অনুশীলনটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনও চেষ্টা হল না। শত্রুকে ক্ষুদ্র মনে করে অবহেলা না করার উপদেশটি ভুলে যাওয়া হল।

অথচ, স্পষ্ট সতর্কবার্তা ছিল। স্বাধীনতার আগেই হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কটাকে এতটাই ভয়াবহরকম বিষিয়ে তোলা হয়েছিল যে, 'এ-দেশে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের বিভীষিকায়' রবীন্দ্রনাথের মন 'হতাশ্বাস হয়ে পড়ে, এই বর্বরতার অন্ত কোথায় ভেবে পায় না।'[৭]

দুই

যে-মানুষটি সম্ভবত ভারতবর্ষের অন্তরাত্মার এই দুঃসহনীয় ভবিষ্যৎটি সবচেয়ে স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি তথাকথিত রাজনীতি চর্চায় কোনওদিনই জড়াননি। হয়তো সে-কারণেই ভারতবর্ষের চিরন্তন সাধনার অনুসন্ধানে আজীবন ব্যাপৃত থাকা মানুষটির ভিন্নভাবে বলা কথাগুলি স্বাধীন ভারতে তেমনভাবে গুরুত্ব পেল না। যদি পেত তাহলে, আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষকে আজ গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের তলায় পড়ে তার নিজস্ব ভারতীয় পরিচিতি হারানোর বিপদের মুখে পড়তে হত না। মানুষটির নাম ক্ষিতিমোহন সেন। স্বাধীনতার এক দশক আগের ভারতবর্ষে তিনি শুনতে পাচ্ছেন দেশের অন্তরের খণ্ড-বিখণ্ড হবার বিপদ-ঘণ্টা, তাই সাবধান করে দিচ্ছেন: 'সর্বপ্রকারে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে।' কারণ, সন্ত দাদূ-র প্রসঙ্গ টেনে তিনি উল্লেখ

করছেন সাম্প্রদায়িকতা ‘সর্বপ্রকার সাধনার মধ্যে সামঞ্জস্য ও ঐক্য’-র পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা।[৮]

দেশ স্বাধীন হল, কিন্তু থেকে গেল সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা, জাতিভেদ ও নারীবিদ্বেষের নানা সূত্র। ক্ষিতিমোহন বাক্‌-সংক্ষেপের প্রচণ্ডরকম পক্ষপাতী। কিন্তু স্বাধীনতার কালে দেশের ভাগ্য যে দুঃস্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল, তা, অনেকের মতোই ক্ষিতিমোহনকেও ভয়ানক বিচলিত করে। পার্থক্য এই, তাঁর বিচলন কেবল দেশভাগ বা সাম্প্রদায়িক হিংসা নিয়েই নয়। সে বিচলন, বহু যুগের, বহু মানুষের পরিশ্রমে গড়ে ওঠা ভারতীয় সত্তাটির অস্তিত্বের সংকট নিয়ে। ১৯১০ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরের দীর্ঘ লেখকজীবনে, স্বাধীনতা ও দেশভাগের কালেই তিনি সবচেয়ে বেশি মুখর। একের পর এক লিখে চলেছেন, ভারত ও বাংলার বহুসাংস্কৃতিক অনুশীলন নিয়ে *ভারতের সংস্কৃতি* (১৯৪৩), *হিন্দু-সংস্কৃতির স্বরূপ* (১৯৪৭), *সংস্কৃতি এক সংগম ও বাংলার সাধনা* (১৯৪৫), *বাংলার বাউল* (১৯৪৯), দেশের উন্নতির পথে ‘প্রধানতম এক বাধা’ জাতিভেদ নিয়ে বই *জাতিভেদ* (১৯৪৬), প্রাচীন ভারতের নারীদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা থেকে বর্তমান যুগে শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে *প্রাচীন ভারতে নারী* (১৯৫০), এবং সেই মুহূর্তে দেশ যেভাবে সাম্প্রদায়িক বিভাজনে দীর্ণ হয়েছে, তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার পথ খুঁজেছেন, *হিন্দু-মুসলমান যুক্ত সাধনা* (১৯৪৯), এবং হিন্দুধর্মের বহুত্ববাদী স্বরূপটিকে তুলে ধরা ইংরেজিতে প্রকাশিত *হিন্দুইজম* (১৯৬১)।[৯]

তাঁর কাছে দেশের সংকটটি উঠে এসেছে যুগের এক সংকট হিসেবে।[১০] তাঁর শেষ, এবং সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই *হিন্দুধর্ম*, যেখানে তিনি দেখাচ্ছেন, ‘ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, হিন্দুধর্ম মূলত জীবনাচরণের ব্যাপার’, সেখানে তিনি জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করছেন এইভাবে:

> আজ আমরা বাস করছি বিজ্ঞানের যুগে। বহু বিষয়েই আজ আমরা আমাদের পূর্বসূরিদের চেয়ে বেশি ভাগ্যবান। অবশ্য তাঁদের চেয়ে বেশি নিরাপত্তা বোধ করছি আজ, এমন বলা হঠকারী সিদ্ধান্তই হবে। এমনকি আমাদের ভোগবাদী সমাজ ব্যক্তি ও ব্যষ্টিজীবনে সামঞ্জস্য ঘটিয়েছে, এমন দাবি করা আরও কঠিন। নব্য বিজ্ঞান আর তারই সঙ্গে যুক্ত সামাজিক বিকাশ আমাদের একই সঙ্গে সমস্যা আর সুযোগের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে।[১১]

সমস্যা কী? সেটা মানুষে মানুষে বিভেদ ও অনৈক্য, আর সুযোগ হচ্ছে ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনার ধারাটিকে অবলম্বন করে ভারতবর্ষের মানবিক অন্তরাত্মাটিকে প্রস্ফুটিত করে তোলা, যেখানে ‘মানুষ বন্ধনমুক্ত হইয়া

দিনে দিনে হইয়া চলুক অগ্রসর।'[১২] সেই বন্ধনমুক্তির প্রথম ধাপই হচ্ছে সমন্বয়: 'ভারতের আকাশে বিধাতার যে আদেশবাণী তাঁর দামামায় নিত্য ধ্বনিত হয়েছে, সে হল সকল সাধনার সমন্বয়বাণী।'[১৩] হিন্দু-মুসলমানের বিভেদের অস্তিত্ব বিষয়ে তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন। 'হিন্দু মুসলমানের সাক্ষাৎ হইতেই দেখা যায় প্রথমে মারামারি কাটাকাটি দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষেরই ইতিহাস।' কিন্তু, 'ক্রমে প্রেম মাধুর্য প্রভৃতি সুন্দর ভাব হয় আবির্ভূত।'[১৪]

অর্থাৎ, বিভেদটাই শেষ কথা নয়, তা শুরু মাত্র। দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের পরে আসছে প্রেম ও মাধুর্য, যা কেবল পারস্পরিক সহনশীলতা ও সম্প্রীতির মধ্যে আটকে থাকল না—তা এগিয়ে গেল। তাঁর অবলোকনে, 'মৈত্রীই ভারতের ভগবান্নির্দিষ্ট শাশ্বত সাধনা। যত দিনে ইহা পূর্ণ না হয় তত দিন ভারতের মুক্তি নাই।'[১৫] মৈত্রীর মধ্য দিয়ে ভারতীয় জাতীয় সত্তা গড়ে তোলার বিষয়ে বহুজনে বহুকথা বলেছেন। একদিকে দীনেশচন্দ্র সেন ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো পণ্ডিতরা বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলমান সহযোগিতার কথা বলছেন। নিদর্শন হিসেবে, দীনেশচন্দ্র সেন লিখছেন:

> বাদসাহী দরবারে বাঙ্গলা ভাষা আদর লাভ করিয়াছিল। হয়ত হিন্দুরাজত্ব থাকিলে এটি ঘটিতে পারিত না। বিদ্যার অর্ণবযানসদৃশ, দেব-ভাষার প্রতি অতিমাত্রায় শ্রদ্ধাবান টুলো পণ্ডিতদের বাঙ্গলা ভাষার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণার দরুণ আমাদের দেশের ভাষা যে কোনকালে রাজদ্বারে প্রবেশ করিতে পারিত, এমন মনে হয় না। পাঠান প্রাধান্যকালে বাদসাহগণ একেবারে বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের দলিলপত্রও অনেক সময় বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত হইত। শের সাহের কামানের উপর বাঙ্গলা অক্ষরে তাঁহার নাম ও উপাধি পাওয়া গিয়াছে।[১৬]

আবার, ১৯৩৪ সালে এক বক্তৃতায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় হিন্দু-মুসলমান সহযোগিতার স্বরূপটিকে তুলে ধরছেন:

> প্রথম সংঘাতের [তুর্কী বিজয়ের] পরে বাঙ্গালায় উপনিবিষ্ট বিদেশী ও বিদেশী-মিশ্র মুসলমান এবং দেশের হিন্দু বাঙ্গালী জন-সাধারণের মধ্যে একটি সংস্কৃতি-বিষয়ক সহযোগিতা আরম্ভ হয়।...বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ইসলাম ধর্ম বাস্তবিকই 'মজম উ-ল-বহরৈন' অর্থাৎ 'দুইটি সাগরের সম্মিলন' হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।[১৭]

এর পাশাপাশি, অন্য একটা ধারাও ছিল, এবং সেটা, তার সরলীকৃত ভাবের কারণে খুব কম জনপ্রিয় ছিল না। যেমন, স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন, ভারতীয় জাতীয়ত্বের রূপ হবে ইসলাম-দেহ ও বেদান্ত মস্তিষ্ক, যাকে সমালোচনা করে কাজী আবদুল ওদুদ বলেছিলেন, 'তার চাইতে এই কথা বলাই ভাল,

ভারতীয় জাতীয়ত্বের রূপ হবে পূর্ণাঙ্গ মানব-দেহ ও পূর্ণাঙ্গ মানব-মস্তিষ্ক, সৃষ্টিশক্তির প্রকাশ যার ভিতরে হবে অবাধ।'[১৮]

তিন

কিন্তু এই সাংস্কৃতিক ধারাটি ক্ষিতিমোহনের অনুভবে বহুস্তরীয় রূপে ধরা দিয়েছে, যার শিকড় সরল লোকসমাজের— শ্রমজীবী জনতার— মানসে অত্যন্ত গভীরে জটিলভাবে প্রোথিত। তিনি এই শিকড়গুলোকে জাতপাত-সাম্প্রদায়িকতা-প্রাদেশিকতার মতো সংকীর্ণতায় পরস্পর জড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পাচ্ছেন, যেটা অন্যেদের দৃষ্টিতে তেমনভাবে ধরা পড়েনি। তাঁর চোখে, এ-কেবল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সহিষ্ণুতার ব্যাপার নয়, এর মধ্যে আছে আর্য ও আর্যেতর, বিদেশ থেকে আগত ও দীর্ঘকাল ধরে ভারতে বসবাসকারী, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তের— যেমন দক্ষিণ ভারত বা গুজরাটের সঙ্গে বাংলার, মধ্য ভারতের সঙ্গে পশ্চিম বা উত্তর ভারতের, আসামের সঙ্গে মহরাষ্ট্রের— নিরবচ্ছিন্ন আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে একটি বিশিষ্ট ভারতীয়ত্ব গড়ে তোলা, যা আবার মিলে গেছে বিশ্বমানবের উদার জগতের সঙ্গে। তাঁর উপলব্ধি, 'অনেক বিরোধিতা সহিতে না পারিলে আর মহত্ত্ব কিসের?'[১৯] তিনি দেখাচ্ছেন, মৈত্রীর পথ হল যুক্ত-সাধনার পথ, 'সকল ধর্মকে তাল পাকাইয়া ঐক্য নয়, সকল দলের সুসমাবেশে সাধনার একটি শতদল কমল ফুটাইয়া তোলা'-র পথ।[২০] রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে বলছেন, কীভাবে দুই নদী মিলে যাওয়ার পরও তাদের ধারাগুলিকে বহুদূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, বহুদূর পর্যন্ত স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও তারা একটি নদী হয়ে উঠল।[২১] এবং এই যুক্ত-সাধনার মধ্য দিয়েই, শিখ ও মুসলমানের লড়াই সত্ত্বেও শিখ মুসলমানের কাছ থেকে গ্রহণ করছে গ্রন্থসাহেব-এর পূজা বা ধর্মস্থলে প্রবেশ করার আগে মাথা ঢেকে নেওয়া, আবার রাজপুত-মুসলমান নিজেদের মধ্যে লড়াই চালিয়ে গেলেও রাজপুত মুসলমানের কাছ থেকে গ্রহণ করছে আভিজাত্যের লক্ষণ পর্দা বা আফিং-এর ব্যবহার।[২২] মুসলমানরাও গ্রহণের ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। যেমন, ক্ষিতিমোহনের দেওয়া উদাহরণগুলোর মধ্যে পাই:

> আমেদাবাদে দেখিলাম, হিন্দু মন্দিরের শিল্পের আদর্শেই মসজিদগুলি নির্মিত। সেখানে মন্দির ও মসজিদ রচনায় হিন্দু ও মুসলমান গুণীদের সম্মিলিত সাধনা। ...ভারতে আসিবার পূর্বেই আরবরা নানাভাবে হিন্দু সংস্কৃতির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ...তাজের ...রচনারীতি ঠিক যবদ্বীপের চণ্ডীসেবার পঞ্চরত্ন মন্দিরের নকশার সঙ্গে মেলে। ...অজন্তার চিত্রেও তাজের নকশার

নমুনা পাওয়া যায়। ...শুধু তাজে নহে, আকবরের সেকেন্দ্রাতে এমন সব শৈলী দেখা যায় যাহাকে ঠিক মুসলমানী বলা চলে না।[২৩]

ক্ষিতিমোহনের সারা জীবনের অনুসন্ধান ছিল এই যুক্ত-সাধনা। তার নানা কারণের মধ্যে একটা বড়ো কারণ হল, দেশের মানুষের মধ্যে প্রবাহিত অগণন সাধারণ মানুষের চিন্তার— গণচিন্তার—যে বহুল ধারা সেগুলির সম্মিলনে গড়ে ওঠা ভারতীয় ধারাটিকে খুঁজে বের করা। *হিন্দুধর্ম* বইতে তিনি বলছেন, 'রাষ্ট্রীয় মতামত ও প্রয়োজন বারবার বদলায়। তাহার উপর নির্ভর করিয়া নির্লিপ্ত থাকা মূঢ়তা।'[২৪] দেশের মানুষকেই দায়িত্ব নিতে হবে দেশের মানুষকে চিনবার, জানবার। আর, এই চেনা-জানার কাজে, বিদ্যা-সংস্কৃতি- সমাজচর্চার তথাকথিত উচ্চ আদর্শের ধারাটির ওপরও ভরসা করা চলে না, নির্ভর করতে হয় সাধারণ দেশবাসীর ওপর। ক্ষিতিমোহন তাই সারা জীবন ধরে এই সাধারণ-শ্রমজীবী-মানুষের জীবনে বিচিত্র সংস্কৃতি, তাঁদের বিচিত্র জীবন ও চিন্তার প্রবাহকে ধরতে চেয়েছেন। এবং তাঁর চেয়ে সফলভাবে সেটা কেউ করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতিতে:

সুহৃদ্বর ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর এই গ্রন্থে ভারতবর্ষের সুদীর্ঘকালের সেই চিত্তপ্রবাহের পথটিকে তার ভিন্ন ভিন্ন শাখায় প্রশাখায় অনুসরণ করে এসেছেন। ...ভারতের জনসাধারণের মধ্যে সাধনার যে স্বাভাবিক শক্তি অন্তর্নিহিত রয়েছে ক্ষিতিমোহনের এই রচনায় তাকে আবিষ্কার করা গেল।[২৫]

রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন, 'যেহেতু ভারতীয় সমাজ ভেদবহুল, যেহেতু এখানে নানা ভাষা, নানা ধর্ম, নানা জাতি, সেই জন্যই ভারতের মর্ম্মের বাণী হচ্ছে ঐক্যের বাণী।'[২৬] আর সেই ঐক্যের বাণী সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে জাগ্রত করে রাখলেন যাঁরা, তাঁরা হলেন, আমাদের দেশের গণ-কবি, গণ-দার্শনিক মরমিয়া কবিরা:

মৃত্যু থেকে মানুষের চিত্তকে পরিত্রাণ করার জন্য বৈকুণ্ঠের অমৃতরস প্রস্রবণের উপরেই আমাদের মরমিয়া কবিরা দৃঢ় আস্থা রেখেছিলেন। ...তাঁরা যে রসের ধারাকে বৈকুণ্ঠ থেকে এনেছিলেন, আমাদের দেশের সামাজিক বালুর তলায় তা অন্তর্হিত। কিন্তু তা মরে যায়নি। ক্ষিতিমোহনবাবু ভার নিয়েছেন বাংলাদেশে সেই লুপ্তস্রোতকে উদ্ধার করে আনবার।[২৭]

বস্তুত, ক্ষিতিমোহনের জীবনীকার প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'ভারতীয় মধ্যযুগের সন্তসাধনাকে অবলম্বন করে যে আশ্চর্য গভীর ও ঐশ্বর্যময় ভাবসম্পদ সৃষ্টি হয়েছিল, ক্ষিতিমোহনের সংগ্রহ ও চর্চার ভিতর দিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সে সম্পর্কে আগের তুলনায় বেশি অবহিত ও আগ্রহী হয়ে উঠলেন।'[২৮]

রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনকে বলেছিলেন, 'যখন নমঃশূদ্র, ছুতার, জেলে, মুচি, ভুঁইমালি প্রভৃতি কুলে উৎপন্ন বাউলদের কথা ও রচনা দেখি তখন আমাদের মনে হয় এমন সব কথা বলিতে পারিলে আমরাও ধন্য হইতাম। ইহাই খাঁটি, সত্য, শাশ্বত ও সার্বভৌম গণসাহিত্য।'[২৯] এর অনেক আগেই অবশ্য সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে উঠে আসা সন্তদের সঙ্গে ক্ষিতিমোহনের আত্মীয়তা ঘটে গেছে। বারাণসীতে ছাত্র অবস্থাতেই কবীর ও অন্য সন্ত কবি ও দার্শনিকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয়, যাঁরা ছিলেন সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে। ক্ষিতিমোহন বলছেন, 'সম্প্রদায়ভেদ সত্ত্বেও মানবের মধ্যে যে এই অভেদদর্শন এটা মধ্যযুগের একটা মস্ত কথা। যে জাতিভেদ এখন ভারতের প্রধান সমস্যা সেই জাতিগত ভেদ তা তাঁরা স্বীকার করেননি।'[৩০] দেশ বলতে তিনি যেহেতু বুঝতেন, দেশের মানুষ। কেবল উচ্চ জ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে যে সেই মানুষকে চেনা যাবে না, তা তিনি সম্যক বুঝেছিলেন—অনেকটাই তাঁর পিতামহের সতীর্থ ঈশানচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শিক্ষক সুধাকর দ্বিবেদী (যাঁর সাহচর্যে আবদুল রশিদের মতো ফকিরের সঙ্গে তাঁর পরিচয়), গুরু গঙ্গাধর শাস্ত্রী এবং অগ্রজ অবনীমোহন সেনের প্রভাবে (লক্ষণীয়, তাঁর প্রথম *কবীর* উৎসর্গিত হচ্ছে, 'যিনি আমাকে হিন্দুস্থান ও পারস্যের ভক্তগণের বাণী আস্বাদন করিতে শিখাইয়াছিলেন, সেই অগ্রজ ও গুরু পরলোকগত অবনীমোহন সেন মহাশয়ের পবিত্র স্মৃতিতে'[৩১])। জ্ঞানের পিপাসা ছিল অনন্ত, কিন্তু তার চেয়ে বেশি ছিল, মানুষের ভেতর দিয়ে দেশকে হৃদয়ে অনুভব করার ঐকান্তিক আগ্রহ।

চার

ক্ষিতিমোহনের সুরে বিদ্যাবেত্তাদের কেউ কেউ স্বাধীনতার গোড়ার দিকটাতেই রাজনেতা ও দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। যেমন, ১৯৬০ সালেই ইতিহাসবেত্তা সুরজিৎ দাশগুপ্ত লিখেছিলেন :

> ভারতীয় লোকসত্যের থেকে অগ্রসর শ্রেণীর বিচ্ছেদ, ব্রিটিশ শাসনের কালে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে উক্ত শ্রেণীর সুযোগসন্ধানী বৃত্তির অধিকতর অভিব্যক্তির প্রচেষ্টা এবং ব্রিটিশ কায়েমী স্বার্থরক্ষার জন্য প্রযুক্ত ব্রিটিশ রাজনীতির মর্মান্তিক পরিণতি হলো আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসে বিভেদ থেকে বিরোধের উৎপত্তি। অর্থাৎ, হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে বিভেদের অস্তিত্ব সত্ত্বেও সমন্বয়ের সাধনাই ছিল প্রবলতর, কিন্তু ব্রিটিশ রাজনীতির প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু ও মুসলিমের সম্পর্ক মাত্র বিংশ শতাব্দীতে ব্যাপক বিদ্বেষ ও বিরোধের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায়।... একবার যে লোকজীবন সুযোগসন্ধানী অগ্রসর শ্রেণীর সংক্রামে সাম্প্রদায়িকতার ব্যাধিতে জর্জরিত হয়েছে তার হৃতস্বাস্থ্য ও হৃতশক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য চাই

> নির্মল ও নির্মোহ আত্মসমীক্ষা, এবং যেমন সুপরিকল্পিত উদ্যমে তার অন্তর্গূঢ় সত্যকে বিধ্বস্ত করা হয়েছে তেমনই সুপরিকল্পিত উদ্যমে তাকে পুনর্বাসনের অটল প্রতিজ্ঞা।

এই কথা আমাদের শিক্ষায়, আমাদের অনুশীলনে কোনও স্থান পায়নি। আমার ২৫-২৬ বছর বয়সের আগে ক্ষিতিমোহনের রচনার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেনি, স্কুল-কলেজের পাঠ্যবই বা অন্য কোনও চর্চায় ক্ষিতিমোহনের উল্লেখই হত না। এমনকি ১৯৮০ সালে, আমার কলেজে পড়ার সময়, তাঁর শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ও তাঁকে নিয়ে জনপরিসরে খুব আলোচনা হয়েছে বলে মনে করতে পারি না। তাঁর লেখা পড়ি স্কুল-কলেজ শেষ করার অনেক পরে— যখন ভিন্নধারার বামপন্থী রাজনীতির নেতা ভাস্কর নন্দীর কাছ থেকে *জাতিভেদ* বইটি পাই। তিনি আমাকে বলেছিলেন, জাতিগত অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে, ক্ষিতিমোহনের এ বইটা একটা হাতিয়ার। এই লেখা লিখবার ক্রমে, আমি আমার সময়ের জনাকুড়ি লোককে জিজ্ঞাসা করেছি, স্কুল-কলেজে ক্ষিতিমোহনের কোনও লেখা তাঁরা পড়েছেন কি না। এঁদের মধ্যে, 'বইয়ের পোকা' বলে খ্যাত বন্ধুটিও বললেন যে, ক্ষিতিমোহনের কথা তিনি জানতে পারেন অমর্ত্য সেনের লেখায়—অনেক বড়ো বয়সে। অথচ, আমাদের স্কুল-কলেজে পড়ার কিছু আগে, অশোক মিত্র লিখছেন, '১৯৬৪ সালে, পূর্ব পাকিস্তানে *আনন্দবাজার পত্রিকা* কলকাতার বুকে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধাবার জন্য প্রতিদিন সবকটি পাতা উজাড় করে বিষ ঢালছে।'[৩২]

দুর্বিপাকের মধ্যে বাঙালির সামনে একটা সুযোগ এসেছে: সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু শতাব্দী প্রাচীন অনড়তা এবং কিছু অত্যাধুনিক লোক-বিরোধী গতিশীলতা (যেনতেনপ্রকারেণ টাকা কামানোই যার বৈশিষ্ট্য) সম্পর্কে সচেতন অনুসন্ধান এবং তাদের বিরুদ্ধে একটা বৃহত্তর সামাজিক জোট গড়ে তোলার। বাংলার অন্তরের একটা অন্যতর, অগ্রগামী চিন্তার ঐতিহ্য ও আছে। বাঙালি এখনও সেই সেই চিন্তার, সেই অনুসন্ধিৎসার ঐতিহ্যকে আবাহন করে, তার নিজস্বতা বজায় রাখতে পারে। বিজেপির রাজনীতিকে কেবল ভোটে হারানোটাই একমাত্র কাজ নয়, কাজটা তার চেয়ে অনেক বড়ো। তার আয়োজনে প্রথম ধাপ হচ্ছে, বাঙালি জনসাধারণের— গ্রামের বা নগরের, নারী বা পুরুষ, হিন্দু বা মুসলমান, উঁচু জাত বা নিচু জাত, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত— সকলের মানবিক মর্যাদার স্বীকৃতি। এবং প্রত্যেকের বিকাশের জন্য সমান সুযোগের দাবিটাকে প্রধান দাবি হিসেবে তুলে আনা। আজকের দিনে বাংলার তথাকথিত

অগ্রণী সমাজের কাছে এটাই একটা বড়ো সুযোগ। অন্যের স্বার্থভাবনার মধ্যে দিয়েই সে নিজের স্বার্থ শুধু নয় অস্তিত্বটাকেও সুরক্ষিত রাখতে পারে। ক্ষিতিমোহন আমাদের যে আশার শিক্ষা দিয়ে গেছেন তার ওপর আমাদের আরও বেশি করে নির্ভর করতে হবে।

তথ্যসূত্র

[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ', *শিক্ষা*, কলকাতা : বিশ্বভারতী।

[২] অমর্ত্য সেন (২০২১), 'নিজের কথা', *নিজের কথা, পৃথিবীর কথা*, কলকাতা: গাঙচিল, পৃষ্ঠা ১৪; অমর্ত্য সেনের কিশোর মনে এই বীভৎসা যে না-ভুলতে-পারা গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে, তার উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁর *তর্কপ্রিয় ভারতীয়* (কলকাতা: আনন্দ, ২০০৭), পরিচিতি ও হিংসা (কলকাতা: আনন্দ, ২০০৯), *A Home in the World* (London: Penguin, 2021) সহ অনেক লেখায়।

[৩] অমর্ত্য সেন [২০১৮ (১৯৯৩)], 'দ্য গ্রেট টু সেকুলার ইন্ডিয়া', *দ্য নিউ ইয়র্ক রিভিউ অব বুকস,* ১১ মার্চ ১৯৯৩। বাংলা তর্জমা প্রকাশিত হয়েছে, অশোকেন্দু সেনগুপ্ত সম্পাদিত '*বিপন্ন ভারত*', রূপালী, কলকাতা, ২০১৮, বইতে।

[৪] অমর্ত্য সেন (২০১৯), *বলা যায়,* কলকাতা: আনন্দ, পৃষ্ঠা ১৪৪।

[৫] অমিতাভ গুপ্ত (২০১৯), *লজ্জাটুকুই ভরসা,* কলকাতা: আনন্দ, পৃষ্ঠা ২৮-৩৪ ।

[৬] সন্তোষ রাণা [২০১৯ (২০০০)], *প্রবন্ধসংগ্রহ* , কলকাতা: গাঙচিল, পৃষ্ঠা ৯২-৯৩ থেকে উদ্ধৃত।

[৭] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৩৫), 'মুখবন্ধ', কাজী আবদুল ওদুদ-এর *হিন্দু মুসলমানের বিরোধ,* শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী।

[৮] ক্ষিতিমোহন সেন, (১৯৩৫) *দাদূ* , শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশনা বিভাগ, পৃষ্ঠা ২৮।

[৯] ক্ষিতিমোহনের রচনার পূর্ণতর একটি তালিকা পাওয়া যায়, তাঁর জীবনী নিয়ে লেখা, প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের রচিত বইতে। দ্রষ্টব্য, প্রণতি মুখোপাধ্যায় (১৯৯৯) *ক্ষিতিমোহন সেন ও অর্ধশতাব্দীর শান্তিনিকেতন* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

[১০] *হিন্দুধর্ম* বইতে ক্ষিতিমোহন লিখছেন, ' হিন্দুধর্ম এ কালের এই সব বিভ্রান্তিকর সমস্যার সমাধান পুরোপুরি বলে দেয় এমন দাবি আমি করি না। কিন্তু এর মৌলিক বিশ্বাস আর জীবনদর্শন হয়তো আধুনিক বিশ্বের সমস্যার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক নয় এবং হয়তো বা এই যুগসংকটে উঠে আসা কিছু প্রশ্নের পুরো তাৎপর্য বুঝে নেয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক।' ক্ষিতিমোহন সেন (২০১৫), *হিন্দুধর্ম* (মূল ইংরেজিতে লেখা *Hindusim* (1963)-এর তর্জমা), কলকাতা: আনন্দ।

[১১] *হিন্দুধর্ম,* পৃষ্ঠা ৪।

[১২] *সন্তমত ও মানবযোগ,* পৃষ্ঠা ২৮।

[১৩] ক্ষিতিমোহন সেন, [১৯৭৭ (১৯৪৩)], *ভারতের সংস্কৃতি*, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা ৮১।

[১৪] *সন্তমত ও মানবযোগ*, পৃষ্ঠা ৮০-৮১।

[১৫] ক্ষিতিমোহন সেন (১৯৩০), *ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা*, কলকাতা: বঙ্গীয় কলা কেন্দ্র, পৃষ্ঠা ৬৫।

[১৬] দীনেশচন্দ্র সেন [২০১৬ (১৯৩৫)], *বৃহৎ বঙ্গ*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৫৬-৭; তাঁর ১৯৪০ সালে প্রকাশিত *প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান*, কলকাতা: করুণা (পুনর্মুদ্রণ, ২০০৬)।

[১৭] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় [২০০৫ (১৯৯০)], 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য', *বাঙ্গালীর সংস্কৃতি*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃষ্ঠা ৮।

[১৮] কাজী আবদুল ওদুদ (১৯৩৫), *হিন্দু মুসলমানের বিরোধ*, শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী।

[১৯] *হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ*, পৃষ্ঠা ২৭৮।

[২০] *দাদূ*, পৃষ্ঠা ২৮।

[২১] ক্ষিতিমোহন সেন (১৯৪৬), নিবেদন, *জাতিভেদ*, কলকাতা: বিশ্বভারতী।

[২২] ওই, পৃষ্ঠা ৭৫।

[২৩] ক্ষিতিমোহন সেন [২০১৫ (১৯৪৯)], 'ভারতে হিন্দ-মুসলমানের যুক্তসাধনা', *ভারত সংস্কৃতি*, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা ৩২২-৩২৫।

[২৪] *হিন্দুধর্ম*, পৃষ্ঠা ১৩।

[২৫] রবীন্দ্রনাথ [২০১০ (১৯৩০)], 'ভূমিকা', *ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা*।

[২৬] রবীন্দ্রনাথ, (১৯৩৫), 'ভূমিকা', *দাদূ* , শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশনা বিভাগ, পৃষ্ঠা ২১।

[২৭] ওই, পৃষ্ঠা ২৩।

[২৮] প্রণতি মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০২।

[২৯] *জাতিভেদ*, 'নিবেদন'।

[৩০] *ভারতের সংস্কৃতি*, পৃষ্ঠা ৬৭।

[৩১] ক্ষিতিমোহন সেন [১৯৯৫ (১৯১০)], *কবীর*, কলকাতা: আনন্দ ।

[৩২] অশোক মিত্র (২০১৫), *আপিলা চাপিলা* , কলকাতা: আনন্দ।

মহাফেজখানার সংস্কৃতি

জয়ন্ত সেনগুপ্ত

মহাফেজখানা ও তার গোড়ার কথা

ইতিহাস ভারতে কীভাবে এক 'অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিন' হিসেবে গড়ে উঠল, সে বিষয়ে কয়েক বছর আগেই বেরিয়েছিল ইতিহাসবিদ দীপেশ চক্রবর্তীর অনবদ্য বই *The Calling of History : Sir Jadunath Sarkar and His Empire of Truth* (২০১৬)। সেখানে রয়েছে এমন এক সময়ের বিবরণ, যখন ইতিহাসের গবেষকদের কাটাতে হত শিকারী ব্যাধের মতো তৎপর এক যাযাবর জীবন। চষে বেড়াও সারা দেশ, সতর্ক নজর রাখো কখন রাজা-রাজড়া বা জমিদারদের মতো কোনও লোক বেচে দিচ্ছেন তাঁর ব্যক্তিগত দলিল-দস্তাবেজের বস্তা, বা কোনও সাহেব ভারত ছেড়ে যাওয়ার আগে নিলামে চড়াচ্ছেন তাঁর সাধের লাইব্রেরি। এ ছাড়াও ছিল সরকারি নথিপত্রকে জনসাধারণের কাছে, তিলমাত্র পরিমাণে হলেও, অধিগম্য করার জন্য ঔপনিবেশিক সরকারের কানের কাছে নাছোড়বান্দার মতো ঘ্যানঘ্যান করে যাওয়া। বিশ শতকের গোড়াতেও প্রায়ই কাপড়ে-বাঁধা এক একটা দলিলের গাঁটরি কেনার জন্য পকেট থেকে খসাতে হত হাজার দশেক টাকা। আর তার পর নিজের হাতে সেই সব দলিলের নকল করার কাজ তো আছেই! এখন অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি, ১৯৩৭ সালেও সরকারি নথি পড়তে গেলেই ইম্পিরিয়াল রেকর্ডস ডিপার্টমেন্টের সংগ্রহাধ্যক্ষ (কিপার)-কে দিতে হত টাইপ-করা প্রতি দশ পাতার জন্য দু-টাকা করে 'এগজামিনেশন ফি', যা ছিল কিনা ওই ক-টি কাগজ 'স্ক্রিন' করে দেওয়ার খরচ। মাইক্রোফিল্ম? ফোটোকপি

মেশিন? ইন্টারনেট? আমরা তো দূরস্থান, গ্রহান্তরের মানুষের স্বপ্নেও সে সব জিনিস তখনও আসেনি।

সেই অবিশ্বাস্য সময়ে আকরসূত্রের, অর্থাৎ 'প্রাইমারি সোর্স'-এর, খোঁজে এই অতিমানব গবেষকরা বিভিন্ন জায়গায় হত্যে দিয়ে যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছিলেন, তার তুলনায় আমরা পেরিয়ে এসেছি অনেক পথ। প্রাথমিক সূত্রের দলিল থেকে 'লং হ্যান্ডে' নকল করা বা নোট নেওয়া থেকে শুরু করে, টাইপস্ক্রিপ্ট আর মিমিওগ্রাফ ছুঁয়ে, মাইক্রোফিল্ম আর ফোটোকপি ঘুরে, গুগল বুকস, জেস্টর (JSTOR), বা প্রোকোয়েস্ট (ProQuest)-এর মতো বৈদ্যুতিন দলিলভাণ্ডার হয়ে এঁকেবেঁকে গেছে সেই পথ। তবু দুনিয়ার বেশির ভাগ জুড়ে মহাফেজখানার ধারণাটি রয়ে গেছে মোটামুটি একইরকম— নিঃশব্দ গাম্ভীর্যের আস্তরণে মোড়া এক ভীতিসঞ্চারক পরিসর, যেখানে 'কৃপণ' আর্কাইভিস্ট ভুরু কুঁচকে হাতে তুলে দেবেন একটি একটি করে বিবর্ণ, ভঙ্গুর দলিল, যেখানে অপরিসীম সাবধানতায় পাতা ওলটাতে হবে, পেনসিল ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করা যাবে না, আঙুলগুলি ধূলিধূসর না হলে কোনও গবেষণাই হবে না। ওই প্রত্নতত্ত্ববিদরা তাঁদের 'ফিল্ডে' পরিখায় নেমে 'পাথুরে প্রমাণের' খোঁজে যেমন খোঁড়াখুঁড়ি করেন আর কী!

এই অর্থে মহাফেজখানা হল আদতে অনেকটা এক মহাসমুদ্রের মতো, যেখানে নৌকো বা জাহাজ চলাচলের রুটম্যাপ ঠিক পরিষ্কার ভাবে ছকা নেই। গবেষককে তাই জাল বিছিয়ে বসতে হয় বেশ ফাঁদিয়ে, যাতে বরাতজোরে জুটে যেতে পারে রাঘব বোয়াল— অর্থাৎ সেই বিবর্ণ, ছেঁড়া পাতাটি, যা কিনা নতুন দিগন্ত খুলে দেবে, ধরাশায়ী করবে প্রাপকের পূর্বসূরি সেই সব ভাগ্যহীন গবেষকদের, যাঁদের কপালে ওই মহামূল্যবান টুকরো কাগজটির প্রাপ্তিযোগের শিকে ছেঁড়েনি। এই ধরনের ইটপাথরের 'অফলাইন' মহাফেজখানায় অনিশ্চয় মুহূর্তে গবেষকের 'কীওয়ার্ড সার্চের' শরণাপন্ন হওয়ার উপায় নেই। এই প্রসঙ্গে একটু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। অনেক বছর আগে গবেষণার জন্য লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে (যা কিনা ব্রিটিশ লাইব্রেরিরই ভারত-সংক্রান্ত নথিপত্রের উপশাখা) দলিলপত্রের খোঁজে বহুদিন কাটিয়েছি। একবার, মনে পড়ে, ঔপনিবেশিক আমলে ওড়িশার দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য দেখছিলাম 'ক্রাউন রেপ্রেজেন্টেটিভস্ রেকর্ডস্' যার মধ্যে ছিল ওই রাজ্যগুলিতে খবরদারি করার জন্য মোতায়েন ব্রিটিশ রেসিডেন্টদের লেখা রিপোর্ট, দিনপঞ্জি, ইত্যাদি। পাক্কা এক সপ্তাহ ধরে খুঁজছিলাম ভূমিস্বত্ব আর

রাজস্বব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্য, কিন্তু পড়তে পড়তে সেঁটে গিয়েছিলাম ওই সিরিজের রোমাঞ্চকর এবং বিরামহীন সব বর্ণনায়, যেখানে অশ্বারোহী ব্রিটিশ রাজপুরুষরা বন্দুকের গুলিতে মেরে চলেছেন শ'য়ে শ'য়ে বটের, তিতির, বালিহাঁস, আর কখনও বাংলোয় ফিরে, কখনও নদীর ধারেই সদলবলে বার্বিকিউ করে খাওয়া হচ্ছে সেই (নিশ্চয়ই) অনির্বচনীয় স্বাদের পক্ষীমাংস। গোটা এক সপ্তাহ ধরে এই শিকারকাহিনির রসাস্বাদন করে আমার গবেষণার তিলমাত্র লাভ হয়নি বটে, কিন্তু কথাটা এ জন্যই বলা যে মোক্ষম অমূল্য রতনের খোঁজে মহাফেজখানার অলিগলি চষতে চষতে হঠাৎ কখনও দেখা হয়ে যায় এই সব ইতস্তত আকীর্ণ মণিমুক্তোর সঙ্গে। মহাফেজখানার মানচিত্র এইরকম চোরাগলিতে ভর্তি, সেখানে পথ হারানো গবেষক-পথিকের ভবিতব্য। অবশ্যকর্তব্যও বটে।

মহাফেজখানা ও তার প্রাতিষ্ঠানিক নিগড়

কিন্তু কোনটা আমাদের মহাফেজখানা? কাকে বলে মহাফেজখানার সংস্কৃতি? কীভাবে তা গড়ে ওঠে? সহজ উত্তর হল, এই সংস্কৃতির মূলে আছে বিভিন্ন ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করে রাখার অভ্যাস, সেটা লিখে, মৌখিক বিবরণ রেকর্ডিং করে, অথবা স্থিরচিত্র বা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে 'ধরে রাখার' প্রক্রিয়া। সেই অর্থে ভারতে কখন মহাফেজখানার সূত্রপাত? যাকে আজকের পরিভাষায় আমরা 'আর্কাইভাল প্র্যাকটিস' বলি, তা এ দেশে কবে শুরু হয়েছিল? এ প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। প্রাচীন ভারতে কি মহাফেজখানা ছিল? এ কথা অনস্বীকার্য যে নথিপত্র সংরক্ষণের সঙ্গে প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রশ্নটি জড়িত, এবং অনিবার্য ভাবেই, রাষ্ট্রক্ষমতারও। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রশাসন যেমন দক্ষ আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল ছিল, এবং সাম্রাজ্যের সর্বত্র তথ্য সরবরাহ সুষ্ঠুভাবে হত। সম্রাটের সব ঘোষণাপত্র সাম্রাজ্যের সমস্ত জনাকীর্ণ জায়গায় পাথরে উৎকীর্ণ হত, যাতে ক্ষমতাশালী এবং ন্যায়পরায়ণ হিসেবে তাঁর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। এইভাবে শিলালিপি হয়ে ওঠে আর্কাইভিং-এর এক উপাদান।

এই ব্যবস্থারই আরও উন্নততর রূপ দেখা যাবে মুঘল ভারতে, যেখানে সম্রাট আকবর ফতেপুর সিক্রিতে রাজধানী নির্মাণের সময় ১৫৭৪-৭৫ সালে প্রশাসনিক নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য দফতরখানা নামে একটি ভবন নির্মাণ করবেন। এই রাজধানী পরে পরিত্যক্ত হলেও আকবরের আমলে নথিপত্র সংরক্ষণের গুরুত্ব কমেনি, আবুল ফজলের *আইন-ই-আকবরি* থেকেও পাওয়া যায় দলিল রক্ষা করার রাজকর্মচারীদের কথা, যাঁরা সম্রাটের দৈনন্দিন জীবনকেও

লিপিবদ্ধ করতেন, আবার তাঁর বিবিধ অনুশাসনকেও। জমির মালিকানা, আঞ্চলিক প্রথা ও বিধি, প্রদেয় রাজস্ব, ইত্যাদি সম্পর্কে স্থানীয় দলিলপত্র রক্ষা করার কাজ ছিল 'কানুনগো' নামের কর্মচারীদের উপর, ভারতবর্ষে যাঁদের আবির্ভাব মুঘলদের আগেই। সরকারের কাছে দলিল ও নথিপত্রের গুরুত্ব ছিল কতখানি, তার এক অনন্য দৃষ্টান্ত দেখতে পাই ১৭২০-র পর থেকে মারাঠা জোটশক্তির আমলে, যেখানে একজন পূর্ণ মন্ত্রী বা 'প্রধান' ছিলেন মহাফেজখানার দায়িত্বপ্রাপ্ত। পুণার 'হুজুর দফতর'-এ অসংখ্য কর্মচারী সরকারি কাজের সমস্ত নথিপত্র সংরক্ষণ করতেন।

বলাই বাহুল্য, এই ধরনের নথিপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার তাগিদ থেকেই সাবেকি বা প্রাতিষ্ঠানিক মহাফেজখানার সূত্রপাত, এবং সেই ধারা পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়। তবু, ঘটমান বর্তমানের নথিভুক্তিকরণ বা পঞ্জিকরণ, অর্থাৎ documentation-এর সংস্কৃতি সর্বত্র সমান নয়। ইউরোপীয় সভ্যতায়, বিশেষ করে তার ধর্মসংস্কৃতিতে এই সংরক্ষণের যে সংস্কৃতি আছে তা সেই সভ্যতার মহাফেজখানাকে সমৃদ্ধ করেছে। উদাহরণ, বহু শতক ধরে সেই মহাদেশের এক বিস্তৃত অঞ্চলে রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদীদের চলত তদন্ত, বিচার, এবং নৃশংস শাস্তিপ্রদানের পর্ব, মধ্যযুগের ইউরোপে যাকে বলা হত ইনকুইজিশন। এই প্রক্রিয়ার বিস্তারিত নথিপত্রের যে মহাফেজখানা, তার সাহায্যে অনেক চমকপ্রদ ইতিহাসের কাহিনির পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছে। যেমন প্রখ্যাত কানাডীয়-মার্কিন ইতিহাসবিদ নেটালি জিমন ডেভিসের *Le Retour de Martin Guerre*, যে বইয়ে ইনকুইজিশনের বিচারপ্রক্রিয়ার জবানবন্দি ধরনের নথি থেকে আমরা পেয়ে যাই চোদ্দো-পনেরো শতকের ফরাসি কৃষক সমাজে প্রেম, বিশ্বাসভঙ্গ, লোভ, পারিবারিক মূল্যবোধ, এবং পাপ-পুণ্যের ধারণার এক অনবদ্য খতিয়ান। এই ধরনের সামাজিক ইতিহাস লেখার চ্যালেঞ্জ মধ্যযুগের ভারতবর্ষে অনেক বেশি, কারণ ওই ধরনের আর্কাইভ আমাদের হাতের নাগালে নেই, ফলে সাহিত্যের উপাদানের— সে মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব চরিতসাহিত্য, বা ফারসি কিসসা, যাই হোক না কেন— সঙ্গে অনেকটা কল্পনা মিশিয়ে ইতিহাসের রসসৃষ্টি করতে হয়। এই সীমাবদ্ধতার কারণে হয়তো দক্ষিণ এশিয়ায়, বিশেষত ইংরেজি ভাষায়, ইতিহাসধর্মী সাহিত্যের এত রমরমা। নেটালি জিমন ডেভিস যে ধরনের ইতিহাস লিখেছেন, সেখানে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের অনুষঙ্গ আছে, কারণ ইউরোপের মহাফেজখানা তাঁকে সে লেখার উপযোগী রসদ সরবরাহ করেছে। অন্যদিকে ভারতীয় উপমহাদেশে অমিতাভ ঘোষের মতো সাহিত্যিকরা

যে উপন্যাস লিখেছেন, তা আমরা ইতিহাসের মতো করে পড়ছি, উপভোগ করছি, কারণ ইতিহাসবিদরা মহাফেজখানার বাইরে যেতে পারেন না, তাঁরা যে বিন্দুটিতে এসে থেমে যান, সেটিকে অতিক্রম করে গিয়ে সাহিত্যিকরা ইতিহাসের মূল কাঠামোটিকে উপজীব্য করে তাতে ইতিহাসাশ্রয়ী কল্পনার সাহায্যে চরিত্র আর রস সৃষ্টি করেন। তাই তাঁদের লেখা আমরা যখন আনন্দ করে পড়ি, তা এক অর্থে আর্কাইভের বন্দিশালা থেকে মুক্তির আনন্দ।

পঠনপাঠন গবেষণা ও মহাফেজখানার ব্যবহার

কীভাবে মহাফেজখানার নথিপত্র থেকে আমরা গড়ে তুলতে পারি কোনও অঞ্চলের অজ্ঞাতপূর্ব ইতিহাসের নানা আখ্যান? এর জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয় অঞ্চলের ইতিহাসের, সমাজের, অর্থনীতি সংক্রান্ত নানান দলিলের সংরক্ষণ, সে প্রাতিষ্ঠানিক বা ব্যক্তিগত, যে স্তরেই হোক না কেন। গবেষকের ভাগ্য ভালো হলে তিনি তাঁর অধীত অঞ্চলটিতে এই ধরনের সংগ্রহ ও সংরক্ষণের একটি ঐতিহ্য দেখতে পান, ফলে তাঁর কাজটি সহজতর হয়।

যতই আমরা গবেষকদের জন্য এক অনন্য সহায়সূত্র বলে মহাফেজখানার কথা ভাবি না কেন, ছাত্রছাত্রীদের জন্যও মহাফেজখানার কোনও বিকল্প নেই, বিশেষত যারা ইতিহাস পড়ে তাদের জন্য। ইতিহাসের তথ্যসূত্র হিসেবে মহাফেজখানায় লভ্য প্রাথমিক আকরের মতো 'প্রামাণ্য' আর কিছু নেই, ছাত্রছাত্রীদের বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম করার কাজে তারা বিপুল সহায়তা করতে পারে। বিশ্বের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনটা ভাবা হয়ে থাকে যে ছাত্রছাত্রীরা যে শুধু ইতিহাস শিখবে তা নয়, তারা ইতিহাস তৈরিও করবে, প্রকৃত ইতিহাসবিদদের মতো— অন্তত প্রাথমিক স্তরে— গবেষণা করবে, আর এই ভাবে তৈরি হয়ে উঠবে এক প্রকৃত অংশগ্রহণমূলক শিক্ষাব্যবস্থা। ইতিহাসের এই 'নির্মাণ' প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ছাত্রছাত্রীদের 'ক্রিটিক্যাল' চিন্তার ক্ষমতাও তৈরি করে দেয়, কারণ তারা প্রাথমিক আকরসূত্র ব্যবহার করে তাদের নিজেদের ব্যাখ্যা তৈরি করে, অন্য গবেষকদের ব্যাখ্যার তুল্যমূল্য বিচারও করে।

তবুও, আশ্চর্যজনক ভাবে, অনেক জায়গাতেই কোনও মহাফেজখানার অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীরা দিব্যি স্নাতক হয়ে যায়। নিজের উদ্যমে যথার্থ ইতিহাসচর্চার রোমাঞ্চ তাদের অনুভব করা হয়ে ওঠে না আর। ভারতের কথা বিচার করলে, মুষ্টিমেয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া সর্বত্র প্রাথমিক আকরসূত্র ব্যবহার করার ন্যূনতম অভিজ্ঞতা ছাড়াই স্নাতকোত্তর ডিগ্রিও পাওয়া যায়। পশ্চিমের,

বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অবশ্য স্নাতক স্তর থেকেই ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে প্রাথমিক আকরের ব্যবহারের উপর জোর দেয়। এই ব্যাপারটি সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য 'সাম্মানিক' বা 'অনার্স' ট্র্যাকের পাঠ্যক্রমে, যেখানে প্রাথমিক স্তরেই পড়ানো হয় 'হিস্ট্রি ওয়র্কশপ' বা 'হিস্ট্রি ল্যাব' ধরনের কোর্স, যেখানে ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক আকরসূত্র পড়ে ও যাচাই করে, নিজস্ব ব্যাখ্যা ও যুক্তি প্রয়োগ করে, প্রকৃত ইতিহাসবিদদের শৈলীতে লেখা শিখতে হয়। এই পর্যায়ে তারা যে ধরনের সূত্র ব্যবহার করতে শেখে তার মধ্যে সাধারণত থাকে পাণ্ডুলিপি, দুষ্প্রাপ্য বই, ব্যক্তিগত কাগজ ও চিঠিপত্র (অর্থাৎ 'প্রাইভেট পেপার্স'), সংবাদপত্র, পুরোনো ছাপা বই, ইত্যাদি, অর্থাৎ যে সব ধরনের দলিল অভিজ্ঞ গবেষকরাও ব্যবহার করে থাকেন। এমনকি, এর বাইরেও ইতিহাসের বিভিন্ন 'সার্ভে কোর্সের' ছাত্রছাত্রীদেরও প্রাথমিক আকরসূত্র ব্যবহার করার সম্পর্কে বুনিয়াদি ধারণা গড়ে তোলার প্রয়োজন পড়ে।

এ কথা অবশ্য অনস্বীকার্য যে, সরাসরি মহাফেজখানায় বসে কাজ করা এই প্রাথমিক পর্যায়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না, আর সেই জন্যই তৈরি হয় 'হ্যান্ডবুক' ধরনের বই, যেখানে থাকে সযত্নে বাছাই করা এবং সাজিয়ে দেওয়া বিভিন্ন প্রাথমিক আকরসূত্রের অংশ বা ক্ষেত্রবিশেষে পুরোটাই— বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সেগুলি ব্যবহার করেন, অনেক সময়ে পেশাদার গবেষকরাও। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস পড়ানোর জন্য এই ধরনের যে সব আকরসূত্রের সংকলন শিক্ষক-ছাত্রছাত্রীরা সচরাচর ব্যবহার করেন, তার সর্বোত্তম উদাহরণ হল, বিশেষত প্রাচীন ও মধ্য যুগের জন্য, 'বিশ্ব-ইতিহাসের' শৈলীর বিখ্যাত পথপ্রদর্শক উইলিয়াম এইচ. ম্যাকনিলের সংকলিত *ক্ল্যাসিকাল ইন্ডিয়া*, বা নীহাররঞ্জন রায়ের সম্পাদিত *আ সোর্সবুক অব ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন*, কিংবা— সবচেয়ে প্রচলিত এবং দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত— আদিতে থিওডোর ডি ব্যারি আর স্টিফেন হে, এবং দ্বিতীয় সংস্করণে এইন্সলি এম্ব্রি, লিওনার্ড গর্ডন, রেচেল ম্যাকডারমট, ডেনিস ডালটন প্রমুখ ইতিহাসবিদ্‌দের সংকলনে ও সম্পাদনায়, দুখণ্ডের *সোর্সেস অব ইন্ডিয়ান ট্র্যাডিশন/স*। প্রাচীন ও মধ্য যুগ ছেড়ে আধুনিক দক্ষিণ এশিয়ার দিকে তাকালে আমরা পাচ্ছি ওই *সোর্সেস অব ইন্ডিয়ান ট্র্যাডিশন/স*-এরই দ্বিতীয় খণ্ড, বা বারবারা হার্লো আর মিয়া কার্টারের যুগ্ম-সম্পাদনায় *আর্কাইভস অব এম্পায়ার*, অথবা জন ম্যারিয়ট আর ভাস্কর মুখোপাধ্যায়ের যুগ্ম-সম্পাদনায় বৃহৎকলেবর, ছয় খণ্ডের *ব্রিটেন ইন ইন্ডিয়া, ১৭৬৫-১৯০৫*। অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে এই বইগুলি অতি

জরুরি হলেও সমস্যামুক্ত নয়। প্রত্যেকটিতেই আকরসূত্রের নির্বাচনে রয়েছে সংকলক-সম্পাদকদের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ, ঝোঁক, সুতরাং সেই সম্পাদকীয় ঝাঁকিদর্শনের বিশেষ পরিপ্রেক্ষিত ছাত্রছাত্রীদের সমগ্র ভারতকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটিকে প্রভাবিত করবে, এমন আশঙ্কা থেকে যায়। তা ছাড়াও, নিঃসন্দেহেই এই সব বই আসল মহাফেজখানার বিকল্প নয়, সেগুলিতে আকরসূত্রের মূল 'টেক্সট'-এর অপরিবর্তিত পাঠরূপটি মুদ্রিত অক্ষরে থাকলেও তার চিত্ররূপ বা 'ফ্যাক্‌সিমিলি' ভাষ্যটি নেই, তাই লিখনপ্রক্রিয়ার আদি ও নিখাদ শরীরী রূপটি সেখানে ধরা পড়ে না। তা সত্ত্বেও এই বইগুলির অস্তিত্ব ও বহুল ব্যবহারই প্রমাণ করে, ইতিহাসের পঠনপাঠনে প্রাথমিক আকরসূত্রের ব্যবহার সম্পর্কে খানিক ধ্যানধারণার অর্জনকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। শিক্ষায় ও জনজীবনে 'মহাফেজখানার সংস্কৃতি'র প্রভাব ও উপকারিতা এখানেই।

ভারতের মতো প্রাচীন সভ্যতা ও সমাজে সেই সংস্কৃতি খুব বেশি দানা বাঁধেনি, সেটা দুর্ভাগ্যের। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ভারতে বিভিন্ন সময়ে আমরা দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের স্নাতক পর্যায়ের পাঠ্যক্রমকে উদ্ধৃত করি, কারণ সেই পাঠ্যক্রমের রূপায়ণে অনেক চিন্তাভাবনার স্বাক্ষর আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, আর সুচিন্তিত ভাবে নির্বাচিত প্রামাণ্য গবেষণাপত্রের সংকলনকে অবশ্যপাঠ্য করার ব্যাপারে তাঁরা এক রকমের পথিকৃৎ। কিন্তু সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এখনকার স্নাতক স্তরের ইতিহাসের পাঠ্যক্রমেও আমরা দেখি আবশ্যিক 'কোর' কোর্সের তালিকায় প্রাথমিক আকরসূত্রের ব্যবহার-নির্ভর কোনও কোর্স নেই। আর আবশ্যিক বাদ দিয়ে পছন্দসই চারটি 'ইলেক্টিভ' বা ঐচ্ছিক কোর্স বেছে নিতে হবে সাতটির মধ্যে থেকে, যার মধ্যে অন্যতম হল 'রিসার্চ মেথডলজি ইন হিস্ট্রি'। আর আরও নীচের সারিতে দুটি ঐচ্ছিক 'স্কিল এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স' বেছে নিতে হবে চারটি অপশনের মধ্যে থেকে, যার মধ্যে একটির নাম 'আর্কাইভস অ্যান্ড মিউজিয়ামস'। মোদ্দা কথা হল গবেষণাপদ্ধতি বা মহাফেজখানার ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞানার্জন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের স্নাতক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যকর্তব্য নয়, আর তা ছাড়া ওই দুটি কোর্সের পাঠ্যক্রমেও প্রাথমিক আকরসূত্রের ব্যবহারের মডিউল একেবারেই নেই, বরং অনেক বেশি চোখে পড়ে ইতিহাসচর্চার ধারা, অর্থাৎ 'হিস্টরিওগ্রাফি' পড়ানোর ঝোঁক। ইতিহাসচর্চার বিভিন্ন শৈলীর বিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করব, অথচ সেই চর্চার গোড়ায় নিহিত আছে প্রাথমিক উপাদান ব্যবহার করার যে বুনিয়াদি মনন, তা অভ্যাস করব না, এর মধ্যে কোথাও যেন একটা বড় ফাঁক (অথবা

ফাঁকি) আছে। সেই জন্যই বলি, 'মহাফেজখানার সংস্কৃতি' শব্দবন্ধটি যতই গ্রাম্ভারি বলে মনে হোক, সেই সংস্কৃতি যে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইতিহাসের শিক্ষণে এক উপেক্ষিত সংস্কৃতি, সে কথা অস্বীকার করা চলে না।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ আমাদের সর্বস্তরের শিক্ষায় এক বহু আলোচিত বিষয়, তার 'চরিত্র' সম্পর্কে আমরা বহু ইতিহাসবিদের 'মতামত' পড়ি, কিন্তু সেই বিদ্রোহের সঙ্গে সম্পর্কিত ভারতীয়দের লেখা সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমকালীন লেখা হল উত্তর প্রদেশের আজমগড় থেকে ১৮৫৭ সালের মে মাসে মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের পৌত্র ফিরোজ শাহের লেখা 'আজমগড় ঘোষণাপত্র', যার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তিলাভের জন্য মুসলমান ও হিন্দুর এক সঙ্ঘবদ্ধ অঙ্গীকার। আশ্চর্যের কথা হল, *সোর্সেস অব ইন্ডিয়ান ট্র্যাডিশন/স*-এর দ্বিতীয় খণ্ডে একটি বিশদ ভূমিকাসহ এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ দলিলটির সম্পূর্ণ পাঠ অন্তর্ভুক্ত হলেও, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ইতিহাসের স্নাতক স্তরের ছাত্রছাত্রীরা এটি পড়ে না। এনসিইআরটি-র একটি স্কুলপাঠ্য বইতে দলিলটি আলাদা করে 'উপাদান' হিসেবে দেওয়া আছে, কিন্তু, কিমাশ্চর্যম্ দলিলটির কোনও ভূমিকা, প্রেক্ষিত, ইত্যাদি আলোচনা করার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন লেখক-সম্পাদকরা বোধ করেননি। একই ভাবে, এ দেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের সুপারিশ করে রামমোহন বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে ১৮২৩ সালে এক বিখ্যাত চিঠি লেখেন, এ কথা সেই ছাত্রছাত্রীরা সবাই তাদের পাঠ্য বইতে পড়ে, কিন্তু মূল চিঠিটি তাদের ক-জন এই স্তরে পড়ে, সে নিয়ে বিস্তর সন্দেহ আছে।

জনজীবনের নানা দিক ও মহাফেজখানার পরিসর

মহাফেজখানার সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে যে প্রক্রিয়া, তাকে আমরা দৈনন্দিন প্রয়োগবিধিতে বলি 'ডকুমেন্টেশন', অর্থাৎ তথ্য সংকলন, পঞ্জিকরণ, ও সংরক্ষণ। এই তথ্য সংকলন নানান বিষয়ে হতে পারে। শুধু রাজনীতি, প্রশাসন, ভূমিস্বত্ব ও রাজস্ব, ইত্যাদি গুরুগম্ভীর বিষয়ে সরকারি নথিপত্র নয়, মহাফেজখানা বা তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা যেতে পারে সাহিত্য, চারুকলা, সঙ্গীত, নাট্যশিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, চলচ্চিত্র, এমনকি রান্নাবান্না-খাওয়াদাওয়া নিয়েও। আমাদের দুর্গাপুজোকে ঘিরে গড়ে উঠেছে যে পরিব্যাপ্ত 'সৃষ্টিশীল অর্থনীতি' বা 'ক্রিয়েটিভ ইকনমি', তা নিয়ে ২০২০-২১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দফতর আর ব্রিটিশ কাউন্সিল এক সমীক্ষা

করে, যেখানে দেখা যায় যে সেই অর্থনীতির অর্থমূল্য বত্রিশ হাজার কোটি টাকারও বেশি। ২০২২ সালে দুর্গাপুজোকে মানবসভ্যতার অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা 'ইনট্যাঞ্জিবল কালচারাল হেরিটেজ'-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত করার আগে ইউনেস্কো যে প্রতিবেদনগুলির সমীক্ষা করেছিল, তার মধ্যে এটি ছিল অন্যতম। এই যে ডকুমেন্টেশন-নির্ভর তথ্যভাণ্ডার, যার মাধ্যমে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে একটি শহর, বা জনগোষ্ঠী, বা সাংস্কৃতিক অঞ্চলের জীবন-বৈচিত্র্যের নানান দিক, তার প্রয়োগ এবং উপকারিতা দেখা গেছে জয়পুর শহরের ইউনেস্কো 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সিটি' তকমার জন্য আবেদনপর্বেও। সরকারি উদ্যোগের কথাটি সরিয়ে রেখে বলা যায়, যেখানে জনসমাজে 'মহাফেজখানার সংস্কৃতি' সুদৃঢ় ভাবে প্রোথিত, উৎসাহী সংকলক-সংগ্রাহক-পঞ্জিকারকদের সংখ্যা বেশি, সেখানে হরেক বিষয়ে গড়ে ওঠে সমৃদ্ধ তথ্যভাণ্ডার, ঐতিহ্য সংরক্ষণের কাজটি সুষ্ঠু ভাবে সমাধা হয়।

আমাদের বঙ্গসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান নিয়ে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, বা যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয়েছে খানিক ইতস্তত ভাবে ছড়িয়ে-থাকা নানান মহাফেজখানা। ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসার যে এই কাজকে সহায়তা করেছে, তা অনস্বীকার্য। মূল আকর, সূত্র, ও দলিলের সংরক্ষণের সঙ্গে ডিজিটাল সংরক্ষণের সমন্বয় হল এক আদর্শ পন্থা, এর প্রয়োগ কোনও কোনও ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভাবে সফল। বেশ কিছু সর্বভারতীয় সংস্থার মহাফেজখানাতে বাংলার উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ। যেমন নাট্যশোধ সংস্থার থিয়েটার আর্কাইভে রয়েছে বাংলার বেশ কিছু বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্বের চিঠিপত্র আর পাণ্ডুলিপি, তা ছাড়াও ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, বহুরূপী, থিয়েটার অ্যাকাডেমি, লিটল থিয়েটার গ্রুপ, পিএলটি-র মতো নাট্যগোষ্ঠী সম্পর্কে বিস্তর তথ্য। পুণের ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভেও রয়েছে বাংলার অত্যুজ্জ্বল চলচ্চিত্র-ঐতিহ্য সম্পর্কে অনেক মহামূল্যবান নথি, যদিও তাঁদের ওয়েবসাইটে এই সংগ্রহের কোনও হদিশ পাওয়া যায় না। সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেনের বহুধাবিস্তৃত কর্মকৃতি নিয়ে একাধিক দেশে আর্কাইভ আছে, আছে ভাইনিল রেকর্ডে বাংলা গানের গৌরবময় ইতিহাস নিয়ে একাধিক সংগ্রাহকের সযত্ননির্মিত আর্কাইভও। আর সাহিত্যের তো কথাই নেই। উনিশ শতক ও বিশ শতকের বেশ কয়েক দশকের বাংলা কল্পনাশ্রয়ী তথা প্রবন্ধসাহিত্যের বহু বিখ্যাত গ্রন্থ, যা হয়তো এখন আর ছাপা নেই, পড়বার জন্য এখন আর লাইব্রেরিতে ঢুঁ মারতে হয় না, সেগুলি আন্তর্জালে বিনামূল্যে পড়তে পাওয়া যায় ইন্টারনেট আর্কাইভে, অথবা ন্যাশনাল ডিজিট্যাল লাইব্রেরি অব ইন্ডিয়ায়।

ওই সময়ের অগণিত বাংলা সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠারাজির বৈদ্যুতিন প্রতিলিপি নিয়ে কলকাতার গবেষণা-প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস-এ গড়ে উঠেছে যে হিতেশরঞ্জন সান্যাল স্মারক আর্কাইভস, তার সংগ্রহও এখন হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পাঠকদের কাছে দৃশ্যমান, আর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব কালচারাল টেক্সটস-এর উদ্যোগে ডিজিটায়িত বহু পুরোনো ও দুষ্প্রাপ্য বাংলা বই পড়া সম্ভব ব্রিটিশ লাইব্রেরির ওয়েবসাইট থেকে। এই ধরনের উদ্যোগ যত বেশি হবে, মহাফেজখানার সংস্কৃতি তত বেশি জনজীবনে চারিয়ে যাবে, আমাদের সংস্কৃতি ও ইতিহাস তত বেশি গবেষক-বান্ধব হয়ে উঠবে। সীমিত সাধ্য ও পুঁজির প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে শুধু নিষ্ঠা ও নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমেও যে এই সংস্কৃতিকে আলিঙ্গন করা যায়, তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ কলকাতার উপকণ্ঠে উত্তরপাড়ার 'জীবনস্মৃতি ডিজিট্যাল আর্কাইভ', যার কর্ণধার এক অনন্য উদ্যোগে এবং মুষ্টিমেয় সমর্থকের সহায়তায় গড়ে তুলেছেন 'বই সংগীত চিত্র আলোকচিত্র চলচ্চিত্র এবং রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ে এক চমকপ্রদ অণু-মহাফেজখানা।

আমাদের স্মৃতি ও সত্তা, আর মহাফেজখানার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

পরিশেষে নিবেদন করি যে, মানুষের স্মৃতির মতো বৃহৎ এবং জীবন্ত মহাফেজখানা আর দ্বিতীয়টি নেই। এমনিতে মহাফেজখানা সম্পর্কে আমাদের সনাতন ধারণা হল এই যে, এ যেন নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজের এক ইমারত, যেখানে অসীম ধৈর্য আর ধুলো ঘাঁটার উৎসাহ নিয়ে আমাদের খড়ের গাদায় ছুঁচ খুজতে হবে। কিন্তু আদতে মহাফেজখানার সঙ্গে এই ইটপাথরের ইমারতের সাবেক সম্পর্ক দ্রুত গতিতে শিথিল হয়ে পড়ছে। সাহিত্য যেমন সমাজমানসের এক বৃহদায়তন মহাফেজখানা, আমাদের স্মৃতিও সে রকম এক অনিঃশেষ মহাফেজখানা যা আমরা নিরন্তর বয়ে বেড়াই, সময়বিশেষে খুঁড়ে, ধুলোর পলেস্তারা সরিয়ে দেখি। উদাহরণ হিসেবে দেশভাগের সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চার কথা বলা যেতে পারে, নেতাদের দাবিদাওয়া-আপস-মীমাংসা ও রাজনৈতিক দলাদলির পরিসর ছাড়িয়ে যে ইতিহাসচর্চা এখন ঢুকে এসেছে সাধারণ মানুষের জীবনের অন্দরমহলে, যেখানে দেশভাগের 'দায়িত্বের' প্রশ্নটি আর প্রধান নয়, দেশভাগের 'অভিজ্ঞতার' প্রশ্নটিই সব কিছুকে ছাপিয়ে ওঠে। গত দুই দশকে উচ্চবর্গের রাজনীতির পর্যালোচনা থেকে চোখ সরিয়ে দেশভাগের ইতিহাসবিদরা প্রায় সম্পূর্ণতই মনোনিবেশ করেছেন দেশভাগের স্মৃতি ও তার পুনর্নির্মাণের

গতিপ্রকৃতির উপর। মহাফেজখানার ধারণাটিকেও তাই নতুন করে ভাবতে হয়েছে অবশ্যম্ভাবী ভাবেই। দেশভাগের— এবং ঠিক সেই রকম অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার— ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা স্মৃতির ভাণ্ডার হল সেই নতুন মহাফেজখানা, যা আছে বলে আমরা জানি, কিন্তু যার যথার্থ পুনরুদ্ধার আমরা এখনও করে উঠতে পারিনি— বা অন্য ভাবে বলতে গেলে, যে মহাফেজখানা সতত নির্মীয়মাণ।

এই মহাফেজখানার গুরুত্ব আরওই বেশি উপলব্ধি করতে পারব আমরা যদি মনে রাখি যে অতি শৈশবেও যাঁরা দেশভাগ প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁদের বয়স এই মুহূর্তে অন্তত আশি, বা তারও বেশি। সুতরাং এমন একটি ভয়ংকর সময় অচিরেই আমাদের দোরগোড়ায় হাজির হবে, যখন দেশভাগের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছেন এমন কেউই আর জীবিত থাকবেন না। ঠিক যেমন আর অল্প কিছুদিন পরেই এমন কেউই জীবিত থাকবেন না যিনি স্বাধীনতার মুহূর্তটিকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তেতাল্লিশের মন্বন্তর বা ছেচল্লিশের দাঙ্গা দেখেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে গেছেন, রবীন্দ্রনাথকে স্বচক্ষে দেখেছেন, গান্ধীবাদী সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন, বা সিঙ্গাপুর রেডিও থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের অবিস্মরণীয় রেডিও ভাষণগুলি স্বকর্ণে শুনেছেন। তাঁদের বহুবর্ণ স্মৃতির পরিব্যাপ্ত অন্তর্লীন— অর্থাৎ intangible— মহাফেজখানাটিও বিনষ্ট হবে তাঁদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই। উত্তরপ্রজন্মের মানুষরা, বিশেষত গবেষকরা— যাঁরা ঋত্বিক ঘটকের ছবি সুবর্ণরেখা-র চরিত্র হরপ্রসাদের ভাষায় ‘যুদ্ধ দ্যাখে নাই, মন্বন্তর দ্যাখে নাই, দাঙ্গা দ্যাখে নাই, দেশভাগ দ্যাখে নাই’—, কোন আকরসূত্রের কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন, বিশেষ করে আমাদের আবেগ আর অনুভূতির ইতিহাস রচনা করার জন্য?

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই ধরনের মহাফেজখানা সরকার বানাতে পারে না, বরং তা নির্মাণ করার জন্য এগিয়ে আসতে হয় কমিউনিটিকেই। স্থানীয় সুশীল সমাজ, উৎসাহীবৃন্দ, উদ্যমী ছাত্রছাত্রী-গবেষকদের প্রয়াসেই এই ভাবে গড়ে উঠেছে অমৃতসরের পার্টিশন মিউজিয়াম, বা আন্তর্জালের মহাফেজখানা 1947 partitionarchive.org/ অথবা কলকাতা পার্টিশন মিউজিয়াম, যাদের প্রধান কাজ হল অডিয়োভিস্যুয়াল সাক্ষাৎকারের এক বৃহৎ ভাণ্ডার গড়ে তোলা, অথবা ব্যক্তিমানুষের স্মৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সামগ্রী বা artifacté-এর সংগ্রহ সাজিয়ে তোলা। খানিকটা এই তাগিদ থেকেই নৃতত্ত্ববিদ

এবং ইতিহাসবিদ অঞ্চল মালহোত্রা তৈরি করেন The Museum of Material Memory নামে এক প্রতিষ্ঠান, যা আন্তর্জালের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে আবেদন জানায় পারিবারিক স্মৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনও সামগ্রীর ছবি তুলে তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখে পাঠাতে, যার থেকে সমৃদ্ধ হবে এই 'crowd-sourced digital repository'। অঞ্চলের লেখা *Remnants of a Separation: A History of the Partition through Material Memory* (২০১৭) বইটিতেও রয়েছে মানুষের স্মৃতির এই নব্য মহাফেজখানা গড়ে তোলার কথা।

শতাব্দীপ্রাচীন এক কল্পনা ও অগ্রপথের সম্ভাবনা

আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করি যে 'বস্তু-নির্ভর স্মৃতি' বা material memory-র এই ধারণার পূর্বাভাস বাঙালির চিন্তায় প্রতিফলিত হয়েছে একশো বছরেরও বেশি আগে। উপলক্ষ ছিল আমাদের ঘরের কাছের প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, যাকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কল্পনা করেছিলেন এক 'মাতৃমন্দির' হিসাবে। ১৯০৮-৯ সালে, স্বদেশি আন্দোলন যখন তুঙ্গে, এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ছিল এ রকম:

> সেই মন্দিরের এক পার্শ্বে একটি পুস্তকালয় থাকিবে, যেখানে বাঙ্গলা ভাষায় রচিত, মুদ্রিত, অমুদ্রিত, প্রকাশিত, অপ্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ সংগৃহীত হইবে। বঙ্গের নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হাতে-লেখা প্রাচীন পুঁথি সেইখানে স্তূপাকৃতি হইবে। সহস্র বৎসরের ধারাবাহিক চেষ্টার ফলে বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে কিছু ফসল জন্মিয়াছে, তাহা আমরা এক স্থানে সংগৃহীত ও সঙ্কলিত দেখিতে পাইব। গ্রীক ও রোমান হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক মার্কিন ও জাপানী পর্য্যন্ত যে-কোন বৈদেশিক আগন্তুক বাঙ্গালীর সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও সেই স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইংরেজ সরকার বাঙ্গলার ভূগোল, ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন ও সরকারী সাহায্য ব্যতীত যিনি যাহা সংগ্রহ করিতেছেন, তাহা সেই স্থানে সযত্নে রক্ষিত হইবে।

লক্ষণীয় যে, এই লক্ষ্যের মধ্যে নিছক গ্রন্থাগারের অভিজ্ঞান ছাপিয়ে গিয়ে একটি প্রকৃত মহাফেজখানা গড়ে তোলার অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দর এমনকি সেখানেও থামেননি, চেয়েছিলেন বাংলার ইতিহাস, সাহিত্য, পুরাতত্ত্বের নানান বস্তুগত নিদর্শন— তা সে প্রস্তরলিপি বা তামার মুদ্রা হোক, বা রাজা

প্রতাপাদিত্যের বাড়ির ভাঙা কলসি থেকে শুরু করে পলাশীর যুদ্ধের কামানের গোলা থেকে বিদ্যাসাগরের খড়ম বা বঙ্কিমের ব্যবহৃত কলম— দিয়ে সাজিয়ে তোলা হোক এক পুরোদস্তুর সংগ্রহশালা। রামেন্দ্রসুন্দরের সেই কল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি, গ্রন্থগার ও মহাফেজখানার সীমারেখা যে ভাবে তিনি ঘুচিয়ে দিতে চেয়েছিলেন— সেই সঙ্গে কাগুজে নথি ও বস্তুগত নিদর্শনের সীমারেখাও— সেই দর্শন কোনও আধুনিক মহাফেজখানার মধ্যে বিধৃত হয়নি, অন্তত এখনও। কিন্তু ওই দর্শনের রূপায়ণের মধ্যেই মহাফেজখানার সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ নিহিত। প্রতাপাদিত্য বা সিরাজ, কিংবা বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের থেকে প্রসারিত হয়ে এই 'আর্কাইভ্যাল স্পিরিট' সঞ্চারিত হবে আমাদের জনজীবনে, এমন আশা করা কি কষ্টকল্পনা? আমাদের দুই বাংলার নানান প্রান্তে, পারিবারিক চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, ডায়েরি, বা খাতাঞ্চির খাতায় হয়তো নিহিত আছে অনেক অজানিতপূর্ব, অভাবিতপূর্ব ইতিহাস। বাঙালির মানসবিশ্বের মহাফেজখানার আলো-আঁধারি কোণগুলিতে জ্বলে উঠুক তেমনই অনেক আলোকবর্তিকা, ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে সেইটুকুই আমার আশা।

বই-সংস্কৃতি

ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী

আমরা এখন ডিজিট্যাল যুগের বাসিন্দা। পকেটের মোবাইলে বন্দি সারা বিশ্ব। ভূতের রাজার বর আর শুধু গুপী-বাঘার একচেটিয়া নয়, আমরা যে কেউ চাইলেই যে কোনও জায়গায় বসে যে কোনও খাবার আনাতে পারি, যে কোনও পোশাক পেতে পারি, যে কোনও গন্তব্যে যাওয়ার জন্য বাইক থেকে বিমান, হোমস্টে থেকে বিলাসবহুল রিসর্ট, নিমেষে সব কিছুরই ব্যবস্থা করে ফেলতে পারি। এ তো গেল ভোগের দুনিয়া। আর মনের খাদ্য? সংস্কৃতির উপকরণ? ইন্টারনেটে, ইউটিউবে, ব্লগে সব আছে। রবীন্দ্রনাথের ২২০০-রও বেশি গানের যেটা খুশি যে কোনও সময় ইচ্ছে হলেই শুনে নিতে পারি। কিন্তু বই?

হ্যাঁ, অনেক বইও এখন ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। এমন সব বই, যা কখনও চোখে দেখতে পাব ভাবিনি। হ্যাকারদের কল্যাণে দুর্মূল্য স্বদেশি ও বিদেশি বই, কপিরাইট রয়েছে এমন বইও পিডিএফ আকারে পাওয়া যায়। ফেসবুকে বিভিন্ন গ্রুপে নিয়মিত পিডিএফ পোস্ট করা হয়, শুধু ডাউনলোড করে নিলেই হল। অনেকে যুক্তি দেন, বহুদিন অমুদ্রিত তথা দুর্লভ বই পিডিএফ করে আগ্রহী পাঠক-গবেষকের স্বার্থে বিতরণ করাই যায়, সেখানে আর কপিরাইট নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলে। পাঠকের দিক থেকে দেখলে এ তো হাতে চাঁদ পাওয়ারই শামিল, তবে আইনগত দিক থেকে অবশ্যই অন্যায়। এই দায় এড়াতে অনেক বই পিডিএফ করার সময় প্রকাশক বা প্রকাশকাল সংক্রান্ত তথ্য (বিশেষ করে টাইট্‌ল ভার্সো) বদলে দেওয়া হয়। এর ফলে একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটছে। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে, এই ভুল তথ্য সমেত বহু বইয়ের পিডিএফ নেট

দুনিয়ায় অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পাঠক-গবেষক-ছাত্রছাত্রী চোখ বন্ধ করে তা ব্যবহার করছেন, এমনকি তথ্যসূত্র হিসেবে নিজেদের লেখায় উল্লেখও করছেন। ইন্টারনেট আর্কাইভের মতো সাইটেও এই রকম বই আপলোড হয়ে যাচ্ছে, এবং স্বাভাবিকভাবেই একধরনের স্থায়িত্ব ও স্বীকৃতি পেয়ে যাচ্ছে। গ্রন্থাগারে গিয়ে কোনও বইয়ের পুরোনো বা বিভিন্ন সংস্করণ মিলিয়ে দেখার পরিশ্রম অনেকেই আর করতে চান না, সবই তো ব্যাদে (পড়ুন ইন্টারনেটে) আছে, ফলে ছাপা বই ঘেঁটে দেখার প্রবণতাটাই পড়তির দিকে।

ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, ট্যাব, কিন্ডল হয়ে এখন মোবাইলে বই-প্রবন্ধ সব পড়ে নেওয়া যায়, আজকের প্রজন্ম পড়ার বই, বাইরের বই সবই মোবাইলে পড়ে। সেমেস্টারের চাপ, ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা, সব মিলিয়ে এক বেসামাল প্রজন্মের কাছে লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ার সময় বা উৎসাহ কোনোটাই নেই। স্কুলে লাইব্রেরিটা সবথেকে অবহেলিত এবং প্রান্তিক বিভাগ, তাও যদি থাকে সেখানে গ্রন্থাগারিকের পদ খালি। বহু স্কুল-কলেজ এমনকি কোনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে পুরোনো এবং মূল্যবান বই বাতিল করে স্রেফ কাবাড়িওয়ালাদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, সেখান থেকে সেগুলি আবার চলে আসছে পুরোনো বইয়ের দোকানে। কেন? যথাযথ উত্তর কোথাও পাবেন না, তবে মোটের উপর বক্তব্য হল এসব বইয়ের কোনও পাঠক নেই, ছাত্রছাত্রীদের কথা ছেড়েই দিন, শিক্ষকরাও বই পড়তে আগ্রহী নন। কর্মীর অভাব সর্বত্র, তাই পুরোনো বই নষ্টও হয়ে যাচ্ছে। অতএব সে সব বিদায় করে দেওয়াই ভালো, জায়গাও খালি হয়। এই অবস্থায় শিক্ষকরা তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কীভাবে বই পড়ার আগ্রহ তৈরি করবেন? স্কুলে তো এই অবস্থা, বাড়িতেই বা কজন অভিভাবক ছোটোদের নিয়মিত বই কিনে দেন? এ এক দুষ্টচক্র, চাহিদা না থাকায় বাংলায় অন্তত ছোটোদের জন্য ভালো বইয়ের প্রকাশনাতেও ঘাটতি তৈরি হয়েছে। আমারই এক প্রাক্তন সহকর্মী অনেক দিন ধরে ভালো মানের বই প্রকাশ করছেন, তিনি একসময় চমৎকার ছোটোদের বই প্রকাশ শুরু করেছিলেন। কিন্তু বিক্রির অভাবে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর প্রকাশনার ছোটোদের শাখাটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন, এবং জমে থাকা অবিক্রীত বই আক্ষরিক অর্থে বিলিয়ে দেন। আমার মতো যাটোর্ধ্ব অধিকাংশ বাঙালির ছোটোবেলা ভরে ছিল একদিকে দেব সাহিত্য কুটীরের শারদীয় প্রকাশনা ও অন্যান্য রহস্য-রোমাঞ্চ-অ্যাডভেঞ্চার-অনুবাদ সিরিজের বই, অন্য দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের উজ্জ্বল রঙিন

ছবিওয়ালা বাংলা বই দিয়ে। ছিল *শুকতারা, কিশোর, ভারতী, সন্দেশ, আনন্দমেলা,* কি একটু আগের *শিশুসাথী, মৌচাক-এর* মতো পত্রিকা, প্রতি মাসে যাদের জন্য থাকত উন্মুখ প্রতীক্ষা। আজকের ছোটো ছেলেমেয়েদের জীবন থেকে সেই প্রতীক্ষাটা হারিয়ে গেছে, তারা হয় চাইবার আগেই এত কিছু পেয়ে যায় যে ছোটো ছোটো প্রাপ্তি তাদের আর কোনও আনন্দ দেয় না, না হলে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীর কাছে উপযুক্ত উপকরণ পৌঁছোয় না। তাদের বাবা-মায়ের কাছেও ভালো বই-পত্রিকার জগৎটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অচেনা, প্রতিযোগিতার ইঁদুর-দৌড়ে শামিল হয়ে গিয়ে ওদিকে আর মন দেওয়ার সময় হয়নি অনেকেরই।

তা হলে ছাপা বইয়ের কী হবে? এ নিয়ে অসীম নস্টালজিয়া থেকে শুরু করে তীব্র ক্ষোভ, সবই আছে। বিতর্ক চলছেই, তা মেটার কোনও সম্ভাবনাও নেই। বিশ্বজুড়ে বহুল-প্রচারিত নানা পত্রপত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাংলা বাজারে প্রকাশকেরা আগে যেখানে হাজার কপির সংস্করণ করতেন, জনপ্রিয় লেখক হলে দু-পাঁচ হাজার কপির সংস্করণও কিছু অস্বাভাবিক ছিল না, আজ সেখানে প্রিন্ট অন ডিমান্ড পদ্ধতিতে পঞ্চাশ কি একশো কপি দিয়ে নতুন বইয়ের প্রকাশ শুরু হয়। ভালো বিক্রি হলে তখন আবার কিছু ছেপে নেওয়া, নইলে ওখানেই ইতি। আগে বাঁধাইকরদের ঘরে বইয়ের ফর্মা স্তূপীকৃত থাকত, প্রকাশকেরা দরকার মতো বাঁধিয়ে নিতেন। এখন ভালো বাঁধাইকরের সংখ্যা কমেছে, পাঠ্যবইয়ের চাপে অন্য বই প্রান্তিক, ফর্মা রাখতে হলে গোডাউন ভাড়া করতে হবে, যা খুব বড়ো প্রকাশক ছাড়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

গত দুদশকে অনেক ছোটো প্রকাশক বাংলা প্রকাশনার জগতে উঠে এসেছেন। তাঁদের অধিকাংশই বইয়ের বিষয় নির্বাচন, লেখক সন্ধান, মুদ্রণ ও প্রকাশনার মান, উপযুক্ত সম্পাদনা ও প্রুফ সংশোধনের উপর জোর দেওয়ার কথা বলছেন। সবাই সব ক্ষেত্রে সাফল্য না পেলেও নিয়মিত যথেষ্ট ভালো কাজ যে হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। এর মধ্যে একটা বড়ো অংশ অবশ্য পুরোনো বই পুনর্মুদ্রণে বেশি আগ্রহী। তার একাধিক কারণ আছে। প্রথমত কপিরাইটের সমস্যা নেই, দ্বিতীয়ত দুর্লভ এবং একদা-বিখ্যাত হওয়ার সুবাদে বিক্রির ব্যাপারেও খানিকটা আশাবাদী হতে বাধা নেই। সমস্যা অন্যত্র, সেটা হল পুরোনো বই নতুন করে সম্পাদনা এবং টীকা দেওয়া। অধিকাংশ সময়েই নমো

নমো করে দুপাতার একটা ভূমিকা লিখে এবং সুপরিচিত ‘সেকেন্ডারি সোর্স’ থেকে কিছু টীকা যোগ করে কাজ সারেন তথাকথিত সম্পাদক। তাতে অবশ্য বইয়ের নামপত্রে, এমনকি প্রচ্ছদেও নিজের নাম যোগ করতে এই সম্পাদকদের কোনও দ্বিধাবোধ হয় না, যেখানে পুলিনবিহারী সেন বা সুবিমল লাহিড়ীর মতো অতীতের দিক্‌পাল সম্পাদকেরা আলগোছে, নিছক তথ্য সংরক্ষণের খাতিরে কোথায় যে নিজের নামটা উল্লেখ করে রাখতেন তা খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। তবে ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। প্রয়াত দেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি অশোক উপাধ্যায় নামেই গবেষকমহলে সুপরিচিত ছিলেন, গত কয়েক দশক ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও বহুক্ষেত্রেই অযাচিতভাবে কত বইয়ের রচনা-সম্পাদনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তার হিসেব লুকিয়ে আছে সেই সব বইয়ের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের কয়েকটি শব্দের আড়ালে। বাংলা গবেষণাগ্রন্থের ক্ষীয়মাণ সংস্কৃতিতে অশোক উপাধ্যায়ের ভূমিকার মূল্যায়ন ভবিষ্যতে কেউ নিশ্চয়ই করবেন।

কিন্তু বইয়ের সম্পাদনা থেকে মুদ্রণমান সবই ভালো করতে হলে, এবং বেশি ছাপা সম্ভব না হলে প্রকাশককে বাধ্য হয়েই দাম বেশি রাখতে হয়। আবার দাম বেশি হলে পাঠক একটু পিছিয়ে যান। বাজেট অনুযায়ী বেছেবুছে অল্প বই কেনেন। নিজের আগ্রহের বিষয়ে ভালো বই পেলে এখনও দাম দিয়ে কেনার পাঠক আছেন, যদিও তাঁদের সংখ্যা সীমিত। তাঁরা ঠিক ক্ষ্যাপার মতো পরশপাথর খুঁজে ফেরেন। এখন নতুন বইয়ের প্রচারের অন্যতম প্রধান মাধ্যম সোশ্যাল মিডিয়া, কারণ বাণিজ্যিক হারে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ক্ষমতা হাতে গোনা কয়েকজন প্রকাশক ছাড়া কারোরই নেই। এই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিখ্যাত বইয়ের গ্রুপে নতুন বইয়ের খবরের সঙ্গে অনেক সময়েই থাকে প্রি-বুকিং-এর অফার। এতে প্রকাশক পাঠকের চাহিদার একটা মোটামুটি আন্দাজ পেয়ে যান, কত কপি ছাপা নিরাপদ হবে তাও অনুমান করতে পারেন। কিছু অগ্রিম টাকাও হাতে এসে যায়। পাঠকের দিক থেকে তাঁর আগ্রহের বইটি বাড়িতে বসে পাওয়া সুনিশ্চিত হয়, ভালো ছাড়ও পাওয়া যায়। উভয় পক্ষেরই লাভ। আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় করোনা অতিমারির পর থেকে আর-একটা নতুন দিক খুলে গেছে। অনলাইন বই বিক্রির ব্যাবসা গত দুবছরে তুঙ্গে উঠেছে। নতুন বই অনলাইনে বিক্রি অনেক আগেই শুরু হয়েছিল, আমাজন ফ্লিপকার্ট ছাড়া প্রকাশকরাও আস্তে আস্তে নিজেদের বই নিজেরাই অনলাইনে বিক্রি করা শুরু করেন। তাতে বিক্রি অবশ্যই

বেড়েছে। এর পাশাপাশি জমিয়ে বসেছে পুরোনো বইয়ের ব্যাবসা। পুরোনো বই বিক্রির অনেক গ্রুপ তৈরি হয়েছে, সেখানে নজর রাখলে একটা বিষয় বোঝা যায়। দুর্লভ (এই অভিধার অর্থ এখন কোথায় নেমেছে তাও এই সব গ্রুপে বিক্রেতাদের বিজ্ঞাপন থেকে বোঝা যায়) বইয়ের সঙ্গে সাম্প্রতিক জনপ্রিয় বইও বেশ ছাড়ে বাড়িতে বসে পাওয়ার সুবিধা তৈরি হওয়ায় পাঠকদের উৎসাহ বেড়েছে।

তবে এই সব মিলিয়েও বই-পাঠকের সংখ্যা যে এখানে সীমিত তাতে সন্দেহ নেই। অল্প ছাপা, নির্দিষ্ট পাঠককুলের মধ্যে বিক্রি, প্রকাশের কিছুকাল পরে 'আউট অভ প্রিন্ট' হয়ে যাওয়া, এবং অনেক ক্ষেত্রেই কয়েক বছর পর 'কালেক্টর্স আইটেম'-এ পরিণত হওয়া, এটাই মোটের উপর এখন ভালো মানের (সব অর্থে) বইয়ের পরিণতি। এতে কি বই-সংস্কৃতি টিকবে? পাঠকের রুচি দ্রুত বদলাচ্ছে, আগামী দিনে আরও দ্রুত বদলাবে। এখন যাঁরা ভালো বইয়ের পাঠক, তাঁদের অনেকেই ষাট-সত্তর-আশির দশকের প্রকাশনার সঙ্গে পরিচিত। অর্থাৎ বাংলা বইয়ের সেরা সময়ের বইপত্র তাঁরা নাড়াচাড়া করার সুযোগ পেয়েছেন। পরের প্রজন্ম থেকে সেই সুযোগ ক্রমশ কমেছে। বর্তমান পাঠক-প্রজন্ম, আগেই বলেছি, মোবাইল নির্ভর। মোবাইলে ছাপা হরফের চেহারাটাই শুধু দেখা যায়, আপাদমস্তক বই দেখার কোনও সুযোগ সেখানে নেই। বইয়ের ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদ, কাগজ, পাতায় স্পেস-এর ব্যবহার, ছবি এসব তো হাতে না স্পর্শ করলে, বইয়ের ত্রিমাত্রিক অবয়ব চোখে না দেখলে বোঝা সম্ভব নয়। বিশেষ করে প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ পিডিএফ-এ সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। বইয়ের প্রচ্ছদ তো আসলে শিল্পকর্ম, কম্পিউটারের আগের যুগে কীভাবে এক-একটি অসামান্য প্রচ্ছদ রচিত হয়েছে সে গল্প আজ রূপকথার মতো ঠেকবে। আশার কথা, প্রচ্ছদ-শিল্পীদের নিয়ে খুব সামান্য হলেও কিছু উদ্যোগ শুরু হয়েছে, কয়েকটি বইতে সংকলিত হয়েছে কিছু কাজের নিদর্শন। আজকের প্রজন্মকে সেই সব কাজ দেখানো খুব জরুরি, তা না হলে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক তাদের কাছে অজানাই থেকে যাবে।

প্রচ্ছদের মতো বাঁধাইও আর এক শিল্পকর্ম। অধ্যাপক পি লাল তাঁর রাইটার্স ওয়ার্কশপের বই যেমন শাড়ির পাড় ব্যবহার করে তুলামিয়াঁ মহিউদ্দিনকে দিয়ে বাঁধিয়ে নিতেন, তত বিশিষ্ট না হলেও বিশ শতকের বিশ-তিরিশের দশকে নরম ফুলো ফুলো বাঁধাই করা উপহারের বই, উপরে রঙিন ছবি সাঁটা, আজও

হাতে নিলে আশ্চর্য লাগে। বিশ শতকের শেষ দিকে নারায়ণ চক্রবর্তী বাঁধাই নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, তাঁর কাজ বিশেষ স্বীকৃতিও পেয়েছে। এমন কত নাম-না-জানা দপ্তরি চমৎকার কাজ করে গেছেন, তাঁদের নাম কেউ মনে রাখেনি। পুরোনো বইতে 'জেল্‌দ্‌গর' অর্থাৎ বাঁধাইকরের নাম ছাপা হত, সে রীতি বহুকালই পরিত্যক্ত।

ডেস্কটপ পাবলিশিং আসার আগে মুদ্রাকরদের ভূমিকাও বড়ো কম ছিল না। হরফ সাজানো থেকে গ্যালি প্রুফ তোলা, পাতা সেট করা থেকে চূড়ান্ত মুদ্রণ যে কতখানি কর্মযজ্ঞ ছিল তা আজ কল্পনা করাও কঠিন। মুদ্রণকর্মীদের পাতা সাজানোর দক্ষতা এতটাই ছিল যে পাতার এপিঠে ওপিঠে উপরের আর নীচের লাইন ঠিক এক জায়গায় থাকত, একটুও এধার-ওধার হত না। সিসের হরফ যখন কাগজের উপর চাপ দিয়ে অক্ষর ফুটিয়ে তুলত, তার সঙ্গে জড়িয়ে যেত অনেক মানুষের শ্রম আর দক্ষতা। আবার চার রঙের ছবি ছাপতে চার বার একই জায়গায় ইমপ্রেশন দিতে হত, একচুল নড়ে গেলে ছবি নষ্ট হয়ে যাবে। পুরোটাই হাতের উপর নির্ভর। সংস্কৃতির এই দিকটা হয়তো আজকের বইতে পাওয়া যাবে না, কিন্তু আজও মেশিন সবটা করতে পারে না। কোনও দিনই হয়তো পারবে না।

কিছু মানুষ ছিলেন যাঁরা সারা জীবন এই সংস্কৃতির সন্ধান করে গেছেন। কল্যাণী দত্তের লেখায় তাঁদের কথা আছে, তিনি নিজেও ছিলেন সেই ধারার অনুবর্তী। সমঝদার বিক্রেতারা এঁদের মন বুঝতেন, হাতে জুগিয়ে দিতেন কাঙ্ক্ষিত ধন। কেউ কেউ নির্দিষ্ট বিষয়ের বই সংগ্রহ করলেও অনেকেই ছিলেন সর্বভুক পাঠক। গত প্রায় চার দশকে কলেজ স্ট্রিটে, ওয়েলিংটনের মোড়ে, হাতিবাগানে, গড়িয়াহাটে, কিংবা ইন্দ্রনাথ মজুমদারের 'সুবর্ণরেখা' কি গ্যালিফ স্ট্রিটের কোনায় রঞ্জন গুপ্তের লালবাড়িতে, আর এন ভট্টাচার্য কি আদিত্য ব্যানার্জির কাছে এমন সব পাঠকের বই বিক্রি হয়ে যেতে কম দেখিনি। সম্প্রতি দেখা গেল পার্থসারথি চৌধুরীর বিপুল এবং বিচিত্র সংগ্রহ টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে যেতে। পার্থবাবু শুধু যে আজীবন হাজার হাজার বহু বিষয়ের বই সংগ্রহ করেছিলেন তাই নয়, বই-সংস্কৃতিকে তিনি যেভাবে লালন-পালন করতেন, তার আর কোনও দৃষ্টান্ত আমি অন্তত দেখিনি। বই হাতে পেলে তিনি প্রথমেই (হার্ডবাউন্ড হলে) মলাটটা খুলে নিতেন। তারপর একটা বিশেষ ধরনের শক্ত কালো কাগজ দিয়ে (এতে নাকি পোকার আক্রমণ ঠেকানো যেত) নিজের হাতে

বইটা বাঁধাতেন। জ্যাকেট কভার থাকলে তা মাপমতো কেটে পুস্তানিতে সেঁটে রাখতেন, ব্লার্বও বাদ যেত না। এমনি কভার হলে তাও সুনিপুণ দক্ষতায় বোর্ড থেকে ছাড়িয়ে সেঁটে দিতেন। পুটে নিজের হাতে, সুন্দর হস্তাক্ষরে বইয়ের নাম লিখে রাখতেন। সংগ্রহের হাজার হাজার বইয়ের প্রত্যেকটা এই ভাবে তৈরি করেছেন। বইয়ের রিভিউ পাওয়া গেলে, বা অন্য কোনও তথ্য, তাও সাঁটা থাকত মলাটের ভিতরে। অত্যন্ত ব্যস্ত উচ্চপদস্থ সরকারি আমলা এত সময় দিয়েছেন বইয়ের পিছনে, নতুন জীবন দিয়েছেন প্রতিটি বইকে, এ এক আশ্চর্য ঘটনা। তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের পক্ষে এই অমূল্য সংগ্রহ একটাই রক্ষা করা সম্ভব হল না, এটা খুবই দুঃখের। তবে এই সংগ্রহের গুরুত্ব বোঝার মতো মানুষ যে আজকের পাঠকদের মধ্যে অনেকেই আছেন, সেটাও যথেষ্ট আশার কথা। বিভিন্ন পুরোনো বইবিক্রেতার কাছ থেকে যাঁরা পার্থবাবুর বই কিনেছেন, তাঁরা ফেসবুকে একটি গ্রুপ তৈরি করেছেন যেখানে মাঝেমাঝেই এই সংগ্রহের নানা মণিমাণিক্য নিয়ে আলোচনা হয়। পার্থবাবুর মতো সর্বভুক পাঠক আগামী দিনে আর আসবেন কি না জানি না। তবে ভরসা হয়, যাঁরা এমন সংগ্রহের স্বাদগন্ধ উপলব্ধি করেছেন, তাঁরা বার বার ফিরে যাবেন মুদ্রিত বইয়ের কাছেই। আর তাঁরাই উৎসাহিত করতে পারবেন নতুন প্রজন্মকে, ছাপা বই আর তার সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখার জন্য।

মন-মননের অ-মৌলায়ন ও প্রাকৃতায়ন

অনুপ ধর

জুন-এর চার তারিখ। ভোটের ফলাফল এল। দেখা গেল প্রায় সবাই ভুল করেছেন তাঁদের এক্সিট পোল-এর হিসেব-নিকেশ-এ। শুধুমাত্র দুটো মানুষ (আমার সীমিত জানার মধ্যে অবশ্য)— যোগেন্দ্র যাদব এবং পরাকালা প্রভাকর প্রেডিকশনটা প্রায় ঠিক করেছিলেন। ঠিক করেছিলেন হয়তো এইজন্য যে দুজনেই 'শুধু সার্ভে' করেননি। দুজনেই মানুষের সঙ্গে মিশেছিলেন। দুজনেই মানুষের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। সম্পর্কও স্থাপন করেছিলেন। দুজনেই মানুষের 'মন'-টাকে বুঝতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় 'মনন'-টাকে ধরতে চেয়েছিলেন। দেখতে চেয়েছিলেন অন্তঃসলিলা স্রোতটা কোথায়। বুঝতে চেয়েছিলেন হিমশৈলের নিমজ্জিত অংশটা ... অর্থাৎ, জলের নীচের লুকোনো অংশটা কীভাবে ডুবিয়ে দিতে পারে আত্মম্ভরিতার টাইটানিক। অবচেতন বা নির্জ্ঞান 'অন্দরমহল'-টাই বা কোথায়। কীই বা তার আকার, আকৃতি, প্রকৃতি। মন-মননের অন্তরের-অন্দরের পরিসর তো আবার আবেগ-অনুভূতিরও পরিসর। শুধুমাত্র যুক্তির পরিসর নয় তা। হয়তো ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যেও তা সক্রিয় থাকে। সক্রিয় থাকে নানান ধরনের অযৌক্তিকতায়। অযৌক্তিক ভালো লাগা। অযৌক্তিক অপছন্দ। অযৌক্তিক আকর্ষণ। অযৌক্তিক বিকর্ষণ। ভারতীয় জন-মানসটা, ভারতীয় জনসমাজের মানস-ভূমিটা বুঝতে না পারলে, তাকে ধরতে না পারলে ভোটের ফলাফলের কাছাকাছি পৌঁছানো সম্ভব হয় না। সম্ভব না ভারতীয় সাংস্কৃতিক অবচেতন-এর ('কালচারাল আনকনশাস'), বা নির্জ্ঞান অন্দরমহলের আদিরূপ ('কালচারাল আর্কেটাইপ') তথা আদি-নকশাটাকে বোঝা। আর সেটা না বুঝলে,

সেটার কাছাকাছি পৌঁছাতে না পারলে ভোটের ফলাফলের প্রেডিকশনটা এলোমেলো হয়ে পড়ে। অধরাই থেকে যায় মানুষের আকাঙ্ক্ষার অন্তঃসলিলা স্রোতটা।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৯১১-১৯৬৪) বাংলার তথা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক অবচেতনের, বা নির্জ্ঞান অন্দরমহলের আদিরূপ তথা আদি-নকশাটাকে ধরতে চেষ্টা করছেন। ধারণায় আনতে চাইছেন মন-মননের অন্তঃসলিলা স্রোতটা। করতে গিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন 'রাধা-তত্ত্বে'। দেখতে পাচ্ছেন 'বিধিবদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে রাধা-তত্ত্ব তন্ত্রাদির শক্তি-তত্ত্ব এবং সাংখ্যের প্রকৃতি-তত্ত্ব যতই পৃথক হোক না কেন' ... সহজিয়া চর্যা-দর্শনে রাধা-তত্ত্ব, শক্তি-তত্ত্ব, প্রকৃতি-তত্ত্ব এক পরম পারস্পরিকতায় সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। এই সহজিয়া রাধা-তত্ত্ব (বা রাধা-অবলম্বী চর্যা-দর্শন) বাংলার সাংস্কৃতিক অবচেতন, বা নির্জ্ঞান অন্দরমহলের আদিরূপ তথা আদি-নকশাটার নির্মাণ-আধার।

এই লেখায় আমরা শশিভূষণ দাশগুপ্ত-র *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ : দর্শনে ও সাহিত্যে* বইটা পড়ব। ১৯৫২-৫৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে যে বইটা। কিছুটা হলেও পড়ব। অত্যন্ত জটিল এবং গভীর একটা কাজ এই বইটা। প্রায় কার্ল ইয়ুং-এর সাংস্কৃতিক অবচেতন বা নির্জ্ঞান আদিরূপ-এর ধারণার পাশাপাশি রাখব এই বইকে। আগে পিছে নয়, পাশাপাশি। লেখক এই বইতে দেখাচ্ছেন— প্রত্যেক জাতির দেহের কাঠামোর যেমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তেমনই প্রত্যেক জাতির মননের কাঠামোর, মনের কাঠামোরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য সেই জাতির, সেই সাংস্কৃতিক পরিসরের ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, এমনকি অন্য সৃষ্টিকর্মেও একটা ছাপ থাকে। থাকে একটা ছাঁচ। একটা অভিনবত্ব। যা একান্তভাবেই তার নিজস্ব। 'বৈষ্ণবধর্মের লীলাবাদ— বিশেষ করে রাধাবাদ—আমাদের জাতীয় মনন-বৈশিষ্ট্যেরই দ্যোতক'।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত বাংলার তথা বাংলা দেশের কথা বলছেন না। উনি ভারতবর্ষের কথা বলছেন। বলছেন রাধাবাদের ভিতরে অন্তর্নিহিত জাতীয় মনন-বৈশিষ্ট্যের কথা। এমন এক রাধাবাদ যা শুধু 'কমলিনী' নয়; যা শক্তিবাদের এবং প্রকৃতিবাদের সঙ্গে অবিরাম কথোপকথনে সমৃদ্ধ। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক থেকে যে বৈষ্ণব সাহিত্য বাংলা দেশে রচিত হয়েছে— যার পুরোধা জয়দেব (*গীত-গোবিন্দ*), শ্রীধরদাস (*সদুক্তিকর্ণামৃতে*) এবং চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি— তার বৈশিষ্ট্য এই রাধাবাদে। যেখানে প্রেমলীলাই মুখ্য। এবং এই প্রেমলীলার 'বিষয়'

কৃষ্ণ। 'আশ্রয়' রাধা। ভারতীয় মনের মননের 'চেতন- সলিলের অন্তঃস্থলে গভীর চিত্তভূমির ভিতরে যে পরমশ্রেয়বোধ, যে পরমপ্রেম, সৌন্দর্য এবং মাধুর্য-বোধের বীজ' লুকিয়ে ছিল, বহুকালের ধীর-সুকুমার পরিণতির এবং রূপান্তরের মধ্য দিয়ে তা রাধাবাদ বা রাধাতত্ত্বের আকার নিয়েছে, সহজিয়া চর্যায়। আকার নিয়েছে দর্শনে, সাহিত্যে। সর্বোপরি নিম্নবর্গের জীবনচর্যায়।

ভারতীয় পরম্পরা বা ধর্মের *অ-মৌলায়ন* (অ-মৌলায়ন প্রক্রিয়া 'মূল', 'মৌল' বা আধিপত্যকারী ধারণাগুলোকে প্রতিসরিত করে; প্রতিসরিত করে 'মৌল'-বাদী ধারণাগুলোকে) ব্যতীত এই রাধাতত্ত্বে বা রাধা-জীবন-চর্যায় পৌঁছানো শক্ত। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের বৈষ্ণব ধর্ম থেকে যদি আমরা সরে না আসতে পারি, যদি সরে না আসতে পারি

বিষ্ণু = রাম

রাম = কৃষ্ণ

কৃষ্ণ = চৈতন্য

এই আধিপত্যকারী সমীকরণটা থেকে, যদি চৈতন্যকে রাধা-র প্রতিরূপ (কৃষ্ণের নয়, রাধা-র) হিসেবে না দেখতে পারি ('বনমালী তুমি পর-জনমে হইয়ো রাধা') তাহলে রাধাতত্ত্বে পৌঁছানো শক্ত। শশিভূষণ দাশগুপ্ত শুধু ভারতীয় পরম্পরা নয়, শুধু হিন্দু-ধর্ম নয়; উনি সুফিধর্মকেও নতুন করে দেখেছেন। 'শুধু বাংলার নয়, ভারতবর্ষেরই যে সুফিধর্ম' তা একটা 'মিশ্রধর্ম'। তা পারস্যের প্রেমধর্ম এবং ভারতবর্ষের প্রেমধর্মের এক অপূর্ব মিশ্রণ। নিম্নবর্গের সহজিয়ার সমন্বয়ে সুফি প্রেমধর্মের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ-লীলা, রাধার পূর্বরাগ অনুরাগ বিরহের আর্তি মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। মিলেমিশে গেছে নিখিলের বা পরমের আর্তির সঙ্গে সাধারণের চিত্তের আর্তি।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত একইসঙ্গে ধর্মের পশ্চিমী ধারণার *প্রাকৃতায়ন* (প্রাকৃতায়ন করলেন 'সংস্কৃত' ধারণাগুলোর)। ধর্ম মানেই বিমূর্ত পুরুষ-দেবতা, ধর্ম মানেই একেশ্বরবাদ, ধর্ম মানেই এক অতীন্দ্রিয় একমেবদ্বিতীয়ম্ পরমপুরুষ, ধর্ম মানেই রোজ সকালে 'ইন দ্য নেম অভ ইয়োর ফাদার, হলি বিই ইয়োর নেম'— শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই পশ্চিমী ধারণাটাকে ভাঙলেন। যেন ধর্মের 'সংস্কৃত' ধারণার প্রাকৃতায়ন।

আবার বৃন্দাবন বৈষ্ণববাদ থেকে সরে এসে শশিভূষণ দাশগুপ্ত ধর্মের ভারতীয় ধারণার, আধিপত্যকারী ধারণার অ-মৌলায়ন করলেন। সরে এলেন

আবারও 'বিষ্ণু = রাম = কৃষ্ণ = চৈতন্য' এই সমীকরণটা থেকে। সরে এলেন রাম-রূপী পুরুষ-দেবতা থেকে। সরে এলেন উচ্চকোটির মানুষের পুরুষ-পৌরুষের একেশ্বরবাদ থেকে নিম্নবর্গীয় মাতৃ-রূপিণী নারী-রূপিণী বহু-ঈশ্বরবাদে— এমন এক ঈশ্বর যা এই পৃথিবীরই অঙ্গ-অংশ। যিনি এই পৃথিবীর সাধারণ মানুষের মধ্যেই থাকেন। যার মধ্যে মানুষের দুর্বলতা। মানুষের ভালোবাসা। মানুষী ভালোবাসা—রাধা-রূপী। চৈতন্যের জীবন এই 'অ-প্রাকৃত রাধা- প্রেমেরই ভাবব্যাখ্যা'। অপ্রাকৃত রাধাপ্রেম একটা তত্ত্বভাবনা। এই তত্ত্বভাবনা বিষয়ীকৃত হয়েছিল 'মহাপ্রভুর জীবনে'। চৈতন্যের প্রেম, রাধা-প্রেমের রহস্যের ভেতরে প্রবেশ করার চাবিকাঠি।

যদি গৌরাঙ্গ না হত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা
জগতে জানত কে।

সহজিয়া চর্যা-দর্শন রাধাতত্ত্ব তথা রাধা-প্রেমকে একটা বিশেষ রূপ দিয়েছিল। শশিভূষণ দাশগুপ্ত দেখাচ্ছেন যে সহজিয়া মতের মূল বা মৌল-রূপ কোনও বৈষ্ণব দার্শনিক সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এই চর্যা-দর্শনের প্রতিষ্ঠা 'গুহ্য'-ধারার কিছু সাধন-পদ্ধতির উপর। গুহ্য সাধনার এই ধারাগুলো অত্যন্ত প্রাচীন। কোথাও তা তান্ত্রিক সাধনা রূপে প্রকাশিত। কোথাও তা এসেছে বৌদ্ধ-সহজিয়া পথের অন্দরের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে। আবার কোথাও তা মিলেছে বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে। মিলে জন্ম দিয়েছে বৈষ্ণব-সহজিয়া পথের। পুরুষ নারীর মিলিত ধর্মসাধনার ধারা, পুরুষ নারীর মিলনের মধ্য দিয়ে ধর্মসাধনার ধারা ভারতবর্ষে আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। বামাচারী তান্ত্রিক সাধনা, বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনা, বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনা এ ধারারই নানান উপধারা। বাইরে থেকে দেখলে এরা ভিন্ন। কিন্তু এদের (গুহ্য) সাধনার চর্যা মন দিয়ে দেখলে একটা 'গভীর ঐক্যও অনুভূত' হবে। এদের প্রত্যেকেরই মধ্যে সক্রিয় এক 'অন্বয় পরমানন্দ স্বরূপ' বা এক 'অন্বয় আনন্দ-তত্ত্ব'। এই অন্বয় আনন্দ-তত্ত্বে দুটো আপাত বিপরীত ধারা মিলিত হয়। এই মিলনে দুটো ধারার নিজস্বতা বা স্বকীয়তা অস্বীকৃতি নয়। বরং পূর্ণতা-প্রাপ্তি। পূর্ণতা প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে আবারও এক অখণ্ডতার আশ্বাস। কিন্তু অখণ্ডতায় খণ্ডের বিলীন নয়। এটাই মিথুনতত্ত্ব বা যুগলতত্ত্ব। বৌদ্ধমতে যুগনদ্ধতত্ত্ব। তান্ত্রিক সাধনায় 'শিব' ও 'শক্তি'-র এই অখণ্ড

যুগলতত্ত্বই, পুরুষ-নারীর মিলিত সাধনার কেবলানন্দতত্ত্ব। সাধক বিষয়ী নিজের শরীরের ভিতরেই 'শিব-শক্তি-তত্ত্বকে পূর্ণ-জাগ্রত ও পূর্ণ-পরিণত' করে নিজের শরীরের ভেতরেই মিলনজনিত অখণ্ডতার কেবলানন্দ-সুখ খুঁজে পেতে পারেন। তান্ত্রিক পরিসরে যা কেবলানন্দ বা সামরস্য-সুখ, বৌদ্ধ পরিসরে তাই 'মহাসুখ'। বৈষ্ণব ভাষায় তাই 'মহাভাব-স্বরূপ'। সহজিয়া চর্যা-দর্শনে এই পুরোনো যোগ-সাধনার অবলম্বনেই গড়ে উঠল রাধাকৃষ্ণের 'প্রেম-সাধনা'। রাধাকৃষ্ণের নিত্যবিহার। নিত্যবিহারের ভিতর দিয়ে নিত্য প্রবাহিত 'সহজ' রসের ধারা। 'গুপ্তচন্দ্রপুরে'। এরই ভেতর লুকিয়ে আছে 'অর্ধনারীশ্বরতত্ত্ব'। শরীরের দক্ষিণ অঙ্গ শিব বা ঈশ্বর। বাম অঙ্গ নারী বা শক্তি। সহজিয়া পরিসরে 'দক্ষিণ নেত্রে কৃষ্ণ এবং বাম নেত্রে রাধিকার অবস্থান'। এই দক্ষিণ নেত্রই সাধকের শ্যামকুণ্ড। এবং বাম কেন্দ্র রাধাকুণ্ড। চণ্ডীদাস-এর একটা গানের কয়েকটা লাইন:

প্রেম সরোবরে দুইটি ধারা।
আস্বাদন করে রসিক যারা।
দুই ধারা যখন একত্রে থাকে।
তখন রসিক যুগল দেখে।

পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন-এর গানের কয়েকটা লাইন:

তুমি অন্নপূর্ণা মা,
তুমি শ্মশানে শ্যামা,
কৈলাসেতে উমা তুমি বৈকুণ্ঠে রমা। ...
তুমি পুরুষ কি নারী
তাত বুঝিতে নারি।
স্বয়ং না বুঝালে সে কি বুঝিতে পারি।
তাইত আধা রাধা আধা কৃষ্ণ
সাজিলে বৃন্দাবনে।

পুরুষ-প্রকৃতির বা রাধাকৃষ্ণের বা শিবশক্তির এই দুই ধারাকে সহজিয়ারা 'রস' ও 'রতি' বলেন। বিমূর্ত অর্থে। এই রস ও রতি প্রবাহিত হয় প্রাকৃতজনের মধ্য দিয়ে। মানুষের মধ্য দিয়ে: 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। সহজিয়া চর্যা-দর্শনে মানুষ ও ঈশ্বরের, পুরুষ ও নারীর, জীবলোক ও পরলোকের, এমনকি হিন্দু মুসলিমের নিশ্ছিদ্র বিভাজনের অ-মৌলায়ন।

অ-মৌলায়ন মূল বা অরিজিন-এর সঙ্গে একটা বিশেষ সম্পর্ককে সূচিত করে।[১] যার ফলে আকার পায় একটা অ-মৌল গল্প। বিনির্মাণের মতোই, অ-মৌলায়ন প্রক্রিয়া অভিজ্ঞতা, ধারণা ও তত্ত্বের অন্দরে, তার আদিতে, তার বুননের মধ্যে ফেসে যাওয়া অংশের, তার ইট গাঁথার মধ্যেকার ফাঁক-ফাঁকি, এমনকি তার নিটোল দেওয়ালেও সূক্ষ্ম সব ফাটলের সন্ধান পায়। পশ্চিম এবং পুব, উত্তর-দক্ষিণ— উভয় পরিসরেই পায়; বা পাওয়া যেতে পারে। মার্কস, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ— তিনজনই নিজ নিজ পরিসরে অ-মৌলায়ন প্রক্রিয়ার পথ খুলেছেন। এই বই-এ শশিভূষণ দাশগুপ্তও ধর্মের তথা মন-মননের অ-মৌলায়ন-এর অর্গল খুলেছেন।

অন্যদিকে, প্রাকৃতায়ন এক প্রাকৃত গল্পের খোঁজ। হয়তো-বা ঔপনিবেশিক নৃতত্ত্ববিদ্যায় যাঁকে 'অ্যাবরিজিনল' বলে অভিহিত করা হয়েছিল, অভিহিত করা হয়েছিল আধুনিকতার অতীত হিসেবে তাঁর চর্যা-দর্শনে ফিরে গিয়ে। ইতিহাস এবং নেশন-স্টেট-এর সেই বিস্মৃত সত্তার— সেই আদিবাসী সত্তার, সেই আদি-বাসী, আদি-নিবাসী সত্তার জীবনচর্যায় ও জীবনদর্শনে, তাঁর ধারণা-পরিসরে ফিরে গিয়ে। পশ্চিমি অরিজিনাল বা মূল-কে প্রতিহত করা, ব্যাহত করা, পার্থক্য-প্রণয়নে দুর্বল করে তোলাটা প্রাকৃতায়নের একমাত্র লক্ষ্য নয়। সে পৃথক। সাংস্কৃতিকভাবে, ধারণাগতভাবে সে পৃথক। সে একটা পৃথক গল্প বলতে চায়।

প্রাকৃত এই গল্পে বা গল্পের এই প্রাকৃততায় পৌঁছোনো শক্ত। শক্ত, কারণ আমরা এই গল্প বা গল্পের এই প্রাকৃত সম্ভাবনা থেকে আজ শত যোজন দূরে চলে গেছি। পশ্চিমি শিক্ষা, সংস্কৃত শিক্ষা আমাদের কতকগুলো চিন্তাকাঠামোতে অভ্যস্ত হতে শিখিয়েছে। শিখিয়েছে সংস্কৃত সংস্কৃতি। শিখিয়েছে অমুক অমুকগুলো সমস্যা। এবং অমুক অমুকগুলো সমস্যার সমাধান। আমরা তাই ওই খেলাগুলোই খেলে চলি। ওরা আমাদের একটা গল্প বলেছিল। একটাই গল্প বলেছিল। আর সেই গল্পটাই আমাদের নিজের গল্প, নিজের সংজ্ঞা হয়ে গিয়েছিল। ওরা বলেছিল পৃথিবীর মানচিত্রের উত্তর-পশ্চিমটা উন্নত। আর বাদবাকিটা অনুন্নত; বাদবাকিটা তৃতীয় বিশ্ব। বলেছিল বাদবাকিদের উত্তর-পশ্চিমের মতো হতে হবে। হ্যামবার্গার খেতে হবে। কারণ তৃতীয় বিশ্ব অনুন্নত (আন্ডার-ডেভেলপড)! আর আমরাও ওদের কথা বিশ্বাস করেছিলাম। মনে করেছিলাম 'আমরা তো এরকমই'। চোখের সামনে আমরা যা কিছু দেখছিলাম তা ওদের বীক্ষা দিয়ে ব্যাখ্যা করেছিলাম। ভেবেছিলাম ব্যাখ্যাটা

বেশ তো! ওদের 'সমস্যা' আর ওদের 'সমাধান'— দুটোকেই আমরা আপন করে নিয়েছিলাম ধীরে ধীরে। পরধন পরজ্ঞান লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ আমেরিকার আকাদেমিক অলিন্দে। কবে ডাক পাব? আত্মভোলা হওয়ার, আত্ম-কে ভোলার, নিজেকে হারানোর এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর কীই বা হতে পারে? এই আত্ম-বিস্মৃতি, প্রাকৃতজনের তথা প্রাকৃতদর্শনের এই বিস্মৃতি সইদীয় প্রাচ্যবাদের প্রক্রিয়াটাকে আরও গভীর করে, আরও শিকড় দেয় তাকে।[২] সাদা-দের প্রাচ্যবাদ আর খয়েরি-বাদামি-কালো মানুষের প্রাচ্যবাদ কোথায় যেন মিলতে-মিশতে শুরু করে নিজেদের অজানতেই।

ওরা বলেছিল *ভগবৎ গীতা* তোমাদের ধর্মগ্রন্থ। আমরাও মেনে নিয়েছিলাম। আমরাও *গীতা* হাতে নিয়ে শপথ নিতে শিখে গিয়েছিলাম। ওরা বলেছিল তোমাদেরও একেশ্বরবাদী হতে হবে। তোমাদেরও 'একটা' পুরুষ-দেবতা হবে। তোমরাও একটা জেরুসালেম বানাবে। আমরাও ওদের কথামতো 'একটা' ভগবান— একটা ভগবান 'রাম'-এর পুজোয় নামলাম। আমরাও 'একটা' জেরুসালেম নির্মাণ করতে লাগলাম। অযোধ্যা হয়ে উঠল আমাদের জেরুসালেম। যদিও এমনকি স্বয়ং অযোধ্যার আদি বাসিন্দারাও এখনও বহু-ঈশ্বরবাদে বিশ্বাস রাখেন। সেই বহু ঈশ্বরের অধিকাংশই মাতৃ-রূপিণী নারী-রূপিনী। রাধা-তত্ত্ব শক্তি-তত্ত্ব প্রকৃতি-তত্ত্বর অন্তঃসলিলা ভারতীয় স্রোত এখনও শুকিয়ে যায়নি। এখনও তা সক্রিয়। এই দেশে এখনও তা ভোটের ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে। হিন্দুত্বের সরকারি হাইওয়ে এখনও মুছে দিতে পারেনি বেনারসের অগণন অলিগলির অগণন ঈশ্বর। পাথরের ঈশ্বর। পাথর যেখানে ঈশ্বর। মাটির ঈশ্বর। মাটি স্বয়ং যেখানে ঈশ্বর। এক নয়। অনেক। এক ঈশ্বর নয়। বহু। যত মত তত পথ।

শশিভূষণ দাশগুপ্তর *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ: দর্শনে ও সাহিত্যে* এই 'অগণন'-এর পথে পথচলার সাথী। সাথী অ-মৌলায়নের প্রাকৃতায়নের। ধর্মের অ-মৌলায়ন প্রাকৃতায়ন। মন-মননের অ-মৌলায়ন প্রাকৃতায়ন। রাজনীতির অ-মৌলায়ন প্রাকৃতায়ন।

তথ্যসূত্র

[১] যে সম্পর্কে মূল বা অরিজিন ইজ পুট আনডার ইরেজার

[২] Said, E. 1985 [1978]. *Orientalism*. Harmondsworth: Penguin; Chaudhuri, A. 1994. "On Colonial Hegemony: Toward a Critique of Brown Orientalism". *Rethinking Marxism*. Vol 7 (4).

ভারতের পূর্বাঞ্চলে আদিবাসী আঞ্চলিক ইতিহাস

সংযুক্তা দাশগুপ্ত

এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী গোষ্ঠী দ্বারা রচিত বিভিন্ন আঞ্চলিক ইতিহাস যার মাধ্যমে তাঁরা জাতীয় ইতিহাসে নিজেদের বর্তমান প্রান্তিকতার কারণ বিশ্লেষণ এবং মূলধারার ইতিহাসের মধ্যে নিজেদের অতীত কাহিনির অন্তর্নিবেশ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। জঙ্গলবাসী জনজাতিদের আদিম ও অসভ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে প্রাচীন যুগ থেকে। বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থে এই সকল প্রত্যন্তনিবাসী গোষ্ঠীগুলিকে রাক্ষস এবং বর্বর আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[১] একই ভাবে মধ্যযুগে আঞ্চলিক রাজপরিবারগুলির বংশতালিকায় এদের হয় অসভ্য ও বন্য আখ্যা দেওয়া হয়, নয় এদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়।[২] এই ধরনের বিবরণ আরও জোরদার হয়ে ওঠে ঔপনিবেশিক শাসনকালে। এই সময় এক নতুন সামাজিক বিন্যাসের সর্বনিম্ন স্তরে আদিবাসী গোষ্ঠীগুলিকে 'ট্রাইব' রূপে স্থান দেওয়া হয়। ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র তথাকথিত অনুন্নত জনগোষ্ঠীগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদের সুসভ্য করে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করে। জনজাতিগুলির অনুন্নতির লক্ষণ হিসেবে তুলে ধরা হয় তাদের ইতিহাসবোধের অভাব। তথাকথিত এই অভাব পূরণ করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ প্রশাসকরা এদের ইতিহাস নির্মাণ করতে উদ্যত হন।[৩] এই যুক্তির দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শের ন্যায্যতা ও ইতিহাসের প্রদানকারী হিসাবে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার উপস্থিতির বৈধতা দান করে। এবং একই সাথে জনজাতিগুলির কণ্ঠস্বর এবং তাদের ঐতিহাসিক সত্তাকে নীরব করে দেয়।[৪]

নিজেদের কোনও লিখিত ইতিহাস না থাকায় এই সকল আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি কার্যত আঞ্চলিক ও সাম্রাজ্যিক ইতিহাসের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। কোন্ কাহিনি শোনা হবে বা কোন্ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হবে, এই সিদ্ধান্ত যেহেতু নির্ধারিত হয় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে, প্রান্তিক লোককথা তাই মূলধারায় স্থান পায় না অথবা বিকৃত হয়ে ওঠে। তবে বর্তমান কালে প্রান্তিক অঞ্চলগুলি নিজেদের অতীত ও বর্তমান অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করার জন্য সরব হয়ে উঠেছে। সংখ্যালঘুদের এই অতীতকাহিনি— যা দীপেশ চক্রবর্তী 'নিম্নবর্গীয় অতীত' বা 'subaltern pasts'[৫] বলে ব্যাখ্যা করেছেন— হয়ে উঠেছে জাতীয় মূলস্রোতে অন্তর্ভুক্তি এবং স্ব-প্রতিনিধিত্বের জন্য বর্তমানকালের সংগ্রামের এক আবশ্যিক অঙ্গ।[৬] এখনকার জটিল উন্নয়ন ও পরিচিতিভিত্তিক রাজনীতিতে প্রান্তিক সম্প্রদায়গুলো শুধুমাত্র তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থানের উন্নয়নের দাবি পেশ করছেন, তা নয়। বরং ইতিহাস ও সামাজিক কাঠামোর একটি বিকল্প ব্যাখ্যা প্রস্তাব করারও সুযোগ খুঁজে নিয়েছেন। এই ধরনের বিকল্প ব্যাখ্যার মূল উদ্দেশ্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ন্যায়বিচারের দাবি। নিম্নবর্গীয় গোষ্ঠীগুলির রচনাগুলি কেবলমাত্র প্রান্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূলস্রোত ইতিহাসের সরল পুনর্লিখন নয়। এগুলি হল এযাবৎকাল নীরব ও বহিষ্কৃত গোষ্ঠীগুলোর নতুনভাবে নিজেদের পরিচিতি গড়ে তোলার এক প্রয়াস। একদিকে এগুলি কেন্দ্র ও প্রান্তের ক্ষমতার সম্পর্ককে বিঘ্নিত করে নিম্নবর্গীয় অতীতকে জাতি-গঠন প্রক্রিয়ার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে। আবার, একই সাথে জাতীয় অতীতকাহিনিতে নিম্নবর্গের উপস্থিতি অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করে। অনিবার্যভাবে এর ফলস্বরূপ দেখা দেয় বহুবিধ বিতর্ক ও পরস্পরবিরোধী, প্রতিদ্বন্দ্বমূলক দাবিদাওয়ার উন্মেষ।

আদিবাসী সংজ্ঞার উদ্ভব

উনিশ এবং বিশ শতকে, বহির্বিশ্বের সাথে সংযোগ প্রসারণের ফলে, আদিবাসীদের জমি ক্রমশ বহিরাগতদের কাছে হস্তান্তরিত হয়। নিজ জমি থেকে উৎখাত হয়ে স্থানচ্যুত হওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে তাদের প্রতিরোধের রাজনৈতিক মতাদর্শ জাগ্রত হয়। আদিবাসী প্রতিরোধ শুধুমাত্র হিংসাত্মক বিদ্রোহ হিসেবে ঘটেনি, শান্তিপূর্ণ বিরোধিতার রূপেও প্রকাশিত হয়েছিল। এর একটি বৈশিষ্ট্য হল ভারতীয় ইতিহাসের মূলধারার মধ্যে আদিবাসীদের অবদান লিপিবদ্ধ করার

প্রচেষ্টা। বিশেষ করে বিশ শতক থেকে আদিবাসী বুদ্ধিজীবীরা বিভিন্নভাবে এই প্রয়াস করেন এবং এই আঞ্চলিক ইতিহাসে তাদের ক্রম স্থানচ্যুতির বিষয়টির উপর জোর দেন। এই সকল ইতিহাসে ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগের শাসনব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করে ভারতীয় ইতিহাসের প্রধান ঘটনাগুলির মধ্যে আদিবাসী নেতৃবৃন্দের ভূমিকা সংযোজন করা হয়। তাছাড়া বিকল্প নেতৃত্বের উদাহরণ হিসেবে আদিবাসী বিদ্রোহী নেতাদের জীবনীও উপস্থাপন করা হয়।

উনিশ শতকে বর্তমান ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আদিবাসী গণ-অভ্যুত্থান ঘটেছিল— যথা ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল হুল, ১৮৫৮-৯০ সালের খেরওয়ার বিদ্রোহ এবং সরদারি লড়াই, কিংবা ১৮৯৯ সালের বিরসা মুন্ডার উলগুলন। কিন্তু বিশ শতকের প্রথম দিকে সভা-সমিতির মাধ্যমে আধুনিক রাজনীতির আবির্ভাব লক্ষ করা যায়। ছোটনাগপুর উন্নয়ন সমাজ, ছোটনাগপুর ক্যাথলিক সভা, ছোটনাগপুর কিষাণ সভা, মুন্ডা সভা এবং অন্যান্য সমিতি সংগঠিত হয়, যা অবশেষে ১৯৩০ সালে একত্রিত হয়ে আদিবাসী মহাসভা নামক সংস্থায় পরিণত হয়। এই সময় থেকে আদিবাসী, অর্থাৎ মূল বাসিন্দা, শব্দটির উল্লেখ আমরা দেখতে পাই। উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে ভারতের নিম্নবর্ণ এবং তথাকথিত অস্পৃশ্য গোষ্ঠীগুলি সমষ্টিগতভাবে নানাবিধ অধিকার আন্দোলন সংগঠন করে, যথা আদি-দ্রাবিড়, আদি-অন্ধ্র, আদি-কর্নাটক প্রভৃতি। নিম্নবর্গীয় জনসমষ্টিগুলির নতুন পরিচিতি সৃষ্টি করে বহু শতাব্দীব্যাপী সামাজিক অবমাননার প্রতিকার করতে এই গণ আন্দোলনগুলি সচেষ্ট হয়েছিল। একইভাবে আদিবাসীরা দাবি করে যে তারাই ভারত উপমহাদেশের 'আদি বাসিন্দা', যারা প্রাচীন কাল থেকে আর্য সভ্যতার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নিজ জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছিল।[৭]

জয়পাল সিং ও আদিবাসী ইতিহাস নির্মাণ

আদিবাসী শব্দটির প্রবর্তনের প্রধান উদ্দেশ্য এই অঞ্চলের জনজাতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলে এক নতুন সমষ্টিগত পরিচিতি নির্মাণ। ১৯৩৯ সালে আদিবাসী মহাসভার সভাপতি ও পরবর্তীকালে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের নেতা জয়পাল সিং লিখেছেন যে, সংস্থাটির সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এই যে এর মাধ্যমে

তাঁরা 'আদিম', 'জংলী', 'অনগ্রসর', 'অনার্য', 'কোল' ইত্যাদি অবমাননাকর উপাধির পরিবর্তে 'আদিবাসী' শব্দের সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা স্থির করতে পেরেছিলেন।[৮] জয়পাল সিং-এর চিন্তাধারা আদিবাসীদের পরিচিতিবোধ এবং ইতিহাস সম্পর্কে সমসাময়িক দৃষ্টিভঙ্গিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। ১৯৮০-এর দশকে Constituent Assembly-তে পৃথক আদিবাসী রাষ্ট্রের দাবি প্রেরণ করার সময় জয়পাল সিংয়ের আদিবাসী অতীত সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা পেশ করেছিলেন যা খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং নানাবিধ স্থানীয় ইতিহাস পুস্তিকা, সংবাদপত্র এবং রাজনৈতিক প্রতিলিপির মাধ্যমে ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে তাদের বার্তা ছড়িয়ে পড়েছিল।

সর্বোপরি এই সকল ইতিহাস রচনা করে ভারতীয় সামাজিক কাঠামোর মধ্যে আদিবাসীদের অবস্থার পুনর্বিন্যাসের চেষ্টা করা হয়। আদিবাসীদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করলেও, জয়পাল সিং নিম্নবর্ণের মানুষের সঙ্গে আদিবাসীদের আত্মীয়তার দাবিও করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে, ২৮ ফেব্রুয়ারি রাঁচি শহরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় আদিবাসী মহাসভায় 'জয় ঝাড়খণ্ড! জয় আদিবাসী! জয় হিন্দ!' নামক ভাষণে, জয়পাল সিং ঘোষণা করেছিলেন যে Depressed Class-এর ব্যক্তিরা আদপে আদিবাসী, যাদেরকে কালক্রমে নানান ভাবে হিন্দু ধর্মের ফাঁদে বেঁধে ফেলা হয়েছিল। তিনি বলেন যে আদিবাসীরা প্রকৃতপক্ষে দুটি ধরনের—যারা ধর্মান্তরিত হয়নি, অর্থাৎ এখনও যারা পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য ও ধর্মে বিশ্বাস করে, এবং অন্যরা, যারা খ্রিস্টধর্ম, বা ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিল কিম্বা হিন্দুধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।[৯] তিনি আরও বলেন যে ধর্মের ভিত্তিতে আদমশুমারির ফলে আদিবাসী সমাজকে বিভক্ত করে এক প্রান্তিক সমাজে পরিণত করা হয়েছিল, যার ফলে তাদের দাবিগুলি সরকারের পক্ষে অগ্রাহ্য করা সহজ হয়ে উঠেছিল। বিহার কংগ্রেস হরিজন এবং আদিবাসীদের জন্য একটি বিশেষ উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই পদক্ষেপের সমালোচনা করে জয়পাল সিং বলেছিলেন যে, তা কেবলমাত্র এক ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নয়, বরঞ্চ ছোটনাগপুরে আদিবাসীদের সংখ্যালঘু হিসাবে প্রমাণ করার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এক প্রচেষ্টা। একইভাবে, আদিবাসীদের উপর হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল তাদের সুপ্রাচীন সংস্কৃতি ধ্বংস করার একটি প্রচেষ্টা।[১০]

আদিবাসীদের স্থানচ্যুতির ইতিহাস

জয়পাল সিং-এর মতে, আদিবাসীদের প্রান্তিকীকরণ দীর্ঘকালব্যাপী এক প্রক্রিয়ার ফল, যা হরপ্পা সভ্যতার সময়কাল থেকে শুরু হয়েছিল। এই বক্তব্য তিনি বারংবার তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছেন। 'জঙ্গলি' হওয়ার জন্য গর্ববোধ প্রকাশ করে ১৯ ডিসেম্বর ১৯৪৬ সালে Constituent Assembly-তে ঘোষণা করেন:

> As a *jungli*, as an Adibasi, I am not expected to understand the legal intricacies of the Resolution. But my common sense tells me that every one of us should march in that road to freedom and fight together. Sir, if there is any group of Indian people that has been shabbily treated it is my people. They have been disgracefully treated, neglected for the last 6,000 years. The history of the Indus Valley civilization, a child of which I am, shows quite clearly that it is the newcomers most of you here are intruders as far as I am concerned—it is the newcomers who have driven away my people from the Indus Valley to the jungle fastness. The whole history of my people is one of continuous exploitation and dispossession by the non-aboriginals of India punctuated by rebellions and disorder, and yet I take Pandit Jawahar Lal Nehru at his word. I take you all at your word that now we are going to start a new chapter, a new chapter of independent India where there is equality of opportunity, where no one would be neglected.[১১]

অতএব আদিবাসীরাই প্রকৃত ভারতবাসী, যারা আর্যদের আগমনের পূর্বে ভারতের ভূমিতে বসবাস করত এবং যারা অগ্রসরমান 'আর্য বাহিনী'র দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। বীরের মতো লড়াই করা সত্ত্বেও তারা অবশেষে জঙ্গলের গভীরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। জঙ্গলগুলি বিচ্ছিন্ন এবং দুর্গম হওয়ার দরুণ আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি বহু শতাব্দী ধরে তাদের 'প্রাচীন বিশ্বাস এবং জীবনধারা'[১২] সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

স্বাধীন ভারতে গণতন্ত্র প্রবর্তন নিয়ে জয়পাল সিং Constituent Assembly-তে ঘোষণা করেন যে জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে আদিবাসীদের গণতন্ত্র শেখার কোনও প্রয়োজন নেই। জওহরলাল নেহরুকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, 'আপনি আদিবাসীদের গণতন্ত্র শেখাতে পারবেন না; তাদের

কাছ থেকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি শিখতে হবে। তারা পৃথিবীর সবচেয়ে গণতান্ত্রিক মানুষ'।[১৩] তাঁর মতে, আর্য আক্রমণকারীদের আবির্ভাব আদিবাসী গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছিল। 'প্রাচীন গণতন্ত্রের ব্যবস্থা' এককালে ছোটনাগপুরের সর্বত্র পাওয়া যেত, কিন্তু এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলি ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনকালে 'প্রাচীন স্বশাসন ব্যবস্থা' শুধুমাত্র কোলহান এবং সাঁওতাল পরগণায় অক্ষত ছিল।[১৪] এগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কারণ এগুলি থেকে অনাদিবাসীরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনেক কিছু শিখতে পারে। আদিবাসী জমির অধিকার রক্ষা করার দায়িত্ব অনাদিবাসীদের উপর বর্তায়, কারণ আদিবাসীরা 'ভূমির সন্তান', এবং এমন সকল পদক্ষেপ নেওয়া উচিত যাতে তাদের শিকড় অটুট থাকে।[১৫]

আদিবাসীরা যে হরপ্পা সভ্যতার সৃষ্টিকর্তা, এই বিশ্বাস পরবর্তী লেখকদের রচনায়ও পাওয়া যায়। এই বিষয় নিয়ে আঞ্চলিক স্তরে হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষায় বহু পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে যেইগুলিতে প্রাচীনকালে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সম্পদ এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের উপর জোর দেওয়া হয়। ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিদ্বজ্জনের প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ঝাড়খণ্ডের স্থানীয় ইতিহাস বুদ্ধিজীবীরা দাবি করেন যে, প্রাক্-আর্য অস্ট্রিক জনগণ এক কালে সিন্ধু থেকে গাঙ্গেয় সমভূমি, এই বিশাল অঞ্চলে বসবাস করত। নিত্যানন্দ হেমব্রমের মতে, যাযাবর আর্যরা 'জমি চাষ করতে বা বাড়ি তৈরি করতে জানত না'। এই বিদ্যা তারা অর্জন করে 'স্বচ্ছল আদিবাসী জনজাতিদের কাছ থেকে', 'যাদের নৃতত্ত্ববিদরা প্রোটো-অস্ট্রালয়েড এবং ভাষাবিদরা অস্ট্রিক গোষ্ঠীর লোক' বলে অভিহিত করেছেন।[১৬] সাধারণভাবে বন্য এবং আদিম জঙ্গল-নিবাসী হিসাবে অবহেলিত এই সম্প্রদায়ের মধ্যে গর্ববোধ জাগানোর জন্য, নিত্যানন্দ হেমব্রম লেখেন:

> As per Adivasi version these Indus Valley people had their palaces to live in. They established townships which they called them as 'Nagraha' (sic) and each clan had their Garh. Many historians also have categorically mentioned that those Adivasis only started agriculture, building houses with bricks and cementing materials (Hingul), making clothes from cotton thread. They contributed in various social and cultural fields.[১৭]

অর্থাৎ, আদিবাসীরা ছিল সুসভ্য, আর্যরা বর্বর, তারা শুধুমাত্র যুদ্ধে দক্ষ। অতীতে আদিবাসীরাই আর্যদের সভ্য করে তোলে। অতএব নিত্যানন্দ হেমব্রম মনে করেন যে, আদিবাসীরাই আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।[১৮]

নিত্যানন্দ হেমব্রমের যুক্তিগুলি সাম্প্রতিক অন্যান্য গ্রন্থে আরও বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে কমল লোচন কোরাহ হো-র লেখা *লারকা হো কল* (২০১৪) নামক পুস্তিকায়, যেখানে তিনি হরপ্পা সভ্যতাকে 'সিন্ধু দিসুম' নামকরণ করেছেন। মুন্ডারি ভাষায় দিসুম শব্দের অর্থ দেশ। এই শব্দ ব্যবহার করে তিনি সিন্ধু অঞ্চলটিকে বৃহত্তর আদিবাসী সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি লিখেছেন,

> In the ancient times, Adivasi communities were spread across India. They had their own written history. They had an advanced literature and scientific script. They had a flourishing culture and civilization. There was an ancient indigenous system of governance. They had their own religion and religious texts and also a well-developed economy.[১৯]

এই বিবরণগুলির মূল বক্তব্য এই যে আদিবাসীদের সভ্য করে তোলার কোনও প্রয়োজন নেই কারণ তারা কখনোই অসভ্য ছিল না। একই ভাবে ঔপনিবেশিক লেখকদের অভিমতের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক লেখকরা দাবি করেন যে আদিবাসীদের ইতিহাস বোধেরও অভাব ছিল না। অন্যান্য রচনায় আদিবাসী লেখকরা একথা বলেন যে হরপ্পা সভ্যতারও আগের যুগ থেকে আদিবাসীরা উপমহাদেশে বসবাস করে। দ্রাবিড় এবং মুন্ডা জনগণের মধ্যে পার্থক্য করে, মাহলি লিভিন্স তির্কে লিখেছেন,

> The Negritos of upper Paleolithic age (40,000-10,000 BC) and the Australoids of Neolithic age (10,000-5,000 BC) gave rise to the Munda race through admixture in the course of long contacts. It is also said that the Munda race is 9,000 years old (since c. 7,000-6,000 BC). We could assume then that the Munda race continued to dwell in the Indus Valley till the advent of the Dravidian race in c. 3500 B.C.[২০]

ঐতিহাসিক ইরফান হাবিবের *দ্য ইন্ডাস সিভিলাইজেশন* (২০০২) বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে মাহলি তির্কে সিন্ধু উপত্যকায় প্রাক্-দ্রাবিড় সভ্যতাকে মুন্ডা

সভ্যতার এক উদাহরণ বলে শনাক্ত করেছেন। প্রমাণ হিসেবে তিনি তুলে ধরেছেন ছোটনাগপুর এবং ওই অঞ্চলের স্থানীয় নামের সাদৃশ্য। তিনি মনে করেন যে মুন্ডা ঐতিহ্য অনুযায়ী মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার মতো নামগুলি মুন্ডারি ভাষা থেকে এসেছিল।[২১]

আদিবাসী নায়কের সন্ধান

মূলস্রোত জাতীয় ইতিহাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্তির জন্য আদিবাসী বুদ্ধিজীবীরা দুটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন— প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে বসবাস এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে আদিবাসী বীর ও নেতৃবৃন্দের ভূমিকার বিশ্লেষণ। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী নেতাদের, কেবলমাত্র আদিবাসী নেতা হিসাবে নয়, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী হিসাবে তাঁরা চিত্রায়িত করেছেন। আদিবাসী নেতৃবৃন্দের জীবনী রচনা করে তাঁদের রাজনৈতিক ভূমিকা মূল্যায়ন করেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে আদিবাসীদের সমান অংশীদার হিসেবে তুলে ধরেন।[২২] এই ধরনের ব্যাখ্যা জনজাতিগুলির সংহতি ও শক্তি প্রদান করে আদিবাসী পরিচিতিবোধকে সুদৃঢ় করে তুলতে সাহায্য করে। বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলেন সাঁওতাল হুলের নেতা সিধু এবং কানু, এবং মুন্ডা উলগুলনের নেতা বিরসা মুন্ডা, যাঁর অনুপ্রেরণায় ১৮৯৯ সালে মুন্ডা জনজাতি পূর্বপুরুষদের স্বর্ণযুগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার ব্রত নিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বর্তমান প্রজন্ম বিভিন্নভাবে এই আন্দোলনগুলির পুনর্ব্যাখ্যা ও পুনঃপ্রকাশ করতে উদ্যত।[২৩] বিরসা মুন্ডার একটি জনপ্রিয় জীবনী লিখে এ. কে. ধন বিরসার প্রতি তাঁর মুগ্ধতা ব্যক্ত করেছেন:

> From my early years, Birsa was one of the persons who influenced me the most. I became familiar with Birsa's activities, listening to the family members and my elders. The utterance of Birsa's name creates in the minds of the people of Chotanagpur a romance and an element of pride,which perhaps, cannot be fully appreciated by any outsider.[২৪]

একই ভাবে প্রখ্যাত আদিবাসী মহিলা সাংবাদিক দয়ামণি বার্লা মনে করেন যে বিরসা মুন্ডার আন্দোলন আদিবাসী জীবনে গ্রাম এবং স্বশাসন ব্যবস্থার গুরুত্বকে পুনর্ব্যক্ত করেছিল।[২৫] জীবনী শুধুমাত্র বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অল্প পরিচিত বিদ্রোহী নেতাদের সঙ্গে আজকের জনসাধারণকে পরিচিত করার এক প্রচেষ্টা চলছে যা পুনরায় আদিবাসীদের আত্ম-পরিচয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করছে।

উপসংহার

বর্তমানকালে আদিবাসী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, আদিবাসীদের প্রান্তিকতা আর্য আগ্রাসনের পর থেকেই শুরু হয় যার ফলে তারা নিজেদের ভূমিতে দাস হিসেবে পরিণত হয়েছে। সিংভূম জেলায় বসবাসকারী মানবাধিকার কর্মী গ্ল্যাডসন ডুংডুং মনে করেন যে আর্যরাই সর্বপ্রথম আদিবাসী সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে। বন্য, রাক্ষস বা অসুর আখ্যা দিয়ে আদিবাসী জনজাতি ও তাদের বংশধরদের নিধনকে ন্যায্যতা দেওয়া হয়।[২৬] মুঘল ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এবং স্বাধীনতার পরবর্তী পর্বে আদিবাসীদের জমি, আত্মপরিচিতি, ঐতিহ্য এবং জীবনবোধের উপর আক্রমণ অব্যাহত থাকে। স্বাধীন ভারতের অর্থনীতির কঠোর সমালোচনা করে গ্ল্যাডসন ডুংডুং বলেন যে, জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে আদিবাসীদের ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়েছে। যদিও তারা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অবহেলিত এবং উপেক্ষিত, অন্যায়ভাবে তাদের উন্নয়ন ও আধুনিকতা- বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[২৭] তাঁর রচিত *Whose Country is it Anyway?* (*2013*), *Mission Saranda: A War for Natural Resources in India* (*2015*) এবং *Endless Cry in the Red Corrider* (*2017*) বইগুলিতে তিনি আদিবাসীদের উপর সংঘটিত হিংসাত্মক নীতির স্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে প্রখ্যাত আদিবাসী মহিলা সাংবাদিক দয়ামণি বার্লা বলেন যে, ‘ব্রিটিশ আমলে বিরসা মুন্ডাকে লড়াই করতে হয়েছিল কেবলমাত্র একটি একক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে। তার পরিবর্তে আজ সব মহল থেকে আক্রমণ হচ্ছে। পূর্বে ছিল একটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, এখন বহুবিধ’।[২৮]

অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বঞ্চনার সম্মুখীন হয়ে আদিবাসীরা বহুদিন এক নীরবতার সংস্কৃতির (culture of silence) দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে।[২৯] এর ফলে আদিবাসীরা হয় মূলধারার রাজনীতি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখে, নয় হিংসাত্মক বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে। তাদের গভীর মানসিক আঘাতের অনুভূতি নানান প্রচারপত্র ও পুস্তিকায় প্রতিফলিত হয়।[৩০] বিশ শতকের শেষার্ধে, ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে ‘জল, জঙ্গল, জমিন’-এর জন্য আহ্বান জানানো হয় যা পরবর্তীকালের সকল আদিবাসী আন্দোলনের স্লোগান হয়ে উঠেছে। এই প্রক্রিয়ার ফলে ‘আদিবাসী’ শব্দটি আজ আরও জটিল অর্থ বহন করে। শুধু আদি বসবাসকারীর ধারণা নয়, আদিবাসীরা আজ নিজেদের পরিবেশের ঐতিহ্যবাহী রক্ষক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছে। নির্যাতনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা আজ আদিবাসী আখ্যানে এক প্রভাবশালী আঙ্গিকে পরিণত হয়েছে। সমসাময়িক পরিস্থিতিতে স্থানচ্যুতি, উচ্ছেদ এবং উচ্ছেদের গল্পগুলি ক্রমশ

গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আদিবাসীদের অস্তিত্বের সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে এটি আজ অনিবার্য।

তথ্যসূত্র

১ Romila Thapar, Thapar, 'Perceiving the Forest: Early India', *Studies in History*, 2001 17 (1), pp. 1-16

২ ছোটনাগপুরে স্থিত ক্ষুদ্র রাজপরিবারগুলি বংশতালিকা বা বংশাবলীর মাধ্যমে নিজ পরিবারের প্রাচীনত্ব ও বংশকৌলিন্য প্রচার করে। উল্লেখ করা যেতে পারে পোড়াহাটে অবস্থিত সিংভূম শাসকবংশের *বংশ প্রভা লেখন* নামক বংশাবলী।

৩ এগুলির মধ্যে উল্লেখ্য S. R. Tickell, 'Memoir on the Hodisum (improperly called the Kolehan)', *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, ১৮৪০, 9 (2): 694-710; 783-808; F. B. Bradley-Birt, *The story of an Indian upland*, London: Smith, Elder and Co., 1905; F.B. Bradley-Birt, *Chota Nagpore, a little-known province of the empire*, London: Smith. Elder and Co., 1903; W. W. Hunter, *Annals of rural Bengal*, London: Smith, Elder and Co., [1966 (1868)].

৪ Ajay Skaria, *Hybrid histories: Forests, frontiers and wildness in western India*, New Delhi: Oxford University Press, 1999, p. 2.

৫ Dipesh Chakrabarty, 'Minority Histories, Subaltern Pasts', *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*. Delhi: Oxford University Press, 2001, p. 97.

৬ Partha Chatterjee, 'History and the present: An introduction,' P. Chatterjee and A. Ghosh eds., *History and the Present*, Delhi: Permanent Black, 2002, p. 2.

৭ Prabhat Kumar, 'Political Economy of Jharkhand Region 1908-2012'. Ph.D. thesis, Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 2019, p. 73.

৮ A.K. Pankaj, *Adivasidom; Selected Writings and Speeches of Jaipal Singh Munda*. Ranchi: Pyara Kerketta Foundation, 2017, p.88.

৯ Ibid., pp.124-125.

১০ Ibid., pp.20-21.

১১ *Constituent Assembly Debates* (1950) 2014. Volume I: 9-23 December 1946. New Delhi: Lok Sabha Secretariat. (2014), p.143.

[১২] A.K. Pankaj, *Adivasidom*, pp. 23, 93.

[১৩] Constituent Assembly Debates, pp.143, 145.

[১৪] A.K. Pankaj, *Adivasidom*, p.134.

[১৫] Ibid.

[১৬] Nityananda Hembram, *Ancient Culture of India: Its Origin and Development, Based on the Study of the Culture of the Most Ancient People, the Adivasis of India*, Midnapur: Sitaram Murmu, 2012, p. 2.

[১৭] Ibid.

[১৮] Ibid.

[১৯] Kamal Lochan Korah Ho, *Larka Ho Kol: Ek Parichay*. Ranchi: Jharkhand Jharokha, 2014, p. 24.

[২০] Mahli Livins Tirkey, *Tribal Origins and Culture (With Special Reference to Tribes of Chotanagpur*). New Delhi: L. Tirkey, 2013, p.17.

[২১] Ibid., p. 20.

[২২] উল্লেখ্য সুশীল কেরকেটা রচিত বিদ্রোহী খেরিয়ার নেতা তেলেঙ্গা খারিয়ার জীবন কাহিনি (Susheel Kerketta, *Shaheed Telenga Kharia ka Jeevan Darshan Evam Kranti*, Allahabad: K.K. Publications, 2010); দয়মন্তী সিঙ্কু রচিত উনিশ শতকের বিদ্রোহী হো নেতাদের জীবনী (Damayanti Sinku, *Singhbhum ke Shaheed Laraka Ho*, Allahabad: K.K. Publications, 2011); ফ্রান্সিসকা কুজুর রচিত বিরসা মুন্ডা-এর আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকার উপর পুস্তিকা লিখেছেন (Fransisca কুজুর, *Jharkhand Ulgulanki Krantikari Mahilayen*. Allahabad: K.K. Publications).

[২৩] আদিবাসী নায়কদের রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে বর্তমান প্রজন্মের চিন্তাধারা এবং আধুনিক রাজনীতিতে ঐতিহাসিক স্মৃতির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন Daniel J. Rycroft, 'From History to Heritage: Adivasi Identity and Hul Sengel', Marine Carrin and Lidia Guzy eds. *Voices from the Periphery: Subalternity and Empowerment in India*. Delhi: Routledge, 2012; Rahul Ranjan, *The Political Life of Memory: Birsa Munda in Contemporary India*, Delhi: Cambridge University Press, 2022.

[২৪] A.K. Dhan, *Birsa Munda*, New Delhi: Government of India Publications Division, 2006. Preface.

[২৫] Rahul Ranjan, *The Political Life of Memory*, p. 116.

[২৬] Gladson Dungdung, *Whose Country is it Anyway? Untold Stories of the Indigenous Peoples of India*. Kolkata: Adivaani, 2013.

[২৭] Ibid., pp. 3, 29.

[২৮] Rahul Ranjan, *The Political Life of Memory*, p.1.

[২৯] Pashupati Prasad Mahato, *Sanskritisation vs. Nirbakisation: A Study on Cultural Silence and Ethnic Memocide in Jharkhand*, Kolkata: Sujan Publications, 2000.

[৩০] Salkhan Murmu,Pushpa Tete and Kerubim Tirkey, *Adivasi Muddon ki Rajniti se hi Adivasiyon ki Raksha Sambhab Hai*, Ranchi: Jharkhand Express, 2020.

নারীর আত্মকথন ও একটি দেশের পথ পরিক্রমা: নূরজাহান বোস-এর *আগুনমুখার মেয়ে*

সাবিহা হক

এলবার্ট ই স্টোন ১৯৮১ সালে লিখেছিলেন যে, আত্মজীবনী সাহিত্যের ছাত্র ও সাহিত্য সমালোচকের জন্য নতুন একটি সাহিত্যের ধারা যা থেকে আহরণ করার মতো অনেক কিছুই আছে (সূত্র: বেরিম্যান ১৯৯৯)। কথাটি একবিংশ শতকের দুই দশক পেরিয়েও যথেষ্ট গুরুত্ব রাখে, যদিও আত্মজীবনী এখন আর সাহিত্যের ছাত্রের কাছে নতুন কোনও ধারা নয়। যে কোনও আত্মজীবনী একটি সময়ের ইতিহাসকে ধারণ করে, পুস্তকের গৎবাঁধা ঘেরাটোপের থেকে বেরিয়ে ইতিহাসের একটি অধ্যায়কে নতুন করে ভাবতে শেখায়। আর তাই আত্মজীবনী, দিনপঞ্জি, বা চিঠিপত্র এখন ইতিহাস ও সাহিত্যপাঠের একটি গুরুত্বপুর্ণ শাখা। উইলহেল্ম ডিলথে লিখেছেন, আত্মজীবনী হল 'the highest and most instructive form in which the understanding of life confronts us' (১৮৮৩, পৃ. ৮৫, বেরিম্যান ১৯৯৯, পৃ. ৭৩)। জীবনবোধের ব্যাপারে সর্বশ্রেষ্ঠ অভিধাসম্পন্ন এই লেখনীকে চার্লস বেরিম্যান 'a crucial form of evidence for the study of social and cultural history' (১৯৯৯, পৃ. ৭৩) হিসেবে অভিহিত করেছেন যা আলোচ্য *আগুনমুখার মেয়ে* গ্রন্থের জন্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কারণ এই আত্মজীবনীতে লেখক নূরজাহান বোস শুধু যে নিজের জীবনের চিত্র এঁকেছেন তাই নয়, তিনি বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও পৃথিবীর মানচিত্রে একটি শিশু রাষ্ট্র হিসেবে তার বিকাশের একটি রেখাচিত্রও পাঠকের

সামনে তুলে ধরেছেন। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থারও কিছুটা ভবিষ্যদ্‌বাণীও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

কে সচ্চিদানন্দনের বক্তব্য অনুযায়ী সাবঅলটার্ন বা প্রাকৃতজনের আত্মজীবনীর আত্মপ্রকাশের ফলে ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে আত্মজীবনী সাহিত্যের ধারা হিসেবে এই শতকে এসে একটি ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে (২০১০, পৃ. ৬)। দলিত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ, গৃহপরিচারক, যৌনকর্মী, এমনকি পকেটমারের আত্মজীবনীও বেশ বাজার পেয়েছে ভারতবর্ষে। নারী বা নারী লেখকের আত্মজীবনীও এই গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন সচ্চিদানন্দ। নারীর রচনায় স্থান-কাল-পাত্রের অন্তরঙ্গ একটি রূপ পাওয়া যায়, যা ইতিহাস পাঠের এক অনন্য উপাদান হতে পারে। ইতিহাসের বইয়ের পাতায় আমরা যেসকল নেতৃবৃন্দের নাম বা তাঁদের কাজের কিছু ঘটনা জানতে পারি, তাঁদের ভেতরের নিজস্ব রূপ বা ব্যক্তিমানসের সন্ধান পাওয়া যায় এরকম একটি আত্মজীবনীতে। *আগুনমুখার মেয়ে* গ্রন্থে আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি স্বাধীন বাংলাদেশের জনক, তাঁর পাশাপাশি বহুসংখ্যক নেতাকর্মীর সঙ্গে লেখকের অন্তরঙ্গ সাক্ষাতের বর্ণনা পাই, আর তাই এই আত্মজীবনী বাংলাদেশের ইতিহাস ও সাহিত্য দুটি ক্ষেত্রেই একটি বিশেষ স্থান লাভ করেছে।

নূরজাহান তাঁর লেখার নাম দিয়েছেন *আগুনমুখার মেয়ে*। আগুনমুখা নদী বাংলাদেশের দক্ষিণে বরিশাল অঞ্চলের সুপরিচিত নদী। এই নদীর নাম কেন তিনি শিরোনামে ব্যবহার করলেন। এই শিরোনামের দুটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। এক, নদীকে পিতা-মাতা বা অভিভাবকের স্থান দিয়েছেন তিনি। তাঁর শেকড়ের সন্ধানে বা অতীতযাত্রায় এই নদীর ভূমিকা স্বীকার না করে উপায় নেই। নদী পেরিয়ে শহরে অবস্থান করেছেন পড়াশোনা ও জীবিকার তাগিদে। এই নদীর গতিপথের সমান্তরালে বহতা নদীর মতোই বেড়েছে লেখকের জীবন। গ্রন্থের ভূমিকায় নূরজাহান লিখছেন, 'আমার জীবনে আগুনমুখার প্রভাব অন্তহীন। এই অঞ্চলের সমগ্র জনগোষ্ঠী আমার আত্মার আত্মীয়। এদের সুখ-দুঃখের কাহিনি আমার জীবনের সুখ-দুঃখের কথা। তাই আমার জীবনকাহিনি আগুনমুখার মেয়েরই কাহিনি' (২০১১, ভূমিকা)।

আর দ্বিতীয়ত, নদীটিকে ভালোবাসার পাশাপাশি প্রচণ্ড ভয় যে পেতেন তা তিনি ভূমিকাতেই উল্লেখ করেছেন। আগুনমুখা নদীর সঙ্গে আরও ছটি নদী মিলিত হবার কারণে এই সাত নদীর সঙ্গমস্থলে উত্তাল জলরাশি ও প্রবল ঢেউয়ের কথা উল্লেখ করে তিনি লিখছেন,

> একটা ভীতির শিহরণ জাগত শরীরে-মনে এই নামটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে।... আগুনমুখার ভয়াল মূর্তি ছিল কিংবদন্তীর মত।... প্রবল ঢেউয়ের ওপর প্রতিফলিত সূর্যরশ্মি জ্বলন্ত আগুনের লেলিহান শিখাকে মনে করিয়ে দিত। এজন্যই সম্ভবত এর নাম আগুনমুখা। এপার-ওপার করার সময় চারদিকে কিছুই চোখে পড়ত না। শুধু জলরাশি আর জলরাশি। আমার মা, খালা, দাদি এবং গ্রামবাসীর কাছে শুনেছি, এই অঞ্চলের মেয়েরা শাশুড়ি, ননদ এবং স্বামীর অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য এই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তি পেত। প্রেমিক-প্রেমিকারাও বাড়ি তথা সমাজে স্বীকৃতি না পেলে আগুনমুখার কোলেই যুগলে আশ্রয় নিত। বড় নৌকায় বা ডিঙিনৌকায় আগুনমুখা পাড়ি দেয়ার সময় কত মানুষ যে প্রাণ হারিয়েছে, তার হিসাব কেউ কখনও রাখেনি।... লোন্দার বাড়িতে বেড়াতে গেলে অথবা চিকিৎসা বা লেখাপড়ার প্রয়োজনে শহরে যেতে হলে আনন্দের পাশাপাশি এক ধরনের আতঙ্কও আমাকে গ্রাস করত। (২০১১, ভূমিকা)

লেখক যে সময়ে অর্থাৎ ২০০৯ সালে রাজধানী ঢাকা থেকে ইঞ্জিন নৌকা বা লঞ্চে লেখকের বাড়ি কাটাখালি যেতে আঠারো থেকে ত্রিশ ঘণ্টা লেগে যেত, বর্তমানে পদ্মাসেতু হবার পর তা পাঁচ ঘণ্টাতেই যাওয়া যায়। আজকের পাঠকের কাছে তাই আগুনমুখার ভয়াবহতার এই বৃত্তান্ত একটি সময়কে ফিরে দেখার পাশাপাশি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেরও একটি দলিল। শিরোনামে আগুনমুখার উল্লেখ তাই নানাবিধ কারণেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রন্থটির শুরু হয়েছে লেখকের নারীর প্রতি সন্মান ও নারীর জীবনবোধের মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে। বিনয় ও আত্মসন্মানবোধ দুইয়ের সম্মিলনে তিনি লিখছেন, 'আগুনমুখা নদীর পাড়ের আমার মতো এক সাধারণ মেয়ে কী বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত ওয়াশিংটনের পটোমাক নদীর পাড়ে গিয়ে তার জীবনের অর্ধেকের বেশি সময় কাটিয়ে দিল! হাসি-কান্নায় ভরা সেই জীবনগাথা লিখে যেতে পারলে হয়তো কোনওদিন কারও নজরে পড়তেও পারে' (পৃ. ১)। এভাবে তিনি আত্মজীবনী লেখার একটি চমৎকার ঢং-এর অবতারণা করলেন, যদিও মেয়ে হিসেবে নূরজাহান ছিলেন অনন্য ও অসাধারণ। অসম্ভব সাহস ও মনোবলের অধিকারী এই নারী তাঁর জীবনের প্রতিটি ধাপ আত্মমর্যাদার সঙ্গে যেভাবে পার হয়েছেন, তাতে নিজেকে সাধারণ মেয়ে আখ্যা দেওয়াটা তাঁর মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রমাণ ছাড়া কিছুই নয়।

নূরজাহান তাঁর গ্রন্থটি নিজের মা জোহরা বেগম ও মাতৃতুল্য মনোরমা মাসিমাকে উৎসর্গ করেছেন। এ থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উৎসর্গে তিনি

লিখছেন, 'যে দুই মহীয়সী নারীর ভালবাসা ও দিকনির্দেশনা আমার নিরন্তর পথচলার প্রেরণা'। প্রথমত, স্বল্পশিক্ষিত মা ও মাসিমা যে কোনওভাবেই অশিক্ষিত বা অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিলেন না, এই দাবিতে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তিনি পশ্চিমা নারীবাদকে সমর্থন করে দক্ষিণ এশীয় গৃহিণী মা-মাসিকে উপেক্ষা করছেন না। বরং বাঙালি নারীর সীমার মধ্যে অসীম হয়ে ওঠার ক্ষমতাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চেয়েছেন। আর দ্বিতীয় বিষয়টি বর্তমান বৈশ্বিক ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নূরজাহান এখানে ধর্মনিরপেক্ষ একটি অবস্থানকে গ্রহণ করছেন। মুসলিম নারী হয়েও তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামির বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন হিন্দুধর্মাবলম্বী মনোরমা মাসিমাকে মায়ের সমান মর্যাদা দেবার মধ্য দিয়ে। দক্ষিণ এশিয়ার সামাজিক রাজনৈতিক জনজীবনের জন্য নূরজাহান-এর একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বীর স্ত্রী হিসেবে আত্মপরিচয়ের ইতিহাসও চমকপ্রদ। তাঁর মার্কসবাদী রাজনৈতিক জীবন ও কর্মের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের এই দিকটি দক্ষিণ এশিয়ার চিরন্তন ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির এক অনন্য উদাহরণ। আজকের রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনে এই ধর্মনিরপেক্ষতার অভাব যে কোনও সচেতন নাগরিককে চিন্তাগ্রস্ত করে।

কানাডার টম্প্সন রিভার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, হুমায়ুন কবির দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলাম ধর্ম ও গণতন্ত্র, মুসলিম সমাজ, তাদের সংস্কৃতি ও রাজনীতি এবং মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর মতে দক্ষিণ এশিয়ার ঐতিহাসিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে তিনটি বিশেষ প্রকরণে ভাগ করা যায়, যার প্রথমটি হল সংহতিমূলক বা ইন্টেগ্রেটিভ প্যারাডাইম যা মূলত পাকিস্তান রাষ্ট্রগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ব্রিটিশ উপনিবেশ ও হিন্দু আধিপত্যবাদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উপমহাদেশের মুসলমানদের একীভূত করার জন্য ধর্মকে প্রধানতম উপায় হিসেবে দেখা হয়েছিল। অঞ্চলগত ও ভাষাগত বিভেদ থাকা সত্ত্বেও পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানকে একীভূত করা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের গঠনের পর অসংহতিমূলক প্যারাডাইম দেখা যায় যার মূল কারণই সাংস্কৃতিক দূরত্ব ও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বঞ্চনা। কবিরের মতে, 'এর ফলেই রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্কটা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে' (Source URL)। বর্তমানে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশেই আবার ধর্মীয় সংহতির প্যারাডাইম থেকে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার উদ্ভব হয়েছে। ধর্মকে জাতীয়তাবাদের বাহন করা হয়েছে যার ফলে সংঘর্ষ ও প্রাণহানির ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে। এই অসহিষ্ণুতার বীজ যে ১৯৪৭-এর আগের ইতিহাসের

বা অতীতের গ্রন্থিতে ছিল না, যা প্রকৃতপক্ষে বাহ্যিকভাবে বাংলাদেশের মতো ধর্মনিরপেক্ষ দেশের উপর আরোপ করা হয়েছে, তার একটা বড়ো প্রমাণ নূরজাহান বোসের এই গ্রন্থ।

এই জীবনকাহিনির একটি বিশেষত্ব এর নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। প্রতিটি পদে বাংলার স্বল্পশিক্ষিত নারীর প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটেছে এই বর্ণনায়। নূরজাহান বর্ণনার শুরুতেই নিজের মাকে স্মরণ করেছেন— 'আমার মায়ের কথা বাদ দিয়ে আমার জীবনকাহিনির শুরু হতেই পারে না' (পৃ. ১)। বাঙালি নারীর ছোটোখাটো গড়ন ও শ্যামবর্ণের প্রতিও তাঁর ভালোবাসা—

> মা আমার সাধারণ বাঙালি মেয়েদের গড়ন নিয়েই জন্মেছিলেন। ছিলেন ছোটখাটো আকৃতির, গায়ের রঙ শ্যামলা। তাঁর বড় বড় হরিণ চোখদুটো দেখে মনে হত যেন জলে ভরা। মাথাভর্তি গুচ্ছ গুচ্ছ কোঁকড়া চুল। নেমে এসেছিল কোমরের নীচ পর্যন্ত। মুখে কথা নেই, চোখে নীরব ভাষা। (পৃ. ১)

এই নীরব ভাষা কিন্তু নীরবতা নয়। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে নারীবাদকে যেভাবে দেখা হয়, বাংলাদেশ বা দক্ষিণ এশিয়ায় ঠিক সেরকম নারীবাদের মতবাদ নয়। পশ্চিমা নারীবাদে বিশ্বাসের পাশাপাশি এতদঞ্চলের নারীর একটি নিজস্ব দর্শন রয়েছে, সেখানে মাতৃত্ব, সাংসারিক জীবন ও সামাজিক দায়বদ্ধতার ব্যাপারটি একটু ভিন্ন দৃষ্টিতেই দেখা হয়। শান্ত প্রকৃতির মা-কে নূরজাহান জ্বলে উঠতেও দেখেছেন যখন স্বদেশ বোসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে নানা রটনার প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে তাঁর এই নীরবভাষী মা নিজের সম্মতি দিচ্ছেন দুই ভিন্নধর্মী মানুষের বিয়েতে— স্বদেশের মতো ভালো ছেলে আমি কখনও দেখিনি। ওর সমান যোগ্য কোনও মুসলমান ছেলে আমার নজরে পড়েনি এখনও। না আমার কোনও আপত্তি নেই (পৃ. ৯৯)। নূরজাহান লিখছেন,

> আমার মা ছিলেন ধার্মিক, কিন্তু গোঁড়া ছিলেন না। আমি দেখেছি বিনা কারণে মা নামাজ কাজা করেননি। তাঁর রোজা কেউ ভাঙ্গাতে পারেনি। তাঁর গলার স্বর আমরা ছাড়া বাইরের কেউ কখনও শোনেনি। সর্বদা মা'র মাথায় কপাল পর্যন্ত ঘোমটা দেয়া থাকত। (পৃ. ১০০)

নূরজাহান-এর এই দৃষ্টিভঙ্গি চন্দ্রা তালপাড়ে মোহান্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যিনি 'third world woman'-কে একটা ক্যাটেগরি হিসেবে দেখাকে এক ধরনের নব্য প্রাচ্যবাদ মনে করেন। পশ্চিমা নারীবাদী দৃষ্টিতে তৃতীয় বিশ্বের নারীর জীবনকে এভাবে দেখা হয়—'This average third world woman leads an essentially truncated life based on her feminine gender (read:

sexually con-strained) and being 'third world' (read: ignorant, poor, uneducated, tradition-bound, domestic, family-oriented, victimized etc.)' (Mohanty 1984, 334)। মোহান্তি প্রতিবাদ করে লিখছেন,

> Concepts like reproduction, the sexual division of labor, the family, marriage, household, patriarchy etc., are often used without their specification in local cultural and historical contexts. These concepts are used by feminists in providing explanations for women's subordination, apparently assuming their universal applicability. For instance, how is it possible to refer to 'the' sexual division of labor when the content of this division changes radically from one environment to the next, and from one historical juncture to another? (১৯৮৪, পৃ. ৩৪৭)

নূরজাহান পূর্ব বাংলার গ্রামীণ সমাজে ও মফস্‌সলে বসবাসরত নারীর জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রতিবন্ধকতা, পরাধীনতা, অত্যাচারিত জীবন দেখিয়েছেন, কিন্তু পাশাপাশি এই নারীদের অসম সাহস, কর্মস্পৃহা, প্রতিবাদ, সংগ্রাম— এ সবই বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর পিতামহ ও মাতামহের বাড়ির অসংখ্য নারী সদস্যের দুর্গতির বয়ান করেছেন, যাদের জীবন সত্যিই অন্ধকারাচ্ছন্ন ও সংকটপূর্ণ ছিল। এ সকল নারী নানা প্রকার অসম্মান ও যৌন নিপীড়ন-এর শিকার হয়েছেন। আবার অসংখ্য নারীচরিত্রকে তিনি পরিচয় করিয়েছেন পাঠকের সামনে, যাদের মধ্যে সাংসারিক প্রয়োজন, সামাজিক সংকট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ— কোনও অবস্থাতেই সাহসের কমতি দেখা যায় না। পূর্বাপর বিবেচনা না করেই এই নারীরা ন্যায় ও ন্যায্যতার পক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের নারীর তৎকালীন অবস্থান আজকের তুলনায় কোনও অংশেই পশ্চাৎপদ ছিল না। বরং আজকের বাংলাদেশের নারী অনেক বেশি ধর্মীয় ও সামাজিক নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের পর যে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান রচিত হয়েছিল, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার পর বাংলাদেশে সাংবিধানিক ধর্মনিরপেক্ষতা নস্যাৎ করে ধর্মীয় রাজনীতির উদ্ভব হয়েছে। পাশাপাশি নারীর অধিকার ও মুক্ত সাংস্কৃতিক চর্চায় সামাজিক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীকে সমমর্যাদার অধিকারী বলা হলেও সামাজিক জীবনে নারীকে নানাভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। নূরজাহান বোসের মা গ্রামীণ পরিবেশে পর্দা আবৃত সরল নারী, অথচ তিনিই অনেকগুলো সন্তানের পড়াশোনার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। নূরজাহান লিখছেন,

> কাদের সঙ্গে আমরা খেলাধুলা করি, কী খেলি, সেদিকেও মা'র তীক্ষ্ণ নজর ছিল। ছোটবেলা থেকেই মা আমাদের বলতেন, 'ভালো করে লেখাপড়া শিখে মানুষের মত মানুষ হয়ে এখান থেকে তোদের বের হতে হবে। আমার মতো জীবন তোদের কিছুতেই হতে দেব না। (পৃ. ১১)
>
> ...
>
> মা আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন, সংসারে মেয়েদের কী অসহনীয় অবস্থা। বাড়ির কাজের ঝি, চাকরানি এবং আমাদের আশ্রিতা আত্মীয়াদের প্রতি আমাদের বাড়ির পুরুষদের আচরণ সম্পর্কেও মা আমাকে সচেতন করেছিলেন। এদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে পুরুষেরা তাদের ওপর যে অত্যাচার চালাত, সেটা আমাকে কষ্ট দিত। আমার মা চেষ্টা করতেন আশ্রিতাদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে সরিয়ে দিতে। তার জন্য মাকে যথেষ্ট অপমান সহ্য করতে হয়েছে। মা নীরবে সেসব সহ্য করেছেন।

এই মা-ই কিশোরী নূরজাহানকে লেখাপড়ার জন্য দূরদূরান্তে আত্মীয় স্বজনের বাড়ি পাঠিয়েছেন নিজের সিদ্ধান্তে, যার জন্য তাঁকে প্রচণ্ড সমালোচনার মুখে পড়তে হয়, কিন্তু তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে মেয়েকে জীবনে দাঁড়াবার সুযোগ করে দিয়েছেন। নূরজাহান বিশেষভাবে মায়ের একটি কথা উল্লেখ করেছেন, 'আমি তোমাকে সারাজীবন পাহারা দিয়ে রক্ষা করতে পারব না। নিজেকে রক্ষা করতে হবে তোমাকেই' (পৃ. ১২)। এই অসাধারণ মা-ই পরবর্তীকালে সন্তানকে একজন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর হাত ধরে জীবনে সুখী হবার পথে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছেন। ভারতীয় বা বাঙালি নারীর নারীবাদ যে মাতৃত্ব ত্যাগ করে হয় না, সেটি যেন বারবার ফিরে এসেছে তাঁর গ্রন্থে। স্বামীর সঙ্গে বিলেতে গিয়ে তিনি ব্যুভোয়ার-এর *শি কেম টু স্টে* বা *দ্য সেকেন্ড সেক্স*-এর সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন কিন্তু তাঁর মাতৃত্ব বা সাংসারিক দায়দায়িত্বকে তিনি কখনও অবহেলা করেননি। তিনি লিখছেন,

> 'শি কেম টু স্টে'। বিখ্যাত নারীবাদী লেখিকা Simone-de-Beauvoir-এর এই বইটি এবং এরপর 'দি সেকেন্ড সেক্স' পড়ে আমার জীবনের ধ্যানধারণা চিরকালের জন্য পালটে গেল। প্রথমবার পালটে ছিল মার্কসবাদ- লেনিনবাদের সংস্পর্শে এসে। এবার এই বইগুল পড়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ের বিশ্লেষণের ধারা বদলে গেল। অনেক না-জানা, না-বোঝা সমস্যার কার্যকারণ খুঁজে পেলাম। নিজের জীবনের সুখ-দুঃখের ইতিহাস বুঝতে পারলাম। নারী ও পুরুষের সম্পর্ক একজনের বা একদিনের সৃষ্টি নয়। এর পেছনে রয়েছে হাজার বছরের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। নারী দুর্বল, অবলা ও বোকা নয়। তাকে এভাবে সাজানো হয়েছে নিজেদের স্বার্থ ও সামাজিক প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য। (পৃ. ২০২)

স্বদেশ বোসের সঙ্গে বিয়ের আগেও নূরজাহান বাঙালি অনেক নারীর থেকেই আলাদা। তাঁর প্রথম প্রেম ইমাদুল হকের সঙ্গে কম্যুনিস্ট আন্দোলনে একই সঙ্গে কাজ করার প্রেক্ষাপট তিনি পাঠকের সামনে যেভাবে তুলে ধরেছেন তাতেই তিনি তাঁর নারীবাদী সত্তাকে ঊর্ধ্বে তুলেছেন। বাঙালি নারী যে কেবলই গৃহকোণে বসবাস করে সন্তান লালন-পালনই করতে পারে, আর কিছু তার ক্ষমতায় নেই, এই পশ্চিমা ধারণাকে তিনি মিথ্যে প্রমাণিত করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে নারীদের যে অগ্রণী ভূমিকা আছে সেই ইতিহাস তুলে এনেছেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের অনেক আগেই প্রকৃতির তাণ্ডবে গৃহহীন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর যে অদ্ভুত সাহস তিনি দেখিয়েছেন তা থেকে জানা যায়, এই নারী সাধারণ কোনও নারী নন। ইমাদুল হকের অকাল মৃত্যুতে শোকাহত নূরজাহান অসাধারণ ধৈর্যের সঙ্গে তাঁর জীবনের সেই দুর্ভাগ্যের সময় পার করছেন তখন, স্বামীর মৃতমুখও তাকে দেখতে দেওয়া হয়নি। তিনি এক কঠিন বাস্তবতার মুখে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করছেন,

> এ প্রশ্ন সেদিন যেমন আমি করেছিলাম, আজ এত বছর পরেও করছি। দু'জন মানুষ ইমাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় ও প্রধান ছিল। তার মা, অন্যজন আমি অর্থাৎ তার স্ত্রী। কেন তাদের কথা কারও মনে পড়ল না? তাদের বাদ দিয়েই ইমাদকে কবর দেয়ার সিদ্ধান্ত কারা নিয়েছিল? ইমাদের কাছে শেষ বিদায় নেওয়ার সুযোগ যারা আমাদের দেয়নি তারা ক্ষমার অযোগ্য। এই সমাজে এখনও প্রতিদিন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মা, মেয়ে এবং স্ত্রীদের বাদ দিয়ে। সবসময় আমি ভাবি এর পরিবর্তন কবে হবে? (পৃ. ৭৩)

পরিবর্তনের এই আকাঙ্ক্ষা নারীবাদের চিরায়ত আকাঙ্ক্ষা এবং একবিংশ শতকে এসেও যখন সমস্যাগুলো থেকে যায়, তখন আমরা বুঝতে পারি, দেশ, অর্থনীতি ও গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে যতই এগিয়ে থাকুক, সামাজিক সূচকে পিছিয়ে রয়েছে। ২০১৬ সালের একটি সামাজিক উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তানের থেকে এগিয়ে থাকলেও, ব্যক্তি স্বাধীনতা, উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা ও অন্যান্য উপাদান যার মধ্যে নারীর উন্নয়নও রয়েছে, সেখানে পিছিয়ে আছে। অপরপক্ষে, বাংলাদেশের নারী অর্থনৈতিক উন্নয়নে যে বিপুল অবদান রেখে চলেছে, তার স্বীকৃতি নেই। ২০২৩ সালের স্থিতিশীল উন্নয়ন রিপোর্টে দেখা যায় যে বাংলাদেশ লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণে অনেকটা পিছিয়ে আছে। জাতিসংঘ (UN)-এর ২০২৩-এর একটি খবর বলছে,

> ... Bangladesh features as a key reference in microfinance, illustrating how the region has made outstanding progress in economic growth, human development, and poverty reduction.
>
> However, the benefits of this progress have not been evenly shared. Absolute deprivations remain a key concern, as does structural exclusion with respect to gender, the informal sector, and the digital divide. (Source URL)

অর্থাৎ, অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ যতই এগিয়ে থাকুক, অনুন্নত দেশের সীমারেখা পার হয়ে উন্নয়নশীল দেশের অবস্থান পেছনে ফেলে মধ্যম আয়ের দেশ হবার আকাঙ্ক্ষা যতই এই দেশের মানুষকে প্রভাবিত করুক না কেন, পিতৃতান্ত্রিকতার অন্ধকার এখনও কাটেনি। এখনও নারীকে সংসারের দাসী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আমরা এত সাহসী নূরজাহানকে দেখি, যাকে ১৯৭০-এর ঝড়ের তাণ্ডবে ভেসে যাওয়া নিজের আত্মীয়স্বজনসহ আগুনমুখার পার্শ্ববর্তী জনপদের বিপুল জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখি, সেই নূরজাহান নিজের জীবনেও কম আত্মাহুতি দেননি। বাল্যকালে মাত্র দশ বছর বয়সে মায়ের এক মামার যৌন হয়রানির শিকার হতে হয়েছে তাঁকে। দুজন স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও এই নানা তাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। এর বাইরে এরকমই আর-একজন তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, যার ফলশ্রুতিতে বালিকা নূরজাহানকে আমরা অনেক বেশি আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠতে দেখি, 'তারপর থেকে আমার মনে একটাই ভাবনা, এই জঙ্গল থেকে আমাকে বের হতেই হবে' (পৃ. ১৭)। মায়ের প্রভাব খাটিয়ে চাচার সাহায্য নিয়ে তিনি আগুনমুখার স্রোত বেয়ে বরিশাল শহরে এসে পড়াশোনা করার সুযোগ তৈরি করে নেন। কিন্তু তাঁর মতো অমন দুর্বৃত্তের কবলে পড়ে কত শত আগুনমুখার নারীর জীবনের সলিল সমাধি হয়েছে তার ইঙ্গিত আমরা এখান থেকেই পেতে পারি। বাংলার নারী কত অসহায় একটি সময় পেরিয়ে এসেছে, ইতিহাসের এই অধ্যায় আমাদের সামনে তুলে ধরেন নূরজাহান। কিন্তু আসলে কি পেরিয়ে এসেছি আমরা সেই সময়? আজও অনেক পরিবারে, বিশেষত নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে বহু বাল্যবিবাহ ঘটে। অর্থের বিনিময়ে নাবালিকাকে বয়স্ক পুরুষের দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্ত্রী হতে বাধ্য করা হয়।

নূরজাহান এত সাহসী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবনেও কম আত্মত্যাগ করতে হয়নি। ছাত্রাবস্থায় পরবর্তীকালে ইমাদুল্লাহকে তিনি ভালোবেসেছেন সত্যি, কিন্তু ইমাদের উদাসীনতায় তাঁকে কাঁদতে হয়েছে, আবার একটা সময়ে ইমাদের একক

সিদ্ধান্তে তাঁকে বিয়ের পিড়িতেও বসতে হয়েছে। ইমাদের পরিবারের নানা সংস্কারের কাছে তাঁকে মাথা নোয়াতে হয়েছে। বাঙালি নারীর চিরন্তন অসহায়ত্ব এর মাঝে দৃশ্যমান। আবার অপরদিকে একটি মেয়ে নিজের পছন্দে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়ার পরও কত রকমের অনুশাসনের ভেতর দিয়ে সমাজে তাঁর সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠা দিতে হয়, তার ইতিহাসও আমরা দেখি এই পর্বে। বিয়ের অল্প কয়েকমাস পরে ইমাদের অকালমৃত্যু নূরজাহানের জীবনে নতুন যুদ্ধের সূচনা করে। তার মাঝেও সন্তানের দায়িত্ব, নিজের পড়াশোনা, অর্থোপার্জনের নানা চেষ্টা এই ইতিহাসকে নানাভাবে উপস্থাপন করেছে। তৎকালীন বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতে মফস্‌সল শহরে বসবাসরত একজন মধ্যবিত্ত নারীর জীবনযুদ্ধের এই চিত্র ইতিহাসের অংশ বই কিছু নয়। আগুনমুখার তীব্র স্রোতের মাঝে তৈরি ঘূর্ণির সঙ্গে নূরজাহান বোসের জীবনের বাস্তব মিল আমাদের মনে করিয়ে দেয়, এই নারী ওই নদীরই সন্তান। নদীর প্রতিকূল স্রোতে নৌকা বেয়ে চলাচল করতে করতে কখন যেন নূরজাহান নদীর মতোই সহনশীল আবার উত্তাল হয়ে উঠতে শিখেছেন।

স্বদেশ বোসের সঙ্গে সংসার করার শুরুতে স্বদেশের যে অন্যায় আচরণ তিনি মেনে নিয়েছেন তার বর্ণনাও পাই আমরা এই আত্মজীবনীতে। একজন বিধবার প্রতি স্বদেশের অনুকম্পা তাঁদের যৌথজীবনের সূত্রপাত ঘটিয়েছে ভাবলে ভুল ভাবা হবে। নূরজাহান বিধবা অবস্থায় অত্যন্ত অসহায় ছিলেন বটে, কিন্তু স্বদেশের শারীরিক ও আর্থিক অবস্থা আরও খারাপ ছিল। এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছিল, যখন স্বদেশের প্রতি দুর্বলতা নূরজাহানের নিজের জন্যই ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বদেশের প্রতি সহমর্মিতা, আর নিজের জীবনের শূন্যতাকে স্বদেশের হাত ধরে পূর্ণ করার আকুলতা, ইমাদ ও তাঁর সন্তান জসিমকে মানুষ করার তাড়না— এ সব মিলিয়ে তিনি দ্বিতীয় বিয়েতে আগ্রহী হয়েছিলেন। রান্নায় যথেষ্ট সুনাম থাকা সত্ত্বেও স্বদেশের সঙ্গে বিয়ের পর নূরজাহানের রান্নার খুঁত ধরে স্বদেশ খাবার ছুঁড়ে ফেলে দিতেন, এই বর্ণনা দিতে গিয়ে নূরজাহানের আত্মশ্লাঘা হয়, 'স্বদেশ যদি খেয়ে বলত যে, রান্না ভালো হয়নি, তাতে আমার কষ্ট হয়তো কম হত। কিন্তু মুখে না দিয়েই যখন খাবার ছুঁড়ে ফেলে দিত, তখন আমার খুব খারাপ লাগত' (পৃ. ১৬২)। তিনি এই রান্না নিয়ে বাঙালি গৃহবধূর উপর পুরুষের যে অত্যাচার তাঁর মায়ের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন, 'সে (স্বদেশ বোস) অনেকটা আমার বাবার মতোই

আচরণ করত। বাবাও একইভাবে খাবারের নানা দোষ খুঁজে বের করে প্রায়ই ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। আমাদের বাড়িতে বাবার থালাবাসন ভেঙ্গে ফেলাটা নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। মায়ের মতো আমার ভাগ্যেও তাই ঘটেছিল' (পৃ. ১৬৩)। স্বদেশের সঙ্গে করাচি বসবাস করতে গিয়েও তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছেন, কারণ পশ্চিম পাকিস্তানে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ তখন ভয়ংকর রোষানলে পড়ার কারণ। তাই স্বদেশের কাছে কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ যে এই বিয়ে নয়, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। নূরজাহান হয়তো স্বদেশের হাত ধরে বড়ো দুনিয়ায় প্রবেশ করেছেন, নিজেকে আবিষ্কারের রাস্তা খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু তাঁকে কম হারাতেও হয়নি। এক পর্যায়ে তিনি লিখছেন যে,

> স্বাধীনতার পর দিদি (ড. নীলিমা ইব্রাহীম) আমাকে বলেছিলেন, স্বদেশকে নিয়ে এ দেশে তুমি শান্তিতে থাকতে পারবে না। বাইরেই তোমরা ভালো থাকবে। আমার ইচ্ছে ছিল দেশে কাজ করার। বিশেষ করে অবহেলিত, নির্যাতিত নারীদের পাশে থেকে তাদের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করার। মানুষ যা চায়, তার সব কি সে পায়!' (পৃ. ১৫৪)

এমন করে নিজের ইচ্ছে বিসর্জন দিয়ে, নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে যে নারী একজন অন্য ধর্মের পুরুষকে জীবনসঙ্গী করে, রান্নার জন্য স্বামীর থেকে এই অন্যায্য আচরণ কখনই তাঁর প্রাপ্য হতে পারে না।

শুধু রান্না নয়, স্বদেশের সঙ্গে ইয়োরোপের জীবনেও নূরজাহান অনেকভাবে যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। তাঁর স্বামী ঘরকন্নার কিছুই করতে পারতেন না, এবং সোশ্যাল ওয়ার্কারদের সাহায্য নেবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর সাহায্যের জন্য তিনি কোনও উদ্যোগ নেননি, এটা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। নূরজাহানের এই পর্বের জীবনযাত্রা এমনকি এখনকার সময়ের বাঙালি গৃহবধূর জীবনেরই গল্প। এখনও বাংলাদেশের পুরুষ উচ্চশিক্ষার জন্য উন্নত দেশে গেলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁর স্ত্রীকে নিজের চাকুরি ছেড়ে হলেও তাঁর সঙ্গে গিয়ে থাকতে হয় ও জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই করে স্বামীর উচ্চশিক্ষায় সহায়তা করতে হয়। পুরুষের সফলতার পিছনে নারীর আত্মত্যাগের এই ইতিহাস কোথাও লেখা হয় না। তাই নূরজাহান বোসের জীবনের আখ্যান বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের এক-একটি পর্যায়ের আখ্যান হয়ে ওঠে। একজন বাঙালি নারী এরকম বৈরী সময়কে নিজের মতো করে সাজিয়ে সৃজনশীল কিছু করার উদ্যোগ নিতে পারে নূরজাহান তা করে দেখিয়েছেন। প্রতিবেশী নিঃসঙ্গ ও বিষণ্ণতায়

ভোগা মেয়েদের নিয়ে আড্ডা ও সামাজিক সহযোগিতার কাজ তিনি কেম্ব্রিজে শুরু করেন ও পরবর্তীকালে আমেরিকায় গিয়েও তা অব্যাহত রাখেন। বাঙালি নারী যেন এক বিশ্ব নাগরিক; আর এই বর্ণনায় বাংলাদেশ যেন পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে উঠে এসেছে পৃথিবীর মানচিত্রে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের বহু অন্যমাত্রিক অধ্যায়ও উঠে আসে নূরজাহানের আত্মজীবনীতে। বহু রাজনৈতিক নেতাকর্মীর সঙ্গে তিনি একান্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন, বা তাঁর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার জন্য অনেকের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত ছিলেন, যার ফলে তাঁদের ব্যাপারে বেশ কিছু না-জানা বিষয় তাঁর জবানিতে উঠে আসে। বাংলাদেশের অনেক নাম-না-জানা রাজনীতিবিদ যাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের স্বার্থে কাজ করে গেছেন, তাঁদের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় হয় এই সূত্রে। বরিশালের বহু কমিউনিস্ট নেতাকর্মী ও বিপ্লবীকে আমরা একান্ত নিজস্ব পরিবেশে দেখতে পাই। মনোরমা বসু, যিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন ১৯৪০-এর দশকে, তাঁকে নূরজাহান একান্ত কাছে থেকে দেখছেন ও পাঠকের সামনে নিয়ে আসছেন। তাঁর অসীম সাহস, ধৈর্য, মানবতাবোধ—এসবের মর্মস্পর্শী বয়ান পাই আমরা এই আত্মজীবনীতে। স্বামী স্বদেশ বোস ছাড়াও মনোরমা, হীরেন ভট্টাচার্য, নুরুল ইসলাম, হাসান ইমাম, প্রশান্ত দাশগুপ্ত, আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, এরকম বহুবিধ মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে লেখকের, এবং তাঁদের সংস্পর্শে এসে তিনি জীবনের নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। বাংলাদেশের জন্মলগ্নে ঢাকা শহরে বসবাসের যে অভিজ্ঞতার বয়ান করেছেন তাও অসাধারণ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণসহ গোটা ১৯৭১ সাল জুড়ে যুদ্ধের মাঝে ঢাকা শহরে অবস্থানের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। ২৩শে মার্চ ছাত্রলীগের আহ্বানে বাংলাদেশের পতাকা টাঙাতে চেয়েছেন নিজের বাড়ির ছাদে। ২২শে মার্চ নিজের হাতে পতাকা তৈরি করেছিলেন। তাঁর বাড়িতে ওইদিন সন্ধ্যায় বেড়াতে আসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার কথা স্মরণ করেছেন, 'আমাদের পতাকা বানানো দেখে দাদা সাবধান করে বললেন, নূরজাহান, তুমি স্বদেশ বোসের স্ত্রী! হুট করে পতাকা তুলো না। চারদিক দেখেশুনে তবেই পতাকা উঠিও' (পৃ. ২১২)। একজন মুসলিম নারী হয়ে অন্য ধর্মীর স্ত্রী হওয়ায় তাঁকে অন্যদের থেকে অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে। তারপরও তিনি দমে যাননি। ২৩শে মার্চ ছেলেমেয়েসহ ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে গিয়ে

জনমানুষের ঢল দেখে ফিরে এসে উৎসাহিত হয়ে নিজের বাড়ির ছাদে পতাকা তুলেছেন। আবার সেই পতাকা নামিয়ে নিজের শাড়ি কেটে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করতে হয়েছে।

২৫শে মার্চের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। স্বামীর সঙ্গে জানালায় বসে 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর হত্যাযজ্ঞের শব্দ শুনেছেন। চাক্ষুষ করেছেন মুসলিম লিগ নেতা সবুর খানের বাড়িতে ২৫শে মার্চ পরবর্তী কর্মকাণ্ড। ২৬শে মার্চ ছাদে উঠে বাইরে দেখার চেষ্টা করতে গিয়ে মিলিটারির গুলি ছোঁড়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর। বেতারে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মেজর জিয়াউর রহমানের দেওয়া বাংলাদেশের যুদ্ধের ঘোষণা শুনেছেন। হিন্দু ধর্মাবলম্বী স্বামীর প্রাণ বাঁচানোর জন্য ঢাকা শহর ছাড়তে হয়েছে এরপর। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাঁদের এই যুদ্ধকালীন বেঁচে থাকার গল্প যে-কোনও মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসকে মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু আগরতলা থেকে দড়ি বেয়ে যেভাবে তিনি কলকাতাগামী বিমানে উঠেছিলেন সেই বর্ণনা যে-কোনও উপন্যাসকেই হার মানাবে। বিমানের মেঝেতে বসে কলকাতায় পৌঁছে যেভাবে তিনি স্বামীর আত্মীয়স্বজনকে খুঁজে বের করে আপন করে নিয়েছেন, তা সত্যিই অতুলনীয়। এ যেন, স্বজনহারা মানুষের বিশ্বজোড়া আপনজন। কলকাতায় বহু গুণীজনের সান্নিধ্যে ঋদ্ধ হয়েছেন, তেমনি মুক্তিযুদ্ধের শরণার্থীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন।

একটি বিশেষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন তিনি অন্নদাশংকর রায় ও তাঁর স্ত্রী লীলা রায়কে নিয়ে, যা থেকে মানবতাবাদী নূরজাহান সাম্যবাদী ও নারীবাদী হয়ে উঠেছেন। লীলা রায় নিজের জাতীয়তা, আত্মীয়স্বজন, সর্বোপরি নিজের ভাষাকে বিসর্জন দিয়ে যেভাবে ভারতীয় বধূ হিসেবে অন্নদাশংকর রায়ের সঙ্গে সংসার করেছেন, তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, কিন্তু অন্নদাশংকর রায়কে কখনও অসম্মান করেননি। বাংলাদেশের মানুষ মাতৃভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, সেই জাতির একজন হয়ে তিনি লীলা রায়ের মাতৃভাষা বিসর্জন দিয়ে একটি জীবন কাটিয়ে দেওয়া মেনে নিতে পারেননি। জাতীয়তাবোধ ও অন্য ভাষী মানুষের প্রতি তাঁর এই সমবেদনা আধুনিকতা ও বিশ্বজনীনতার যে ইঙ্গিত বহন করে তা স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বার্তা বহন করে। বিশ্বায়ন ও বহুজাতীয়তাবাদের যুগে বাংলার মানুষকে এমন মানসিকতাই ধারণ করতে হবে। অপরপক্ষে, বাঙালি নারীর সামাজিক প্রথা ও এমনকি বিশেষ

ক্ষেত্রে সেই প্রথাগত ধারায় আবদ্ধ উচ্চশিক্ষিত নারীকে দেখেও তিনি বিস্মিত হয়েছেন। নবনীতা দেব সেনের ক্ষেত্রে তিনি একজন নারীর দৃষ্টিতে তাঁর কষ্টের প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়েছেন, এবং অমর্ত্য সেনকে কোনও কটাক্ষ করেননি, কিন্তু এত অসম্মানের পরও নবনীতার অমর্ত্য সেনের প্রতি ভালোবাসা দেখে সামান্য হলেও অসন্তুষ্ট হয়েছেন বৈকি। নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রীর কথাও উঠে এসেছে এখানে, যেখানে নীরদ চৌধুরীর আপাত সাহেবি জীবনের পেছনের বঞ্চনার অন্ধকার পাঠকের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছে। তবে সমস্ত বয়ানে একটি পরিমিতিবোধ থাকায় কোনও গল্পই রুক্ষ সমালোচনার রূপ নেয়নি।

একদিকে বহু গুণী মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটেছে এই আত্মচরিতের মধ্যে দিয়ে, আবার একই সঙ্গে ১৯৪৭ পরবর্তী ভারতবর্ষের একটি বড়ো বাঙালি গোষ্ঠী পশ্চিমা দেশগুলোতে থিতু হচ্ছে, এই দৃশ্যও পাঠক দেখতে পাচ্ছে। পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মাঝে একই সঙ্গে সেতু বন্ধন, আবার কোথাও একটা আলাদা সত্তা গড়ে উঠছে—দেশভাগ পরবর্তী এক বোধ থেকেই যাচ্ছে এই বর্ণনায়। এটি আরও প্রকট হয়ে উঠছে ১৯৭১-এর যুদ্ধের সময় কলকাতায় অবস্থানরত লক্ষ লক্ষ অভিবাসীর জীবনযাত্রায়। স্বদেশ বোসের দাদার পরিবারের সঙ্গে মিলিত হবার মধ্য দিয়ে নূরজাহান একাধারে মিলিত হবার তাড়না আবার সেই সঙ্গে অপ্রতিরোধ্য বিচ্ছেদের যন্ত্রণার কথা জানাচ্ছেন। ধর্মীয় রাজনীতি, দাঙ্গা—বারবার ঘটনার মাঝে উপস্থিত হয়ে দেশভাগকে মনে করিয়ে দেয় এই আত্মজীবনীতে।

তবে আমেরিকার জীবনে নতুন করে পড়াশোনা শুরু করা বা চাকরি ও সামাজিক জীবনে স্বামীর পরিচয়ের বাইরে নিজের পরিচয় তৈরি করা ও স্বকীয়তার পরিচয় দেয়ার যে গল্প নূরজাহান লিখেছেন, তা যেন আপামর শিক্ষিত বাঙালি নারীর জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে। শান্তিনিকেতনে প্রফেসর অশোক রুদ্রের সঙ্গে কথোপকথনে নূরজাহানের নারীবাদ ও বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তি অনেকটাই বাঙালি নারীর উচ্চশিক্ষিত হয়ে উঠতে পারার সংগ্রামের ইতিহাস মনে করিয়ে দেয়। নূরজাহান একাধারে সুবিধাবঞ্চিত এবং সুবিধাপ্রাপ্ত নারীদের প্রতিবিম্ব হয়ে ওঠেন।

স্বদেশ বোসের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আত্মজীবনীর পরিসমাপ্তি হলেও নূরজাহান অনেকটা সময়কে অতিক্রম করে এরই মাঝে ১৯৭১ পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মীয় নিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের পরাজয়ের গল্পও কিছুটা তুলে

এনেছেন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর হত্যা আর তার সঙ্গে আব্দুর রব সেরনিয়াবাতসহ তাঁর পুরো পরিবারের হত্যা অন্য এক রূপ নিয়েছে এই গ্রন্থে। যেহেতু সেরনিয়াবাত নূরজাহানের উভয় স্বামীর সূত্রে তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন, তাঁর কন্যা রোজীর, নূরজাহানের প্রিয় বন্ধু, যাকেও প্রাণ দিতে হয় সেই কালরাত্রিতে, এই জাতীয় হত্যা ব্যক্তিগত হারানোর শোকের মতো মনে হয়। বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের এরকম নানা অধ্যায়কে অন্যভাবে দেখার সুযোগ হয় পাঠকের এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে।

উপসংহারে বলা যায় যে, নারীর আত্মজীবনী জাতীয় ইতিহাসের এক অজানা অধ্যায়কে তুলে আনার ক্ষেত্রে এক অনন্য ভূমিকা পালন করে, কারণ নারীর অতীতকে অবলোকন করা ও তার খুঁটিনাটি বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করার ভাষা ভিন্ন। এলেন দ্যুবোয়া যেমন আমেরিকার ইতিহাসের নানা সময়কে নারীর চোখ দিয়ে দেখলে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যাবে বলে দাবি করেছেন, তেমনি নিঃসন্দেহে দাবি করা যায় যে, নূরজাহান বোসের এই আত্মজীবনী বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের ইতিহাসের নানা সময়কে এক অন্য আলোকে উপস্থাপন করেছে যা ইতিহাসের পরিপূরক হতে পারে। বরিশালের আগুনমুখা নামক আগ্রাসী নদীর পাকদণ্ডী বেয়ে নূরজাহানের ইউরোপ ও আমেরিকা জীবনযাপনের পরিক্রমা একটি ক্ষুদ্র জাতিরাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশের স্থান করে নেওয়ার ইতিহাস। এই বাংলাদেশ গড়ে ওঠার পিছনে বহু নারীর আর্থ-সামাজিক অবদান রয়েছে যা আজও অজানা। এই ইতিহাসকে আরও ভালোভাবে বুঝতে হলে নারীর আত্মকথনের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান, সামাজিক রাজনৈতিক জীবনে নারীর অংশগ্রহণের স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন, এবং সেটা না হলে ইতিহাসের প্রতি সুবিচার করা যাবে না।

গ্রন্থঋণ

নূরজাহান বোস, *আগুনমুখার মেয়ে*, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১।

রাফসান গালিব, ‘গণতন্ত্রহীনতা রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব বাড়িয়ে দিয়েছে’। বিশেষ সাক্ষাৎকার: হুমায়ুন কবির, *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০ আগস্ট ২০২৩। https://www.prothomalo.com/opinion/interview/bbvzd9igvd

Berryman, Charles, "Critical Mirrors: Theories of Autobiography". *Mosaic: An Interdisciplinary Critical Journal*, March 1999, Vol. 32, No. 1, 1999. pp.

71-84. https://www.jstor.org/stable/44029420.

DuBois, Ellen, "Through Women's Eyes": The Challenges of Integrating Women's History and U.S. History in the Writing of a College Textbook". *OAH Magazine of History*, Vol. 19, No. 2, 2005. pp. 7-9. https://www.jstor.org/stable/25163754.

Liller, Stefan, "Stories: New Directions for Human Development in Bangladesh". *UN Newsletter*, 17 December 2023. https://bangladesh.un.org/en/256074-new-directions-human-development-bangladesh.

Satchidanandan. K., "Reflections: Autobiography Today". *Indian Literature*, Vol. 54, No. 2 (256), 2010. pp. 6-9. https://www.jstor.org/stable/23341994.

কলকাতা চলন্তিকা: ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও সমকালীন সমাজ (১৯১১-১৯৩১)

ঋতজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু,
‘চেয়ে দেখো’ ‘চেয়ে দেখো’ বলে যেন বিনু।
চেয়ে দেখি, ঠোকাঠুকি বরগা-কড়িতে,
কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে।
ইঁটে-গড়া গণ্ডার বাড়িগুলো সোজা
চলিয়াছে, দুদ্দাড় জানালা দরজা।
রাস্তা চলেছে যত অজগর সাপ,
পিঠে তার ট্রামগাড়ি পড়ে ধুপ্ ধাপ্।
দোকান বাজার সব নামে আর উঠে,
ছাদের গায়েতে ছাদ মরে মাথা কুটে।
হাওড়ার ব্রিজ চলে মস্ত সে বিছে,
হ্যারিসন্ রোড চলে তার পিছে পিছে।
মনুমেন্টের দোল যেন খেপা হাতি
শূন্যে দুলায়ে শুঁড় উঠিয়াছে মাতি, ...
লক্ষ লক্ষ লোক বলে, ‘থামো থামো’
কোথা হতে কোথা যাবে, একি পাগ্‌লামো!’
কলিকাতা শোনে নাকো চলার খেয়ালে,
নৃত্যের নেশা তার স্তম্ভে দেয়ালে।...

সঞ্চয়িতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ চৈত্র ১৩৬৭

ভূমিকা

১৯১১ সালে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ গ্লাসগো এবং বম্বে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের অনুকরণে কলকাতায় একটি ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট গঠন করে। উদ্দেশ্য ছিল, এই সংস্থা জাতীয়তাবাদী মিউনিসিপাল রাজনীতির আবর্তের খানিক বাইরে থেকে কলকাতার সামগ্রিক নাগরিক ব্যবস্থা নিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা রচনা ও বাস্তবায়িত করবে। বিশ শতকের প্রথমার্ধে বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিচালিত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট মধ্য-উত্তর কলকাতা জুড়ে অনেকগুলি চওড়া ও মোটর-বান্ধব রাস্তা বানায়। তার সঙ্গে কয়েকটি শহরতলির পরিকল্পনাও করা হয়। ধরে নেওয়া হয়, নতুন রাস্তা বানানোর সময়ে যারা বাস্তুচ্যুত হবে, বা সুযোগমতো চড়া দামে সম্পত্তি বিক্রি করে দেবে, তারা সবাই ওইসব শহরতলিতেই চলে যাবে। শহরতলিগুলিকে যদি শহরের সঙ্গে নতুন রাস্তা, ট্রামলাইন ইত্যাদি দিয়ে জুড়ে দেওয়া যায়, তবে তো কথাই নেই। শহরে থাকবে সচ্ছল মানুষ। আর শহরতলি থেকে ট্রামে-বাসে যাতায়াত করবে নিম্নমধ্যবিত্ত ও বিত্তহীন মানুষজন। পরিকাঠামো উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে জমির দাম। রাস্তার পাশের অধিগৃহীত জমি চড়া দামে বাজারে ছেড়ে ট্রাস্ট সহজেই খরচাপাতি চালিয়ে নিতে পারবে, আর সেই ফাঁকে কিছুটা মুনাফাও করে নিতে পারবে, এই ছিল পরিকল্পনা।

আজকের মতো সেই সময়েও উত্তর ও মধ্য কলকাতা ছিল অত্যন্ত জনাকীর্ণ। বাজারের মধ্যেই পাকা ঘরবাড়ি আর তার পাশেই হয়তো মাটির ঘরের বস্তি। সরু সরু কিলবিলে সব রাস্তার জাল, কোনও কোনওটা আবার দুম করে শেষ হয়ে যায় একটা পাকাবাড়ির পাঁচিলে বা উঠোনে। তার মধ্যেই খুলে গেছে দোকান-পসার। সেইসব রাস্তায় চলছে সাধারণ মানুষ, কুলি, ফেরিওয়ালা, মোটবোঝাই গরুর গাড়ি, পালকি, ঘোড়ার গাড়ি আর দুটো একটা মোটর।

যেমন পরিকল্পনা, তেমন কাজ। ট্রাস্টের সাহেবরা বস্তি আর ঘিঞ্জি পাড়াগুলির মাঝখান দিয়ে চালিয়ে দিলেন মস্ত মস্ত সব রাস্তা। বহু বস্তি শেষ হয়ে গেল। অনেক পাকা বাড়িঘরও ছাড় পেল না। নতুন রাস্তার মুখে যে-কোনও কিছুই যেন প্রতিরোধের দ্যোতক, যাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে রাস্তাকে গতিময় হতে হবে। সমকালীন সাহিত্যে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের এই কর্মযজ্ঞ যথেষ্ট ছাপ রেখে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' শীর্ষক কবিতাটি আগেই উল্লেখ করেছি—বিশ শতকের কলকাতা এক অস্থির ও চলন্ত শহর।

যাই হোক, দুটো বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানের সময়ে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের ভাঙচুর কলকাতায় নানাধরনের সামাজিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়

কলকাতার কিছু ভারতীয় ব্যবসায়ীর হাতে টাকা এসেছিল। কিন্তু উদ্বৃত্ত পুঁজি বিনিয়োগ করার মতো কোনও সহজ ও তাৎক্ষণিক ক্ষেত্র ছিল না। তাই হঠাৎ-ধনী ব্যবসায়ীরা জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে ফাটকা খেলা শুরু করেন। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের বানানো রাস্তার ধারের জমি, বস্তি ও পাড়াগুলি (যেমন সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ সংলগ্ন এলাকাগুলি) হয়ে ওঠে পুঁজির নতুন খেলার মাঠ। বড়োবাজারের অর্থবান মাড়োয়ারি গোষ্ঠী অতি দ্রুততার সঙ্গে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ সংলগ্ন অঞ্চলগুলির জমি কেনা-বেচা শুরু করেন। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন বস্তিবাসী মুসলমান জনগোষ্ঠী। রাতারাতি বস্তিগুলি বড়োলোকের আবাস কিংবা ব্যবসার জায়গা বা বাজারে পরিণত হয়। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে কলকাতার এইসব অঞ্চল অনেক রক্তক্ষয়ী মুসলমান-মাড়োয়ারি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সাক্ষী থেকেছে (১৯১৮, ১৯২৬)। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের রাস্তার কাজ, এলাকা পুনর্গঠন, জমি নিয়ে ফাটকা খেলা, আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পরস্পরের সঙ্গে বিজড়িত ছিল। এই বিষয়টির উপস্থাপনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

১

শহর ও শহরতলি

আগেই বলেছি, নতুন রাস্তা বানানো ছাড়াও ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল কলকাতার আশপাশের অঞ্চলগুলিকে নিয়ে নগর পরিকল্পনা করা এবং তাদের সঙ্গে উত্তর ও মধ্য কলকাতাকে জুড়ে দেওয়া। তেমন কিছু অঞ্চল ছিল উত্তর-পূর্বে মানিকতলা, উত্তরে কাশীপুর, দক্ষিণে টালিগঞ্জের উত্তরে কিছু অঞ্চল, আজ যেখানে রবীন্দ্র সরোবর, সাদার্ন অ্যাভিনিউ ও রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। পুবে গড়িয়াহাট রোড আর পশ্চিমে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের কর্তাব্যক্তিরা ভেবেছিলেন, উত্তর থেকে ছিন্নমূল মানুষজন (কিছু মধ্যবিত্ত ও বাকি শ্রমিক শ্রেণির মানুষ) এইসমস্ত অঞ্চলে ঠাঁই পাবে।

কিন্তু বাস্তব ছিল অন্যরকম। এইসব অঞ্চলে নগর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই জমি কেনা-বেচার সেই ফাটকা খেলা শুরু হয়ে যায়। তার উপর কলকাতার এইসব প্রান্ত অঞ্চল সেইসময় নীচু জমি, জলা, পুকুর, খালবিলে পরিপূর্ণ ছিল। জলাজমির ওপর মাটি ও শক্ত জঞ্জাল ফেলে উঁচু জমি না বানাতে পারলে নগর পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ছিল একেবারেই অসম্ভব। দ্রুত সেই কাজ সারতে গরুর গাড়ি করে আনা হল মণ মণ রাবিশ। উত্তর ও মধ্য কলকাতায় তখন প্রচুর ভাঙচুর চলছে। মূলত সেখান থেকেই আনা হল যতসব জঞ্জাল।

হাজার হাজার মজুর বহু বছর ধরে মাটি তুলে ইট বানাল। মাটি তোলা শেষ হলে 'খনন এলাকা' পরিণত হল আজকের রবীন্দ্র সরোবরে।

এই কাজ করার সময় ছোটোখাটো লড়াই-ঝগড়া লেগেই থাকত স্থানীয় ও পরিযায়ী মজুরদের মধ্যে। মজুরি বাড়ানোর দাবিতে ১৯২১ ও ১৯২৬ সালে দু-বার মাটি কাটার মজুরেরা কাজ বন্ধও করে দিয়েছিলেন। বর্ষাকালে জলাজমি ভরাট করার কাজ অত্যন্ত দুরূহ। প্রতি বছর এই কাজ করতে গিয়ে অজস্র গরুর গাড়ি মাটির নীচে বসে যেত।

নগরায়ণের এইসব প্রাকৃতিক প্রতিরোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অজস্র আইনি জটিলতা। মনের মতো ক্ষতিপূরণ না পেয়ে অনেক ভদ্রলোক শ্রেণির বাসিন্দারা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের বিরুদ্ধে হাই কোর্টে মামলা ঠুকে দিয়ে কাজের গতি মন্থর করে দিলেন। দক্ষিণ শহরতলির একটি মামলা তো চার বছর ধরে ঘুরেফিরে শেষে লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে গিয়ে মিটল। রায় ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের পক্ষেই গেল শেষমেশ, কিন্তু জমি অধিগ্রহণের কাজ থমকে থাকল প্রায় পাঁচ বছর (১৯১৬-১৯২০)।

এর উপরে ছিল নানাধরনের চুরি-ডাকাতির অভিযোগ। বিশাল বিশাল এলাকায় রাত্রিবেলায় উপযুক্ত নজরদারির বন্দোবস্ত ছিল না। ১৯২২ সালে চেতলা এলাকার নামকরা ব্যবসায়ী ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য বাবু অমূল্যধন আড্ডি অভিযোগ করেন, স্থানীয় চালকলগুলির মালিকদের প্রশ্রয়ে 'গুন্ডারা' মাটি এবং নির্মাণসামগ্রীর ডাকাতি-কালোবাজারি শুরু করে দিয়েছে। গুন্ডারা টালি নালার মাঝি-মাল্লাদের হাত করে এইসব সামগ্রী গঙ্গা ধরে জলপথে বিহার, দিল্লি ও উত্তর ভারতের নানা জায়গায় পাচার করে দিচ্ছে। মনে রাখতে হবে, দিল্লিতেও তখন এক নতুন শহর তৈরির ধুম পড়ে গেছে। তাই নির্মাণসামগ্রীর কালোবাজারি যথেষ্ট লাভজনক ছিল।

যাই হোক, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের হাতে উত্তর ও মধ্য কলকাতার পুনর্নির্মাণের গতি আর শহরতলির নগরায়ণের বাস্তবতায় সময়ের একটা বড়ো ব্যবধান ছিল, যার ফলে নিম্নমধ্যবিত্ত ও বস্তিবাসী জনতার মধ্যে বাস্তুসমস্যা এক চরম আকার ধারণ করে। কিছু তথ্য জড়ো করে আমি ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করছি। এই উদ্দেশ্যে আমরা একবার ফিরে যাই ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ স্কিম-এ। শহরের মধ্যে এই স্কিমটিই ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

১৮৫৪ সালে অল্ডারম্যান উইলিয়াম ক্লার্ক (কলকাতার ভূগর্ভস্থ নিকাশিব্যবস্থার রূপকার) কলকাতার মানচিত্রে একটি রাস্তার রেখা এঁকেছিলেন,

যার উত্তর প্রান্তে বাগবাজার আর দক্ষিণ প্রান্তে ধর্মতলা। রেখাটি ছিল সে যুগের হ্যালিডে স্ট্রিটের প্রলম্বিত ও বর্ধিত কল্পনা। আজকের সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ বা চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ এই রেখাটিরই বাস্তব রূপ। ১৯১৪ থেকে ১৯৩১-এর মধ্যে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ধর্মতলা থেকে এই রাস্তার কাজ শুরু করে উত্তরে বিডন স্ট্রিট অবধি পৌঁছে যায়। প্রায় তিন মাইল লম্বা এই রাস্তা প্রস্থে ছিল ১০০ ফুট। এই রাস্তা বানানোর সময় প্রায় ২০০.১ একর জমি থেকে উচ্ছেদ হয় ৫০,০০০-এর বেশি মানুষ। বৌবাজার, কলুটোলা, জোড়াবাগান, জোড়াসাঁকো আর সুর্তিবাগান এলাকাগুলির ভোল বদলে যায়।

সে যুগে এই এলাকাগুলিতে নানা ধর্ম, শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস ছিল। একদা ধনী ও শহুরে জমিদার শ্রেণির বাঙালি ভদ্রলোকের সম্পত্তির পাশেই গজিয়ে উঠেছিল অধুনা বড়োলোক মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা। অজস্র ভাড়াবাড়িতে বসবাস করত নিম্নমধ্যবিত্ত অনেক হিন্দু পরিবার। অনেক প্রজন্ম ধরে বাড়ি ভাগ হতে হতে একই বাড়িতে গাদাগাদি করে বাস করত অনেক পরিবার। পাশেই ছিল উর্দুভাষী মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজনের বসবাস। বাজার এলাকাগুলি কাছেপিঠে গড়ে ওঠার কারণে ওই একই অঞ্চলে আস্তানা ছিল বহু বাঙালি, হিন্দুস্তানি, হিন্দু ও মুসলমান শ্রমিক শ্রেণির মানুষের। তাঁদের বেশিরভাগই পুরুষ, পরিবার ফেলে গ্রাম থেকে শহরে এসেছেন জীবিকার সন্ধানে। ছিল যাযাবর কাবুলি ব্যবসায়ীদের আড্ডা। আর ছিল কলকাতায় পড়তে আসা ছাত্রেরা। তাঁরা বিভিন্ন বোর্ডিং হাউস, মেসবাড়ি, আর হোস্টেলে বসবাস করতেন। অনেক পরিযায়ী শ্রমিক, ছোটো দোকানদার, কাবুলি ব্যবসায়ীরা ফুটপাতেই ঘর বানিয়ে ফেলেছিলেন। অনেক সময়েই এইসব ঘিঞ্জি এলাকায় জীবন ও জীবিকার সহাবস্থান দেখা যেত। এখন এসব অঞ্চল অনেক পালটে গেছে। কিন্তু যতটুকু বেঁচে আছে, তার থেকে এমন কিছু ঐতিহাসিক অনুমান একেবারেই যে অসম্ভব, তা নয়।

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ রাক্ষসের মতো একে একে অনেক ছোটো ছোটো গলি হজম করে ফেলল। বিমল মিত্রের *সাহেব বিবি গোলাম* থেকে একটি বর্ণনা তুলে দিলাম:

> ওদিকে বউবাজার স্ট্রিট আর এদিকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ। মাঝখানের সর্পিল গলিটা এতদিন দুটো বড়ো রাস্তার যোগসূত্র হিসেবে কাজ চালিয়ে এসেছিল। কিন্তু আর বুঝি চললো না। বনমালী সরকার লেন বুঝি এবার বাতিল হয়ে গেল রাতারাতি। আধখানা আগেই গিয়েছিল সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ তৈরির সময়ে, এবার বাকি আধখানাও শেষ।... ভার পড়েছে ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের ওপর।

> গলিটাতে ঢুকে হঠাৎ মনে হবে বুঝি সামনের বাড়ির দেয়ালটা পর্যন্ত ওর দৈর্ঘ্য। কিন্তু বুকে সাহস নিয়ে এগিয়ে গেলে অনেক মজা মিলবে। নীচু নীচু বাড়িগুলোর রাস্তার ধারের ঘরগুলোতে জমজমাট দোকানপত্তর। বাঁকের মুখে বেণী স্বর্ণকারের সোনা রুপোর দোকান। তারপর পাশের একতলা বাড়ির রোয়াকের ওপর 'ইন্ডিয়া টেলারিং হল্'। কিছুদূর গিয়ে বাঁ-হাতি তিন রঙা ন্যাশন্যাল ফ্ল্যাগ আঁকা সাইনবোর্ড। প্রভাসবাবুর 'পবিত্র খদ্দর ভাণ্ডার'। তারপরেও আছে গুরুপদ দে'র 'স্বদেশী-বাজার'। যখন স্বদেশী জিনিস কিনতে খদ্দেরের ভিড় হয় তার জেরটা গিয়ে ঠেকে পাশের বাড়ির 'সবুজ-সংঘে'র দরজা পর্যন্ত। ...
>
> নোটিশ দিয়েছে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট যথাসময়।...
>
> নোটিশের পেছন পেছন এল চেন, কম্পাস, শাবল, ছেনি, হাতুড়ি, কোদাল, গাইতি, ডিনামাইট— লোকলস্কর, কুলিকাবারি। আর এল ভূতনাথ। ওভারসিয়ার ভূতনাথ। ভূতনাথ চক্রবর্তী।

১৯১১ আর ১৯২১-এর মধ্যে বস্তিবহুল ও মুসলমান-প্রধান কলুটোলার জনঘনত্ব ৩২.৫ শতাংশ কমে গেল। জোড়াসাঁকোর জনঘনত্ব কমল ৩.২ শতাংশ। এই দুই অঞ্চলে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ স্কিম-এর জন্য ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট যথাক্রমে ৩৩.৩০ আর ২২.৬০ একর জমি অধিগ্রহণ করেছিল। ১৯০১, ১৯১১, আর ১৯২১-এর আদমশুমারি অনুযায়ী কলুটোলার একর-পিছু জনঘনত্ব ক্রমশ ২৮২, তারপর ২৫৫, ও ১৭২-এ নেমে আসে। বিশ শতকের প্রথম তিন দশক জুড়ে বড়োবাজারের মাড়োয়ারিরা মুসলমানদের সরিয়ে দক্ষিণে কলুটোলায় বসতি স্থাপন করতে থাকে। ১৯৩১-এর আদমশুমারি এই ঘটনাকে ''মাড়োয়ারি এক্সোডাস অ্যালং দ্য সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ'' বলে অভিহিত করেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আমলে এইসব অঞ্চলের জমির দাম ছিল আকাশছোঁয়া। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ১৯১৬ থেকে ১৯১৯-এর মধ্যে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট প্রেসিডেন্সি কলেজের পিছনের ১১টি প্লট নিলামে বিক্রি করে। মোট আটজন মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী এই জমিগুলি কেনেন। তাঁরা কাঠা-পিছু ৬৫ হাজার থেকে ৯০ হাজার টাকা পর্যন্ত মূল্য দিতে রাজি হন। জমি নিয়ে ফাটকা খেলার প্রসঙ্গ আগেই উঠেছিল। এই ছিল তার বাস্তব রূপ।

২

বাসস্থানের অভাব

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে জনবিন্যাস পরিবর্তনের আরও কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক। এই কাজে কলকাতার কিছু স্ট্রিট ডিরেক্টরির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

১৯১৮-য় সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ সংলগ্ন ৪৯ নম্বর বলরাম দে স্ট্রিটে একটি উর্দুভাষী মুসলমান-অধ্যুষিত বস্তির কথা পাওয়া যায়, কিন্তু ওই একই ঠিকানায়, ১৯৩৩-এ উল্লেখ পাওয়া যায় একটি সলিসিটার ফার্মের। ১৯১৮ সালে ৫০ নম্বর বলরাম দে স্ট্রিটে একটি ছোটো 'বেশ্যালয়' ছিল। বাড়িটি ছিল নারান দাসী ও নারান মোতি দেবীর নামে। ১৯৩৩ সালের ডিরেক্টরিতে এই ঠিকানা অবলুপ্ত। ৫২ নম্বরে তিনটি ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অফিস ছিল ১৯৩৩-এ। ১৯১৮-তে এদের কোনও উল্লেখ ছিল না। ১৯১৮ সালে ৫২ নম্বর বলরাম দে স্ট্রিটের অস্তিত্বই নেই। অর্থাৎ, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের গায়ে লাগা এই রাস্তাটি অনেক পরিবর্তনের সাক্ষী। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনটি হল এই যে, এই ছোট্ট রাস্তাটি একটি বাসস্থান-ঘন এলাকার থেকে একটি ছোটোখাটো অফিসপাড়ায় রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে ১৯১৮ থেকে ১৯৩৩-এর মধ্যে।

এই একই রূপান্তর হচ্ছে মুসলমান-অধ্যুষিত জাকারিয়া স্ট্রিটের। ১৯১৮-র ডিরেক্টরি এই রাস্তায় তিনটি ঠিকানার কথা লিখেছে। ১৯৩৩-এ গিয়ে আমরা ৫৪টি ঠিকানার সন্ধান পাচ্ছি। সব বাণিজ্য-সংক্রান্ত ঠিকানা। লোয়ার চিৎপুর রোড থেকে সুর্তিবাগান পর্যন্ত মোট ৩৫টি ঠিকানা, সবগুলিই মুসলমান ব্যবসায়ীদের নামে। আর সুর্তিবাগান এলাকার প্রায় সব সম্পত্তিই বাণিজ্যিক। এগুলি বাঙালি হিন্দু বা মাড়োয়ারিদের নামে নথিভুক্ত।

যুদ্ধের বাজারে এমনিতেই জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়ছে। আর তার মধ্যে হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত। এর ফল হল মারাত্মক। উত্তর আর মধ্য কলকাতায় বাড়িভাড়া লাগামছাড়া হয়ে গেল। ১৯২০ সালে প্রাদেশিক আইনসভায় স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, কেবলমাত্র ১৯১৭ আর ১৯২০-র মধ্যেই গড়ে ৫০ শতাংশ ভাড়া বেড়ে গিয়েছে শহর আর শহরতলিতে। বাড়িভাড়ার অগ্নিমূল্য নিয়ে মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে আইনসভার সদস্য বর্ধমানের মহারাজা (বিজয়চাঁদ মহাতব) আশঙ্কা প্রকাশ করেন, কলকাতা দ্বিতীয় এক বলশেভিক রেভোল্যুশনের মতো পরিস্থিতিতে পৌঁছে গেছে। আইনসভার বিভিন্ন সদস্য মন্তব্য করেন যে কলকাতায় যেন একটা বাড়িভাড়ার ঝড় ('Rent storm') উঠেছে, আর সেই ঝড় যেন কলকাতাকে এক 'বাসস্থান মন্বন্তরে' ('House famine') ফেলে দিয়েছে। মনে রাখা জরুরি, যুদ্ধের বছরগুলিতে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ৬৪৩টি পাকাবাড়ি ধূলিসাৎ করেছিল এবং ৬৮৭ বিঘা জমি (মূলত বস্তি) অধিগ্রহণ করেছিল। আর সেই অনুপাতে নতুন ঘরবাড়ি তৈরি হয়নি। এই মন্বন্তর কেবলই যে নেটিভ ভাড়াটিয়াদের বিপাকে ফেলেছিল তাই

নয়, এর ছোঁয়া থেকে বাদ যায়নি চৌরঙ্গির সাহেবপাড়াও। ওই অঞ্চলের বহু ঘরবাড়ি আর দোকানের মালিক ছিলেন বাঙালি জমিদার ও মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা। এই অঞ্চলের ভাড়া গড়ে তিন গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯২০-র শীতকালে সাহেবদের কাগজ *দ্য স্টেটসম্যান* একটি প্রতিবেদনে জানায়, অনেক সাহেবসুবো ঘরবাড়ি ত্যাগ করে হোটেলে রাত্রিবাস করছেন। এই অবস্থায় মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের ইউরোপীয় গোষ্ঠী সমস্যার সমাধানের জন্য চাপ বাড়াতে থাকে। সাময়িকভাবে কিছু বন্দোবস্ত করা গেলেও সাধারণ মানুষের বাসস্থানের অভাব মেটেনি। ১৯৩১ সালে কলকাতার একটি বাড়িতে গড়ে ১৬ জন বাস করত, ১৯৪১-এ সংখ্যাটা দাঁড়ায় ২৭.৫।

ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের কর্তারা ভেবেছিলেন, শহরতলিগুলিকে সাজিয়ে তুলতে পারলে শহর থেকে জনতা শহরতলির দিকে চলে যাবে। তাঁদের ধারণা ছিল, জনবিচ্ছুরণ হবে শ্রেণির ভিত্তিতে। যে যত গরিব, সে তত দূরে ঠাঁই পাবে। এটা এমন কিছু একটা নতুন কথা ছিল না। ১৯১১-র আদমশুমারি একথা স্পষ্ট করে দিয়েছিল, বাস্তবিকভাবেই প্রায় দু-দশক ধরে মানুষজন শহরতলিমুখী। ১৯০১ আর ১৯১১-র মধ্যে বেনিয়াপুকুরের জনসংখ্যা ৫৩.৫ শতাংশ বেড়েছিল। ওই একই দশকে বালিগঞ্জের জনসংখ্যা বেড়েছিল ২৮ শতাংশ। এন্টালি, বেনিয়াপুকুর, আর টালিগঞ্জে মহিলাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ছিল লক্ষণীয়।

অর্থাৎ, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের যুগ শুরু হওয়ার আগেই এইসব অঞ্চল স্থায়ীভাবে বসবাসকারী পরিবারে ভরে গিয়েছিল। কাজেই, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের যুগে গৃহহীন হওয়া মানুষের জন্য শহরতলিগুলির বহু অঞ্চলই সাশ্রয়ী ছিল না। শরিকি ভাগযোগ মিটিয়ে ক্ষতিপূরণের পুঁজি দিয়ে শহরতলির জমি কেনা ছিল প্রায় অসম্ভব।

যুদ্ধের সময়ে কলকাতা ও লন্ডনের জমির দামের একটি তুলনামূলক আলোচনা দেখাচ্ছে যে, কলকাতার শহরতলির জমির দাম লন্ডনের তুলনায় গড়ে ২০ গুণ বেশি ছিল, যখন মধ্য কলকাতার জমির দাম ছিল লন্ডনের জমির দামের ৪ বা ৫ ভাগের একভাগ। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট যা ভেবেছিল, তার চেয়ে শহর আর শহরতলির মধ্যে জমির দামের পার্থক্য অনেক কম ছিল। কাজেই, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট যেভাবে জনবিচ্ছুরণ কল্পনা করেছিল, তা বাস্তবায়িত হল না। আমার ধারণা, সব পরিকল্পনার ইতিহাসই আসলে ব্যর্থতার ইতিহাস, কখনও ট্রাজেডি, কখনও বা প্রহসন। জনজীবনের মধ্য দিয়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়, আর তাদের ঠোকাঠুকিতে যা তৈরি হয়, তার সঙ্গে পরিকল্পনার অমিল স্বাভাবিক।

১৯২১-এর আদমশুমারি উল্লেখ করেছে যে ১৯১১ আর ১৯২১-এর মধ্যে ৯০ হাজার বস্তিবাসী গৃহহীন হয়েছিল। এদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। ১৯২৬-এ *সত্যাগ্রহী* পত্রিকা মন্তব্য করে: '...by all virtue of the Improvement Trust Act the condition of Calcutta is, indeed being improved day by day, but the town is at the same time, being gradually destitute of Musalman'. ১৯২৭-এর আরেকটি রিপোর্ট দেখায়: 'growing tendency among the Mohammedan workmen to migrate from the central parts to the eastern and south-eastern wards such as 14, 15, 16 and 48, 49'.

৩

দাঙ্গা

কলকাতা বরাবরই হিন্দুপ্রধান। কিন্তু প্রদেশ হিসেবে তদানীন্তন বাংলা ছিল মুসলমানপ্রধান। হিন্দুদের শক্তি তুলনামূলকভাবে বেশি হলেও কলকাতার মিউনিসিপাল রাজনীতিতে মুসলমানরা একেবারে নগণ্য ছিলেন না। উনিশ শতকের শেষের দিক অবধি কুলি ও মজুরদের মধ্যে মুসলমানদের প্রাধান্য বেশি ছিল। কিন্তু উনিশ শতকের ৯০-এর দশক থেকে রাজপুতানা, সংযুক্ত প্রদেশ (উত্তরপ্রদেশ) ও বিহার থেকে হাজার হাজার হিন্দু শ্রমিক শহরের বাজারগুলিতে ভিড় জমাতে শুরু করে। তাদের অভিবাসনের সঙ্গে মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের একটা বিরাট যোগ ছিল। মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা মুসলমানদের হঠিয়ে হিন্দু-হিন্দুস্থানি শ্রমিকদের দারোয়ান ও মুটে-মজুর হিসেবে নিয়োগ করার পক্ষপাতী ছিলেন।

কারণটা সহজ। মাড়োয়ারিদের একটা বড়ো অংশ নিজেরাই তখন অন্য জায়গা থেকে এসে একটু একটু করে ব্যবসার ভিত শক্ত করছেন। ব্যবসা রক্ষা করতে গেলে শ্রমিক হিসেবে 'নিজেদের' লোক চাই। সে যুগে কলকাতার বাজারগুলিতে হিন্দু-মুসলমান কলহ এক নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। দাঙ্গা একবার শুরু হয়ে গেলে মুসলমান শ্রমিকরা মাড়োয়ারিদের দোকান লুঠপাট করতে ছাড়বেন না। কখনও কখনও নিম্নশ্রেণির স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান হাত মিলিয়েও লুঠপাট চালাতে পারে। সে উদাহরণও ভূরি ভূরি। তার চেয়ে, সস্তায় যদি একটা পরিযায়ী লেঠেলবাহিনী পোষা যায়, তাহলে বিপদের দিনে সুরক্ষাও পাওয়া যাবে, আবার বহু শ্রমিকের জোগানের ফলে মাথাপিছু মজুরিও কমে যাবে। ১৯২০-র দশক থেকে বাজার কলকাতার এই হিন্দু-জৈন সম্প্রদায়ের

মধ্যে উত্তর ভারতের কিছু প্রভাবশালী হিন্দু নেতার (যথা—মদনমোহন মালব্য) প্রভাব উল্লেখযোগ্য ছিল। অন্যদিকে, মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে খিলাফত আন্দোলনের সময় থেকে নাখোদা মসজিদকে ঘিরে একটা রাজনৈতিক বলয় দানা বাঁধছিল। কলকাতার নেতাদের সঙ্গে উত্তর ভারতের প্রভাবশালী মুসলমান নেতাদের নিত্য আনাগোনা ছিল নাখোদা মসজিদে। কলকাতা বন্দরে আর ফলমূলের বাজারগুলিতে মুসলমান মস্তানদের দাপট ছিল চোখে পড়ার মতো। অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলনের সময় থেকে সুরাবর্দির নেতৃত্বে এই মস্তান বাহিনী সংহত হতে শুরু করে।

এই দুই লেঠেলবাহিনীর ওপর ভর করে ১৯১৮ থেকে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার চরিত্র বদলে যায়। উত্তর ভারতের কোথাও দাঙ্গা শুরু হলে তা কলকাতায় প্রভাব ফেলতে শুরু করে, আবার কলকাতায় একবার দাঙ্গা বেধে গেলে তা আর একটা বা দুটো এলাকায় আটকে থাকে না। ছড়িয়ে পড়ে। হাওড়া শিল্পাঞ্চল, বারাকপুর শিল্পাঞ্চল, বন্দর, আর মধ্য কলকাতার বাজার দাঙ্গার আগুনে একাকার হয়ে যায়। এই নতুন দাঙ্গায় সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশি হয়, আর প্রচুর রক্তও ঝরে।

কিন্তু সব দাঙ্গার আবার একটা স্থানীয় প্রেক্ষিত থাকে। আমার বইতে আমি দেখিয়েছি, কীভাবে কলকাতায় ১৯১৮ থেকে ১৯৪৬ অবধি হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ইতিহাস আর ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের ইতিহাস নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। বিশেষ করে ১৯১৮ আর ১৯২৬-এর দাঙ্গাদুটির মানচিত্র আর ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের কর্মকাণ্ডের মানচিত্র অনেকটাই মিলে যায়। উত্তরে বিডন স্ট্রিট, দক্ষিণে বৌবাজার স্ট্রিট, পূর্বদিকে কলেজ স্ট্রিট, আর পশ্চিমে স্ট্র্যান্ড রোড। দুটি ইতিহাসের এই সমাপতন নিছক আকস্মিক নয়। এই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে আমি এই প্রবন্ধের ইতি টানব।

১৯১৮ আর ১৯২৬-এর দাঙ্গাদুটির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস দেখিয়েছেন শ্রমিক শ্রেণির মুসলমানরা (যথা— কসাই, দর্জি, কুলি, গাড়োয়ান, কারখানার শ্রমিক, মাঝি -মাল্লা) বিশেষ করে মাড়োয়ারিদের ঘরবাড়ি, আড়ত, আর দোকান ধরে লুঠপাট চালাত। সবচেয়ে বেশি সংঘর্ষ হত শ্রমিক শ্রেণির হিন্দুদের (যথা—হিন্দুস্থানি দারোয়ান, গাড়োয়ান, মুচি, মেথর, কুলি) সঙ্গে। বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণির সম্পত্তির ওপর হামলা খুব কম হয়েছে। ১৯২৬-এর একটি গোয়েন্দা রিপোর্ট তো এমনও বলেছিল যে, হিন্দু বস্তি-মালিক আর মুসলমান ভাড়াটিয়াদের মধ্যে একটি বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল। দু-পক্ষই

ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট আর মাড়োয়ারিদের হাতে একটানা মার খাচ্ছিল। ১৯২৬-এর দাঙ্গায় মেছুয়াবাজারের অনেক ধনী মুসলমান পেশোয়ারি ফলবিক্রেতাও সর্বস্বান্ত হন।

১৯১৮-র দাঙ্গা প্রসঙ্গে হোম ডিপার্টমেন্টের এক সাহেব আধিকারিকের এই উক্তি থেকে দাঙ্গার ইতিহাস আর পরিকল্পনার ইতিহাসের সমাপতন পরিষ্কার হয়ে যায়: 'The savagery shown towards Marwaris by Muhammadans in Calcutta gives reasons for thinking that to some extent the cause of disturbances was local. Mr. Banerjee told me yesterday that the quarter in which the worst disturbances occurred used to be occupied by Muhammadans; that the Calcutta Improvement Trust had in the course of its operation acquired a good deal of land in that quarter and had resold it to Marwaris for the purpose of building substantial houses and shops; that the Muhammadans resented their eviction very keenly and vented their wrath on the Marwaris'. (Home Department, Political Branch, November 1918, Nos. 164-201, Note by J. Hullah, 19.9.18– (NAI), 5.)

১৯১৮ আর ১৯২৬-এর দাঙ্গায় হিন্দুদের থেকে মুসলমানদের ক্ষতি ঢের বেশি হয়েছিল। সব শ্রেণির মুসলমান প্রাণ বাঁচাতে ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। মাড়োয়ারিরাও পালিয়ে যান ও আশ্রয় নেন তাঁদের শহরতলির বাগানবাড়িগুলিতে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার জানাচ্ছেন: 'Mohamedans have left the city with the intention of remaining absent for some considerable time and have returned to their original homes.' ওই একই রিপোর্টে পুলিশ কমিশনার জানাচ্ছেন, বহু হাজার মুসলমান কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যান। তাঁদের অনেকেই আর ফিরে আসেননি। যাঁরা ফিরে এসেছিলেন, তাঁদের অনেকেই দেখলেন যে চাকরিটা আর নেই *('The Calcutta Riots', Extracts from the 'Report of the Commissioner of Police on the Calcutta Riots from the 2 to 15 April 1926', in India in Home Polity, January-June 1926, vol. I [Calcutta: The Annual Register Office, 1926], 81.)*।

১৯২৬-এর দাঙ্গা ধীরে ধীরে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক বয়কটের রূপ গ্রহণ করে। মাড়োয়ারিরা সিদ্ধান্ত নেন যে তাঁরা কিছুতেই আর মুসলমান কর্মচারী রাখবেন না। কিন্তু এই জেদ বেশিদিন টেকেনি, কারণ জেদ বজায় রাখলে পারিশ্রমিক বাবদ খরচা ক্রমেই বেড়ে চলেছিল।

উপসংহার

এই প্রবন্ধে আমি ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের কিছু অজানা, অধুনা-বিস্মৃত, কিংবা আধ-জানা ইতিহাস তুলে ধরলাম। আমার লক্ষ্য ছিল এই প্রতিষ্ঠানটির প্রথমদুটি দশকের কিছু কর্মকাণ্ডের সূত্র ধরে দেখানোর চেষ্টা করা যে, কীভাবে একটি প্রতিষ্ঠানের 'সামাজিক ইতিহাস' লেখা সম্ভব। নগর পরিকল্পনার ইতিহাস আর দাঙ্গার ইতিহাস একসঙ্গে পাঠ করা জরুরি। আর সেই সঙ্গে আমরা দেখলাম, কীভাবে নগর পরিকল্পনার ইতিহাসের প্রশ্ন দাঙ্গার ইতিহাসে প্রাসঙ্গিক এবং দাঙ্গার ইতিহাসের প্রশ্ন নগর পরিকল্পনার ইতিহাসে প্রাসঙ্গিক। এই দুই ইতিহাস মিলিয়ে পড়লে কলকাতার মতো দক্ষিণ এশিয়ার অনেক ঔপনিবেশিক শহরের ইতিহাস অন্যভাবে ভাবা বা লেখা যেতে পারে।

কী সেই ভাবনা? ভাবনাটি হল এই যে, গণহিংসা ও জমির বাজারের চাহিদা-জোগানের আন্তঃসম্পর্ক ধরে আধুনিক শহরের বিবর্তনের ইতিহাস লেখা সম্ভব। কলকাতার ক্ষেত্রে এই ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় ১৯৪৬-এর দাঙ্গা আর দেশভাগের হাত ধরে। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতা শহর দুটি অসমান ভাগে ভাগ হয়ে যায় হিন্দু—শহর, রেফিউজি শহর, ও মুসলমান ঘেটো। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে আমার বইয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে (Bandyopadhyay: 2002)।

তথ্যসূত্র

Bandyopadhyay, Ritajyoti, *Streets in Motion*: *The Making of Infrastructure, Property, and Political Culture in Twentieth-century Calcutta*, Cambridge: Cambridge University Press, 2022.

Das, Suranjan, *Communal Riots in Bengal*, 1905-1947, Delhi: Oxford University Press, 1993.

বিমল মিত্র, *সাহেব বিবি গোলাম*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, ১৯৫৩।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্বপ্ন', *সহজপাঠ* (দ্বিতীয় ভাগ), কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৩৭ (বঙ্গাব্দ)।

কৌস্তুভমণি সেনগুপ্ত, 'চেনা কলকাতাকে না পাল্টেই বদল সম্ভব: পথ দেখাতে পারে একটি বাতিল রিপোর্ট', রোববার, ২০২৪: https://robbar.in/column/kolikatha-episode-1/

অপরের সংস্কৃতি

শিমূল সেন

'অপরের সংস্কৃতি' নিয়ে ভাবতে-ভাবতেই, একটা পুরোনো বিতর্কের কথা মনে এল। 'সংস্কৃতি' শব্দটাকে আদৌ যতটা সর্বমান্য ভাবি আমরা, তাই-ই কি? 'কখনও কখনও হয় এমন,' শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় বছরকয়েক আগে কলকাতায় একটি বক্তৃতায় নিংশে উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, 'যখন নিতান্তই হালনাগাদ কোনও শব্দের গায়ে প্রাচীনত্বের মহিমা আরোপ হয়।' তিনি আরও বলেছিলেন, সংস্কৃতি শব্দটাও বস্তুত এই গোত্রের। সত্যি বলতে, বাংলা ভাষায় এ শব্দের আমদানি একশো বছরও নয়।

এক হিসেবে দেখতে গেলে, সংস্কৃতি-নামক ধারণাটির ভেতরেই আত্ম ও অপরের একটা সূক্ষ্ম সমীকরণ লুকিয়ে রাখা আছে। সংস্কৃতি একটা ক্ষমতাবিশেষ, যা কোনও নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে প্রণোদনা দেয়, অন্য কোনও গোষ্ঠীর চেয়ে নিজেকে উচ্চ শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসাতে। অর্থাৎ কিনা, সংস্কৃতি একটা essence— একটা সার— যা কিনা দুই জনগোষ্ঠীর আত্মিক ও জাতিগত পার্থক্যকেই নির্দেশ করে। এই শতকের গোড়ায়, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, এখন নিউইয়র্কের অধ্যাপক ও ইতিহাসবিদ অ্যান্ড্রু সার্টোরি বাঙালি ভদ্রলোকের কুলুজি বিচার করতে গিয়ে দেখিয়েছিলেন, সংস্কৃতিই বাঙালির ভাবাদর্শ। বাঙালি ভদ্রলোকের আত্মপরিচয়ের মূল কথা: সংস্কৃতি। অতএব, যে তার অপর, সে হীন— কেন-না, সে অসংস্কৃত।

সংস্কৃতি শব্দটিকে তাই আরামসে টুকে নেওয়ার কোনও কারণ নেই। আর সমস্ত অবধারণার মতোই, সংস্কৃতিও একটি স-বিশেষ (particular) ভাবকল্প—

তারও একটা স্থানকালপাত্র কাজ করে, তারও একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে। উপনিবেশের ঋতুতে, অন্য অনেক ভাবকল্পের মতোই (ধর্ম, প্রগতি, সভ্যতা, স্বাধীনতা ইত্যাদি-প্রভৃতি) তারও উদ্ভব বাংলাভাষী ভদ্রলোকের মননচর্চায় স্বরাজ-স্থাপনের অভিপ্রায়ে। এই সত্যিটাকে স্বীকার না-করে, নিছকই 'অপর' জনগোষ্ঠীর স্কন্ধে সংস্কৃতিচর্চার ভূত ক্ষেপণ করলে, তা একটা মস্ত বৌদ্ধিক অসততা হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য।

সংস্কৃতির শেকড়বাকড়

সংস্কৃতি শব্দটার অগ্রজ এবং তুতো বেরাদর নেহাত কম ছিল না বাংলা ভাষায়। ১৮৮০-র দশকে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব মনে করুন। গুরু এবং শিষ্যের ভেতর সংলাপ চলছে, গুরু বার বার নাদান শিষ্যকে বোঝাচ্ছেন যে অধুনার ইংরেজি-প্রকুপিত জলহাওয়ায়, ম্যাথু আর্নল্ড-গোছের বুদ্ধিজীবীর হাতফেরতা তোমরা কালচার শব্দটা শিখেছ। কিন্তু, 'কালচার বিলাতী জিনিষ নহে। উহা হিন্দুধর্মের সারাংশ।'

মাথায় রাখতে হবে, আর্নল্ড 'কালচার অ্যান্ড অ্যানার্কি' বইটি লিখছেন ১৮৬০-এর দশকে। শিরোনামেই প্রমাণ, অ্যানার্কি-র বিপরীত শব্দ যে 'হায়ারার্কি', ভিক্টোরিয়ান ব্রিটেনে দাঁড়িয়ে আর্নল্ড তার সঙ্গে কালচারকে একাকার করে দিচ্ছেন। অর্থাৎ, অসংস্কৃতিই সামাজিক নৈরাজ্যের লক্ষণ। শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্বে ১৮৪০ দশক থেকেই ইয়োরোপ উত্তাল। সেই যুগমুহূর্তে দাঁড়িয়ে— থাকবন্দি, শ্রেণিবিভক্ত সমাজের ওপর বুর্জোয়া কর্তৃত্বের প্রশ্নটাকে আর্নল্ড মিশিয়ে দিচ্ছেন সংস্কৃতির দ্যোতনায়। অর্থটা সোজা। কালচার বা সংস্কৃতি কেবল আত্মপরিচয়ের বাহনই নয়। সময়-সময়, অপরের ওপর পীড়ন চালানোর ভাবাদর্শ-কৌশলও বটে। আর্নল্ডের বক্তব্যে নন্দনের প্রশ্নটা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, ভেতরে, মোদ্দায় রয়েছে ক্ষমতা এবং ভাবাদর্শ। একই সময়, জার্মানি ছেয়ে ফেলছে সংস্কৃতি-বাচক দুটি পৃথক নামপদ: 'কুলতুর' এবং 'বিল্ডাং'। অর্থাৎ, ইয়োরোপে ১৮৫০ দশক থেকেই নাগাড়ে চলছে কালচার-মন্থন।

অথ শব্দানুশাসনম্! শব্দের কোটরে মোহিনী ক্ষমতা থাকে, সহিংসতাও। উপনিবেশের তন্ত্রজাল উনিশ শতক ব্যেপে বাঙালি ইন্টেলেকচুয়ালের মস্তিষ্ক ছেয়ে ফেলতে থাকল। সেই সঙ্গে-সঙ্গে হাজিরা জমাল এক গুচ্ছ শব্দমালাও। প্রোগ্রেস, সিভিলাইজেশন, কালচার, নেশন... তালিকা এক-এক করে আরও বাড়ানো যেতে পারে। এই সমস্ত শব্দের গায়েই উপনিবেশ চড়িয়ে দিল পূত

স্বতঃসিদ্ধতার, নৈতিক শ্রেয়তার বল্কল। ততখানি সংস্কৃতিমনস্ক নয় যারা— তারা জাতিগত ভাবে দুর্বল, হীন। কালচারের মতো নিতান্তই আপতিক, বিতর্কযোগ্য একটি 'ডিসকোর্স' পরিণত হতে থাকল অনড়, অচল, স্বতঃসিদ্ধ 'টেক্সট'-এ। এ যেন দাবার প্রথম চাল দিয়ে ফেলার মতো—বাকি খেলাটা সেই গতিবিধির পিছু-পিছুই ঘুরতে থাকবে।

অবশ্য, মোচড়ও আছে। এই প্রথম চাল যদি প্রভুমন্যতার আদি স্মারক হয়ে থাকে, তবে তার পেছন-পেছন প্রতি-প্রভুমন্যতা (কাউন্টার-হেজিমনি) আসবেই। হয়েওছিল তাই। প্রসঙ্গত, গ্রামশি কাউন্টার-হেজিমনি নিয়ে বলতে গিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন। জানিয়েছিলেন, এই কাউন্টার-হেজিমনিপ্রসূত ক্ষমতার ভাষা উঠে আসে স্বীকরণ (অ্যাপ্রো-প্রিয়েশন)-এর ভেতর দিয়ে। সংস্কৃতি ধারণাটিকে স্বীকরণের এই রাজনীতি ছাড়া বোঝা সম্ভবই নয়। ধর্মতত্ত্ব সেই স্বীকরণের পয়লা নম্বর পাঠ। বিদেশি পরতন্ত্র-নিক্ষিপ্ত একটি শব্দকে কীভাবে মুচড়ে, দলা পাকিয়ে তাকে আত্তীকৃত আর প্রতিসৃত করে নেওয়া যায়— এবং, আরও জরুরি— তার ভিত্তিতে চ্যালেঞ্জ জানানো যায় ঔপনিবেশিকতার নায্যতাকে— 'সংস্কৃতি' ধারণাটির স্বীকরণ তার এক উল্লেখযোগ্য নমুনা বই-কি।

বঙ্কিম প্রস্তাব রেখেছিলেন, কালচারের নতুন চেহারা হোক 'অনুশীলন'। এই বক্তব্য গণপরিসরে যথেষ্ট কল্কেও পেয়েছিল। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ-ঘোষণার পর সশস্ত্র বিপ্লববাদে দীক্ষিত তরুণরা অনুশীলনের এই মন্ত্রেই উজ্জীবিত হবেন। কিন্তু, অনুশীলনের এই রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা বেশি দিন বহাল থাকেনি। এরই মধ্যে গান্ধিবাদী আন্দোলনের মহরত ঘটে গেছে ১৯২০-র দশকে, বাংলার মতো শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত-মথিত বন্দর-শহর থেকে রাজনৈতিক ভরকেন্দ্র আক্ষরিক অর্থেই সরে গেছে উত্তর ও মধ্যদেশের গ্রামভারতে। শাসনতন্ত্রে যুক্তপ্রদেশের ধারণা আস্তে আস্তে উঠে আসছে। এই সময়টা গুরুত্বপূর্ণ, কেন-না বাঙালি সমাজের ভেতরেও আত্ম আর অপরের নতুন-নতুন সংজ্ঞা তৈরি হচ্ছে। ১৯২০ দশক থেকেই আইনসভায় জনসংখ্যার সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক বণ্টন নিয়ে উতরোল শুরু হবে— আজকের প্রশাসনিকতা-সর্বস্ব রাজনীতির সূচনামুহূর্ত যাকে বলা যায়। সব্যসাচী ভট্টাচার্য দেখাচ্ছেন, মফস্‌সল ও পুববাংলা থেকে শহরের দিকে পরিযান ঘটছে— সাংস্কৃতিক মানচিত্রে কলকাতার একচ্ছত্র দাপট আর একটু কোণঠাসা। মন্ত্রিত্ব হোক বা খেলার মাঠ— বাঙালি মুসলমানের স্বরাজের দাবি আরও জোরালো। সত্যি বলতে, সারা ভারতেই এক অবস্থা—

অখণ্ড কোনও জাতি-ভাবনার উলটো দিকে, ফাটলগুলো ক্রমেই তীব্রতর। মন্দার আগে, বাজার-অর্থনীতির কল্যাণে, সম্ভোগের নতুন নতুন ফিকির খুলে যাচ্ছে— ভদ্রলোক পরিণত হচ্ছে খরিদ্দারে, আর ক্রয়ক্ষমতার নিরিখে গড়ে উঠছে রুচি-নির্মাণের নতুন সব ব্যাকরণ।

এ রকম একটা পরিস্থিতিতে, ১৯২২ নাগাদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ফ্রান্সে যান। ওখানে থাকতে থাকতেই, এক মারাঠি বন্ধুর থেকে কালচার-অর্থে বহাল 'সংস্কৃতি' শব্দটার অস্তিত্ব জানেন এবং বাংলায় প্রয়োগ করেন। কিছু দশক পর, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে *সোনার বাংলা* পত্রিকায় এ নিয়ে একটা প্রবন্ধে সুনীতিকুমার জানিয়েছিলেন, শব্দটা শোনা মাত্র তাঁর মনে ধরেছিল। কিন্তু ওই মারাঠি বন্ধুটি সুনীতিকুমারের 'আনন্দ দেখে একটু বিস্মিত হন— তিনি বললেন যে তাঁরা তো বহুকাল ধ'রে মারাঠী ভাষায় এই শব্দ ব্যবহার করে আসছেন।' আন্তঃপ্রাদেশিক লেনদেনে কসমোপলিটান, গোঁড়ামিহীন সুনীতিকুমারের আপত্তি ছিল না। সংস্কৃতির সমান্তরালেই, বাংলায় তখন খুব চলত 'কৃষ্টি' শব্দটা। 'সংস্কৃতি' নামেই একটা প্রবন্ধে সুনীতিকুমার এই শব্দটারও ছানবিন করে দেখিয়েছিলেন— তরুণ বৈদিক সাহিত্যে কৃষ্টির ব্যঞ্জনা তিন রকম। এক, কৃষিকাজ। দুই, চষা-খেত। তিন, এবং এ ক্ষেত্রে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ— কর্ষণক্ষেত্রের রূপকার্থে, বৃহদর্থে, দেশ এবং জাতি।

আবার ক্ষিতিমোহন সেনের লেখা থেকে ধার করলে দেখা যাবে, বৈদিক সাহিত্যে সংস্কৃতি শব্দটা যতই ভুঁইফোড় হোক-না কেন, *ঐতরেয় ব্রাহ্মণে* এর কিছু সূত্র মিলবে। সংস্কৃতি, কালচারের মতোই, একটি প্রক্রিয়া, যার লক্ষ্য ধাবিত নৈতিক উৎকর্ষের দিকে। বেদের শ্লোক আউড়ে সুনীতিকুমার বলবেন, 'শিল্পই হল আত্মসংস্কৃতি' (এই একই শ্লোক ১৯৩৩ সালে রবীন্দ্রনাথের লেখা 'ছন্দের প্রকৃতি' বক্তৃতায় থাকবে)।

উল্লেখ্য, কৃষ্টির পক্ষে অন্যতম সওয়ালকারী ছিলেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। ওঁর যুক্তিটা ছিল এ রকম: কালচারের মূলে আছে লাতিন শব্দ কুলতুরা, যার মানে চাষবাস। ফলে, সেই ব্যঞ্জনাকে নিরাপত্তা দেওয়াও প্রতিশব্দকারের অন্যতম দায়িত্ব। রামপ্রসাদের গান টেনে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলেছিলেন, 'অমরকোষে পণ্ডিত শব্দের বত্রিশটি সমার্থ শব্দ আছে। তন্মধ্যে কৃ-ষ্টি একটা। মেদিনীকোষ কৃ-ষ্টি শব্দের দুইটা অর্থই ধরেছেন, পুংলিঙ্গে 'বুধ', স্ত্রীলিঙ্গে 'আকর্ষ'। ভূমির কর্ষণ হয়, চিত্ত ভূমিরও কর্ষণ হতে পারে।

রামপ্রসাদ তার সাক্ষী। পশ্চিমদেশের সংস্পর্শে সে দেশের নানা সংস্কার আসছে নূতন নূতন শব্দও রচিত হচ্ছে। কৃষ্টি নবরচিত নয়, কিন্তু অর্থে অবিকল কালচার।'

এমন চিন্তাশূন্য ও অপরিমেয় কৃষ্টিকরণের বিরুদ্ধে, রবীন্দ্রনাথ দ্ব্যর্থহীন দাঁড়ালেন সুনীতিকুমারের পাশে। কেউ রবীন্দ্ররচনার কালানুক্রমিক খতিয়ান নিয়ে বসলেই বুঝতে পারবেন, তিরিশ-দশক থেকেই মওকা বুঝে এ দিক-সে দিক রবীন্দ্রনাথ গুঁজে দিচ্ছিলেন কৃষ্টি-সংক্রান্ত ওঁর অসন্তোষ। খুলে দেখুন 'গদ্যছন্দ', 'বাংলাভাষা-পরিচয়' কিংবা 'মানুষের ধর্ম'-র মতো বক্তৃতা কিংবা প্রবন্ধ। *তাসের দেশ*-এর পাণ্ডুলিপি কাটাকুটি করতে করতে, সংশোধিত বয়ানে আমরা দেখি: হতভম্ব রাজা ইস্কাবনবৃন্দের গলায় কৃষ্টির জয়নাদ শুনে জিগ্যেস করছেন, 'কৃষ্টি? এটা কী জিনিস?' উত্তর: 'কৃষ্টি মিষ্টিও নয়, স্পষ্টও নয়। এই কৃষ্টি আজ বিপন্ন!' সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা লম্বা চিঠিটি— যা পরে 'কালচার ও সংস্কৃতি' নামে প্রবন্ধ হয়— খুলে দেখতে পারেন। ৮ ডিসেম্বর ১৯৩২, রবীন্দ্রনাথ বলছেন: 'কাল্‌চার্‌ শব্দের একটা নতুন বাংলা কথা হঠাৎ দেখা দিয়েছে; চোখে পড়েছে কি? কৃষ্টি। ইংরেজি শব্দটার অভিধানিক অর্থের বাধ্য অনুগত হয়ে ঐ কুশ্রী শব্দটাকে কি সহ্য করতেই হবে। এঁটেল পোকা পশুর গায়ে যেমন কামড়ে ধরে ভাষার গায়ে ওটাও তেমনি কামড়ে ধরেছে। মাতৃভাষার প্রতি দয়া করবে না তোমরা?... অন্য প্রদেশে ভদ্রতা বোধ আছে। এই অর্থে সেখানে ব্যবহার 'সংস্কৃতি'। যে-মানুষের কালচার আছে তাকে বলা চলে সংস্কৃতিমান, শব্দটাকে বিশেষ করে যদি বলা যায় সংস্কৃতিমত্তা, ওজনে ভারী হয় বটে কিন্তু রোমহর্ষক হয় না। নিজের সম্বন্ধে অহংকার করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, তবু আন্দাজে বলতে পারি, বন্ধুরা আমাকে কালচার্‌ড বলেই গণ্য করেন।' শেষে, *পরিচয়* পত্রিকার উদ্দেশে লিখলেন, 'তোমাদের সম্পাদকবর্গের কাছে আমার এই প্রশ্ন, চিৎপ্রকর্ষ বা চিত্তপ্রকর্ষ বা চিত্তোৎকর্ষ শব্দটাকে কালচার অর্থে চালালে দোষ কি? কালচার্‌ড মানুষকে প্রকৃষ্টচিত্ত লোক বলা যেতে পারে। কালচার্‌ড ফ্যামিলিকে প্রকর্ষবান পরিবার বললে সে-পরিবার গৌরব বোধ করবে। কিন্তু কৃষ্টিমান বললে চন্দনের সাবান মেখে স্নান করতে ইচ্ছা হবে।'

কেউ বলতেই পারেন, রবীন্দ্র-প্রবর্তিত সংস্কৃতি-নামক ধারণায় এভাবেই কৃষি তথা জৈবিকতার সঙ্গে ভদ্রলোকের মানসলোকের একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেল। কর্ষণের অভ্যন্তরে যে নিত্যবৃত্ত, পৌনঃপুনিক, দৈনন্দিনতায় মোড়া শ্রমসাধ্যতার দুনিয়া— সংস্কৃতি-নামক ধারণাটি যেন তার চেয়ে কিঞ্চিৎ উদ্‌বৃত্ত, অতিরিক্ত।

রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক মেনে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৩১ সালে *পরিচয়* পত্রিকায় প্রস্তাব করেছিলেন নতুন শব্দ: পরিশীলন। আত্মসত্তার নিয়ত উৎকর্ষণের মাধ্যমে শীলিত, শোধিত কোনও নৈতিক শ্রেয়তার দিকে যাত্রা— সংস্কৃতি-র এই মোদ্দা কথাটা সুধীন্দ্রনাথেও বহাল। সিরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব গবেষক সমর্পিতা মিত্র দেখিয়েছিলেন, *শনিবারের চিঠি*-র মতো সাহিত্যপত্রিকা কালচারের এই নব্যবঙ্গীয় অবতারকে বিশেষ রেয়াত করেনি। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে, অগ্রহায়ণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ আর সুনীতিকুমারদের মতো রবীন্দ্র-পরিকরদের *শনিবারের চিঠি*-র তরফে খোঁটা দেওয়া হচ্ছে ‘কালচার-অভিমানী ঠাকুর-পূজারীগণ’ বলে।

টিপ্পনীটা জরুরি। এক দিকে, অ-ভদ্রলোক কায়িক শ্রমের সঙ্গে বাঙালি বুর্জোয়া-সম্পৃক্ত সংস্কৃতি-ধারণার একটা বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। অতঃপর, জৈবিকতা-শ্লিষ্ট, বস্তুচাহিদা-মথিত প্রকল্পের সঙ্গে সংস্কৃতির ধারণাকে মেলানো যাবে না। বাঙালি ভদ্রলোক মূলত নগরলোকের বাসিন্দা— ফলে, তার সংস্কৃতিও দাঁড়িয়ে রয়েছে এই উদ্‌বৃত্তের ধারণার ওপরেই। অতীতে গ্রামদেশস্থ জমির ভিত্তিতে তার খাজনা-আদায় হয়ে থাকুক-না কেন, নাগরিক পরিশীলন এসে সেই পরম্পরাকে চ্যুত করেছে, এবং গড়ে তুলেছে নাগরিক বুর্জোয়া সম্প্রদায়, আর তার সংস্কৃতির নিজস্ব সনদ।

নীহাররঞ্জন রায় তাঁর ‘কৃষ্টি, কালচার, সংস্কৃতি’-তে এই মোকামেই স্পষ্ট জানিয়েছিলেন: শিল্পকলা বা সাহিত্য— এগুলি তাৎক্ষণিক চাহিদার বিষয় হতে পারে না। অর্থাৎ, ভাতকাপড় আর সংস্কৃতির ভেতর একটা অনপনেয়, মৌল তফাত রয়েছে। সংস্কৃতির চালিকা শুদ্ধতা, শীলন, আর— নীহাররঞ্জনের ভাষায়— ‘সম্মার্জনা’। এই আত্মকর্ষণ, এই অনন্তর ক্রম-উত্তরণ নিছকই ভৌত নয়— বরং, আধ্যাত্মিক। সত্তার পরম মুক্তিই তার ঈপ্সিত। ফলে, কর্ষণের রূপক তাকে আঁটতে পারে না।

সংস্কৃতি-র অপর কে

১৯৩০ দশকের ভেতর সংস্কৃতি-র একটা সংজ্ঞায়ন ঘটে গেল বাঙালি হিন্দু বুর্জোয়ার মননে। খানিকটা রবীন্দ্র-প্রবর্তিত, খানিকটা আবার তার নিজস্ব ঐতিহাসিক বিবর্তনের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে। সংস্কৃতি হল তা-ই, যা জৈবিক নয়— মানসিক; এবং যা নাগরিক, পৌর, এবং মানুষী চাহিদা-অতিরিক্ত ভাবকল্প।

সংস্কৃতি-র এই সংজ্ঞায়ন খানিকটা প্রতিধ্বনিত হল সুনীতিকুমারের লেখাতেও। শব্দতাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশিই সুনীতিকুমার বললেন, সভ্যতা এবং সংস্কৃতি— এই ধারণা দুটো একে-অন্যের খানিক দূরত্বে দাঁড়িয়ে। একটা দূরত্ব কালানুক্রমিক। সভ্যতার ধারণা প্রাচীন ও ক্লাসিকাল, সংস্কৃতি অনেক সাম্প্রতিক। আদি গ্রিস বা ভারতের সভ্যতায় দেখা যায়: সভ্য কে, আর অসভ্য-ই বা কে, তার একটা শ্রেয় নৈতিক মানদণ্ড ছিল। কোথাও সেই মাপনি হল নগরসভ্যতা, কোথাও-বা— যেমন ভারতের ক্ষেত্রে— বর্ণব্যবস্থা। সিভিটাস শব্দমূল থেকে সিভিলিটি শব্দটা এসেছে— যার অর্থ, শহর। আরবি অভিধানেও, মদিনা বা শহর হল সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। মহম্মদের হিজরত— মক্কা থেকে মদিনায় প্রতিসরণ— রূপান্তরিত হচ্ছে একটা বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পটবদলে। ইয়োরোপীয় ভাষাতেও কালচার আর সভ্যতার সম্পর্ক সমানুপাতিক— যে-মিতালি খানিকটা নৃতত্ত্ব-নামক বিদ্যাবর্গের ভেতর ঘুরেফিরে এসেছে। 'সংস্কৃতি' প্রবন্ধে সুনীতিকুমারের এক-বাক্যের উপমান-আশ্রিত সংজ্ঞায়ন: 'সভ্যতা-তরুর পুষ্প আর আভ্যন্তর প্রাণ বা মানসিক অনুপ্রেরণা...— culture.'

অর্থাৎ, সংস্কৃতি-নামক ধারণাটি অনস্বীকার্যভাবেই বিশিষ্ট— সার্বিক নয়। এবং, দ্বিতীয়ত, এই বয়ানের একটা কর্তা রয়েছে— হিন্দু বাঙালি ভদ্রলোক। একটা নির্দিষ্ট যুগমুহূর্তে দাঁড়িয়ে, 'সংস্কৃতি' হয়ে গেল বাঙালি হিন্দুর আত্ম-পরিচয়ের দ্যোতক।

সময়টা মাথায় রাখার। ১৯২০-র দশক থেকেই আস্তে আস্তে হিন্দু বাঙালির পাশাপাশি মুসলমান বাঙালির স্বরও উঠে আসছিল— আইনসভায়, কর্মক্ষেত্রে, প্রশাসনিক মণ্ডলীতে তার প্রতিনিধিত্বের দাবি জোরদার হয়ে উঠল। এই সূত্রেই, সংস্কৃতি-নামক অবধারণাটি জোরালো বিরোধিতার সামনে পড়ল। সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে *শিখা* পত্রিকা কিংবা বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ঘনীভূত হচ্ছিল ১৯২০-র দশক থেকেই, পরে 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁস সোসাইটি'রও জন্ম হবে, গড়ে উঠবে বিচিত্র সব মুসলিম সাহিত্যসমাজ। অ্যান্ড্রু সার্টোরি বা নীলেশ বসুর মতো গবেষক দেখিয়েছেন, চল্লিশের দশকে এই ক্রান্তিমুহূর্তে 'সংস্কৃতি' বা 'কৃষ্টি'র বিকল্প হিসেবে বাঙালি মুসলমানের বয়ানে উঠে আসে 'তমদ্দুন' শব্দটিও। খেয়াল করার— আরবি বা ফারসি নয়, শব্দটি উর্দু। রেনেসাঁস সোসাইটির কয়েক জন সভ্য মিলেই যেমন ১৯৪৭ সালে 'তমদ্দুন মজলিশ' গঠন করেছিলেন। এঁরাই বলতে আরম্ভ করলেন: ফোর্ট উইলিয়ামের আমল থেকে সংস্কৃতির যে ভাবাদর্শ

ডালপালা মেলেছে, তা মূলত বাঙালি হিন্দুর ভাবাদর্শ। আধুনিকতার প্রভাতমুহূর্তে রাতারাতি বাংলা ভাষা থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছে আরবি ও ফারসি শব্দভাণ্ডার— এক ধরনের শীলিত ভব্যতার পোশাক পরানো হয়েছে তাকে— যার সঙ্গে মূলত যোগাযোগ ব্রাহ্মণ্যধর্মের। বি-ফারসিকরণের পটভূমি ছাড়া, অতঃপর, সংস্কৃতিকে বোঝা যাবে না। সংস্কৃতি ফলে কখনোই অপরের হতে পারে না। সাংস্কৃতিক স্বরাজ তাই অনূদিত হচ্ছিল নতুন এক ভাষায়: 'তমদ্দুনি আজাদি'— যা মিলে গেল পূর্ব পাকিস্তানি পরিচিতিসত্তার সঙ্গে।

এই প্রসঙ্গেই, আমি শরণ নিতে চাইব আবুল মনসুর আহমদের একটি প্রবন্ধের। 'বাংলাদেশের কালচার' নামের এই প্রবন্ধটি ঠাঁই পেয়েছে ওঁর সমনামী একটি বইয়ের প্রথম প্রবন্ধ হিসেবে। প্রবন্ধের রচনাকাল ১৩৭২ বঙ্গাব্দের মাঘ মাস, অর্থাৎ মোটামুটি ১৯৬৫-র আশেপাশে। এই প্রবন্ধটির কথা বলা জরুরি মনে করলাম, কারণ, সব দিক মিলিয়ে দেখলে বিচার করা যায় যে 'অপরের সংস্কৃতি' বলতে কী বোঝায়–– তার নাগাল পেতে প্রবন্ধটি মোটামুটি প্রতিনিধিত্বস্থানীয়। 'অপরের সংস্কৃতি' বলতে আদৌ কিছু হয় কিনা, বা, সংস্কৃতি ধারণার সঙ্গে অপরের যোগাযোগ কতখানি— এটা বুঝে দেখতে প্রবন্ধটি বেশ কাজে আসতে পারে।

আহমদ বলছেন, কৃষ্টি বা সংস্কৃতি— কোনোটাই কালচারের পূর্ণাঙ্গ অর্থ বহন করে না। কালচার বহুমাত্রিক। পলিটিক্যাল, এথিক্যাল, এসথেটিক বা রিলিজিয়াস— এমন বহু বিশেষণের পেছনে শূন্য-চিহ্নক হিসেবে ব্যবহৃত হতে-হতে কালচার তার অর্থ খানিকটা খুইয়ে ফেলেছে। কেবলই কি তাই? এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার বা ব্লাডকালচার— এমন নানা টেকনিক্যাল শব্দের প্রচ্ছদেও তার আনাগোনা।

আবুল মনসুর আহমদের ব্যাখ্যা: কোনও সমাজ বা জাতির মনে কোনও এক ব্যাপারে একটা নির্দিষ্ট ব্যবহারবিধি, মোটামুটি চলনসই সর্বজনীন চরিত্র, ক্যারেক্টার, আচরণ বা চালচলনের রূপ ধারণ করলেই সেটাকে ওই নির্দিষ্ট ব্যাপারে মানবগোষ্ঠীর কালচার বলা হয়ে থাকে। এবং, আরও এক ধাপ এগিয়ে তাঁর বিজ্ঞপ্তি: আজকের পরিবেশে, কালচার আর সিভিলাইজেশনের সীমা ঠিক করে দেওয়া খুবই জরুরি— কিন্তু বড়োই কঠিনও বটে।

সভ্যতা জিনিসটা, আবুল মনসুর আহমদ বলছেন, সমাজের উপরিকাঠামোতেও নিজেকে প্রকাশ করে। পাকা রাস্তা, মোটর, রেল, জাহাজ বলুন, বা, পোস্ট, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, রেডিয়ো, টেলিভিশনের মতো

যোগাযোগ-মাধ্যম। ক্যামেরা, সিনেমা, টেকনিকালার, মঞ্চ, পর্দা, রোটারি মেশিন, লাইনোটাইপ বা মনোটাইপ; ইঞ্জেকশন, কার্ডিয়োলজি, লিফট বা এসক্যালেটর— অর্থাৎ, পশ্চিমা সভ্যতার প্রযুক্তিগত দিকটাই আহমদের চাঁদমারি।

উলটো দিকে, ব্যষ্টি বা এককের কাছে যা ব্যক্তিত্ব— সমষ্টির কাছে সেটাই কালচার। অর্থাৎ, আহমদের ব্যাখ্যা, কালচারে নিহিত এক অন্তর্লীন, স্বতন্ত্র নিজস্বতা, এক পার্থক্যবোধ। অর্থাৎ, কালচার, আহমদ বলবেন, 'আমাদের সামাজিক আমিত্ব।' এই সূত্র-মোতাবেক: আমরা যা আছি— তা-ই 'আমাদের' কালচার।

এর পরেই আহমদ একটি তাৎপর্যপূর্ণ সরণ ঘটাচ্ছেন। কালচারের অছি কে? এই প্রশ্নে, অতীতের হিন্দু বুর্জোয়ার মতো তিনি পৌরসমাজের দিকে ঝোঁকেননি। বরং, স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, 'কালচারের ধারক ও বাহক পল্লিগ্রাম'। শহরের জনতা, শহুরে সংস্কৃতি বলে কি আদৌ কিছু হতে পারে? আহমদের যুক্তি: শহরের নিজস্ব কোনও জনসংস্কৃতি নেই। তারা এক ভাসমান জনপিণ্ড মাত্র। পল্লিজীবনে প্রতিবেশিত্ব বা একাকারত্ব (ইউনিফর্মিটি) দানা বেঁধে ওঠে— তা-ই কালচারের রক্ষক। আবার, শহরে সামাজিক মেলামেশা বেশি, ফলে, চিন্তাভাবনার আদানপ্রদানের ফলে কূপমণ্ডূকতা দূর হয় এবং মনের বিকাশ ও দৃষ্টির প্রসার নিজেদের 'ভব্য, শালীন ও মার্জিত করে তোলে।' নতুন-নতুন ভাবকল্পের জন্ম হয়, তার তরঙ্গ ছড়িয়ে যায় পল্লিদেশে ও মফস্‌সলে। একে অনেকে সভ্যতা হিসেবে পড়তেই পারেন— কিন্তু, তা মানা কঠিন।

এখানেই, আবুল মনসুর আহমদ একটা মোক্ষম বদল ঘটালেন। সরাসরি জানিয়ে দিলেন, বাংলার কালচার বিষয়টাই সোনার পাথরবাটি, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা-হেতু বাংলায় কোনও 'জাতীয় কালচার' নেই, এবং সেই অনুপস্থিতিরই দরুণ তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ কেবল 'পাক-বাংলার কালচারে'ই। তার সংস্কৃতি নিজস্ব। সে 'অপরের সংস্কৃতি'।

'রাষ্ট্রীয় জাতি হিসেবে আমরা নতুন। ...রাষ্ট্রীয় জাতি হিসেবে আমরা নতুন হলেও সভ্য মানুষ ও কৃষ্টিমান জাত হিসাবে আমরা শিশু নই। আমাদের মাতৃভূমির নাম পাক বাংলা। এটা প্রাচীন সমতট দেশ। হঠাৎ জলধি হইতে ভাসিয়া-উঠা চরভূমি নয়। অন্তত দুই হাজার বছরের প্রাচীন কাহিনী ইহার ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে ...'

এই সংস্কৃতি-ব্যাখ্যার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, আর কিছু না— ধর্ম।

'আধুনিকতম ধর্মের উম্মত হিসেবে, তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সভ্য জাতি হিসাবে, আমরা প্রায় সাতশ' বছর এই দেশ পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ কৃতিত্বের সঙ্গে শাসন করিয়াছি ...'

এর কিছু পরেই চলে এল আত্মসত্তা-নির্ধারণের প্রশ্ন:

'পাক-বাংলার সভ্যতা ও শিল্প-বাণিজ্যকে আমরা মুসলমানরা এতখানি উন্নত করিয়াছিলাম। সেই সঙ্গে পাক-বাংলার কালচারকেও আমরা নানা ফুলে-ফলে ও রূপে-গন্ধে সুসজ্জিত ও সুরভিত করিয়াছিলাম ...'

অর্থাৎ, পাক-বাংলার কৃষ্টি ও সভ্যতার ইতিহাসে মুসলিম ছাপ 'সুস্পষ্ট দীপ্তিমান'। তাঁর ঘোষণা,

'বাংলার মাটির সাথে আমাদের সম্পর্ক হাজার বছরেরও বেশি কালের। পুরা সাড়ে ছয়শ' বছর আমরা এই দেশের শাসক ছিলাম। তার মধ্যে প্রায় তিনশ' বছর আমরা স্বাধীন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা শাসন করিয়াছি। এই মুদ্দতে আমরা বাংলাকে নিজস্ব জাতি-নাম, ভাষা ও সাহিত্য দিয়াছিলাম। সে ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীত্বকে নতুন মর্যাদা, তার ভাষা নতুন সুর, তার গলায় নতুন জোর দিয়াছিলাম।'

এ এক নতুন সংস্কৃতি-ব্যাখ্যা, যা পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে আবুল মনসুর আহমদের মতো বাঙালি মুসলমান ইন্টেলেকচুয়ালদের হাতে বিকশিত হল। সুনীতিকুমারদের সংস্কৃতি-ব্যাখ্যার সঙ্গে একে মেলানো যাবে না। নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার লেন্স দিয়ে দেখলে, আর্য ধর্মের বদলে, দ্রাবিড়ী কৃষ্টি ও বৌদ্ধধর্মই এই পাক-বাংলার অন্তঃসার— ফলে, 'আর্যরা কোনও দিন পারে নাই বাংলা জয় করিতে।' আবুল মনসুর আহমদের ঐতিহাসিক তর্জমায়, সেন রাজত্বে বাংলার ওপর আর্য কৃষ্টি ও সংস্কৃত ভাষা চাপানো আরম্ভ হল— এবং তারই পেছন পেছন এল ইসলামি কৃষ্টির আমল। বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের হাত থেকে বেঁচে গেল বৌদ্ধধর্ম, তাতে হাত মেলাল 'সাম্যবাদী' ইসলাম। সাড়ে ছশো বছর ধরে চলতে থাকল নতুন কৃষ্টি রচনার কাজ— যার মধ্যে শাহি-নবাবি উপাদান অতি-সামান্য, বাকিটায় 'জাতীয় প্রাণ ও গণরূপ'। আবুল মনসুর আহমদ স্পষ্ট জানাচ্ছেন: যে-কৃষ্টি বাঙালি হিন্দুর আদর কাড়ে বিশ শতকে, তা একেবারেই সাম্রাজ্যবাদী ও মিশনারি-কেন্দ্রিক 'শুদ্ধিকরণ'-রাজনীতির ফসল। কিন্তু, সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে তো মুসলমানরাই বাংলার অধিকাংশ! ফলে, বিশ শতকে তারাও ঘুরে দাঁড়াল এই পুনর্জাগরণবাদী সংস্কৃতি-ভাষ্যের বিরুদ্ধে। আহমদ বলবেন, 'পাক-বাংলার কৃষ্টির ইহাই পটভূমি।'

এই কৃষ্টিচেতনার পটভূমি কী? ধরুন, আহমদ বলছেন ধর্মোৎসবের কথা। ইদ বা মহরমের কথা তুলে ওঁর প্রশ্ন, 'এ সব উৎসব-পরবে পাক-বাংলার মনের আকাশে জীবন-প্রাচুর্যের লক্ষ তারকা জ্বলিয়া উঠে কি? আমাদের জীবন-সাগরে কর্মচাঞ্চল্যের ঝড় উঠে কি? আমাদের দেহের শিরায়-শিরায় নবজীবনের দ্যোতনার বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটে কি? প্রাণ-রসের উচ্ছলতায় আমরা ফাটিয়া পড়ি কি?' যদি না-ই হয়, তবে গোটা জাতি বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে 'আনন্দ-ক্ষুধার' প্রকোপে। নিরানন্দের এক বিকট বেদনা গিলে খেয়েছে গোটা বাংলাদেশ। ফলে, নজর ফেরাতে হবে কলাচর্চার দিকে— নাচ, গান, ছবি-আঁকায়। স্বাধীন রাষ্ট্রে এ-ই কৃষ্টির এক নতুন সনদ।

রবীন্দ্রনাথও সেই চাঁদমারি থেকে বাদ যান না। তাঁর মতো বিরাট সাংস্কৃতিক আইকন আর কে-ই বা? অথচ, আবুল মনসুর আহমদ বলছেন, ১৯৪৪ সালে এবং তা এখানে পুনরুদ্ধৃত: 'বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব ভারতীয় বিশ্বে কতবার শারদীয়া পূজার 'আনন্দময়ী মা' এসেছে গিয়েছে, কিন্তু একদিনের তরেও সে বিশ্বের আকাশে ঈদ মোহররমের চাঁদ উঠেনি।' যদি কৃষ্টির পুনর্জাগরণ প্রয়োজন হয়, তা হলে বাঙালি মুসলমানকে এই শ্রদ্ধেয়, পূজ্য বিগ্রহগুলিকে প্রশ্ন করতে হবে সজোরে। আর, পশ্চিমা সভ্যতার বুড়ি ছুঁয়ে 'প্রগতির নাগাল ধরিতে হইবে। ...আমাদের কালচারকেও আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক হইতে হইবে।'

উপসংহার

আবুল মনসুর আহমদের লেখা থেকেই দৃষ্টান্ত বাড়ানো যায়। বস্তুত, সংস্কৃতির প্রশ্নটিকে তিনি কেবলই উচ্চকোটিতে সীমায়িত রাখেননি। সাহিত্যিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার কথা যেমন বলেছেন, কুসংস্কারহীন যুক্তিবাদী মানসিকতা বা রেনেসাঁসের উল্লেখ করেছেন যেমন— তেমনই নিতান্ত কেজো, প্রযুক্তিগত প্রশ্নও তাঁর নজর এড়ায়নি। যেমন, বাংলা হরফের চেহারা কী হবে? বর্ণমালার সংস্কার হবে কীভাবে? এ কথা আমরা মানতে বাধ্য যে সুনীতিকুমারের সংস্কৃতি-ভাবনায় এই প্রাত্যহিকী জোরের জায়গাগুলি ছিল না।

এ প্রবন্ধের অর্থ এই নয় যে, আহমদের প্রতিটি যুক্তিই সমান শিরোধার্য। কিন্তু, সবিনয়ে এ কথাটাও বলা চলে যে সংস্কৃতি বলতে যে ভাবকল্পের কথা আমরা ভাবি— তার একটা দেশকালপাত্র আছে, রয়েছে ঐতিহাসিক অনুপুঙ্খ। সংস্কৃতির বয়ানটি এক ঐতিহাসিক কর্তা-র আওড়ানো— যার পা দাঁড়িয়ে ছিল দেশভাগের যুগসন্ধিতে— যখন বাঙালিয়ানা আর বাঙালি হিন্দু সত্তার ভেতর

একটা দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে উঠছে, সর্বভারতীয় রাজনীতির আপাত-খণ্ডসত্তাগুলো ঢেকে দিচ্ছে সংস্কৃতির মহাবয়ানকে। সেই যুগমুহূর্তে দাঁড়িয়ে, আবুল মনসুর আহমদ-রা সংস্কৃতির সীমা-সরহদ্দগুলো চিহ্নিত করছিলেন— গড়ে তুলছিলেন সংস্কৃতিরই এক বিকল্প বয়ান। এ-ই হয়তো অপরের সংস্কৃতি।

কিন্তু, ভাববারও বিষয় আছে। সুনীতিকুমার হোন বা আবুল মনসুর আহমদ, আজকের দুনিয়ায় দাঁড়িয়ে তাঁদের সংস্কৃতি-ব্যাখ্যার প্রাসঙ্গিকতা ঠিক কী রকম? আজ চতুর্দিকে সত্তা-রাজনীতির এই রমরমা দেখলে কী ভাবতেন তাঁরা, জানতে ইচ্ছে করে। রিষ, মাৎসর্য বা অসূয়া শ্রেণিরাজনীতির কাঠামোকে ঢেকে দিচ্ছে— গড়ে তুলছে এক অসহিষ্ণু, অনুদার, শুশ্রূষাহীন রাজনীতি-পরিমণ্ডল। সংস্কৃতির অপরত্ব এখন তার নৈতিক উচ্চতার দ্যোতক। দু-জনেই, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থেকে হলেও, এক বৈচিত্র্যবাদী, সহিষ্ণু, উদার মানবধর্মের কথাই বলে গেছেন দিনের শেষে। সভ্যতা, ভব্যতা, শালীনতা— কালচারাল স্টাডিজের প্রকোপে এ সব গুণের আবাদ এখন নিতান্ত ক্ষমতাক্রীড়া ছাড়া কিছুই নয়। ক্ষমতার বাইরে যেহেতু কোনও দুনিয়ার স্বপ্ন দেখতে আমরা ভুলে গেছি— ফলে, অভব্যতা, অভদ্রতা ও হিংসার স্ট্র্যাটেজিক প্রয়োগ এখন তথাকথিত প্রগতিবাদী রাজনীতিরও আদরণীয়। এরই মধ্যে, সংস্কৃতি-নামক ধারণাটিও কিঞ্চিৎ 'আউটডেটেড'— অসংস্কৃত হতে-পারা এখন হয়তো নৈতিক শ্লাঘার মর্মবস্তু।

আত্ম বা অপর মুলতুবি থাকুক। সুনীতিকুমার বা আবুল মনসুর আহমদরা এই পৃথিবীতে ঠিক কতটা প্রাসঙ্গিক আজ— এই আত্মজিজ্ঞাসার সামনে দাঁড়ালেও মন্দ হয় না!

ক্রোড়পত্র

কলকাতা

সংস্কৃতির ছোঁওয়া, ইতিহাসের ছায়া: কলকাতায় বড়ো হয়ে ওঠা

সুগত বসু

ষাটের দশকের কলকাতায় ছুটির দিনে অনেক সময় ঘুম ভাঙত খুব ভোরে রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে দিনের প্রথম ট্রামের ঢংঢং শব্দে। তার একটু পরেই শোনা যেত দোতলা বাসের মৃদু গর্জন। দাদুয়ার বিশ্বাস সাত সকালে মাথা পরিষ্কার থাকে। অতএব হাত মুখ ধুয়েই তাঁর বৈঠকখানার টেবিলে অঙ্ক কষতে বসতাম। ওই সময়টা কবিতা মুখস্ত করার পক্ষেও ভালো। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' বা 'দুঃসময়'-এর প্রতিটি লাইন, প্রতিটি কথা কীভাবে অভিব্যক্ত করতে হবে তা দাদুয়া অনুশীলন করাতেন। অথবা ইংরেজিতে শেক্সপিয়রের *হেনরি দি এইট্থ* নাটকে কার্ডিনাল উলসির (Wolsey) বিদায় ভাষণ— 'O Cromwell, Cromwell, had I but served my God with half the zeal I served my king, he would not in mine age have left me naked to mine enemies'।

সকাল আটটার পরে আর ইস্কুলের পড়াশুনার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকত না। রাস্তার ওপারে দেশপ্রাণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে আনা হিঙের কচুরি আর আলুর তরকারি দিয়ে প্রাতঃরাশ সেরে মাঝের বসার ঘরে রোমাঞ্চকর সাহিত্য বা সংগীতের জগতে প্রবেশ। দাদুয়া, চারুচন্দ্র চৌধুরী, পেশায় আইন বিশারদ, তবে তাঁর চিত্রকলা থেকে বিজ্ঞান সব বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য। সব প্রশ্নের উত্তর না জানা থাকলেও, কোথায় খুঁজলে উত্তর পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তাঁর লাইব্রেরিতে ইংরেজি ও বাংলা, নতুন ও পুরোনো, সমস্ত ক্লাসিক বইয়ের সম্ভার। প্রতি সপ্তাহে বিদেশ থেকে *টাইম্স লিটেরারি সাপ্লিমেন্ট* বা টি এল্ এস্ আসে। সেই পত্রিকায় রিভিউ পড়ে সদ্য প্রকাশিত বই-এর অর্ডার

দেওয়া হয়। ইচ্ছে মতো যে-কোনও বই আলমারি থেকে বের করে পড়তে বাধা নেই। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোন্ লেখা আগে বা পরে পড়া উচিত, সে বিষয়ে দাদুয়ার কিছু নির্দিষ্ট উপদেশ ছিল। যেমন, রুশ উপন্যাসের জগতে প্রবেশ করে প্রথমে পড়তে হবে তুরগেনেভের *ফাদার্স অ্যান্ড সান্স*, তারপর দস্তইয়েভ্স্কির *ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট* এবং সব শেষে টলস্টয়ের *ওয়ার অ্যান্ড পিস* ও অন্যান্য নভেল। ইস্কুলে থাকতেই এই মহারথী ত্রয়ীর গণ্ডি পার হয়ে, কলেজে প্রবেশ করেই পড়লাম পাস্তারনাকের *ডক্টর জিভাগো* ও শলোখভের *অ্যান্ড কোয়ায়েট ফ্লোস দ্য ডন*।

বই-এর কাছেই সাজানো থাকত ৩৩, ৪৫ ও ৭৮ আর পি এম-এর গানের রেকর্ড। বেশ কিছু আমার জন্মের আগেকার সংগ্রহ। প্রায়ই দাদুয়ার সঙ্গে যেতাম ধর্মতলায় সি সি সাহার দোকানে। সেখানে অনেক রেকর্ড শুনে, শ্রেষ্ঠ গানের রেকর্ড বেছে কেনা হত। সন্ধ্যায় অর্গান বাজিয়ে দাদুয়া গান শেখাতেন। গান তোলা হয়ে গেলে গানের সঙ্গে এস্‌রাজ বাজাতেন। বেশ মনে পড়ে *দরবারি কানাড়ায়* 'আজি মর্মরধ্বনি কেন জাগিল রে' গানটি শিখছি। তারপর ওই গানেরই দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের রেকর্ড শুনে নিজের গায়কি বেছে নিচ্ছি। দেবব্রত বিশ্বাস থাকেন রাসবিহারী অ্যাভিনিউতেই তিন-কোনা পার্কের কাছে। রেকর্ডে তাঁর 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী' শোনার পাশাপাশি, তাঁর ছোট ঘরে লাইভ পারফর্মেন্স শোনার সুযোগ হয়। লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরে হারমোনিয়াম বাজিয়ে দেবব্রত বিশ্বাস গান করছেন, সেই দৃশ্য ভোলার নয়। রবীন্দ্রসংগীতের পাশাপাশি দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত ও নজরুলের গানের চর্চাও চলতে থাকে।

সব সময়ে যে লেখাপড়া বা সংগীতচর্চা নিয়ে ব্যস্ত তা কিন্তু নয়। কোনও কোনও সকালে লেকে বেড়াতে বা সাঁতার কাটতে যাওয়া হয়। আর দিদা ছায়াদেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে গড়িয়াহাটে বাজার করতে যাওয়ার আনন্দ একেবারে আলাদা। সেই যে শিশুবেলায় মা আমাকে দাদুয়া-দিদার জিন্মায় রেখে গোল পার্কে সিটি কলেজে পড়াতে যেতেন, তখন থেকেই বালিগঞ্জের সঙ্গে আমার নিবিড় সম্পর্ক। দাদুয়ার আদি বাড়ি ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ। দিদার ঢাকার নরসিংদি। তাঁরা নিজেদের মধ্যে বাঙাল ভাষায় কথা বলেন। দিদার অসাধারণ পূর্ব বাংলার রান্নার স্বাদ লেখাপড়ার সঙ্গে মিশে আছে।

আমার জন্ম অবশ্য ভবানীপুরে, এলগিন রোডে এলগিন নার্সিং হোমে। আমাদের এক নম্বর উডবার্ন পার্কের বাড়ির খুবই কাছে। এই প্রাসাদসম বাড়িটি

শরৎচন্দ্র বসু বানিয়েছিলেন ১৯২৭ সালে এবং এটি হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। দাদাভাই শরৎচন্দ্র বা ঠাকুমা বিভাবতীকে আমার দেখার সুযোগ হয়নি। আমার জন্মের আগেই তাঁরা চলে গেছেন। মা, কৃষ্ণা বসু, তাঁর স্মৃতিচিত্র 'এক নম্বর বাড়ি'-তে লিখেছেন, 'আমি যখন বধূ বেশে এক নম্বর উডবার্ন পার্কের বাড়িতে প্রবেশ করলাম তখন সেখানে সূর্য অস্ত গিয়েছে অর্থাৎ তার আগেকার গৌরবের দিন আর নেই।' উডবার্ন পার্কে সংস্কৃতির ছোঁওয়া আমরা পেতাম মার হাতে সেতারের জয়জয়ন্তী রাগের ঝংকারে বা তাঁর কণ্ঠে বিদ্যাপতির 'আজু রজনী হামে ভাগে পোহায়নু, দেখনু পিয়ামুখ চন্দা' ভজনের সুরে। বাবা শিশিরকুমার বসু ব্যস্ত শিশু চিকিৎসক এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার রক্ষায় একনিষ্ঠ। তাই ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া দেখার ভার পুরোটাই ছিল মার ওপর ন্যস্ত।

আমার দুবছরের জন্মদিনের আগেই বাবা-মার সঙ্গে পাড়ি দিলাম বস্টন শহরে। বাবা হাভার্ড মেডিক্যাল স্কুলে রকেফেলার ফেলোশিপ পেয়ে বস্টনের বিখ্যাত শিশু হাসপাতালে পিডিয়াট্রিক রেডিওলজি নিয়ে কাজ করলেন। মা সেই সুযোগে আমেরিকার আধুনিক চিত্রকলার বিষয়ে পারদর্শী হয়ে উঠলেন। কয়েক দশক পর যখন আমি হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গার্ডিনার চেয়ার পেলাম, তখন সহজেই মা আমার দুই বা তিন বছর বয়সে তোলা হাভার্ড ইয়ার্ডে ছবি বের করলেন। ১৯৬০-এর জানুয়ারি মাসে বিদেশে দেড় বছর কাটিয়ে কলকাতা ফিরলাম। মা লিখেছেন, 'এক নম্বর উডবার্ন পার্কের গাড়ি বারান্দায় যখন এসে নামলাম তখন মনে এক গভীর প্রশান্তি অনুভব করলাম। গাড়ি বারান্দায় মাথার উপর অতি পরিচিত সবুজ রঙের তরমুজের আকৃতি আলোর শেড হাওয়ায় মৃদু দুলছে, মনে হল সব যেমন রেখে গিয়েছিলাম তেমনি আছে।'

উডবার্ন পার্কের অনতিদূরে অবস্থিত ৩৮/২ এলগিন রোডে নেতাজি ভবন। আমাদের আমেরিকা যাত্রার আগেই ১৯৫৭ সালে বাবা সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছেন নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো। ১৯৬১-র ২৩শে জানুয়ারি সেখানে উদ্বোধন হল নেতাজি মিউজিয়াম। সে বছর জহরলাল নেহরু ডিসেম্বর মাসে সংগ্রহশালা দেখতে এলেন। নেহরুকে কাছ থেকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম এবং তাঁর পায়ে পায়ে ঘুরে যাত্রাপথে খানিক বাধা সৃষ্টি করেছিলাম। তবে তিনি বিশেষ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছিলেন না। এক একটা ঐতিহাসিক চিঠি, ছবি বা দলিলের সামনে তন্ময় হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকছিলেন। ছোটবেলা থেকে দেখেছি কত কষ্ট ও পরিশ্রম করে বাবা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এই অসামান্য প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন। তাঁকে সহায়তা করতেন আজাদ হিন্দ ফৌজের এক সৈনিক,

নগ সুন্দরম্, যাকে মা বলতেন 'অগতির গতি' সুন্দরম। উডবার্ন পার্ক থেকে নেতাজি ভবন ছিল আমার নিত্য যাতায়াত।

এই দুই বাড়িতেই নেতাজির ঘনিষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সৌভাগ্য আমি পেয়েছি। সংস্কৃতির ছোঁয়ার সঙ্গে তাই ইতিহাসের দীর্ঘ ছায়ায় আমার কলকাতা শহরে বড়ো হয়ে ওঠা। নেতাজির সহকর্মী ও সহযোদ্ধাদের নিয়ে বাবা নেতাজি ভবনে বড়ো বড়ো অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তাঁরা থাকেন আমাদের অতিথি হয়ে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে। প্রায়ই এই সব পূজনীয় মেহমানদের জন্য নিজের থাকার ঘর ছেড়ে দিই। তাঁরাই ছিলেন আমাদের পরম আত্মীয়। দক্ষিণের বারান্দায় বসে তাঁদের মুখে নেতাজির কাহিনি শুনেছি। তাঁরা নেতাজিকে স্মরণ করে অঝোরে কাঁদেন। নেতাজি ভবনে ১৯৬১ সালে প্রথম নেতাজি ওরেশন দিতে এসেছিলেন এস্ এ আয়ার। তিনি আবার এলেন ১৯৬৭ সালে যখন জাপানের জেনারেল ফুজিয়ারা বাবার হাতে নেতাজির তরবারি তুলে দিলেন। আয়ার সাহেবের বর্ণনা কীভাবে নেতাজি কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে এক নাগাড়ে সারা রাত ধরে আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণাপত্র রচনা করেছিলেন তা আজও কানে বাজে।

প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে বাবা দেশ-বিদেশ থেকে নেতাজির কোনও বিশিষ্ট সহকর্মীকে নিয়ে আসেন নেতাজি ওরেশন প্রদান করার জন্য। ১৯৭০ সালে এলেন আবিদ হাসান, ১৯৪৩ সালের নব্বই দিনের ইয়োরোপ থেকে এশিয়া ডুবোজাহাজ যাত্রায় নেতাজির একমাত্র ভারতীয় সঙ্গী। উডবার্ন পার্কের বারান্দায় তাঁর নেতাজি ওরেশন লেখার ব্যবস্থা করা হল। ''দি মেন ফ্রম ইমফাল'' শীর্ষক বক্তৃতার খানিকটা লিখে তিনি আমাদের পড়ে শোনানোর জন্য ডেকে পাঠান। অল্প কয়েক লাইন পড়েই তাঁর কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে যায়। দিনের শেষে তিনি হাঁক দেন, 'কৃষ্ণাজি, এবার গান শোনাও।' তাঁর দুটি গান বিশেষ পছন্দ—রবীন্দ্রনাথের 'তোমায় সাজাব যতনে কুসুম রতনে', আর মোহিনী চৌধুরীর 'নাই বা হল মিলন মোদের এই জীবনে, তোমায় আমি ভুলব না গো'।

পাঠ্যবই-এর শুষ্ক ইতিহাস নয়, ছোটবেলা থেকে নেতাজি ভবন ও উডবার্ন পার্কে ইতিহাসের প্রাণবন্ত রূপ দেখেছি। পাঠক হয়তো ভাবছেন তাহলে কি আমি কোনও প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করিনি? না, ইস্কুল কলেজে পড়েছি ঠিকই। তবে বাড়ির পরিবেশের ছাপ ছিল গভীর। আমেরিকা থেকে ফেরার পর মা আমাকে ভর্তি করালেন মি. পায়ার্‌স স্কুলে। উডবার্ন রোড, এলগিন রোড, রোল্যান্ড রো (অধুনা কৃষ্ণা বসু সরণী) ধরে দু-বছর সেখানে পড়লাম। তারপর

ক্লাস টু থেকে একটানা দশ বছর সেন্ট জেভিয়ার্স্ স্কুলে লেখাপড়া। সেখানে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা ভালো, খেলাধুলোরও যথেষ্ট সুযোগ। স্কুলটি তৈরি হয়েছে রোমান ক্যাথলিক ছেলেদের শিক্ষার জন্য, যদিও বাঙালি মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের ছাত্রদের সংখ্যাই বেশি। অবশ্য আমার ক্লাসে মাত্র একজন বাঙালি মুসলমান ছাত্র। তার সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। তার বেনিয়াপুকুরের বাড়িতে ঈদের উৎসব জমে ওঠে।

আমি যখন হাই স্কুলের ছাত্র তখন বাংলার ইতিহাসে দুটি বড়ো রাজনৈতিক ঝড় উঠল। প্রথমটি ১৯৬৭-তে শুরু নকশাল আন্দোলন যাতে পারিবারিক বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ জড়িয়ে পড়ল। নকশালবাড়ির কৃষক বিদ্রোহ কেন মাও-জে-দং-এর ভাষায় প্রেয়ারি ফায়ারের মতো ছড়িয়ে বৃহত্তর বিপ্লবে পরিণত হল না সেই প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী ছাত্রজীবনে খুঁজেছি। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অভিঘাত পশ্চিম বাংলার রাজনীতি ও সমাজেও প্রতিফলিত হল। একাত্তরে বাবার সঙ্গে বনগাঁ সীমান্তে প্রায়ই যেতাম। সেখানে গাইঘাটার কাছে বকচরা গ্রামে নেতাজি ফিল্ড হাসপাতালে আহত মুক্তি যোদ্ধাদের অস্ত্রোপচার ও শুশ্রূষা হয়। আর শরণার্থী শিবিরে বাবা ও তাঁর সহ-চিকিৎসকবৃন্দ শিশুদের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা চালান।

কলকাতা ও বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তন অবশ্যই ফুটে ওঠে সমকালীন সাহিত্য, শিল্পকলা, নাটক ও চলচ্চিত্রে। ষাটের দশকে ও সত্তরের গোড়ায় আমরা তিন প্রজন্ম এক সঙ্গে সিনেমা দেখতে যেতাম। ঋত্বিক ঘটকের জোরালো 'সুবর্ণরেখা', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার' মনকে সব চেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল। সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' ও 'চারুলতা' দেখে মুগ্ধ হলাম। তবে 'নষ্টনীড়'-এর শেষ সংলাপ 'না থাক্' না থাকায় দাদুয়া খানিকটা ক্ষুণ্ণ হলেন। 'সত্যজিৎ এটা কী করেছে, দু হাত না মেলার একটা ফ্রিজ ফ্রেম্!' তাঁর পছন্দ 'জলসাঘর'-এ ছবি বিশ্বাসের দৃপ্ত অভিনয়। যুব সম্প্রদায়ের শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে চাকরিহীনতার জ্বালা সত্যজিতের 'প্রতিদ্বন্দ্বী', নাকি মৃণাল সেনের 'ইন্টারভিউ'-তে সঠিকভাবে ধরা পড়েছে, তাই নিয়ে কিছুটা তর্ক হল। আমাদের পারিবারিক জুরি এক্ষেত্রে 'ইন্টারভিউ'-কেই বেছে নিয়েছিল।

১৯৭৩-এর জুলাই মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্পণ করলাম। ছোটবেলা থেকে মার কাছে তারকনাথ সেনের পড়ানোর নানা গল্প শুনেছি। আমার অভিজ্ঞতা, ক্লাসের ভেতরের চেয়ে ক্লাসের বাইরে অনেক বেশি শিখেছি। স্কুলজীবনের সাউথ ক্লাবে টেনিস খেলা মাঠে মারা গেল। সন্ধে পর্যন্ত কাটে

বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসে বা কলেজের ক্যানটিনে। প্রথম বর্ষে ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনে সর্বাধিক ভোট পেয়ে কলেজের ডিবেটিং সোসাইটির সম্পাদক হলাম। পি.এল.টি. অর্থাৎ ফিজিক্স লেকচার থিয়েটারে নানা বিষয়ে বিতর্কসভার আয়োজন করি। আমার এক বছরের সিনিয়র ইংরেজির কৃতী ছাত্র স্বপন চক্রবর্তীর সঙ্গে বিভিন্ন কলেজে ডিবেট করে বেড়াই। মাতৃভাষায় বিতর্ক হলে আমার দুবছরের সিনিয়র দর্শনের ছাত্র অরিন্দম চক্রবর্তীর কোনও জুড়ি নেই।

আমার কলেজে ব্যস্ততার মধ্যে সরকার আমাদের এক নম্বর উডবার্ন পার্কের বাড়ি অধিগ্রহণ করল। আমি ও আমার ভাই-বোন প্রথমে আশ্রয় নিলাম দাদুয়া-দিদার রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-র বাড়িতে। বাবা-মা প্রথম রাত্রিটা কাটালেন হোটেলে। সেই রাত্রে মা লিখলেন একটি কবিতা— ‘উডবার্ন পার্ক হইতে বিদায়’:

ভাবীকালের দর্শক যেদিন ভিড়
করে আসবে এই গৃহে বলবে
তারা, দেখ ইতিহাস কেমন
বাঁধা পড়েছে এর প্রতিটি ইঁটে...

বাবা নব্বই শরৎ বোস রোডে একটি দোতলা বাড়ি কিনলেন, মা নাম দিলেন ‘বসুন্ধরা’। মা দৃঢ়সংকল্প যে এই ‘বসুন্ধরা’-কে তিনি গড়ে তুলবেন কলকাতা তথা বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের পীঠস্থান হিসেবে। আমাদের বসার ঘরে আয়োজন করেন পি.ই.এন.-এর সাহিত্যসভা বা কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের গানের আসর। নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজের মহানায়ক ও নায়িকারা— যারা অতিথি হয়ে আসতেন উডবার্ন পার্কে— তাঁরা এখন আসেন এই ‘বসুন্ধরা’য়। তাঁদের মধ্যে আছেন আবিদ হাসান, প্রেম সাহগল, লক্ষ্মী সাহগল, জানকী থেভার, গুরবক্স সিং ধিলন ও অন্যান্যরা। পাব্‌লিক সভাগুলি হয় নেতাজি ভবনে, সামাজিক আতিথেয়তা চলে নব্বই শরৎ বোস রোডে। বিদেশ থেকেও আসেন নানান পণ্ডিত ও এশীয় মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসের সাক্ষী।

অবশেষে ১৯৭৮-এর সেপ্টেম্বরের শেষে এক প্রবল বর্ষণের রাতে আমি কলকাতা থেকে পাড়ি দিলাম কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। তখন থেকে প্রথমে ছাত্র ও তারপর পরিযায়ী বুদ্ধিজীবী শ্রমিক হিসেবে কেবলই বারবার কলকাতায় ফিরে আসার পালা।

জলের শহর, কলের শহর

অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতার জন্ম হয়েছিল যেন সুবিধা লগ্নে। এক পক্ষ ব্রিটিশ, যাদের মূল লক্ষ্য ছিল অপার ধনদৌলত আর এক পক্ষ, স্থানীয় কিছু মানুষ, যাঁরা নির্ঘাৎ ভাবলেন, যদি ওরা এ তল্লাট ছেঁচে ধনী হতে পারে তা হলে আমরাই বা নয় কেন? এমন ক্ষেত্রে যা হওয়ার, তাই হল, শহর বেড়ে উঠল অপার অস্নেহে। মহল তৈরি হল হয়তো জলাভূমির পারে বা ঘিঞ্জি বস্তির নিকটে। ফলে সুসজ্জিত বাগানের ফুল থেকে নিঃসৃত গন্ধকে লড়ে মরতে হত ঠিক পাশের নর্দমা থেকে ভেসে আসার গন্ধের সঙ্গে। ১৬৯০ সালে কলকাতার পত্তনের পর প্রায় ২০০ বছর লেগেছিল ঠিকঠাক ড্রেন তৈরি হতে। তাতেও বলাই বাহুল্য কুলোয়নি। তখনই তো প্রায় ৬ লক্ষ মানুষ গিজগিজ করছে এখানে। এখন অবশ্য তা প্রায় দেড় কোটি। সমস্যা কি আর এই একটাই? এ শহর তো বেড়ে উঠেছে একটি জলাজমিতে, যার অবস্থান একটি নদী ও লবণ হ্রদের মাঝে। এই নীচু সমতল যে নদীর গর্ভে এখনও বিলীন হয়ে যায়নি, তা-ই তো মহা আশ্চর্যের। এর পর যখন ঝেঁপে বৃষ্টি নামে, রাস্তা ভেসে যায় সে তোড়ে, জমা জল নামতে লাগে বহু দিন। রাজ্যের নোংরা নিয়ে তার পর এই জল যত্রতত্র চলাচল করে, উপচে পড়ে পুকুর, ফুটপাথ দিয়ে সাঁতরে পার হয় দেখলেন হয়তো মৎস্যকুল। এত কিছুর পর অবস্থা আরও সঙ্গিন হয় যখন রোদ ওঠে। জলের ফেলে যাওয়া আবর্জনা রোদে সেঁকে-পুড়ে অসহ্য এক দুর্গন্ধের নির্মাণ করে। দূষিত হয় পেয় জল, অসুখ কড়া নাড়ে ঘরে ঘরে। মৃত্যু-ও...

এ সব সত্ত্বেও, ১৮ শতকের শেষ ও ১৯ শতকের শুরুর দিকে, এ প্রান্তরে যেন টাকা উড়ত। সে টাকার হদিশ যেমন ছিল ব্রিটিশদের কাছে, তেমনই ছিল কিছু করিতকর্মা স্থানীয়ের কাছেও। তাঁরা ব্রিটিশদের কাছে নিজেদের বেশ প্রয়োজনীয় করে তুলতে পেরেছিলেন। যেমন কেউ খরিদ্দার হলেন, কেউ বা বিক্রেতা, কেউ টাকা ধার করলেন, কেউ রাজস্ব তুলে খুশি করলেন 'প্রভু'দের, কেউ কেউ স্রেফ আলটপকা উড়োখবর রটিয়ে ব্রিটিশদের নেকনজরে এলেন, কিছু জন স্থানীয় গল্প, রীতিনীতি, (সে হোক না সত্যি বা আষাঢ়ে) গোরাদের মন-মতো বুঝিয়ে খুশি করতেন আর কয়েক জনের অনায়াস উপায় একটি সুন্দরী-বেষ্টিত চিত্তাকর্ষক সন্ধ্যার আয়োজন!

এমন কার্যক্রমে লিপ্ত হয়েই স্থানীয় কিছু মানুষ বড়ো ধনী হয়ে উঠেছিলেন। যেমন দ্বারকানাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা তো সে আমলে নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, যথাক্রমে দুঁদে ব্যাঙ্কার, আফিম-ব্যবসায়ী এবং অবেশেষে দেউলিয়া। ১৮৩৪ সালে দ্বারকানাথ কার সাহেবের সঙ্গে জোট বেঁধে কার টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। ওটি এক রকম, এখনের ভাষায় বলতে, ইনভেস্টমেন্ট ফার্ম, যারা জমি, পাটের ব্যবসা, মাইনিং হোক বা অন্য কিছু, সবেতে বিনিয়োগ করত। খুবই কম বেতনে তারা কিছু স্থানীয় মানুষকে ম্যানেজার ও অন্য পদে বসিয়ে কাজ তুলত। উল্লেখ্য, এভাবেই মাত্র ২৫ বছরে তারা স্থানীয় বেনিয়াদের ভাত মেরে তাদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে সক্ষম হল। ফলে বলা অসংগত হবে না যে বাঙালির ব্যবসায় পতন, তাদেরই এক আপন জনের মোক্ষম এক পদক্ষেপের কারণে।

তা এমন এক কাণ্ডের ফলে, বাঙালি যখন ভাবিত ভবিষ্যৎ নিয়ে, অমনি চোখ পড়ল তাদের রিয়েল এস্টেটে। ১৮৩০ বা অমন সময়ের কলকাতায় তখন প্রায় ২ লক্ষ মানুষ, এবং সে সংখ্যা বাড়ছিল দিনে দিনে। অতএব মাথার ওপর একটা ছাদের তো আশু প্রয়োজন। তাই অনেকে আবার একটি ব্যবসার নতুন উপায় পেল। হয় ঘর বানানোর কাজে লিপ্ত হল তারা বা ঘর ভাড়া দেওয়ায়। একটা ব্যাপার খেয়াল করবেন, রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায়, সে পৃথিবীর যে কোথাওই হোক না কেন, স্থানীয় মানুষ হওয়ার অগাধ সুবিধে। একজন সফল রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী সে-ই, যে বিশেষ কোনও জমি বা বাড়ি সম্বন্ধে সমস্ত হাঁড়ির খবর রাখে। যেমন সে জানবে বাড়িটির আসল মালিকানা কার, কারণ অনেক ক্ষেত্রেই যে ব্যক্তি মালিকানা দাবি করছেন আর আসল মালিক যে,

তারা এক নয়। তার পর যখন শরিকি বা মালিকানা সম্পর্কিত কোনও গণ্ডগোল লাগে ১৮ বা ১৯ শতকের কলকাতায় তো এমন বহু গল্প পাওয়া যায়, যেখানে একই সম্পত্তির ৭২ বা তারও অধিক দাবিদার! তখন তো এমনই কোনও রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীর শরণাপন্ন হতে হয়, যাঁরা জানেন কীভাবে নানা পক্ষকে সমঝোতার টেবিলে বসাতে হয়।

'প্রচলিত' কিছু উপায়ের খানিক বর্ণনা থাক তবে। ধরা যাক কোনও বৃদ্ধা কিছুতেই তাঁর ভিটে খালি করতে রাজি হচ্ছেন না। নানা কারণ থাকতেই পারে, যেমন ধরুন, এ বাড়িটিতেই বৃদ্ধার শৈশব কেটেছে, অতএব অনেকটা আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। তা এমন অবস্থায় 'দক্ষ' ও 'অভিজ্ঞ' কেউ কী করবেন? প্রথমেই গিয়ে অতি মিষ্টিভাবে 'মাসিমা' বলে সম্বোধন, যেন ঘরের ছেলে! ধরা যাক, এ সব মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভিজল না, তখন দেখলেন হয়তো বৃদ্ধার বাড়ির ছাদে আচমকা কিছু এলোপাথাড়ি ইঁট এসে পড়ল। বা হয়তো শুনলেন, পাড়াপড়শি হঠাৎই এই বাড়িটিকে 'ভূতুড়ে' তকমা দিচ্ছেল এই সব অহেতুক ঝুটঝামেলা যারা পোহায়, তারা ঠিক জানে কী বলতে হয়, যখন কোনও ভাড়াটে কিছুতেই ভাড়া দিয়ে উঠতে পারছে না, উল্টে কী দুঃখে ও কষ্টে যে দিন কাটছে সে গল্পই শুধু শোনাচ্ছে। সবটা মুখে চিলতে হাসি নিয়ে শুনেটুনে হয়তো যাওয়ার মুখে ভাড়াটেকে শুনিয়ে গেল, যে সে জানে, কখন ও কোন্ পথ দিয়ে ভাড়াটের মেয়ে বাড়ি ফেরে! ট্রিক্স অফ দ্য ট্রেড যারে কয়!

রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী আসলে সবাই হয় না, কেউ কেউ হয়। বা বলি কেউ কেউ-ই তেমনটা হওয়ার ক্ষমতা রাখে। খুব বড়ো ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কেলে

অনেক স্যুট-টাই পরা কর্মচারীকে সামলে কাজ তোলার পদ্ধতি হয়তো ভিন্ন ব্যাপার কিন্তু যারা স্রেফ কিছু বাড়ি তৈরির কাজে লিপ্ত, তাদের ধরন বা কাজ তোলার পদ্ধতি হরেদরে সেই একই, পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তেই হোক না কেন। পথেই কাটবে অনেকটা সময়, চুক্তি-সমঝোতায়, কর্মচারীকে এক চিৎকারেই সিধে করায় বা পিঠ চাপড়ানি দিয়ে আরও কাজ বের করে নেওয়ায়। এই রুটিন—ওই যে বললাম না পৃথিবীর সব জায়গায় একই!

এই 'দাদা'গণের অপার মহিমা, বলার অপেক্ষা রাখে না। হাসি মুখ, দিলদরিয়া আবার প্রয়োজনে পিঁপড়ে টিপে গুড় বের করতেও পিছপা হন না। কাজে এঁদের কোনও ঢিলেমি নেই এবং সাঙ্গোপাঙ্গও বুঝেসুঝে জোটান। মূলত বেকার যুবকের দল, যাদের দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী ইট-পাটকেল ছোঁড়ানো যায় এক কথায়। ১৯ শতকে, এমন মানুষের বেশ বলতে ছিল হয়তো ময়লা ধুতি আর ছোপ লাগা সাদা গেঞ্জি বা বেনিয়ান। এখন অবশ্য সে সবের বালাই নেই, এখন তাদের পরনে জিন্স, কালো চশমা আর অন্দরে এক অটুট ভ্রাতৃত্ব।

এবং অস্বীকার করে লাভ নেই তো, যে এ শহর গড়ে ওঠার নেপথ্যে এই ভ্রাতাগণের অনেকটাই কৃতিত্ব। যে জমিতে বাড়ি তৈরি করার কথা নয়, সেখানেই যদি তুলতেই হয় বাড়ি, কী করণীয় বলুন তো? বা ধরা যাক, মজে যাওয়া একটা পুকুর রয়েছে, সেটি বুজিয়ে ফেললেই মুহূর্তেই লাভজনক, তার জন্য কার কাছে আপনি ছুটবেন? কেন, সেই যে স্থানীয় দাদা! তার দরজা যে সদাই হাট করে খোলা। এক ডাকেই সাড়া দিয়ে সে তক্ষুনি চলে যাবে ঠিক যার সঙ্গে কথা বললেই মুহূর্তেই কেল্লা ফতে। তবে হ্যাঁ, তাকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ওই জমিতে বাড়ি বানানোর বরাতখানি অন্তত দিতে হবে। এ বার আপনি হয়তো তাকে নিজের কাজে জড়ালেন না, হতেই তো পারে, কিন্তু নো চিন্তা, লোকাল দাদা তবুও বড়ো মন দিয়ে আপনার কাজের অগ্রগতির প্রতি লক্ষ রাখবে! এবং সে অবশ্যই জানবে ঠিক কখন আপনার লরি ভর্তি সিমেন্ট আসছে! মজার ব্যাপার হল, আচমকাই যদি আপনি দেখেন কিছু পরিবেশ-বান্ধব রুখে দাঁড়িয়েছেন সেই সিমেন্টের ট্রাকের সামনে, তখন... তখন বলুন তো আপনি কার দ্বারস্থ হবেন? আমি এমনই অনেক দাদা ও উঠতি দাদাদের মধ্যেই বড়ো হয়েছি। তখন চাকরির বাজারে বড়োই টান এ শহরে। এবার আধুনিক শিল্পবাণিজ্যের কথা যদি ভাবি, দেখবেন কলকাতাতেই কিন্তু সর্বপ্রথম এসব গড়ে ওঠে। যাকে বলে ক্লাসিক ১৯ শতকীয় ঢঙে একে একে গড়ে উঠল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেটালের কাজ, পাট ও কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি। তার পর বদলাল সময়, মানুষের পছন্দ—

তারা আর চাইল না ঘরের সন্নিকটে দূষণ ছড়ায় এমন সব কারখানা। পাটের বদলে মানুষের প্রিয় ও কার্যকরী হয়ে উঠল প্লাস্টিক। একটি গোটা ইন্ডাস্ট্রি যেতে লাগল ডুবে। নিয়তিকে তবুও প্রাণপণ ঠেকানোর চেষ্টা চলল, কর্মীদের ইউনিয়ন সক্রিয় হল। স্ট্রাইক ডাকা হল, আন্দোলন শুরু হল, এমনকি মারদাঙ্গাও। কমিউনিস্ট পার্টিও এর মধ্যে ঢুকে পড়ল। এমন কাণ্ডকারখানা যখন প্রায় দিনের বাস্তব হয়ে উঠল, বিনিয়োগকারীরা স্বভাবতই এড়িয়ে যেতে লাগল এ তল্লাট। অলরেডি ধুঁকতে থাকা একটা ক্ষেত্র ক্রমে আরও ভঙ্গুর হয়ে পড়ল। ফলে কাজের বাজারে আরও হাহাকার উঠল। যাদের ট্যাঁকে ভালো ডিগ্রি ছিল বা জুতসই কানেকশন, তারা এক বাক্যে উড়ে গেল ব্যাঙ্গালোর, মুম্বই, দিল্লি বা আমেরিকা। আর পড়ে রইল যা গুটিকয়েক, তাদের ভাগ্যে থাকল এক ওই রিয়েল এস্টেট ছাড়া মাত্র আর কিছু ক্ষেত্রই।

আমি এমনই একজনের কথা বলি বরং। মিষ্টুদা। মিষ্টুদা বিরল প্রজাতির, অর্থাৎ মিষ্টুদা ঘষটে ঘষটে শেষ পর্যন্ত কিন্তু 'টু দ্য টপ' পৌঁছেছে! ও আমার চেয়ে বেশ কিছুটা বড়ো, কিন্তু আমরা এক সঙ্গে ক্রিকেট খেলতাম পাড়ায়। মানে মিষ্টুদা খেলত আর আমি ভান করতাম যেন খেলি।

হাইট মাঝারি কিন্তু একটা আস্ত চওড়া থামের মতো চেহারা ছিল মিষ্টুদার। শুরুটা হয়েছিল মিষ্টুদার কিন্তু সাধারণ বোড়ে হয়েই। শোনা যায়, প্রতিপক্ষের কন্সট্রাকশন সাইটের সামনে মিষ্টুদাকে স্রেফ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেই নাকি

অন্যদের মাথার চুল খাড়া হয়ে যেত। তারপর দিন যত গেল, মিষ্টুদা, বড়দাদের ধরে-টরে বরাত নিল, আদ্যিকালের পুরোনো কোনও সম্পত্তিকে এক ধাক্কায়

ধুলিস্যাৎ করে সেখানে বিলাসবহুল ফ্ল্যাট বানানোর। যেমন কথা, তেমন কাজ। একটার পর একটা সাফল্য মিষ্টুদাকে অন্য পর্যায়ে তুলে দিল।

অবধারিতভাবে ভাসতে লাগল মিষ্টুদাকে নিয়ে একের পর এক গল্প, কয়েকটা সম্ভবত সত্যিই ঘটেছিল। যেমন একটি বাড়ির কথা বলি, আমাদের থেকে কিছুটা দূরেই। ফাঁকাই পড়ে থাকত, প্রায় কেউই থাকত না, ওই এক বছর-৮০-র বিধবা ছাড়া। গোটা পরিবার নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত, ফলে সম্পত্তিটির দখল নিতে হলে শুধু ওই বৃদ্ধার একটি সই লাগত। মিষ্টুদা এক দিন সক্কাল সক্কাল এক গাল হাসি ও মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে হাজির হল দোরগোড়ায়। ভিতরে ঢুকে দুজনে দিল গল্প জুড়ে, যে কী দিন ছিল আগে আহা! কী শান্তি ছিল এলাকায় আর এখন, বাপ রে! সাঁ সাঁ করে এমন গাড়ি যায় বেপরোয়া ভাবে, ভেবেই তো শিউরে উঠতে হয়।

এবার মিষ্টুদা এল মূল কথায়। যে বাড়িটি সই করে দিয়ে দেওয়া মাত্রই, মিষ্টুদা, বৃদ্ধাকে আপাতত অন্য একটা চমৎকার বাড়িতে শিফ্‌ট করে দেবে, এখানে যে মাল্টি-স্টোরিড তৈরি হবে, সেখানে তো একটা ফ্ল্যাট দেবেই, সঙ্গে একটা গাড়ি, ড্রাইভার ইত্যাদি। বছর দুই পর, আবার এখানে তিনি ফিরে আসবেন আর নিজের ফ্ল্যাটেই বাকিটা শান্তিতে কাটিয়ে দেবেন, সিম্পল। ব্যাঙ্কে অঢেল টাকা তো রইলই, আলাদা করে বলতে হয় না। তা এত কিছু শুনেটুনে বৃদ্ধা বলে বসলেন, ‘খামোখা এত টাকা দিয়ে আমি করবই বা কী? আমার ওসব মোটেও চাই না। এমনিতেও আমার কোনও ছেলেপিলে নেই, বাকিরা আমায় কস্মিনকালেও দেখতে আসে না, ফলে...’

মিষ্টুদা সেদিনকার মতো বিদায় নিলেও, ফের এল, বলাই বাহুল্য। বৃদ্ধা তখনও অনড়। অগত্যা, বৃদ্ধার বাড়িতে ইট-পাটকেল পড়তে লাগল। দড়াম

করে জানলার কাচে লাগার শব্দ পড়শিরা ভালোই পেয়েছিলেন। তবে বৃদ্ধা বোধ হয় কিঞ্চিৎ কালা ছিলেন, তাই ওসব তাঁর কানে যায়নি। মিষ্টুদা এবার তবে কী করবে? কেন, আরও একটা বড়ো মিষ্টির বাক্স নিয়ে বৃদ্ধার কাছে হাজির

হবে! এই ভিজিটের পর হঠাৎ শোনা গেল, পাড়ার বেশ কিছু বেড়াল অজানা কী এক কারণে মারা গেছে। কিন্তু বৃদ্ধার যে সেসবেও কোনও হেলদোল নেই। তিনি বহাল তবিয়তে বারান্দায় দাঁড়িয়ে জগতের চলাচল দেখতেন। দেখছিলেন বহাল তবিয়তেই, যত দিন না আবার সেই 'অজানা' কী এক কারণে বারান্দার রেলিংখানি মড়মড় করে ভেঙে পড়ল। আর বেচারি বৃদ্ধা কোনও মতে ওপর থেকে হাতে প্রাণ নিয়ে ঝুলতে লাগলেন। ভাগ্যিস, ঠিক সেই সময়ে মিষ্টুদার কিছু সাঙ্গোপাঙ্গ ওখান দিয়ে যাচ্ছিল, নইলে যে কী হত! তারাই বৃদ্ধাকে কোনও মতে 'নতুন' এক জীবন দান করে। তবে আসল মজাখানি হল, বৃদ্ধা এরপরেও কাগজে সই করলেন না! মিষ্টুদাকে শেষমেশ হার স্বীকার করতেই হল। যদিও এটাও সত্যি যে তদ্দিনে মিষ্টুদার নজরে পড়েছিল অন্য এক বড়ো চাঁই। একটা বন্ধ সাবানের কারখানা। তা মিষ্টুদা কোনও একভাবে মালিককে পটিয়ে ফেলল জমি বেচে দিতে। এরপর, সেখানে মিষ্টুদা তুলে ফেলল অনেকগুলো ২০ তলা ফ্ল্যাটবাড়ি। ভাবুন, যেখানে চারের ওপরে কেউ কোনও দিন দেখেনি, সেখানে একাধিক ২০ তলা! সব বিক্রি হয়ে গেল এবং মিষ্টুদা এমন ধনী হয়ে উঠল যে হাত খুলে ক্ষমতাশীল পার্টিকে এবং হয়তো অন্য দলেদেরও অর্থ দান করল। এছাড়াও মিষ্টুদা খেয়াল করল যে অ্যাদ্দিনের সব সাগরেদরাও তো বুড়ো হচ্ছে, ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিলের ব্যবসায় তো আর তাদের নিয়ে চলবে না, তাই

তাদের জন্যে একটা আস্ত এনজিও-ই খুলে ফেলল মিষ্টুদা। কী কাজ তাদের? না একলা থাকা প্রবীণ মানুষদের সাহায্য করবে!

মুহূর্তেই মিষ্টুদার নাম বেরোতে লাগত বেশ ফলাও করে কাগজে-টাগজে। সমাজসেবী হিসেবে নানা অনুষ্ঠানের ফিতে কাটছে, এমন সব ছবিও বেরোল।

হাওয়ায় গুঞ্জন উঠল, মিষ্টুদা এবার নেমেই পড়বেন রাজনীতিতে, মানে মানুষের আরও ভালো করার লক্ষ্যে।

মিষ্টুদার নাম অতঃপর আরও বড়ো সব বিল্ডিং প্রোজেক্টের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। শহরের দূর কোনও প্রান্তে হাজার হাজার ফ্ল্যাট উঠতে লাগল। পূর্ব দিকে, যেখানে জলাজমি রয়েছে, ভেড়ি রয়েছে, যেখানে শহরের নর্দমার জল গিয়ে পড়ার কথা, সেখানেই উঠতে লাগল বহুতল। এ ট্র্যাডিশন এখনও সমানে চলিতেছে, এই আনতাবড়ি কন্সট্রাকশন কার্যক্রম। কারও বাড়ির পিছনের ভাগটা, অন্য কোনও একটা পুকুর, বা পুরোনো কোনও বাড়ি পলক ফেলার আগে হাত হয়ে যায়, বুজিয়ে ফেলা হয়, তারপর সে অঞ্চল একেবারে অন্যভাবে সেজে ওঠে। আরও আরও মিষ্টুদারা মঞ্চে অবতীর্ণ হন, এক-এক জন আগের জনের থেকে আরও স্পর্ধা রাখনেওয়ালা।

এবং এমনই প্রতিটা পদক্ষেপে, এমনই প্রতিটা খাল বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, এমনই জলাভূমি সংস্কার করে অন্য কাজে ব্যবহৃত হওয়ায়, এমনই প্লাস্টিক ব্যাগের ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিকাশি ব্যবস্থার দফারফা করায়, এ শহর তিলে তিলে যাচ্ছে মরে...

১৯৭৮ সালে একটা সাংঘাতিক ঝড় প্রায় ৪০০ মিলিমিটার বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিয়ে যায় শহর। পাঁচ দিন লেগেছিল জল নামতে। ২০০৬ সালে ৭৮-এর ঝড়ের চেয়ে কম শক্তিশালী একটি ঝড় ২০০ মিলিমিটার বৃষ্টি নামায় শহরে, জল নামতে লেগেছিল দশ দিন। পরিবেশবিদরা এই নিয়ে সোচ্চার হন আর

আমজনতা নিজের ড্রয়িং রুমে জল ঢুকে আসছে বলে সরব হবেন। এ সবের মধ্যে রাজনীতিকরাই শুধু জানবেন, কন্সট্রাকশন ব্যবসা-ই তো সেই সবেধন নীলমণি যেখানে বেকার যুবকদের কাজে লাগিয়ে, তাদের অন্য আরও গন্ডগোল থেকে সরিয়ে রাখা যায়। যতদিন না কাজের সংস্থান বাড়ছে এ শহরে, ততদিন কেউ সোনার ডিম দেওয়া হাঁসকে মারে?

এই মিষ্টুদাকেই জিজ্ঞেস করলে দেখবেন বলছে, (এখন সে কন্সট্রাকশন ব্যবসা থেকে অবসরপ্রাপ্ত যদিও এবং বাঘা রাজনীতিবিদ, যার প্রধান চিন্তা পরিবেশ!) সমুদ্রের স্তর এমন হু হু করে বাড়ছে, কদিন পর তো গোটা শহরটাই জলমগ্ন হয়ে যাবে, এমত অবস্থায় খামোখা কোন্ খানাখন্দে একটু জল জমল, তা নিয়ে ভাবলে চলে?

অলংকরণ : সারনাথ ব্যানার্জি

কলকাতার গুন্ডাদের জগৎ: পুলিশ নথির ভিত্তিতে ফিরে দেখা[১]

সুরঞ্জন দাস

সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অপরাধ মূলত সামাজিক সমস্যা, এক ধরনের মানসিক বিচ্যুতির প্রকাশ। আধুনিক গবেষকরা দেখিয়েছেন ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ সন্ধিক্ষণে 'অপরাধমূলক' কার্যকলাপ সচেতনভাবেই প্রতিবাদী রাজনীতির অঙ্গ হিসেবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। সরকারি দলিলে 'অপরাধ'-এর তালিকা থেকে অবশ্য অনেক সময়ে কারণটি স্পষ্ট হয় না। যেমন, এমনটা মনে করা হচ্ছে যে, ব্রিটেনের ইতিহাসে বেআইনিভাবে জীবজন্তু শিকার বা চোরাকারবার জমিদার শ্রেণির উত্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল। জমির ঊর্ধ্বসীমা আইন ভাঙা ছিল ভূমি, চারণ ক্ষেত্র ব্যবহারে সাধারণের অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। খাদ্য দাঙ্গাও চরম খাদ্যসংকটে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিশ্লেষিত হয়েছে।[২]

এই প্রেক্ষাপটে আমি কলকাতার অপরাধ জগতের ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করব এখনও অবধি অব্যবহৃত ১৯২৬ থেকে ১৯৭১ সালের বেঙ্গল পুলিশের কিছু 'গুন্ডা ফাইল'-এর বিশ্লেষণের মাধ্যমে। অবশ্যই এই ধরনের সমীক্ষা থেকে একটি খণ্ডচিত্র উঠে আসবে, যা অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি তথ্য ও স্থানীয় কিছু কাহিনির ভিত্তিতে পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব। শেভালিয়র-এর ভাষায় বলা যেতে পারে 'গুণগত প্রমাণ' (qualitative evidence) এ ধরনের বিশ্লেষণকে পূর্ণতা দিতে পারে। লন্ডন ও প্যারিসের অপরাধ জগতের ছবিটা এই ভাবেই পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে।

ব্রিটিশদের আসার আগে ভারতে অবশ্যই বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজকর্মে লিপ্ত সামাজিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল। তবে ঔপনিবেশিক আমলে তাদের

আইনের মাধ্যমে গুন্ডা, ঠগ, ডাকাত বা 'অপরাধী জনগোষ্ঠী' (Criminal Tribes) হিসেবে চিহ্নিত করে মূল সমাজ থেকে বার করে দেওয়া হয়। তাদের পুলিশ ও কারাগারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফুকো (Foucault)-র বিশ্লেষণ অনুযায়ী এই ভাবে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে সমাজের মূল স্রোত থেকে আলাদা করে দেওয়া ছিল ঔপনিবেশিক সরকারের ক্ষমতা জাহির করার একটি উপায়।[৩] ১৯২৬-এ চালু হওয়া বাংলা সরকারের 'গুন্ডা আইন' অনুসারে চুরি, ডাকাতি, জুয়াখেলা, পকেটমারি, চোরাচালান, কোকেন ব্যবসা ও বিভিন্ন বেআইনি কার্যকলাপে যুক্ত দণ্ডিত অপরাধী বা সন্দেহভাজন অপরাধীর সমস্ত প্রাপ্ত তথ্য পুলিশকে লিপিবদ্ধ করতে হত। তবে এভাবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গুন্ডার অপরাধে লিপ্ত হওয়ার আসল কারণ অনুসন্ধানের কোনও চেষ্টা ছিল না, বরং রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাকে দমন করত। এ ব্যাপারে একটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া যেতে পারে:

> ... goondas are presented as socially unplaced and the ultimate effect is to create an image of the man, and of a group of men, as brought up outside the sphere of normal society— to peripheralise them.[৪]

কিন্তু গুন্ডা ফাইলের তথ্যের ভিত্তিতে তাদের কার্যকলাপ পুনর্নির্মাণ করলে সমাজের প্রচলিত ধারণা প্রশ্নের মুখে পড়বে। গুন্ডা ফাইলগুলির তথ্যের ভিত্তিতে অপরাধীদের সামাজিক পরিচয়, তাদের অপরাধের প্রেক্ষাপট, অপরাধের ধরন, প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ সব কিছুতেই অসমতা চোখে পড়ার মতো। তবে অনেক ক্ষেত্রেই গুন্ডা হিসেবে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ছিল সামাজিক বৈষম্যের শিকার। আর্থিক বিপন্নতা, পারিবারিক দারিদ্র্য, ব্যবসায় ব্যর্থতা, চাকরি চলে যাওয়ায় নিঃস্ব হয়ে পড়া, কলুষিত পরিবেশ বা বিবাহবিচ্ছেদ এক-একজনকে অপরাধ জগতে ঠেলে দিয়েছে। উল্লেখ্য, যে ৫০টির মতো গুন্ডা ফাইল আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, সেগুলিতে মুসলিম সম্প্রদায় থেকে কোনও গুন্ডার নাম নেই বললেই চলে। তবে এর ঐতিহাসিক সত্যতা কতটা, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।[৫] তবে গুন্ডা আইনে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছে, এমন তালিকায় রয়েছে : দু-জন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান—এরিক মিশেল[৬] ও নেভেল চেম্বার্স[৭], বিদেশি পাসপোর্টধারী জনৈক চিনা ব্যক্তি নাং ওয়াই[৮] এবং এক মহিলা নির্মলা দাসী[৯]।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শহর হিসেবে লন্ডনের অনেক বৈশিষ্ট্য আত্মস্থ করেছিল কলকাতা, যেগুলি তার অন্ধকার অপরাধ জগৎ তৈরিতে বড়ো ভূমিকা

নিয়েছে। একদিকে গত শতাব্দীর শুরুতে শহরটি বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল, অন্যদিকে কলকাতায় জাতিগত ও শ্রেণিগত বিভাজন ছিল স্পষ্ট। ইংরেজ অধ্যুষিত 'সাদা এলাকা' ও সমৃদ্ধ ভারতীয়দের 'নেটিভ এলাকা'র সহাবস্থান ছিল অস্বাস্থ্যকর বস্তির সঙ্গে। এছাড়া, শহরের জনসংখ্যার প্রায় সাত-দশ শতাংশ ছিল বিহার বা উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা কিছু পিছিয়ে পড়া সামাজিক গোষ্ঠীর অংশ, যারা শ্রমিক, গাড়োয়ান, ঠেলা-চালক ও কুলি হিসেবে জীবিকা অর্জন করত। কলকাতার সামাজিক এই মানচিত্র গুন্ডা সমাজ তৈরিতে আলাদা মাত্রা যোগ করেছিল। মহানগরের উত্তর ও কেন্দ্রীয় অংশে, বিশেষ করে আপার সার্কুলার রোড, আমহার্স্ট স্ট্রিট, নারকেলডাঙ্গা, বেলেঘাটা, বউবাজার, রামবাগান এবং মুচিপাড়া অঞ্চলে গুন্ডারা বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। কলকাতার অপরাধের ভূগোল বা geography of crime নিয়ে আলোচনার জন্য একটি বিশ্লেষণধর্মী কাঠামোর প্রয়োজন। এর মাধ্যমে আমরা অনুধাবন করতে পারব কীভাবে সামাজিক পরিবেশ সংঘটিত অপরাধের ধরনের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। সর্বোপরি, অনেক ক্ষেত্রে 'অপরাধ' একটি দৈনন্দিন বাস্তবতায় পরিণত হয় এবং বিপথগামীরা বিশেষ একটি এলাকায় বাস করতে বাধ্য হয়, যেখানকার পরিবেশ তাদের আরও নীচে টেনে নামিয়ে আনে।[৬]

পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি কীভাবে কাউকে কাউকে অপরাধের দিকে নিয়ে যায়, তা আমি কিছু উদাহরণ দিয়ে দেখাতে চাই। ফুলচাঁদ কাহার এবং রণজিৎ দেবনাথের[৭] পরিবার জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় চলে এসেছিল। কিন্তু তারা বস্তিতে থাকতে বাধ্য হয়েছিল, যা তাদের স্থানীয় সমাজবিরোধীদের সহজ শিকারে পরিণত করেছিল। ঢাকার একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে বড়ো হয়ে ওঠা সুবোধচন্দ্র দে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর বেলেঘাটা বস্তিতে বাস করতে আসে। সে ভদ্রস্থ কাজ জোগাড় করতে ব্যর্থ হয় এবং ক্রমে এক অজানা জগতে ঢুকে পড়ে। ধীরে ধীরে অন্ধকার জগতে তলিয়ে যায় সুবোধ।[৮]

পল্টু দাস শৈশবেই তার পিতামাতাকে হারিয়েছিল। তার দিদি পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করেছিল এবং সে-ই ভাইকে পালন করে। পল্টু এইভাবে খুব ছোটো বয়স থেকেই স্থানীয় সমাজবিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত মাদকাসক্ত পল্টু বেশ্যালয়ের দালালের জীবিকাই বেছে নেয়।[৯] শেখ শাহজাহানের বাবা একজন দরিদ্র কুলি ছিল। সে তার ছেলেকে ঠিকভাবে প্রতিপালন করতে পারেনি। এর ফলে শাহজাহান শৈশব থেকেই এলাকার খারাপ চরিত্রের লোকজনের পাল্লায় পড়ে, যারা তাকে জুয়াখেলায় টেনে আনে। শেষ পর্যন্ত কুখ্যাত গুন্ডা

গ্যাং-এর নেতা হয়ে ওঠে শাহজাহান।[১০] একই কারণ মহম্মদ ইদ্রিস, রাজন আলি, আনোয়ার আলি, শামসুল আলম, নিসার আহমেদ এবং কৃপাল সিং-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য[১১]।

আবার, ব্রজেন্দ্র সরকার (ওরফে শম্ভু) এবং চিত্ত পালকে অর্থের অভাবে পড়াশোনা বন্ধ করতে হয়, যা তাদের স্থানীয় লুটেরাদের সহযোগী হতে উৎসাহিত করেছিল।[১১] রবীন্দ্রনাথ দাস, রাহুল আমিন, অধীর প্রামাণিক (ওরফে ভাইয়া), ইন্দুভূষণ গোস্বামী, অষ্ট ঘরাই, ভুলু দাস এবং রণজিৎ গোয়ালা অল্প বয়সেই তাদের বাবাদের হারিয়েছিল, যা তাদের তীব্র অর্থকষ্টের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। ফলে কাঁচা পয়সা রোজগারের তাগিদে তারা মদের বেআইনি ব্যাবসা, জুয়াড়ি ও পতিতালয়ের দালাল হিসেবে কাজ শুরু করে। বিভিন্ন ব্যক্তির ওপর চড়াও হয়ে টাকা আদায় করতেও তারা পিছপা হত না।[১২] নুরু ১৪ বছর বয়সে তার মাকে হারায়, বাবা মহম্মদ শাহ আবার বিয়ে করে। কিন্তু নুরুর সৎ মা তাকে চরম অর্থকষ্টে ফেলে ও জীবিকা অর্জনের জন্য গুন্ডাদের গ্যাং-এ যোগ দিতে বাধ্য করে।[১৩] কৃষ্ণবাহাদুর নেপালি ১৯২৬ সালে দার্জিলিং-এর একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিল। প্রথমে একজন চিনা ব্যক্তি এবং তারপর একজন ফেরিওয়ালা তাকে পালন করেছিল। কিন্তু সে সব সময়ে মানসিক অস্থিরতায় ভুগত। সেখান থেকে রেহাই পেতে সে কুসঙ্গে পড়ে।[১৪] পারিবারিক ব্যবসা অলাভজনক হয়ে পড়লে বাবুলাল খটিক এবং লক্ষ্মীনারায়ণ পোরাল স্থানীয় অপরাধীদের সঙ্গে যোগসাজশে গড়ে তোলে তাদের নিজস্ব গ্যাং।[১৫] উত্তর কলকাতার গুন্ডা হিসেবে পুলিশের খাতায় নথিভুক্তদের অনেকেই পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে অপরাধ জগতে প্রবেশ করেছিল। যেমন, অমিত মাইতির বাবা একজন কুখ্যাত গুন্ডা ছিল এবং দিলীপ সিং-এর বাবা ছিল ধুরন্ধর জুয়াড়ি।[১৬]

প্রায়শই দেখা যায় ব্যক্তিগত জীবনের কোনও প্রতিকূল বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা একজনকে 'গুন্ডা' হিসেবে জীবন কাটাতে বাধ্য করে। রঞ্জিতকুমার বোস (ওরফে রুনু) ছিলেন কালীঘাট স্পোর্টিং ক্লাবের একজন বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড়। কিন্তু ১৯৪৪ সালে ডালহৌসি ক্লাবের কাছে কালীঘাট স্পোর্টিং-এর পরাজয়ের পিছনে তাঁর হাত ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাঁকেই দায়ী করা হয়েছিল। এই সন্দেহের কারণে রঞ্জিত বোস ক্লাব থেকে বহিষ্কৃত হন এবং সেখানেই তাঁর ক্রীড়াজীবনের অপমানজনক সমাপ্তি ঘটে। রুনু তখন হতাশায় তলিয়ে যেতে থাকে ও খুব

সহজেই অসৎ সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।[১৭] বসন্ত সাহা (ওরফে ভেন্ডা) একটি চোরাচালান মামলায় জড়িয়ে পড়ে রিষড়ায় মার্কিন বিমান ঘাঁটিতে চাকরি হারায় এবং তারপর অপরাধ জগতে পা রাখে।[১৮] এছাড়াও, ১৯৫০ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরে যেসব হিন্দু কলকাতায় এসেছিল শরণার্থী হিসেবে, তাদের অনেকেই সৎ পথে জীবনযাপনের চেষ্টা করেও হতাশ হয়েছিল। তারা অচিরেই কলকাতার অপরাধ জগতে প্রবেশ করে।

আর্থিক সংকট এবং গুন্ডাদের দলে নাম লেখানোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কিন্তু বোঝায় না যে, কলকাতার অপরাধজগৎ মূলত 'আর্থিক বৈষম্য এবং সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। আর, সেটা নিয়ন্ত্রণ করত এলাকার অপরাধ জগতের মাথায় বসে থাকা নেতারা।' লন্ডনের সমাজচ্যুত বা টাইবার্নের সাজাপ্রাপ্তদের মতো এটা ধরে নেওয়া ঠিক হবে না যে, কলকাতার সব গুন্ডা প্রান্তিক সামাজিক গোষ্ঠী থেকে এসেছিল বা দরিদ্র ছিল। এমন অপরাধীদেরও খোঁজ মিলেছে যারা জমিদার ছিল, শিক্ষিত, পেশাদার ও মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছে। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি: লাল মিয়া ছিল পূর্ব বাংলার ময়মনসিংহের জমিদারের ছেলে ; ধান, পাট ও আখের ব্যবসায়ে তার আগ্রহও ছিল[১৯]; অমরেন্দ্র মজুমদার সরকারি আর্ট কলেজে দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিল; সলিল মজুমদার এবং অনিমেষ গুপ্ত বিদ্যাসাগর কলেজের ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণির ছাত্র ছিল; সুব্রত চক্রবর্তী ১৯৬০ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং ১৯৬৭ সালে কলকাতা টেকনিক্যাল স্কুল থেকে মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিপ্লোমা লাভ করে[২০]। বেলেঘাটার সত্যপ্রিয় ভট্টাচার্য আইনজীবী পরিবারের সন্তান। সে বেঙ্গল ক্রেডিট ব্যাঙ্ক এবং সরকারি রেশনিং দফতরে চাকরিও করত।[২১] চিত্তরঞ্জন গুহ[২২] এবং দ্বারকা নাথান[২৩] উভয়ই ছিল চিকিৎসকের পুত্র; খলিল আহমেদ কোরেশির বাবা ছিলেন মধ্য কলকাতার একজন কোয়াক ডাক্তার।[২৪]

গুন্ডা ফাইল থেকে এটাও জানতে পারা যায় যে, অপরাধজগতের কিছু ব্যক্তির পূর্বে সামরিক সংযোগ ছিল। অনিল বোস ভারতীয় নৌবাহিনীতে যোগদান করেছিল, কিন্তু ১৯৪৬-এ বোম্বে নৌ-বিদ্রোহে অংশগ্রহণের জন্য চাকরি হারায়।[২৫] প্রকাশ দাস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ঢাকুরিয়া (দক্ষিণ কলকাতা) মার্কিন মিলিটারি ক্যাম্পে ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে কাজ করত, কিন্তু একজন নার্সকে যৌন হয়রানির অভিযোগে তাকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল।[২৬] রাম সিং গিল ১৯৪০-এর দশকে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে জমাদার হিসেবে নিযুক্ত

হয়েছিল।[২৭] তপন বোস এবং উৎপল কুমার পাণ্ডে ১৯৬০-এর দশকে ভারতীয় নৌবাহিনীতে কর্মরত ছিল।[২৮] আমাদের কাছে অন্তত দুটি উদারহণ রয়েছে এবং তাও খুব দূর অতীত থেকে নয়, যেখানে কলকাতার পুলিশের অফিসারদের 'অপরাধী' সংযোগ থাকার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।[২৯] তাদের মধ্যে একজন এমনকি একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান, পিতা ছিলেন জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী এবং দাদা কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের সিকিউরিটি অফিসার।

গুন্ডা ফাইলে উদাহরণ আছে কীভাবে একটি মর্মবিদারক ঘটনা একজনকে অপরাধ জগতে ঠেলে নিয়ে যেতে পারে, যেরকম ঘটেছিল ১৯৪৬ সালের কলকাতার দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে।[৩০] এই প্রসঙ্গে যে নামটির ক্রমাগত উল্লেখ পাওয়া যায় তা হল মধ্য কলকাতার মলঙ্গা এলাকার গোপাল মুখার্জি (ওরফে গোপাল পাঁঠা), যিনি দাঙ্গার সময়ে হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য 'ভারত জাতীয় বাহিনী' গড়ে তুলেছিলেন।[৩১] একটি পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী এই বাহিনী বিস্ফোরক এবং আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে প্রশিক্ষিত একটি বেসরকারি সেনাবাহিনীর মতো ছিল।[৩২] সদস্যদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন, যেমন— কৃষ্ণ, যাঁদের নিরাপত্তাহীনতার কারণে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় বাসস্থান ছেড়ে দিতে হয়েছিল।[৩৩] অন্যরা, যেমন দীনবন্ধু দত্ত (ওরফে অ্যান্ড্রু ওরফে ইন্দু) বা সন্তোষকুমার পাল বা ভানু বোস, মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান।[৩৪] কিন্তু মুসলিমদের হাতে তাঁদের সম্প্রদায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। কখনও বিডন স্ট্রিটের বসন্তের মতো পরিচিত ষণ্ডাগুন্ডাদের গোপাল মুখার্জি নিয়োগ করেছিলেন 'মুসলিম ডাকাতদের' মোকাবিলা করতে। লক্ষ্মীনারায়ণ পাল (ওরফে লাখা)-র মতো ব্যক্তিদের উদাহরণও রয়েছে, যারা লাইসেন্সবিহীন আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে দক্ষতা অর্জনের জন্য বাহিনীতে নিজেদের যুক্ত করেছিল।[৩৫]

জাতীয় বাহিনী হিন্দুদের কাছ থেকে উদারভাবে আর্থিক সাহায্য পেয়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে। কিন্তু দাঙ্গা প্রশমিত হলে, এই সমর্থন প্রত্যাহৃত হয়। এটি সম্ভবত গোপাল মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর অনুগামীদের বেঁচে থাকার তাগিদে 'অপরাধ'-এর জগতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সোনারপুর ডাকাতি মামলা এবং গিনি ম্যানশন ডাকাতি মামলার মতো সশস্ত্র ডাকাতি থেকে শুরু করে অস্ত্র দেখিয়ে অপহরণ, বাড়িতে ডাকাতি, চোরাচালান, ছোটোখাটো ছিনতাই এবং চুরিতে পর্যন্ত তারা জড়িত ছিল।[৩৬] বাহিনীর কিছু অনুগামী কলকাতায় পরবর্তী কালে ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।[৩৭] গোপাল মুখার্জির বাহিনীর একটি অংশ স্বাধীনোত্তর কংগ্রেস পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে

তোলে। কিন্তু আবার রাম চ্যাটার্জির মতো সদস্যরা বাম রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং এক সময়ে বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বও পালন করেন।[৩৮]

কলকাতা পুলিশের গুন্ডা ফাইল দোষী বা সন্দেহভাজন অপরাধীদের কার্যকলাপের ওপর আলোকপাত করার জন্যই তৈরি হয়। তাদের অপরাধের তালিকায় রয়েছে: ছিনতাই, জুলুমবাজি, চুরি, ডাকাতি, ট্রেন-ডাকাতি, চোরাচালান, জুয়াখেলা, কালোবাজারি। একজন পেশাদার গুন্ডার পক্ষে বিপুল অর্থ উপার্জন করাটা কখনোই অস্বাভাবিক ছিল না। যেমন, হেমন্তকুমার মণ্ডলের একটি লরি ও একটি লিমুজিন ছিল। একবার তার বাড়িতে পুলিশের অভিযানে নগদ ৬৫,৪৮৫ টাকা, ৫৫,০০০ টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট, নগদ সার্টিফিকেট, ১৫৩৫ গ্রাম সোনা উদ্ধার হয়। তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রায় ২ লক্ষ টাকার হদিশ পাওয়া যায়।[৩৯] গুন্ডারা সাধারণত সংগঠিত গোষ্ঠী হিসেবে বা ক্লাবের পৃষ্ঠপোষকতায় কাজ করত; যেমন—ভারতীয় জাতীয় বাহিনী, ফ্রন্টিয়ার বাহিনী, বুলেট সংঘ।[৪০] স্থানীয় শরীরচর্চা কেন্দ্র বা আখড়াগুলি অনেক সময়ে গুন্ডাদের কার্যকলাপের ঘাঁটি ছিল।[৪১] বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র অবাধে ব্যবহার করত গুন্ডারা। কিছু গুন্ডা বিশেষ বিশেষ অপরাধে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। যেমন—রামসিং গিল হাইওয়েতে ট্যাক্সি এবং মোটরগাড়ি ডাকাতিতে পারদর্শী ছিল।[৪২] শেখ ইসমাইল ও রবীন্দ্রনাথ ধর ট্রেন ডাকাতিতে হাত পাকিয়েছিল।[৪৩] বাবুলাল কালওয়ার বেশ কিছু ছেলেকে মালিশ করা শিখিয়েছিল, যাতে তারা ময়দানে-আসা মানুষদের মালিশ করার পরে বলপ্রয়োগে অর্থ আদায় করতে পারে।[৪৪] আবার, জমিদারের প্রতিনিধি হয়ে কৃষকদের উচ্ছেদ করত মিলন।[৪৫] চার্লস নেভিল চেম্বারস অল্পবয়সি মেয়েদের নগ্ন ছবি তুলে তারপর ধর্ষণ করত।[৪৬]

পতিতালয় ও গুন্ডাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। গুন্ডা তালিকাভুক্ত অনেকেই পতিতালয়ের দালাল হিসেবে অপরাধী জীবন শুরু করে। কেউ কেউ এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কলকাতায় অবস্থানরত মার্কিন সৈন্যদের জন্যে পতিতা নারী জোগাড় করত। আবার পতিতাদের ওপর নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে অপরাধীরা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষেও লিপ্ত হত।[৪৭]

স্বাধীনতার পরে কলকাতা পুলিশ নতুন ধরনের গুন্ডাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, যাঁরা ‘রাজনৈতিক গুন্ডা’ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁদের নিয়ে ফাইলগুলির একটি নতুন অংশ চালু হয়। আসলে এই সময়ে যেসব আইন লঙ্ঘনকারীদের রাজনৈতিক সংযোগ ছিল, তাঁদের আলাদা করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তথাকথিত ‘রাজনৈতিক গুন্ডাদের’ ফাইলগুলির হিস্ট্রি শিটগুলি যত্ন

সহকারে পড়ে জানা যায়, এই ধরনের দণ্ডিত অপরাধীরা মূলত বাম কর্মী ছিলেন, যাঁদের 'গুন্ডা' হিসাবে চিহ্নিত করে পুলিশ সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। বাম মতাদর্শে বিশ্বাসী এই অভিযুক্তদের অনেকে ১৯৪৯ সালে পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের জন্য ন্যায্য পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেফতার হন। আবার, ১৯৫৩ সালে ট্রামভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন বা মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে ১৯৫৯ সালের রাজনৈতিক সংগ্রামের সময়েও অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং গুন্ডা আইনের অধীনে তাঁদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়।[৪৮] ঢোড়া মাহাতো এবং পুনিত গোয়ালার মতো ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যদের 'রাজনৈতিক গুন্ডা' তকমা দিয়ে চোরাচালান বা অন্যান্য অসামাজিক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বলে অভিযুক্ত করা হয়।[৪৯] এটা লক্ষণীয় যে, বেশ কিছু 'রাজনৈতিক গুন্ডা'-র ফাইলে তাঁদের গ্রেফতার হওয়ার পর আচমকাই সব এন্ট্রি বন্ধ হয়ে যায়। এটা সম্ভবত পুলিশ হেফাজতে তাঁদের মৃত্যুর ইঙ্গিত দেয়।

আমরা কিছু রাজনৈতিক কর্মীর সাক্ষাৎকার নিয়েছি, যাঁরা এক সময়ে পুলিশের ফাইলে গুন্ডা হিসেবে তালিকাভুক্ত, কিন্তু এখন স্ব-নিযুক্তির মাধ্যমে জীবনের মূল স্রোতে ফিরে এসেছেন। তাঁরা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র এবং বোমা ব্যবহার করার কথা স্বীকার করলেও তাঁরা সাধারণ 'অপরাধী'-দের থেকে অবশ্যই আলাদা। অতীতের দিকে তাকালে তাঁরা এখন বুঝতে পারেন, কীভাবে রাজনৈতিক নেতারা তাঁদের পেশিশক্তিকে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছিলেন। সমাজে যাঁরা ক্ষমতার অধিকারী তাঁদের শত্রু হিসেবেই গণ্য করেন এই সব রাজনৈতিক কর্মী।[৫০]

পুলিশ যখন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক কর্মীদের 'অপরাধী'-র মোড়কে শাস্তি দিতে ব্যস্ত, তখনই তালিকাভুক্ত গুন্ডাদের কেউ কেউ প্রশাসনের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি করে আইনের শাসন থেকে নিস্তার পেত। যেমন— হরিলাল পাণ্ডে (ওরফে হরিয়া) বারবার গ্রেফতারি এড়াতে সক্ষম হয়েছিল, কারণ সে ছিল এক বিধায়কের 'প্রিয়'।[৫১] পুলিশের আটকের আদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে ইচ্ছাকৃতভাবে বিরামচিহ্ন ব্যবহার করার কারণে হাইকোর্ট থেকে মুক্তির নির্দেশ পেয়ে যায় জনৈক দিলীপ সিং।[৫২] রাজ্য প্রশাসন এবং কিছু গুন্ডার মধ্যে যোগসূত্র বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন পুলিশি রেকর্ডে উল্লেখ করা হয় যে, 'জনস্বার্থে' তাদের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেওয়া হল।[৫৩] পৃথ্বীশকুমার বোসের কথাই ধরা যেতে পারে। এক সময়ে স্থানীয় থানা তাকে 'কুখ্যাত অপরাধী' বলে চিহ্নিত করেছিল। অথচ একটি নির্দিষ্ট বছর পরে তার হিস্ট্রি শিট-এ এন্ট্রি আচমকাই

বন্ধ হয়ে যায়।[৫৪] এটাও সন্দেহজনক যে, কীভাবে বিদেশি পাসপোর্টধারী নাং ওয়াই (চিনা টনি), তার প্রত্যর্পণের জন্য সরকারি আদেশ অমান্য করে। পুলিশের সঙ্গে যোগসাজশ ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না।[৫৫]

কখনও কখনও উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা গোপনে কাউকে 'ভয়াবহ অপরাধী', 'ভীতির কারণ' বা 'এলাকার মানুষের ত্রাস' বা 'টাকা আদায়ের জন্য অত্যধিক লোভী', 'আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিপদ', 'কুখ্যাত ডাকাত' ইত্যাদি তকমা সেঁটে দেয়।[৫৬] কিন্তু অনেক সময়েই তাদের দোষী সাব্যস্ত করা যায়নি যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে। এই ভাবেই ফুলচাঁদ কাহার বা রঞ্জিতকুমার হাজরা যৎসামান্য জরিমানা দিয়ে ও ছোটোখাটো মেয়াদে কারাদণ্ড ভোগ করে অপরাধমূলক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে থাকে।[৫৭] পুলিশের মতে, গুন্ডাদের দলের লোকেরা স্থানীয় বাসিন্দাদের ওপর প্রতিশোধ নেবে, এই ভয়েই কেউ সাক্ষী দিতে চাইত না। ফলে অপরাধীদের কারাদণ্ড দেওয়া যেত না। কিন্তু এটা সব সময়ে সত্য ছিল না। পুলিশ ফাইলেই উল্লেখ আছে, শনাক্তকরণ প্যারেডের সময়ে প্রত্যক্ষদর্শীরা একজন অপরাধীকে চিহ্নিত করছে বা জনতা গুন্ডাকে ধরে এনে থানায় সমর্পণ করছে।[৫৮] এমন উদাহরণও আছে যেখানে জনগণের চাপে পুলিশকে কাজ করতে হয়েছে। এটি ঘটেছিল গৌরীবাড়িতে, যখন হেমন্ত মণ্ডলের অপকর্মে পুলিশি নীরবতায় হতাশ স্থানীয় লোকজন শান্তি কমিটির নেতৃত্বে একটি প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত করে এবং হেমন্তকে গ্রেফতার করতে প্রশাসনকে বাধ্য করে।[৫৯]

এই প্রেক্ষাপটে আমি সমস্যাটির একটি নতুন দিকের ওপর আলোকপাত করতে চাই। আমি গোপাল মুখার্জির (গোপাল পাঁঠা) প্রতি আবার নজর ফেরাচ্ছি এবং তাঁর প্রতি পুলিশি ধারণার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মনোভাবের উল্লেখ করছি। গোপাল মুখার্জি প্রতিবেশীদের চোখে বিপ্লবী অনুকূল মুখার্জির নাতি, ১৯৪৬ সালে কলকাতা হত্যাকাণ্ডের সময়ে বহু হিন্দু মহিলার রক্ষাকর্তা, জনহিতকর কর্মকাণ্ডের পৃষ্ঠপোষক, নেতাজির জন্মদিনের মতো বেশ কিছু জাতীয় দিবস উদ্‌যাপনে অগ্রগণ্য।

গোপাল মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য, তা অনেক গুন্ডার ক্ষেত্রেও সত্য হতে পারে। সমাজের অনেক মানুষের মতো গুন্ডা আইনে অভিযুক্তরাও একাধিক পরিচয়ের অধিকারী— এমনটা হতেই পারে। একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে কোনও বিশেষ পরিচিতি বাকিগুলির তুলনায় প্রাধান্য পেতে পারে।

একজন গুন্ডা এক সময়ে আত্মস্বার্থে আইন ভাঙতে পারে, কিন্তু অন্য কিছু ক্ষেত্রে সে বহিরাগতদের হাত থেকে তার প্রতিবেশীদের রক্ষক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

একই ব্যক্তির সরকারি খাতায় ও জনমানসে ভাবমূর্তির ক্ষেত্রে যে বৈপরীত্য থাকতে পারে, সে সমস্যার সমাধানের জন্য, আমাদের একটি উপযুক্ত বিশ্লেষণাত্মক কাঠামো প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে পশ্চিমি দুনিয়ায় ইতিহাস রচনার সময়ে প্যাম্‌ফ্লেট, বেনামী চিঠি ও হ্যান্ডআউট থেকে অপরাধীদের সামাজিক পরিচয় উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা চালানো হয়।[৬০] পিটার লাইনবাগ অষ্টাদশ শতকের লন্ডনে অপরাধ ও সুশীল সমাজের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে টাইবার্নে ফাঁসি দেওয়া পুরুষ ও মহিলাদের জীবনী ব্যবহার করেছেন।[৬১] দুর্ভাগ্যবশত এই ধরনের আকর তথ্য আমাদের দেশে পাওয়া কঠিন। এই পরিস্থিতিতে মৌখিক ইতিহাস খোঁজার পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। কিন্তু অপরাধীদের অতীত জীবনের কৃতকর্মের বিবরণ দিতে যথেষ্ট অনীহা লক্ষ করা গিয়েছে। গুন্ডা হিসেবে অভিযুক্তদের সাধারণ মানুষ কী চোখে দেখেন, তা বিশ্লেষণ করা কলকাতার অন্ধকার জগতের গবেষকদের কাছে নিঃসন্দেহে একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবে।

উপসংহার

পুলিশের উপরোক্ত 'গুন্ডা ফাইলের' সেটগুলি, যাকে আধুনিক ভাষায় 'টেক্সট' বলা যেতে পারে, নিশ্চয়ই বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, উত্তর-আধুনিকতাবাদীরা যাঁরা বিশ্বাস করেন 'history is never present to us in anything but a discursive form', অবশ্যই বিনির্মাণের (deconstruction) পথ বেছে নিতেন। কিন্তু যাঁরা ইতিহাসকে পরিবর্তনশীল সামাজিক কাঠামোর অধ্যয়ন হিসেবে দেখেন, তাঁরা বিশ্লেষণ সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হন। তার কারণ উত্তর-আধুনিকতাবাদীদের যুক্তিতে অতীত অবধারিতভাবে সাহিত্যে বিলীন হয়ে যায়। যার ফলে বাস্তব অবস্থা, সংস্কৃতি, আদর্শ এবং আরও জটিল মানবিক প্রতিক্রিয়াগুলি পরিবর্তনের ব্যাখ্যা পথ খুঁজে পায় না। গ্যাব্রিয়েল এম স্পিগেল-এর ভাষায়:

> Our most fundamental task as historians... is to solicit those fragmented inner narratives to emerge from their silences. In the final analysis, what is the past but a once material existence, now silenced, extant only as sign and as sign drawing to itself chains of conflicting interpretations that hover over its absent presence and compete for possession of the relics, seeking to inscribe traces of significance upon the bodies of the dead?[৬২]

কার্ল মার্কস মন্তব্য করেছিলেন:

> The 'criminal' produces not only crimes, but also criminal law, and with this the professor who lectures on 'criminal' law.[৬৩]

অপরাধী সমাজের ইতিহাসবিদকে 'অপরাধ' আইনের বিশেষজ্ঞ হতে হবে না। তবে অপরাধীদের আচরণের অধ্যয়নে সমাজ, 'অপরাধ' এবং অপরাধী সম্পর্কে উপযুক্ত প্রাসঙ্গিক কাঠামো অনুসরণ প্রয়োজন। জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, বা সমাজজীবনের অন্যান্য দিক নিয়ে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যেমনটা করা হয়ে থাকে, এখানেও সেটাই প্রযোজ্য। ভারতে 'অপরাধ' জগতের উপর ইতিহাসের গবেষণা এখনও শুরুর পর্যায়ে।[৬৪] গুন্ডা ফাইলের মতো তথ্যভাণ্ডার এখনও কার্যত অব্যবহৃতই থেকে গিয়েছে। যত বেশি করে আমরা এ ধরনের তথ্যের দুনিয়ায় প্রবেশ করতে পারব, ততই আমরা কলকাতার তথাকথিত অন্ধকার জগৎকে আরও বেশি বুঝতে পারব। কলকাতার অপরাধ-সমাজের পুনর্নির্মাণেও তা সাহায্য করবে, এই আত্মবিশ্বাসে ভর করেই বর্তমান প্রবন্ধটি রচিত।

তথ্যসূত্র

১. এটি যে মূল প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত ও সংশোধিত সংস্করণ: Suranjan Das, `The Goondas: Towards a Reconstruction of the Calcutta Underworld through Police Records', *Economic and Political Weekly*, vol.XXIX, No.44, October 29, 1994, pp.2877-2883.

২. এই বিষয়ে কিছু প্রামাণ্য কাজের মধ্যে রয়েছে: D. Hay (eds) *Albion's Fatal Tree: Crime and Society in Eighteenth-Century England* (Lonodon: 1975); E.P. Thompson, *Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act* (London: 1975); E.P. Thompson, `The Moral Economy of the English Crown in the Eighteenth Century', *Past and Present*, 50(1971); E. Hobsbawm, *Primitive Rebel*s (Manchester 1959); E. Hobsbawm, Bandits (Harmondsworth, 1969); D. Underdown, *Revel, Riot and Rebellion: Popular Politics and Culture in England 1603-1660* (Oxford: 1985); L. Chevalier, *Labouring Classes, and Dangereous Classes in Paris during the First Half of the Nineteenth Century* (London: 1971); David Downes and Paul Rock, *Understanding Deviance: A Guide to the Sociology of Crime and Rule-Breaking* (Oxford: 1982); Gamini Salagado, *The Elizabethan Underworld* (Lonodn, 1977); Gersham M. Sykes, *Crime and Society* (New York: 1967); *Crime and Society* ed. Donna Youngs (London: 2018).

৩. M. Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (Translated from French by Alan Sheridan: New York, May 1995 edition).

৪. *Dilip Basu, `Notes on Criminal Biographies: Calcutta 1931', unpublished paper, November 1987.*

৫. পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল ড. এ পি মুখোপাধ্যায়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ লালবাজারের এই ধরনের গুন্ডা ফাইলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করার জন্য এবং ওই ফাইলগুলি দেখার অনুমতি দেওয়ার জন্য।

৬. অপরাধের ভূগোল সংক্রান্ত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন: David Herbert, *The Geography of Urban Crime* (London: 1982); James M. Bryne and Robert J. Sampson, *The Social Ecology of `Crime'* (New York: 1986); Manika Kannan and Mehtab Singh, *Geogrphical Informatin System and Crime Mapping* (London 2021 edn).

৭. CRO-HS-R 19848-1947; C.RO-HS T 41896-1965.

৮. CRO=HS-G 42493-1967.

৯. CRO HS-T 39989-1962.

১০. CRO HS-G 42614: 1967.

১১. CRO HS-R 25071-1950; CRO HS G 42223: 1966.

১২. CRO HS-R 24957-1950; CRO HS-R 28303-1952; CRO HS-G 39369-1961; CRO HS-R 43300=1969; CRO HS-R 43193-1969; CRO HS-G 42445-1967; CRO HS-FR 22972-22978 of 1950.

১৩. CRO HS-G 42443: 1967.

১৪. CRO HS-R 21299 of 1949.

১৫. HS-G 23849 of `CRO HS 18392:1946; CRO HS-G 23849 of 1950.

১৬. CRO HS-G 2147-1967; CRO HS-G 42656: 1968.

১৭. CRO HS-R 345222:55.

১৮. CRO HS-R 19951 of 1947.

১৯. CRO HS-R 30459:53.

২০. CRO HS-R 20215:48, 29878:53, 37204:58; CRO D 43726:71; CRO HS 23682-1950; CRO HS 21508 of 1950.

২১. CRO HS 23652:50.

২২. CRO HS 25108:50.

২৩. CRO HS-G 38854-60.

২৪. CRO HS HS-32255 of 1954.

২৫. CRO HS-R 25058:50.

২৬. CRO HS-R 24017:58.

২৭. CRO HS-R 28176:52.

২৮. CRO HS-D 43806-1971; CRO HS-G 43134: 1967.

২৯. CRO HS-R 43807:71, 44354:75.

৩০. Suranjan Das, *Communal Riots in Bengal 1905-1947* (Delhi: 1991).

৩১. CRO HS K 235865:1950; CRO HS R 195862:1947, 23193:1950, 18888:1946.

৩২. CRO HS 18888:1946.

৩৩. CRO HS-R 21299: 1946.

৩৪. CRO HS-R 19862:1947, 23193:1950, 18888:1946, 29878:1953.

৩৫. CRO-HS-G-23849:1950.

৩৬. CRO HS 18888:1946, 25108:1950; CRO D 24665:1950; CRO HS-R 25317:1951.

৩৭. CRO HS-R 25071:1950.

৩৮. CRO HS-R 29511 of 1953.

৩৯. CRO HS-R 42716:68.

৪০. CRO HS-PD 24052:1950.

৪১. CRO HS-R 33400:55; CRO HS 32255:54.

৪২. CRO HS-R 28176:52.

৪৩. CRO HS-R 29326:52, CRO HS-G 42 of 984-1968.

৪৪. CRO HS-R 35516-56.

৪৫. CRO HS-R 37516:59.

৪৬. CRO HS-R 37342 258: 58.

৪৭. CRO FR 18374:46; CRO HS-PD 24052:50; CRO HS-R 28303:52, 37541:59, CRO HS-G 39143:61; F.R. 18374-1946; CRO HS-R 28303 of 1952.

৪৮. CRO HS-R 30893:53, 36988:58, 26981:50, 24017:50, 24016:50, 43072:69; CRO HS-D 43396:70, 43722:71, 43911:72; CRO HS-R 44159:73.

৪৯. CRO HS-R 36777:57; CRO HS-M 23420:50.

৫০. উদাহরণ: গাঙ্গুলিবাগানের রঞ্জিত ঘটকের সাক্ষাৎকার, ২৩ মার্চ, ১৯৮৯।

৫১. CRO HS-G 38826:60.

৫২. CRO HS-G 42656:68.

৫৩. CRO HS 36777:57.

৫৪. CRO HS-PD 24052:50.

৫৫. CRO HS-R 36587:57.

৫৬. CRO HS 18888:46; CRO HS-R 27575:51, 27574:51; CRO HS-R 34522:55; CRO HS-R 30907:53; CRO HS-R 33400:50, CRO HS-G 42983:68; CROHS-M 23420; CRO HS 25108:58; CRO HS-R 18392:46.

৫৭. CRO HS-R 19848:47, 43176:69.

৫৮. CRO HS-R 29329:52.

৫৯. CRO HS-R 42716:68.

৬০. E.Hobsbawm and G. Rude, *Captain Swing* (Harmondsworth: 1973); D. Hay (eds) *Albion's Fatal Tree*.

৬১. Peter Linebaugh, *The London Hanged: Crime and Civil Society in the Eighteenth Century* (Harmondsworth: 1991).

৬২. Gabrielle M. Spiegel, `History and Post Modernism', *Past and Present*, May 1992, No.135, p.208.

৬৩. Paul Philips, *Marx and Engels on Law and Laws* (Oxford: 1980), p.161.

৬৪. ভারতের অপরাধ ও অপরাধ জগতের ইতিহাস নিয়ে কয়েকটি প্রামাণ্য লেখা: A. A. Yang ed. *Crime and Criminality in British India* (Tuscon: 1985), B. Chattopadhyay, *Crime and Control in Early Colonial Bengal 1770-1860* (Calcutta: 2000); Mukherjee, *Crime and Public Disorder In Colonial Bengal 1861-1912* (Calcutta : 1995); R. Singha, *A Despotism of Law: Crime and Justice in Early Colonial India* (Delhi: 1998); Ranjan Chakrabarti, *Terror, Crime & Punishment: Order & Disorder In Early Colonial Bengal 1800-1860* (Kolkata:2009); Sumanta Banerjee, *The Wicked City: Crime and Punishment in Colonial Calcutta* (New Delhi: 2009); Anindita Mukhopadhyay, `Crime and Criminality in Colonial Bengal', *Proceedings of Indian History Congress, 2002-01*, Vol.63, pp.968-986; Henry Schwarz, *Constructing the Criminal Tribe in Colonial Indian Acting like a Thief* (Oxford: 2010); Mark Brown, `Crime, Criminality and The Company Raj: The Discovery of Thugee', *British Journal of Criminology*, 2002-01, Vol.42 (1), pp.77-95; *Decolonizing the Criminal Question: Colonial Legacies, Contemporary Problmes*, eds. Ana Aliverti et.al (Oxford: 2023).

কলকাতার রেস্তোরাঁ : কাল, আজ, কাল

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

সিতার নওয়াজ উস্তাদ বিলায়েত খাঁর কাছে কলকাতার খানাপিনার কেরামতির কহানি শুনে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। এমনিতে তো বলতেনই কলকাতার বিরিয়ানি মা ফৌক, অর্থাৎ তুলনাহীন। আর উদাহরণ দিতেন সিরাজের। বলতেন, আমার অর্ডার গেলে ওরা জানেই হাঁড়ির কোন্ জায়গা থেকে উঠিয়ে নিতে হবে রান্নাটা। ভারত ঘুরে তো বহুত খাই, কিন্তু এই কলকাতায় ফিরে বিরিয়ানি মুখে দিলেই ফর্ক, মানে ডিফারেন্সটা বুঝে যাই।

ভরা যৌবনে যখন বম্বেতে থাকছেন, উড়ছেন, নার্গিসের সঙ্গে প্রেমে মাতোয়ারা, তখন ক্রিসমাস এলে ওঁর কলকাতা ফেরা চাই-ই চাই। কারণ? গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল, তার ডান্স ফ্লোর, রাতজোড়া নাচ আর পার্ক স্ট্রিট, নিউ মার্কেট তল্লাটের ক্রিসমাস ফুড (christmas food)। বলতেন, ব্রিটিশরা তিনটে জিনিস রেখে গেছে যা বিলকুল ফরোজাঁ, মানে shining। হিরের মতো জ্বলছে। তারা হল খাবার, নাচ আর ইংলিশ জুবান, ভাষা।

আজ কলকাতার রেস্তোরাঁ নিয়ে লিখতে বসে উস্তাদের এই কথাগুলো মনে এল কারণ উনি আরও একটা অপূর্ব কথা বলতেন হোটেল, রেস্তোরাঁ সম্পর্কে যা কলকাতার ইতিহাসে থেকে যাওয়া উচিত। বলতেন, একটা জিনিস জানবে বাবু কোথায় বসে, কাদের সামনে গানবাজনা করছ এ যেমন influence করে music-এর quality, style, nature-কে; তেমন কোন্‌পাড়ায়, কাদের সঙ্গে, কী food খাচ্ছ decide করে restaurant-এর character।

সত্যি বলতে কী, সওয়া তিনশো বছরের শহরটায় সওয়া তিনশো রকমের ইতিহাস ছড়িয়ে আছে যত্রতত্র, যার অনেকটাই তার রকমসকমের খাদ্যপট্টিতে।

কী খেতে হলে কোন্ পাড়ায় যেতে হবে, কোন্ আড্ডার জন্য কোন্ চায়ের দোকান, কার দেখা পেতে কোন্ কফি হাউজ, এসব মুখস্থ না থাকলে আপনি যথেষ্ট ক্যালকেশিয়ান নন— এই ছিল এককালের public opinion। তবে সেসব ইতিহাসের শুরুও তো হতে হবে ইতিহাস দিয়ে। তাই আমার দেখা ইতিহাসের শুরু করছি আমার শৈশবস্মৃতি দিয়ে। আর ভারত স্বাধীনতার দিন (১৫ আগস্ট, ১৯৪৭) জন্মানো আমার সেই স্মৃতিও ১৯৫৩, ১৯৫৪, ১৯৫৫-র, যখন আমার ডাকসাইটে উকিল বাবা হাই কোর্টে যাবার পথে আমাকে তুলে নিতেন গাড়িতে গ্রেট ইস্টার্নে ব্রেকফাস্ট সারবেন বলে। তারপর কোর্টে গাড়ি ছেড়ে দিলে ড্রাইভার আমায় ফিরিয়ে আনত বাড়ি। আর সারা রাস্তা আমি ওই প্রাতরাশের আবেশে ঝিম মেরে থাকতাম। ঝাড়বাতি ঝোলা গ্রেট ইস্টার্নের গোল পাথরচাপা টেবিলে সরু চিজ এবং চিকেন স্ট্যান্ডউইচ, সানিসাইড আপ এগ পোচ, বেক্ড বিনজ ইন টোম্যাটো সস এবং দুধ-চিনি দিয়েই দার্জিলিং চা। খাওয়া শেষ হলে বাবা একটা স্টেট এক্সপ্রেস ফাইভ ফাইভ ফাইভ ধরিয়ে লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে বলতেন, জান সাহেব, an English breakfast is the best food in the world. Just after বাঙালির ভাত আর মাংস।

আমি তখন গলায় মস্ত সাদা ন্যাপকিন জড়ানো অবস্থায় সিলিং-এর দিকে চেয়ে ভাবতাম ইংল্যান্ড তাহলে কী না কী একটা দেশ! এই দৃশ্যই আমার মনে আসত বিলায়েত খাঁ যখন ওঁর সময়কার সেই গ্রেট ইস্টার্নের কথা বলতেন। আর কপাল এমন ওঁর বর্ণনার সেই ক্রিসমাসের নাচের সময়কালটাও পাঁচের দশকের প্রথম বছরগুলো, যখন বাবার সঙ্গে আমি গ্রেট ইস্টার্নের ব্রেকফাস্ট খাই! খাঁ সাহেবকে সেটা বলতে কীরকম উন্মনা হয়ে বলেছিলেন, ও জিনিস আর হবে না!

পাঁচতারা হোটেল রেস্তোরাঁর কথায় আছি যখন তখন শহরের আর-এক মহার্ঘ পাঁচতারা বাদ যায় কেন? গ্র্যান্ড হোটেলের প্রিন্সেজ এবং ম্যাকসিমজ। পাঁচের দশকে ছেলেবেলায় রোজকার *স্টেটসম্যান* পত্রিকার একটা সেরা আকর্ষণ ছিল বিনোদনের পাতায় হোটেল রেস্তোরাঁর তালিকায় তাদের সেদিনের সেরা প্রোগ্রাম। কোনও ডাকসাইটে ক্যাবারে আর্টিস্ট বা দেশজোড়া নামের গায়ক বা গায়িকার নাম দেখলে সে যে কী পুলক বোধ আমার। একবার তো আমার আর মেজদির প্রিয় পপ সিঙ্গার টোনি ব্রেন্ট-এর নাম দেখে আমার ভিরমি খাওয়ার দশা! মিউজিকাল ব্যান্ড বক্সে রোববার রোববার তখন ওঁর ‘সামওয়ান এল্স্ ইজ ইন ইয়োর আর্মজ টুনাইট’ গানটা খুব ঘুরছে। সেই টোনি ব্রেন্ট স্বয়ং গ্র্যান্ডের প্রিন্সেজে গাইবেন। আগে থেকে টেবিল বুক না করলে তো জায়গাই জুটবে

না। তবু আমি আর মেজদি কাকাকে মনের বাসনাটা জানিয়েছিলাম। কাকা ফোনটোন করে জেনেছিলেন admission strictly for adults !

সেকালে ফ্লোর শোর জন্য রোয়াব ছিল গ্র্যান্ড, গ্রেট ইস্টার্ন বাদ দিলে ফার্পোজের, ট্রিনকা'জের, ব্লু ফক্স, মোকাম্বো এবং ইজায়াস-এর। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের ইজায়াসের নামটাই বদলে গেছে কদ্দিন হল, কিন্তু ক্যাবারে ডান্স, লেটেস্ট পপ গান এবং বিফস্টেকের যে স্মৃতি ও সুঘ্রাণ তা আজও ছেয়ে আছে রসিকের মন। কলেজে উঠে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে শীতের সন্ধ্যায় প্রথম ঢুঁ মেরেছিলাম যে বার-কাম রেস্তোরাঁয় তা এই ইজায়াস। বলা বাহুল্য, সিট না পেয়ে ফিরেও আসতে হয়েছিল। তবে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করে ১৯৬৭-র ক্রিসমাস ইভ দুই বন্ধুর সঙ্গে কাটাতে পেরেছিলাম ট্রিনকা'জে। সেই স্মৃতি ও অনুভূতি জীবনেও ভোলার নয়।

সুটেড-বুটেড হয়ে তিনজনাই ঢুকে পড়েছিলাম সন্ধে সাতটায়। বুকিং টুকিং কিচ্ছু নেই, তবুও তিন জনের মতো একটা টেবিলও পেয়ে গেলাম। আমরা হুইস্কি আর ডিনারে মন দেব কী, মৃদু লাল স্পটলাইটে প্রাশিয়ান ব্লু গাউনে ষাটের দশকের সেরা পপ নাম্বারে ফ্লোর ভাসিয়ে দিচ্ছেন শহরের প্রিয় সোপ্রানো বার্নাডিন। বন্ধুদের উস্কানিতে দুটো পপ সং-এর অনুরোধ করলাম আমিও। ডরিস ডে-র 'কে সেরা সেরা' আর কনি ফ্রান্সিসের 'নেভার অন আ সানডে'। আর কপাল এমনই যে দুটো গানই দারুণ সুরে ও মেজাজে ধরে নিল বার্নাডিন। আর গোটা রেস্তোরাঁকে মাতিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় গানের সময় ফ্লোরে নেমে পড়ে স্ট্রিপ টিজ শুরু করে দিল এক তরুণী নর্তকী। এই গানটার সঙ্গে ও যে কতবার এই নাচ নেচেছে বোঝা গেল গানের কথার সঙ্গে ওর বস্ত্রত্যাগ ও স্টেপিং-এর টাইমিং-এ। শেষে ব্রা ও প্যান্টিতে এসে গেছে যখন নর্তকী ঘরের আলো প্রায় নেই; তারপর ব্রা ছুড়ে ফেলে প্যান্টিতে হাত দিয়েছে যখন মেয়েটি তক্ষুনি শেষ আলোটুকু নিভে গিয়ে ঘোর অন্ধকার! একটা চাপা হাহাকার তখন ট্রিনকা'জ জুড়ে।

রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়েছিল সেদিন বারোটায়। প্রবল শীতে পার্ক স্ট্রিটে দাঁড়িয়ে যখন ট্যাক্সি খুঁজছি তখন সারা রাস্তায় শুধু আমরা তিনজন! বড়োদিনের রাতে এককালে পার্ক স্ট্রিটও এরকম নির্জন, সুন্দর ছিল। সন্ধের পার্ক স্ট্রিটে সে সময় লোক জড়ো হত মুল্যাঁ রুজ, ব্লু ফক্সে একটু প্রিয় বা প্রেয়সীর গলা জড়িয়ে নাচবে বলে। আর সেই নাচের সঙ্গে প্রাণ উতল করা গান কখনও প্যাম ক্রেন-এর, কখনও ভেরোনিকার। কলকাতার রেস্তোরাঁর জাত বোঝাতে ছিল এই গান। পপুলার ডিশ বলতে তখন ছিল ল্যাম্ব স্টেক, চিকেন ফ্রাইজ, কর্নড রিবজ, টোম্যাটো সুপ, শেষে কয়েক রকম অপূর্ব ডেসার্ট। আমি ও আমার হালকা

পকেটের বন্ধুরা স্রেফ গান ও লুই ব্যাঙ্কসের ব্যান্ডের টানে সন্ধে নামলে এক-দেড় বোতল বিয়ার নিয়ে কাটিয়ে দিতাম এক-দেড় ঘণ্টা। আর গোটা সময়টাকে মনে হত আরব্য রজনী।

রাস্তার উলটো ফুটপাথে ছিল ম্যাগনোলিয়া, ছেলেবেলায় যে-নামের আইসক্রিম খেতে অভ্যস্ত ছিলাম আমরা। যৌবনকালে দেখলাম তরুণ-তরুণীদের চমৎকার মেলামেশার জায়গা হয়েছে। যেমনটি ওই ফুটপাথের একধারে আগের থেকেই ছিল ফ্লুরিজ। কেক-পেস্ট্রির জন্য চিরকালই বেজায় নাম ফ্লুরিজের। দিনের আলোয় মস্ত মস্ত কাচের জানলার পাশে বসে, একটা করে চিকেন কাটলেট নিয়ে রাস্তা দেখতে দেখতে প্রেয়সীর অপেক্ষা করা ছিল নব্যযুবার প্রেমের পরীক্ষা। বান্ধবী এলে জুড়ে যেত পেস্ট্রির প্লেট, তবে বুকে হাত দিয়ে আজও বলব সেদিনের চিকেন কাটলেট আর মাটন কসা বিলকুল লা জবাব!

তরুণ-তরুণীদল যখন বড়োসড়ো আকারে ভর করল ম্যাগানোলিয়ায় তখন রেস্তোরাঁটিও চেহারা-চরিত্রে ঝাঁঝ আনতে নিজের নামটা করে ফেলল ম্যাগ্‌জ। ম্যাগ্‌জের দোতলা তখন টক্কর দিচ্ছে গঙ্গার পাড়ে গে রেস্তোরাঁর জানলায় মোড়া দোতলার সঙ্গে। বিকেল বেলায় প্রেমে পড়া ছেলেমেয়েরা দিব্যি যেখানে বসে নদীর স্টিমার, নৌকো দেখতে দেখতে চা কফিতে চুমুক বা আইসক্রিম কোনে কামড় দেয়। একসময় তরুণ বাঙালি লেখকদের যেমন আখড়া হয়েছিল চৌরঙ্গির মোড়ে মিষ্টির দোকান কে সি দাশের দোতলা। ফুলকো লুচি, সন্দেশ আর চিনি-দুধের চায়ের সঙ্গে যেখানে বসত আধুনিক বাংলা গল্প-উপন্যাস নিয়ে আলাপ-আড্ডা। শেখর বসু, রমানাথ রায়, সুব্রত সেনগুপ্তদের সঙ্গে কখনও কখনও বসে পড়তেন প্রবীণ বিমল কর।

পার্ক স্ট্রিট রেস্তোরাঁদের সন্ধের কথা বললে দিনের কথাই বা বাদ যায় কেন? ১৯৬৮-তে দূর বোম্বাই থেকে এক তরুণী এসে ট্রিনকা'জের সন্ধে তো বটেই গোটা দিনের আসরই মাত করে দিল। অদ্ভুত ভারী, প্রায় পুরুষালি গলা মেয়েটির; সেই সঙ্গে দিব্যি সুর আর নখরা জমে আছে তাতে। তার ওপর কোমর দুলিয়ে নেচে নেচে গাওয়ার স্টাইল ওকে instant hit করে ছাড়ল। সেবার ডিসেম্বরের এক রোববার দুপুরে প্রেসিডেন্সির বান্ধবীকে নিয়ে লাঞ্চে বসেছিলাম ওখানে; আর লাঞ্চ খাব কী, ওই তরুণীর গানে গানে মাত হয়ে রইলাম। বলা বাহুল্য, অচিরে শহরবাসীর মুখে মুখে নামটা ঘুরছে—ঊষা উত্থুপ।

ঊষা তো হল দক্ষিণের মেয়ে, তবে খোদ এক বাঙালি ললনাই কলকাতার রেস্তেরাঁর মুড, মেজাজে এক নতুন ধাক্কা এনেছিল। মূলত অ্যাংলো- ইন্ডিয়ান

মেয়েদের দখলে সেসময় হোটেল-রেস্তোরাঁর নাচের floor। সাতের দশকের সেই রাজনীতি, সিনেমা ও নাটকে উষ্ণ শহরে ফার্পোজের ফ্লোরে দেখা দিল এক ক্যাবারে শিল্পী যাকে রক্তমাংসে ফ্লোরে দেখার জন্য রেস্তোরাঁ বিশারদদের মধ্যে রীতিমতন আকচা-আকচি। আমার এক বন্ধু তখন চাকরিতে ঢুকেছে সদ্য গড়া হোটেল রিৎজ-এ (যা পরে নাম বদলে হল পিয়ারলেস ইন্টারন্যাশনাল), সেখানে তার যে ইটালীয় বস মারিও সেই তিনিই আবার ফার্পোজের এন্টারটেনমেন্টের দায়িত্বে। সেই মারিও সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে তিনিই দায়িত্ব নিলেন আমাদের সেই বাঙালি সেনসেশান শেফালির ক্যাবারে দেখার। ডিনার জ্যাকেট আর বো টাই পরা সেদিনের সেই সব ভারতীয় সায়েবসুবোরাও দেখার ব্যাপার ছিল বই-কি! কলকাতা বিশারদ রাধাপ্রসাদ গুপ্ত বলতেন, সে এক সময় ছিল যখন কলকাতা লন্ডনকে বলত 'আমায় দ্যাখ!'

কলকাতার আর এক রেস্তোরাঁ, সেই দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকাল থেকে লন্ডনকে বলে আসছে 'আমায় দ্যাখ!' এবং আজও দিনের বেলায় এক পট দার্জিলিং হাই চা আর দু প্লেট স্যান্ডউইচ নিয়ে বসলে বান্ধবীকে নতুন করে আবিষ্কার করা যায়। রাজনীতি, ভোটাভুটি, টিভির চিৎকার প্রাণ ঝালাপালা করলে আজও গিন্নিকে নিয়ে সাডার স্ট্রিটের এক এবং অদ্বিতীয় ফেয়ারলন হোটেলের বাগানের রেস্তোরাঁয় বসলে সময় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে থমকে দাঁড়ায়। আজও আগের মতোই সাহেব-মেমদের আনাগোনা জারি আছে। বিশেষ করে যুবক-যুবতী যারা বইয়ে পড়া, রোম্যান্টিক কলকাতার খোঁজে আসে। আর যে-ই আসে সে-ই হোটেলে ওঠার সিঁড়িতে একবার দাঁড়িয়ে পড়ে। চোখ মেলে দেখে তরুণ শশী কাপুর আর সদ্যযুবতী জেনিফার কেন্ডেলের যুগলছবি। ১৯৫৬ সালে ওঁরা শেক্সপিয়ারিয়ানা কম্পানির *টেম্পেস্ট* নাটকে অভিনয় করছেন। ১৯৫৮-য় ওঁদের বিয়েও হয় এবং ওঁরা দুজনে পৃথ্বী থিয়েটারের পত্তন করেন। ফেয়ারলন হোটেল আজও ওঁদের সঙ্গস্পর্শে আবিষ্ট হয়ে আছে। আজও ওই রেস্তোরাঁয় গেলে আমার বউ সিঁড়ি ভেঙে ওই ছবির সামনে দাঁড়ায়।

কলকাতার রেস্তোরাঁর কথা শোনাতে গেলে আজ জিভে জলের চেয়ে চোখে জল বেশি আসে। এই যে ফার্পোজের গল্প শোনালাম সেই ফার্পোজই তো আর নেই। সেখানে এক গুচ্ছের দোকান বসেছে আর হাবিজাবি জিনিসের বেসাতি। কে বলবে এই লাঞ্চ, ডিনার সারতে আসত গ্র্যান্ড, গ্রেট ইস্টার্ন, পার্কে ওঠা কাস্টমাররা। বিদেশের কনসুলেট-কনসুলেট থেকে নির্দেশ থাকত: For meals choose Firpo's.

আর এই ফার্পোজ থেকে একসময় set lunch বিক্রি হত পনেরো টাকায়! তাও কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে। ছয়ের দশকে আমার মেজদি কিছুদিন কাজ করেছে বিলিতি কোম্পানি গন্টারম্যান অ্যান্ড পিপার্স-এ। তখন দুপুরে লাঞ্চ সারতে যেত ফার্পোজে। ছুটিটুটি থাকলে ভিড়ে যেতাম আমিও। আর কী সে চার আইটেমের ঐশ্বরিক মধ্যাহ্নভোজ! জিভে নয়, চোখে জল আসছে।

ঝুড়ি করে ফার্পোজ বেকারির ফুরফুরে রুটি তো রাখাই থাকত টেবিলে, ক্রমে ক্রমে আসত হ্যাম বা চিকেন স্যান্ডউইচ, বেকড পোটেটো, একটা ভেজ বা নন-ভেজ স্টু এবং একটা ডেসার্ট। ফার্পোজের দোতলার ওই শৌখিন বারান্দায় বসে চৌরঙ্গি পাড়া দেখতে দেখতে বাস্তবিক এই শহরটার প্রেমে পড়া যেত।

ফার্পোজের হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে আরও কয়েকটা landmark রেস্তোরাঁর হারিয়ে যাওয়ার ট্র্যাজেডির উল্লেখ না করলেই নয়। প্রথমত মেট্রো সিনেমার গা ঘেঁষে বসা বাঙালি ফিল্ম ইন্টেলেকচুয়ালদের পেয়ারের আড্ডাস্থল কাফে ডি মনিকো। মেট্রো, এলিট, লাইটহাউজে কোনও না কোনও হলিউডি ছবি দেখে এখানে জড়ো হয়ে চা বা কফি আর সিগারেটের ধোঁয়ায় সে ছবির নাড়ীনক্ষত্র বিশ্লেষণ না করলে ছবি দেখার কী বর্তাল? 'সাইকো', 'ব্লো-আপ', 'বেকেট' ছবির যে-গুণ বিচার শুনেছি এই চায়ের মজলিশে তা পত্রপত্রিকার ফিল্ম রিভিউকে তুড়ি মেরে ওড়াবে। কাফে ডি মনিকো থেকে বেরিয়ে অনেক বুদ্ধিজীবী এস. এন. ব্যানার্জি রোড ক্রস করে ফের গিয়ে বসতেন আর এক আঁতেল আড্ডা বেঙ্গল রেস্টোরান্টে। সেখানে তখন হয়তো সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণাল চর্চা চলছে। তবে সব্বাই যে নাস্তা সারতেন এই সব ডেরায় তা কিন্তু নয়। অনেকেই রাস্তা পার করেই টুঁ মারতেন কলকাতার সেরা মোগলাই পরোটার ঠিকানা অনাদিতে। সিনেমা হল ও কফি-চায়ের ঠেকগুলোর পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটলেও অনাদি কেবিন আজও টিকে আছে। একবার গিয়ে চেখে আসলেই হয়।

শুধু সিনেমা দেখে চুলচেরা বিচার নয়, সিনেমা তৈরির শৈলী, প্রযুক্তি, ইতিহাস, ভূগোল, নন্দনতত্ত্ব সবেরই মস্ত আলোচনার অতুল আখড়া ছিল ধর্মতলার কফি হাউজ। ফরাসিরা কাফে বলতে যে বুদ্ধিজীবিতা ও সংস্কৃতির পীঠ বোঝায়, কাফে স্যাঁ জরম্যাঁ, কাফে কুপোল, লে দো মাগো, কাফে দ্য ফ্লর, কাফে দ্য লা পেই বা কাফে প্রোকোপ বলতে যে-সাহিত্য, ইতিহাস, সিনেমা, নাটক, রাজনীতির সংস্কৃতি বোঝায় তার কিছুটা ছোঁয়া যেন চার, পাঁচ, ছয় বা সাতের দশকে লেগেছিল ধর্মতলার এই কফি হাউজে। বিশেষ করে চারের দশকের শেষ পাদে এখানে যখন নিয়মিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডায় বসছেন

সত্যজিৎ রায়, কমলকুমার মজুমদার, সুভো ঠাকুর, চৈতন্য চট্টোপাধ্যায় বা রাধাপ্রসাদ গুপ্ত তখন সেও যেন এক লে দো মাগো কী কাফে দ্য ফ্লর যেখানে চার ও পাঁচ দশক জুড়ে লম্বা লম্বা গপ্পো, তর্ক, আলোচনা ও সমালোচনায় মাতছেন আলব্যের কামু, জ্যঁ পল সার্ত্র, সিমোন দ্য বোভোয়া, আর্থার কোয়েসলার! আনন্দবাজার গোষ্ঠীতে চাকরি হতে আমার প্রথম কাজ হয়েছিল খোলা সময় পেলেই কফি নিয়ে ওখানকার লর্ডজ তল্লাটে গিয়ে বসা। সত্যজিৎবাবুরা বসতেন বলেই কফি হাউজের ওই অংশটাকে লর্ডজ বলা হত কি না জানি না তবে সাতের দশক জুড়ে সেখানে কিন্তু তখনও একটা গৌরবের সৌরভ ছেয়ে আছে। চেয়ে চেয়ে দেখতাম কোন্ কোন্ টেবিলে এককালে বসে গেছেন সত্যজিৎ, কমলবাবুরা। এই অভ্যেসটাই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম প্যারিসে সত্তর দশকের শেষে যখন ওই মায়াবি শহরে উচ্চ সাংবাদিকতা পড়তে গেলাম। বিকেলে ক্লাস শেষ হলেই চলে যেতাম স্যাঁ জরম্যাঁ দ্য প্রে পাড়ায় এবং ঢুঁ মারতাম কামু, সার্ত্র, জ্যঁ জনে-র স্মৃতি বিজড়িত কাফেতে। বেশি দাম চুকিয়ে কফি নিয়ে কল্পনা করতাম ওঁর সেই প্রিয় টেবিলে কামুর আত্মা সবার অলক্ষ্যে সময় কাটিয়ে যাচ্ছে।

আজকের জমানার তরুণ-তরুণীরা হয়তো কলেজ স্ট্রিট কফি হাউজে বসলে মনশ্চক্ষে দেখে কোনও টেবিলে ছয়ের দশকের শেষের তরুণ নকশাল নেতা অসীম চট্টোপাধ্যায় (ডাকনাম কাকা) সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বিপ্লবের পথ ও প্রক্রিয়া বিবেচনায় মত্ত। দেখে কোনও টেবিলে এক কাপ ইনফিউসান (কালো কফি) সামনে রেখে উদাস নেত্রে বিড়বিড় করে যাচ্ছেন উন্মাদ কবি বিনয় মজুমদার। কিংবা জানলার পাশের টেবিলে বসে *এক্ষণ* পত্রিকার আগামী সংখ্যার সম্পাদনা করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য। ফরাসি লেখকদের মতো আরও অনেক বাঙালি লেখক, কবি, সম্পাদক কলেজ স্ট্রিট কফি হাউজকে তাঁদের বাড়ি, ঘর, ঠিকানা করেছেন একসময়। চার আনার কফি আর দশ আনার চিকেন কাটলেট খেয়ে লাঞ্চও সারতে হয়েছে এক সময়। অথচ পরিবেশ মাহাত্ম্যে ক্ষুধার জ্বালা যে কখন, কী করে উধাও হয়েছে ভগাই জানে।

অথচ কী নিবিড় আকর্ষণ কফি হাউজের যে একবার বসে পড়লে নিজেকে আর টেনে তোলা যায় না। চার আনার কফিও শেয়ার করে খেয়ে চর্চা চলছে ফরাসি ছাত্র বিপ্লব, আর্বান গেরিলা, ত্রুফোর সিনেমা, আর্তোর নাটক, রিল্‌কে বা শক্তির কবিতা, রমাপদর *এখনই* কী সুনীলের *অরণ্যের দিনরাত্রি* উপন্যাস অথবা চে গেভারার মৃত্যু নিয়ে। কফি হাউজের আশপাশে কতই তো খাদ্যের

ঠিকানা— রাজ হোটেল, বসন্ত কেবিন, জ্ঞান বাবুর রেস্টুরেন্ট, দিলখুশা, ওয়াই এম সি এ কিংবা পুঁটিরাম। কালিকার বেগুনি, আলুর চপ কী পুঁটিরামের লুচি, মিষ্টি পেট পুজোর চরম বন্দোবস্ত করত। তবে বসন্ত কেবিন, ওয়াই এম সি এ সুযোগ দিত প্রেমিক-প্রেমিকাদের দেদার ঘনিষ্ঠ হওয়ার। কত যে প্রথম চুম্বন ও স্পর্শসুখের সাক্ষী এই সব রেস্তোরাঁ! বসন্ত কেবিন আবার আড্ডার ঠিকানা ছিল শিল্পী গণেশ পাইনের। সামান্য দূরে থাকেন তখন গণেশবাবু, রোজই আঁকার কাজ শেষ করে চলে আসেন বসন্তয়। ওঁর সঙ্গে আড্ডায় বসতেন যাঁরা তাঁদেরও সেটা কলার তুলে চলার দিনকাল। তবে সেরা স্মৃতি নিশ্চয় সেই যুবক-যুবতীদেরই যারা ওখানে প্রেমের খোঁজ পেয়েছিল।

কলকাতার সেরা দুই কফি হাউজই দিব্যি টিকে আছে, কিন্তু খদ্দেরদের চেহারা-চরিত্র বেদম বদলেছে। এখনকার নবীন প্রজন্ম নতুন এক বিপ্লব নিয়ে মেতেছে যার নাম সোশ্যাল মিডিয়া বা সমাজ মাধ্যম। জীবনের বাস্তব পরিস্থিতি থেকে মন সরিয়ে কোথায় যে নিয়ে ফেলবে তা জানতে হলে এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দ্বারস্থ (নাকি পোর্টালস্থ?) হতে হবে। নতুন যুগের কফিভক্তদের সেবার জন্য কলকাতায় দুদ্দাড় করে গজিয়ে উঠেছে হাজার দেড়েক কাফে। রংচঙে কাফেগুলোর রংচঙে নাম আর চা-কফির যা দাম তাতে আমাদের কালে একমাসের বিল মেটানো যেত রেস্তোরাঁর। তবে সেকালে কেউ তো আর দেড়-দুলাখ টাকার মাইনে নিয়ে কাজে জয়েন করত না। এখন তো কাফে কফি ডে বা বারিস্তায় কারা নিয়মিত বসে তাতে তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ধরা পড়ে। ছয় বা সাতের দশকে বান্ধবীকে নিয়ে ফেরাজিনিজ (নিউ এম্পায়ার হলের পিছনে) বা পার্ক স্ট্রিটের স্কাইরুম-এ বসা ছিল height of romance। এটা বার কয়েক করতে পারলে আর বিয়ের প্রস্তাবটুকু দিতে হত না। রোমান্সের পীঠ হিসেবে এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছিল স্বল্পকালের জন্য জ্যোতির্ময় দত্তের সাগর পাড়ি দেওয়া ডিঙি নৌকা মণিমেখলা, যেটিকে মাস সাত-আটেকের জন্য বাবুঘাটের হাতার মধ্যে রেস্তোরাঁ করে ভাসিয়ে রেখেছিলেন জ্যোতিদা। এক বিকেলে অপূর্ব দার্জিলিং চা আর কাটলেট খেয়ে সাজানো পুরোনো বইয়ের তাক থেকে এক কপি বিলিতি পত্রিকা *এনকাউন্টার* কিনে ফেরার স্মৃতি আজও অমলিন। ইদানীং অবিশ্যি ভাসমান রেস্তোরাঁ এক নতুন অবতারে ফিরে এসেছে গঙ্গাবক্ষে, যদিও কোনও নৌকা বা স্টিমারে ভর করে নয়। বাবুঘাটেরই এক ঢিল দূরে স্ট্র্যান্ড রোডের এই রেস্তোরাঁ ‘ফ্লোটেল’ ইটকাঠের মকান হলেও একেবারে গঙ্গার বুকে দাঁড়িয়ে। ছড়িয়ে বিছিয়ে বানানো রেস্তোরাঁর মেনু পাঁচতারা

হোটেলতুল্য এবং গানবাজনার ব্যবস্থা করার মতো stage space-ও আছে। সন্ধের অন্ধকারে হাতে একটা স্কচ নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নৌকা-জাহাজ দেখার এক অপূর্ব দুলুনি আছে।

একটা সময় ছিল গঙ্গার ধারে গাড়িতে বসে কয়েক পেগ চড়িয়ে কর্পোরেশন স্ট্রিটে নিজাম হোটেলে এসে মাটন রোল, চিকেন রোল, আলু রোল কিংবা বিরিয়ানি খেয়ে জীবন ধন্য করার। রোলের জগতে নিজাম দীর্ঘ দিন ছিল তেনজিং নোরগে, মানে ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। ছআনায় মাটন রোল, চার আনায় বিফ রোল, তিন আনায় আলু রোল আর দশ আনায় এক প্লেট বিরিয়ানি! আর কী তার স্বাদ! কলেজকাল, বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলো আর চাকরির প্রথমজীবন তো এই নিজামে ভর করে কাটল! একটা তো জীবন গেছে প্রতি হপ্তায় মেজদির সঙ্গে এলিট, মিনার্ভা বা লাইটহাউজে মার্লন ব্রান্ডো, রিচার্ড বার্টন বা পিটার ও'টুলের ছবি দেখে, নিজামে ডিনার সেরে রিকশায় চেপে টুংটুং করে বাড়ি ফেরা। হলিউড আর মোগলাই খানা এক গ্রাসে নেওয়া।

সেই নিজাম কিন্তু এখন দেদার উচ্চকোটি। হালফিলের ডেকরে আলো খেলানো জমজমাট। খাবারের দামপত্তর কুড়িগুণ বেড়ে যে-কোনও দামি রেস্তোরাঁর গায়ে গায়ে। তবে সেই রোলের মেজাজ ও আমেজ সেই পূর্বেকার মতোই। শুধু সেই সাবেক রোল খাওয়ার স্টাইলে কাগজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে, হাম হাম করে খেলে চলবে না, প্লেটে রেখে কাঁটা চামচ দিয়ে কুটকুট করে কেটে খেলেই রক্ষে। ফলে নিজামের রোল কিনে রাস্তায় চলতে চলতে পুরোনো কেতায় ফিরে যাওয়াই শ্রেয় like a rolling stone.

নিজামের গায়েই ছিল বিহার রেস্তোরাঁ; নিজামে জায়গা না হলে লোকজন ওখানে ঢুকত। সেই বিহারেরই কী দবদবা এখন। আর নিজাম থেকে এলিট সিনেমার দিকে এক মিনিট হাঁটলেই যে আমিনিয়া তার মতন স্টাইলিশ মুসলিম খানাপিনার ঠিকানা কলকাতায় ছিল বলে মনে হয় না। লালবাজারের চৌহদ্দিতে রয়্যাল হোটেলের মাটন কোর্মা, রেজালা, কাবাব, কারি আর পোলাও ছিল ভারত বিখ্যাত। সংগীত বিশারদ জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে যৌবনকালে বেশ কবার এক অতীব সুন্দরী মহিলাকে ওই হোটেলে উঠতে দেখেছেন। পরে জেনেছেন ওই মহিলাই হলেন মালিকা-এ-গজল বেগম আখতার!

তবে আমিনিয়ার বিশেষত্ব ছিল রেস্তোরাঁর লেআউট। ছড়ানো-বিছানো ফ্লোর এবং পরিবেশ। রেস্তোরাঁর ভেতরের দিকে খান আষ্টেক বড়োসড়ো কেবিন ছিল যেখানে গোটা পরিবার নিয়ে নিরিবিলি মোগলাই ভোজে মজে যাওয়া

যেত। তাছাড়া আমিনিয়ার বিরিয়ানি সিরাজের বিরিয়ানির মতোই লা জবাব। সিরাজের যেমন হালে এক নতুন রেস্তোরাঁ হয়েছে সাবেকটির উলটো ফুটপাথে আর নামকরণ হয়েছে গোল্ডেন সিরাজ, তেমনই আমিনিয়ারও নতুন রেস্তোরাঁ হয়েছে গোলপার্কে। তবে বিরিয়ানি ছেড়ে কেউ আজও রেজালা চাখতে হলে গুটিগুটি চলে আসবে অফিসপাড়ার হাতার মধ্যে সাবির-এ। চিরকাল বলা হয়েছে, আজও বলা হয়— সাবির মানেই রেজালা, রেজালা মানেই সাবির। যেটা ততটা বলা হয় না তা হল সাবিরের দোতলার ছোট্ট ছোট্ট কেবিনগুলো প্রেমিক-প্রেমিকাদের মেলামেশার নিবিড় নিকেতন। যা এককালে ছিল নিউ মার্কেটের গায়ে, বার্ট্রাম স্ট্রিটের কারকো। মধ্যবিত্ত বাঙালির তখন মনের মতো জায়গা কারকো। চপ, কাটলেট, সুপের ভোজনের পাশাপাশি ব্যান্ড বাজিয়ে বাংলা ও হিন্দি গানের ব্যবস্থা। গোটা আষ্টেক কেবিনের জন্য নারী-পুরুষের লাইন লেগেই থাকত। তারপর হঠাৎ একদিন বিশ-বাইশ বছর আগে কারকোকে ভেঙেচুরে বিলকুল নতুন একটা রেস্তোরাঁ গড়া হল, তাতে বাঙালির শখের আরও একটা ঠিকানা উধাও হল।

বাঙালির মন রাখার জন্য টিপিকাল বাঙালি মেনুর এক রেস্তোরাঁ অনেক দিন হল চালু রেখেছে পিয়ারলেস ইন হোটেল। নাম আহেলি, আর ওদের ভাত, মাংস, লুচি, পরোটা, বেগুন ভাজা, কপির ডালনা দিয়ে দিনের বা রাতের ভোজ সারলে খাদ্যের দামটা তেমন গায়ে লাগবে না। কিন্তু হ্যাঁ, ছ্যাঁকা দেবে জিএসটি। হালফিল রেস্তোরাঁয় ভোজ সারলে বিলের তলায় জিএসটির পরিমাণ দেখে একটা মৃদু শক্ লাগে, একটা গোটা আইটেমের দামই যেন ঝুলছে সেখানে।

বাঙালির পছন্দের রেস্তোরাঁর কথাই উঠল যখন তাহলে তাদের প্রাণের দুই পানভোজের আখড়ার কথা তো আসবেই। সেরা সেরা বুদ্ধিজীবীর হয় দুপুর নয় সন্ধের গন্তব্য ছিল পার্ক স্ট্রিটের অলিম্পিয়া পাব যা এখন নতুন অবতারে হয়েছে অলিপাব। শহরের এক প্রাচীনতম পানের ঠিকানা ছিল অলিম্পিয়া, যার সেরা টান ছিল নতুন বই, নতুন ছবি, নতুন নাটক নিয়ে তুমুল বিতর্ক নয়তো ডাকসাইটে লোকের গোপন কেচ্ছা। মদের দাম বেশ কমের দিকে থাকত আর এদের বিফ স্টেক, চিকেন আ লা অলিপাব ও চিকেন আ লা কিয়েভের সত্যিই তুলনা ছিল না। রাধাপ্রসাদ গুপ্ত বলতেন দিশি দরে বিলিতি স্বাদ। স্বাধীনতার বছর ১৯৪৭-এ তৈরি অলিম্পিয়া নবরূপ ধরল ১৯৮১-তে। হয়ে গেল অলিপাব। খাবারের টান এখনও সমান, কিন্তু লেখক, সাংবাদিক, সিনেমা-বায়োস্কোপের সেই পণ্ডিতরা কোথায়?

স্টেটসম্যান পত্রিকার দুরন্ত ইংরেজির সম্পাদকীয় লেখার সম্পাদকদের রোজকার দুপুরের ডেরা ছিল অম্বর রেস্তোরাঁ। আধ ঘণ্টা, চল্লিশ মিনিটে যার যার এডিটোরিয়াল নামিয়ে এঁরা বারোটা-একটায় জড়ো হতেন অম্বরের একতলার বার-এ। এঁদের মুখের বুলি ছিল চোস্ত ইংরেজি এবং এঁরা বয়-বেয়ারা ছাড়া কারও সঙ্গে ইংরেজিতে ছাড়া কথা কইতেন না। বাংলায় *শীতে উপেক্ষিত* বলে দার্জিলিং নিয়ে অসাধারণ বই লিখেছিলেন যে-নিরঞ্জন মজুমদার তিনি ইংরেজি সম্পাদকীয় লিখে অম্বর বার-এ ঢুকেও তাঁর ইংরেজিয়ানা জাহির রাখতেন। নিজের নিরঞ্জন নামটাকে বিলিতি কেতায় উচ্চারণ করতেন নাইরঞ্জন। এঁদের প্রিয় পানীয় ছিল বিয়ার। এই দঙ্গলেই হংস মধ্যে বক যথা ছিলেন হামদি বে। বিহারে জন্ম হামদির, যেমন ইংরেজির হাত তেমনই পাণ্ডিত্য। যে-কোনও বিষয়ের ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান নখদর্পণে। সাতের দশকের মাঝামাঝি *স্টেটসম্যান* ছেড়ে ইনি আনন্দবাজার গোষ্ঠীতে চলে এলে আমার সঙ্গে বেজায় সখ্য হয়। *সানডে* পত্রিকার জন্য বড়োসড়ো লেখা ঘণ্টাখানেকে নামিয়ে হামদি দুপুরের ড্রিঙ্কের জন্য চলে যেতেন এমব্যাসি রেস্তোরাঁয়। আর তিনটে ভদকা জলে মিশিয়ে খেয়ে এক ঘণ্টা পরে এসে বসে যেতেন কাজে।

অবশেষে আসতেই হচ্ছে কলকাতার চিনে রেস্তোরাঁর গালগপ্পে। গালগপ্পই বটে, চিনে খাবারদাবার আমাদের বাঙালি পাচকরা এমন রসেবশে এনেছে যে সেগুলো কখনও চৈনিক ছিল তা বুঝতে গোয়েন্দা লাগাতে হয়। রোলের দোকানের মতো চিনে খাবারের ঠেকে ছেয়ে গেছে শহরটা। যা দেখলে হয়তো আঁতকে উঠতেন একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি সংবাদপত্র সম্পাদক সন্তোষকুমার ঘোষ। সম্পাদনা ও সম্পাদকীয় লেখার কাজ শেষ হলেই তিনি চলে যেতেন অফিসের তিন পা দূরত্বে চাং ওয়ায়। দুটো হুইস্কি নিয়ে লাঞ্চ সারতেন ফ্রায়েড রাইস আর চাওমিন দিয়ে। সে-সময় তাঁর কথাবার্তা দাঁড়াত প্যারিসের কাফের দিগ্‌গজদের মতো। রাজনীতি থেকে সাহিত্য থেকে ইতিহাস থেকে নর্মান মেলরের গদ্য থেকে রবীন্দ্রনাথের গান থেকে বন্ধু হেমন্তের স্বর্ণকণ্ঠ থেকে সুচিত্রা-কণিকার তুলনা থেকে ঈশ্বরে বিশ্বাস থেকে ভূতের ভয় হয়ে ফরাসি সুন্দরী— কী নয়! কখনও-সখনও সন্তোষদার সঙ্গে এই চৈনিক লাঞ্চে গিয়ে অমূল্য সব মন্তব্য শুনেছি জগৎ সম্পর্কে। যার একটা চিনে আহার সম্পর্কে। বলেছিলেন, চিনের রাজনীতি-টাজনীতি আমার একদম পছন্দ না। কিন্তু ব্যাটারা রান্না যা বানিয়েছে তার তুলনা নেই।

কলকাতায় চিনে খাবার কী করে ঢুকল আর ছড়াল তার কিছুটা আমার চোখের সামনেই। আমি ক্রিক রোর ছেলে, আমাদের পাড়া থেকে এস. এন. ব্যানার্জি রোডের ক্যালকাটা বয়েজ স্কুল সাত মিনিটের হাঁটা পথ। আর তার ঠিক উলটো দিকে ফুটপাথে এক ছোট্টখাট্টো, আত্মভোলা চিনে দোকান আ কং। বসে খাওয়ার জায়গা বলে কিছুই নেই, সবই বলতে অর্ডার সাপ্লাই। স্বামী-স্ত্রী, বুড়ো বাপ আর এক হিন্দুস্থানি ছেলে অজয়কে নিয়ে এক রাউন্ড দ্য ক্লক কিচেন অ্যান্ড ডেলিভারি সিস্টেম। আর হায়, হায়, কী এক স্বাদ ওদের ফ্রায়েড রাইস আর চাও চাওয়ের! হ্যাঁ, আজ যাকে বলা হচ্ছে চাউমিন তাই ছিল সেকালের চাও চাও। মাত্র দশ আনায় এক প্লেট চাও, যা বেঁধে দেওয়া হত কলাপাতায়, যা আবার মুড়ে দেওয়া হত খবরের কাগজে। হপ্তায় দুতিন বার তো আনাতেই হত আ কং-এর চাও চাও। ফলে চিনে খাবার আবিষ্কারে আ কং-ই আমাদের হিউয়েন সাং।

তবে চিনে রেস্তোরাঁ বলতে যা বোঝার তা পার্ক স্ট্রিটের মোড়ের পিকিং। তখন তো চিন দেশের রাজধানীর নামও পিকিং। অভিজাত বাঙালি পরিবারে পিকিং বলতে বোঝাত রাজধানী পিকিং নয়, রেস্তোরাঁ পিকিং। যার ছিমছাম চিনা ডেকরের আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে মোটামুটি ভদ্র দামের পদে বশ না হয়ে উপায় ছিল না। উপরন্তু পিকিং-এর (পরে চিনের রাজধানীর মতো নাম পালটে হল পিপিং) রান্নায় তেল মশলা ছিল কম এবং দাবি করা হত তা খাঁটি চিনা পাকপ্রণালী। ১৯৬২-তে ভারত-চিন যুদ্ধের পর হঠাৎ করে পিপিং-এ ভিড় কমে গিয়েছিল কিছুদিন। তখন আমার খাদ্যরসিক জামাইবাবু আমাদের পিপিং-এ (তখনও পিকিং) নিয়ে যেতে যেতে বলেছিলেন, বর্ডারের লড়াইকে তো কলকাতায় টেনে আনার কোনও মানে হয় না। খাবারে লড়লে তো আবার বাড়ি বসে হারতে হবে।

জামাইবাবুর এই ভবিষ্যদ্বাণী অচিরে ফলতে শুরু করল। দেখতে দেখতে রোম্যান্টিকালি সাজানো পার্ক স্ট্রিটের ওয়ালডর্ফ, চটপটে সার্ভিস আর সুস্বাদু পদের জিমি'জ কিচেন বড়ো গন্তব্য হল খাদ্যরসিকের। একসময় দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত বাঙালি পাড়ায় ঘাঁটি গাড়ল ডিম সুম, যুবশ্রেণির পকেটের মাপে দাম বাঁধা হল সেখানে। প্রেম করতে করতে নুডল, রাইস, চিকেন উইংজ, পর্ক বা মিক্সড ফ্রায়েড রাইসের হালকা লাঞ্চ সারা যেত শতখানেক, শদেড়েক টাকায়। ক্রমে একটা সময় চিনের জনসংখ্যার মতো বাড়তে শুরু করল কলকাতার চিনে রেস্তোরাঁ। স্টাইলিশ চিনা রেস্তোরাঁ বলতে তখন লোকে বুঝত বার-বি-কিউ,

মেনল্যান্ড চায়না, জেন, তুং ফং। পরে রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ের মাঝ মধ্যিখানে দোতলার ওপর গড়ে উঠল হাতারি। এই হাতারিই বাঙালি রুচি আর চিনে পদে চমৎকার বনিবনা ঘটিয়ে ফেলল। বাকিটা করল পাড়ায় পাড়ায় রোলের দোকানের মতো চিনে রেস্টুরেন্ট। পাঁচের দশকে চু এন লাইকে পাশে নিয়ে নেহরুজি যে শোর তুলেছিলেন 'হিন্দি চিনি ভাই ভাই' তার কিছুটা সাড়া যেন মিলল এই চিনে-বাঙালি বোঝাপড়ায়। তারপর সময় এল যখন বাঙালি আইকন ধুতি-শার্টের হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মন কাড়ল শরৎ বসু রোড আর লেক অ্যাভেনিউয়ের জংশনে দাঁড়ানো চিনা রেস্তোরাঁ ম্যান্ডারিন। ভাতবিলাসী হেমন্তদার টান ছিল নানা কিসিমের ফ্রায়েড রাইসে আর চপ সুয়ের প্রতি। আর ওঁর একনিষ্ঠ ভক্ত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বিচারে শহরের সেরা খাদ্য ছিল বেঙ্গল ক্লাবের, আর সেরা চাইনিজ ডিশ ওই বেঙ্গল ক্লাবেরই ওরিয়েন্টাল রেস্টোরান্টের।

এরকম এক কথাবার্তার মধ্যে সৌমিত্রদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওয়ালডর্ফ মিস করেন না? তাতে সঙ্গে সঙ্গে ওঁর উত্তর ছিল, করি না মানে? ওরকম সুখাদ্যের সঙ্গে ওরকম অ্যাটমস্‌ফিয়ার! পাবলিক প্লেসও যে কত প্রাইভেট হতে পারে তা দেখিয়ে দিয়েছে ওয়ালডর্ফ।

শরৎ বসু রোডের ওপর অপেক্ষাকৃত নতুন রেস্তোরাঁ মার্কো পোলো। ইতালি থেকে চিন যাত্রা করেছিলেন পর্যটক মার্কো পোলো। সেই অভিযানের প্রতি অভিবাদনে কি না জানি না এই রেস্তোরাঁয় চমৎকার মিলমিশ ইতালীয় ও চিনা পদের। তবে আমার ও আমার গিন্নির দুঃখ যে বলার মতো তেমন ফরাসি খানার ঠিকানা নেই শহরে। অবশেষে আমরা খেলা শুরু করেছি একটা আইডিয়া নিয়ে। যে বিশুদ্ধ ফরাসি খানা, কিছু বিশিষ্ট ইতালীয় পদ, সেরা কফি, সেরা চা আর কামু, সার্ত্র, সাঁতেক্সুপেরি, জর্ন সিমেনঁ, ইতালো কালভিনো, উমবের্তো একোর বই দিয়ে সাজিয়ে, ভরিয়ে গড়ব একটা কাফে। আর নাম দেব... হাসবেন না প্লিজ... 'রোমান হলিডে'। আর হ্যাঁ, নামের পাশে অড্রে হেপবার্নের ওই গগলজ-পরা ছবিটাও থাকবে!

অন্তরঙ্গ বৈঠক ও জলসার খোঁজে এক যুবক

রন্তিদেব মৈত্র

গত ষাট বৎসর একটা মানুষ ওস্তাদি গানের বৈঠক ও জলসার খোঁজ করেছে। বই, পত্রপত্রিকা, শোনা কথা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার কিছু জমে থাকা কথা সে আজ বলবে।

এই বৈঠক ও জলসার জগৎটাকে প্রথম চাক্ষুষ করিয়েছিলেন বঙ্কিম! *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসে মুঙ্গেরের রাজপ্রাসাদে এক চোখ ঝলসানো আসরে তিনি পরিচয় করালেন মনিয়াবাই-এর সঙ্গে। এই মনিয়াবাইয়ের রাগরাগিণীর অপূর্ব বিস্তারের জৌলুসের বিপরীতে আঁকলেন এক চোরাস্রোত। এই জলসার যোগ জগৎশেঠদের নিরন্তর চক্রান্ত। ধনদৌলতের আলোচনা। এই নাচ-গান যেন একটা লোক দেখানো উপলক্ষ্য মাত্র।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের অন্যতম ধারক ও বাহক এই মনিয়াবাই, যাদের বাইজি বলা হত। রাজা রামমোহন কিংবা তারও আগে তাদের স্বীকৃতি ছিল সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত মহলে। অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণে বৃদ্ধা শ্রীজানবাই ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বাইজিদের গানের উৎকর্ষ সম্বন্ধে বলা আছে। এই বাইজিদের সংগীতের কদর সম্বন্ধে বঙ্কিম আর এক জায়গায় জানিয়েছেন— ঢেঁকি-রূপী কমলাকান্তও স্বর্গে ধান ভেঙে পুরস্কার চান এক ঘণ্টার জন্য উর্বশী বাইজিদের সংগীত।

এই বাইজিরা কারা? এই যুবক তার দিদিমাকে জিজ্ঞেস করে বিপদে পড়েছিল! এর দিদিমা এই শ্রেণির মহিলাদের রাক্ষসী, ডাইনি ও বাঘিনী বলে সম্বোধন করেছিলেন। বললেন 'বাঘিনী' গওহরজানের কথা— যার নাচ, গান

ও অন্যান্য ছলাকলা উনি চিকের আড়াল থেকে দেখেছিলেন, আর শংকিত হয়েছিলেন আমার দাদামশায়ের জন্যে— যেন খাদ্যতালিকা না বনে যান! সাবধান করে দিয়েছিলেন বারবার 'ওদের' সম্বন্ধে।

যুবক এবার অনেক progressive। তার মায়ের কাছে জিজ্ঞেস করল— এরা কারা– এখনও আছে? উত্তরে যুবকের মা বলেছিলেন ওরা অত্যন্ত দাম্ভিক দৌলতপ্রিয় এক শ্রেণি— একবার যুবকের দাদামশায়কে ওঁর নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন। বিখ্যাত কীর্তনীয়া পান্নাময়ী (রমা বাই)-এর আসরে এই যুবকের দাদামশায় ভুল করে cigeratte ধরিয়েছিলেন! গৃহকর্তা ও আসরের হোতা হওয়া সত্ত্বেও তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেননি রমা বাই!

যুবক বিভূতিভূষণের একটা ছোটোগল্পে পড়েছিল জ্ঞানতপস্বী আইনস্টাইনের উপেক্ষা ইন্দুবালার বিপরীতে। বর্ধমানে আমন্ত্রিত আইনস্টাইন পুলকিত চিত্তে দেখেছিলেন platform-এ ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে শয়ে শয়ে লোক অপেক্ষা করছে। বাস্তবে station-এ নেমে উনি হয়ে গেলেন একা, ফুলের মালা, মানুষ সবই ধাবিত হল এক স্থূলাঙ্গী মহিলার দিকে— বাইজি ইন্দুবালা। বিভূতিভূষণ অবশ্যই ইন্দুবালার সংগীত জ্ঞান তপস্যার কদর করতেন না।

ওই বয়সে যা হয় আর কী। এই বিচিত্র নিষিদ্ধ বাইজি শ্রেণির ওপর অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে পড়ল এই যুবক। বিশেষ করে বৈঠকি আসরে। কিন্তু কোন্ বৈঠকে তাদের দেখা মিলবে? এই সময়ে শাস্ত্রীয় সংগীতের আসর বলতে বড়ো-বড়ো music conference যথা, সদারঙ্গ, তানসেন, পার্ক সার্কাস, ডোভারলেন ইত্যাদি। ঘরোয়া আসর যদি হয়েও থাকে তার খবর পাওয়া খুবই মুশকিল ছিল। আর বাইজিদের সংবাদও কোথাও বের হত না— যদিও রেডিওতে কখনও কখনও বেগম আখতার কিংবা সিদ্ধেশ্বরী দেবীদের গান থাকত। কিন্তু তখন তাঁরা বেগম কিংবা দেবী হয়ে গিয়েছিলেন। শাস্ত্রীয় সংগীত সম্বন্ধেও শিক্ষিত বাঙালিদের একটু মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছিল। এক শ্রেণি মুঙ্গের প্রাসাদের ধনী সম্প্রদায়ের মতো status symbol হিসেবে অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন, আর এক শ্রেণি ওস্তাদি গানের মারপ্যাঁচ খুব একটা পছন্দ করতেন না— বিশেষ করে হিন্দুস্থানী ধারায় সাহিত্য দুর্বল কালোয়াতি গানের। সত্যজিতের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর ওস্তাদি গানের থেকে অনেক বেশি মর্যাদা পেয়েছে সহজ সরল বাংলা গান। আর সত্যজিতেরই 'জলসাঘর' কিংবা 'চারুলতা'য় এই শাস্ত্রীয় সংগীতকে কিছুটা নিবু নিবু decadent দরবারে প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে।

এইটা হয়তো সেই চমৎকার জলসার প্রতি বাঙালিদের প্রতিক্রিয়া— পুরোটা না হলেও কিছুটা বলে ওই যুবকের মনে হয়েছিল। এবং কিছুটা এই কারণেই, ওই যুবক নিজেও decadent পরিবারের প্রতীক, ওই জলসার প্রতি আরও কৌতূহলী হয়ে উঠল। পড়ল অমিয়নাথ সান্যালের স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া ওস্তাদ ও বাইজিদের গল্প। কলকাতা শহরের বুকে গত শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে কত জলসার বাহার! কালীপ্রসন্ন সিংগির কলকাতার বাবুরা ছিল প্রাচীন সামন্ততন্ত্র ও নব্য বণিকতন্ত্রের এক কিম্ভূত সমন্বয়। এই বাবুদের ছিল প্রচুর পয়সা ও লোক দ্যাখানো আদর্শভ্রষ্ট সংগীতপ্রীতি। কিন্তু অমিয়নাথ সেই যুবকের চোখে তুলে ধরলেন আর এক কলকাতা— যেখানে বাস করেন বিদগ্ধ সংগীতপ্রেমীরা। নাটোরের মহারাজা, শ্যামলালবাবু শেঠ দুনিচাঁদের মতো শিক্ষিত ধনী সম্প্রদায়। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় মুন্নারি সম্মেলন, শঙ্কর উৎসব, ভবানীপুর সংগীত সম্মিলনীর মতো প্রতিষ্ঠানে ধ্রুপদি সংগীতের নিয়মিত আসর। বৈঠকি সংগীতে উজ্জ্বল গণেশচন্দ্রর ভবন, কেরামতুল্লা খাঁ-এর বাসভবন, দামোদর দাশ খান্নার প্রাসাদ ও আরও অনেক আসরের ঠিকানা। সাদা ফরাসে একসঙ্গে বসে আছেন গণপৎরাওভাইয়া সাহেব, বাদল খাঁ, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, মালকজান, গওহরজান, ইমদাদ খাঁ-এর মতো নক্ষত্ররা! এই ফরাসই ছিল সংগীত শিল্পীদের মিলনের প্রতীক, আড্ডার জায়গা আর স্বতঃস্ফূর্ত সংগীতের লীলাক্ষেত্র।

এরকম হত তাহলে? এখনও হয়? আমরা কি দেখেছি এক ফরাসে বিলায়েৎ খাঁ, কেসরবাই, ওঙ্কারনাথ, সিদ্ধেশ্বরী, রবিশংকরদের? এই সেই সময়ের এই অন্তরঙ্গ আসরের অনেক চিত্র ধরা আছে। সংগীতশিল্পী, বোদ্ধা, শ্রোতাদের অন্তরতম কথোপকথন হত— যার ভাষা সংগীতে সংগীতে। শ্রোতাদের ছিল শোনবার প্রতিভা— তাই শিল্পীরা উজাড় করে দিতেন তাঁদের সংগীতের মনের কথা— তানসেন যাকে বলেছেন— ‘অন্তরবাণীর পুকার’। এই সেই অন্তরঙ্গ বৈঠক, যা সেই যুবকটি খোঁজ করছিল।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখায় সে পেল আরও অনেক গল্প— যাদুমনি, কিরণ, কৃষ্ণভামিনী, মানদাসুন্দরীর মতো প্রসিদ্ধ বাইজিদের কথা— আর অঘোরনাথ চক্রবর্তী, লছমীপ্রসাদ মিত্র, নগেন ভট্টাচার্যের মতো প্রসিদ্ধ ওস্তাদদেরও। এর অনেক পরে সে সেইসব বাইজি ও ওস্তাদদের অনেক gramophone রেকর্ড সংগ্রহ করতে পেরেছিল— দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়েছিল। কিন্তু ওই আসরগুলি থেকেই তো সে নাম জানতে পেরেছিল অতীতের গুণীদের।

একটা সন্দেহ থেকেই যাচ্ছিল— এই গল্পগুলি কতটা বাস্তব?

উত্তরও মিলল। হাতে এল *সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা*-র অনেক পুরোনো সংখ্যা— বিশেষ করে গত শতাব্দীর তিরিশের দশকের। তখন ছিল জলসার স্বর্ণযুগ। শ্রীরামপুর, চন্দননগর, নেত্রকোণা, বিষ্ণুপুর, পাবনা, দার্জিলিং ও বাংলার সর্বত্র কত জলসার আয়োজন হচ্ছে— কলকাতা তো আছেই। কত উপলক্ষ্য ছিল— বসন্ত, বর্ষা, নববর্ষ, জন্মদিন, বিজয়া সম্মিলনী ইত্যাদি। বেশিরভাগ জলসাই তখন শেষ হত রাত্রি দুটোয়— এখন যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। সেই যুবকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা বলবার সময় এসে গিয়েছে। 'সে' এখন 'আমি'।

আমি নিজের অভিজ্ঞতা শুরু করব আমার জন্মের পনেরো বৎসর আগের এক বিজয়া সম্মিলনীর বিবরণ দিয়ে— যা ১৩৪৩ (১৯৩৬) সালে *সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা*-য় প্রকাশিত হয়েছিল। এই ১৯৩৬ সালের আসরের অনেক শিল্পীদের আমি ৪০/৫০/৬০/৭০ এমনকি আশির, বৎসর জুড়েও সামনাসামনি শুনেছি ঘরোয়া বৈঠকে— আর ওঁদেরকেই আমি আমার নিবেদনের প্রথম নায়ক ও নায়িকা হিসেবে পেশ করছি। সেই আসরের বিবরণ হুবহু তুলে দিলাম।

৯ বৎসর বয়সের আসরের প্রথম শিল্পী শ্রীমান অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় নব্বই বৎসর বাদে ৯৮ বৎসরের এই যুবকের গান শুনলাম— মার্চ, ২০২৪-এ।

জয়জয়ন্তীতে খেয়াল গাইছিলেন—বন্দিশটা ছিল 'কহো ক্যায়সে কাটে দিন রতিয়া ...'— গলায় এখনও অচঞ্চল সুর কিন্তু সবথেকে উল্লেখযোগ্য মনে হল.... ওঁর অদ্ভুত প্রেমিক মন রোম্যান্টিক স্পিরিট! প্রেমিকের বিরহ ব্যথায় জর্জরিত জয়জয়ন্তীর বিস্তার আমাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। এই আকুতি এই বয়সেও— আমার ৭৪ বৎসর বয়সের মন শুষ্ক হয়ে গিয়েছে— ভালো নেহাত উনি মনে করালেন— সেই হারিয়ে যাওয়া অনুভূতির জগৎ! অমিয়রঞ্জন ভালো শ্রোতাদের সামনে পেয়ে তাঁর হৃদয়ের গোপন কথাগুলি সুরে সুরে উজাড় করে দিলেন। ওঁনার গান আমি নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম, ডোভারলেন-এও শুনেছি— কিন্তু হাজার হাজার শ্রোতাদের একটা abstraction, শ্রোতার মন জুড়ে। অমিয়রঞ্জনকে তখন খুব serious মাস্টারমশাই হয়ে যেতে দেখেছি।

আর একটা অমিয়রঞ্জনের আসরের কথা মনে পড়ছে, ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনীতে অমিয়রঞ্জনের পিতা সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোকচিত্র উন্মোচনের অনুষ্ঠানে। সেটা সেপ্টেম্বর ২০০১ সাল। ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনীর একশত বৎসর পূর্ণ হয়েছে— সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। এখন ১২৫ বৎসরের এই প্রতিষ্ঠান কলকাতা তথা ভারতবর্ষের প্রাচীনতম বৈঠকি জলসার পীঠস্থান বললে অত্যুক্তি হবে না। সংগীত পরিবেশনের হলে গত শতাব্দীর কিংবা তারও আগেকার সংগীত কিংবদন্তিদের তৈলচিত্র কিংবা আলোকচিত্র দেওয়াল দখল করে বসে রয়েছে। কখন আসর শুরু হবে। বিশ্বনাথ রাও, লছমীপ্রসাদ মিশ্র, অঘোর চক্রবর্তী, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী এবং আরও অনেক দিগ্‌গজ শিল্পীদের বড়ো গানের অনুষ্ঠান এখানে হয়েছে। অনেক নবীন শিল্পীরা এখনও ওখানে গাইতে অস্বস্তি বোধ করেন বলে শুনেছি, এত বড়ো বড়ো ওস্তাদদের স্থির দৃষ্টির সামনে সুরের ওজন নিয়ে খুব সচেতন হতে হয়।

সেদিন অমিয়রঞ্জন গেয়েছিলেন বসন্তের খেয়াল। হারমোনিয়ামে অজয় চক্রবর্তী— তবলায় খুব সম্ভব সমর সাহা। নিজের পিতৃদেব, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, জ্ঞান গোস্বামীর পাশেই জায়গা করে নিয়েছেন— তাছাড়া আসরে উপস্থিত মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল নাগ, সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিদানবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গুণী শিল্পীরা। সেই প্রথম ভালো করে শুনলাম তাঁর অন্তরের কথা। ফাল্গুনের বর্ণনা ছিল সেই গানে–- আর হৃদয় উজাড় করে গান শুনিয়েছিলেন— গোপনতম sentiment-গুলো রাজ্যের অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠেছিল। বৈঠকি আসরে এই হয়?

কুমারী বিন্দুবাসিনী

ওই আসরের আর এক শিল্পী বিন্দুবাসিনী। বিষ্ণুপুরের ওস্তাদ পাড়ায় আশির দশকে ওঁকে দর্শন করে এসেছিলাম। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ সংগীতরত্নাকর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র সন্তান এই প্রতিভাময়ী শিল্পী। ওই আসরে কুমারী বিন্দুবাসিনী দেবীর উচ্চাঙ্গ সেতার ও এসরাজ বাজনার উল্লেখ আছে।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় মনে এল A.H. Fox Strangways-এর রচনা 'A Musical Diary'-র প্রসঙ্গ, ১৯১০-১১ সালে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় পরিভ্রমণ করে ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস অনুসন্ধান ও গুণীজনদের সঙ্গ করেছিলেন তিনি। বিশেষ এক পর্বে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং

রবীন্দ্রগানের কিছু পাশ্চাত্য স্বরলিপির কথাও লিখেছেন। উনি William Rothenstein-এর অনবদ্য potrait-এর কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে রবীন্দ্রনাথ কোনও আসরে 'জীবনে যত পূজা হল না সারা...' গেয়ে গেয়ে সুর করেছেন। রবীন্দ্রনাথ শুনে উনি বলেছিলেন, 'These melodous are such as would have satisfied Plato'— কোনও অন্তরঙ্গ আসরে নিশ্চয়ই তিনি মগ্ন হয়ে শুনেছিলেন ওঁর গান।

রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ওস্তাদদের গান বাজনার ব্যবস্থা থাকত— বিশেষ করে বিশিষ্ট অতিথিদের জন্যে। এই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরবাহার বাদন ও ধ্রুপদ বৈঠকে পরিবেশিত হয়েছে। এই কলকাতার আসরেই Fox Strangways-এর আলাপ হয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে, ওঁর সুরবাহারের অনবদ্য মিড় ও গমকে উনি মুগ্ধ হয়ে যান।

এই বিন্দুবাসিনী (বিন্ধ্যবাসিনী বলে আমরা বেশি চিনতাম)। আমার অনুরোধে কলকাতার চেতলাতে ওঁনার এক ভক্তের বাড়িতে গান গাইতে রাজি হয়েছিলেন। ওঁর বাবা শুধু সুরর বাহা, সেতার, এসরাজ নয়— ধ্রুপদ ও রবীন্দ্রগানেরও এক বিরাট ওস্তাদ ছিলেন।

বিন্ধ্যবাসিনী কিন্তু আমাকে বলে দিয়েছিলেন যে উনি সাধারণ ধ্রুপদের তালে আর গাইতে ভালোবাসেন না (যেমন চৌতাল, ধামার, সুরফাকতালে) যা সবাই গেয়ে থাকেন! সঠিক পাখোয়াজ বাদক যেন সঙ্গে করে নিয়ে আসি— 'বলে দেবে তাঁকে ব্রহ্মতাল, পটতাল ইত্যাদি তালেই গাইব আমি।'

কাঁধে এই বিরাট বোঝা নিয়ে আমি দুদিন ধরে যে দু-চারজন পাখোয়াজি কলকাতায় ছিলেন তাঁদের কাছে প্রস্তাব রাখলাম। এইসব তালের কথা শুনে তাঁরা ডায়েরি দেখতে গেলেন— আর বললেন ওই-দিনে তাঁদের অমুক জায়গায় অনুষ্ঠান আছে!

অনুষ্ঠানের দিন এসে গেল। বিন্ধ্যবাসিনী খুব তেজি মহিলা— তখন তাঁর বয়স ৮০-র ওপরে, অন্যান্য ওস্তাদদের মতোই জেদিও বটেন। ভাবলাম আসর হবে না— কলকাতার হার হবে বিষ্ণুপুরের কাছে! ভবানীপুর দিয়ে অফিস ফিরবার পথে হঠাৎ মনে পড়ল রসরাজ নিদানবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। রাগসিদ্ধ, তালসিদ্ধ এই বিরাট গুণী তখনও স্বাভিমানে আসরে গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, আমাদের মতো মুষ্টিমেয় কিছু সংগীত পাগলদের নিজের স্বল্প

পরিসর কামরাতে ধ্রুপদ ও খেয়ালের অত্যন্ত রঙিনবাহারি গান গেয়ে আরও পাগল করে দিচ্ছেন। ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন পীযূষকান্তি সরকার। আমার স্ত্রী বর্ণাকে ও পরবর্তীকালে আমার মেয়ে চান্দ্রেয়ীকে, উনি ধ্রুপদ ও খেয়ালের তালিম দিয়েছেন। ওঁর আসরের কথা অন্যত্র বলব কখনও।

যাই হোক, নিদানবন্ধুর কাছে আমার দুঃখ নিবেদন করলাম--- বিন্ধ্যবাসিনীকে উনি চিনতেন না— কিন্তু উনি ব্রহ্মতাল, পটতালে ধ্রুপদ গাইবেন শুনে ওঁর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দীর্ঘ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত উনি নিজেকে সংগীত শিক্ষার্থী মনে করতেন।

উনি রাজি হলেন পাখোয়াজ সঙ্গত করতে— উনি পাখোয়াজ তবলা এক যুগ আগে ছেড়ে দিয়েছেন। 'লোক জানাজানি যেন না হয়'— আমাকে বললেন নিয়ে যেতে— আমার বাড়ির পাখোয়াজ, আমার স্ত্রী আর ওঁকে নিয়ে চললাম চেতলায় বিন্ধ্যবাসিনীর দরবারে।

আসরে ১৫/২০ জন হাজির— বিন্ধ্যবাসিনী গল্প করছেন, প্রাণখোলা হাসি-আড্ডা চলছে। নিদানবন্ধুর নাম বলিনি— এমনিতেও সাধারণ শ্রোতারা ওঁকে খুব একটা চিনতেন না— পাখোয়াজ নিয়ে সবাই ঘরে ঢুকতেই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন— পটতাল, ব্রহ্মতালের কথা বলে এনেছি কিনা। তারপর সরাসরি নিদানবন্ধুকে তুমি করে সম্বোধন করলেন। প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুললেন। ব্রহ্মতালের অস্তরাগ গানের সঙ্গে উনি সঙ্গত করেছেন, পটতালের সঙ্গে কী কী ছন্দ মানানসই, ইত্যাদি। বিন্ধ্যবাসিনী তখন আশির কোটাতে, আর নিদানবন্ধু ৭০ ছুঁই ছুঁই।

নিদানবন্ধুর রসিক মহলে প্রচণ্ড দাপুটে ওস্তাদ হিসাবে সুখ্যাতি ও কু-খ্যাতি দুটোই আছে। কিন্তু কী আসাধারণ ধৈর্য নিয়ে তিনি সবিনয়ে উত্তর দিতে লাগলেন— ওস্তাদির ঝাঁঝ একবারও জাহির করলেন না। বিন্ধ্যবাসিনী খুশি হয়ে ধরলেন— সুরেন্দ্রনাথের পিতা অনন্তলালের অপূর্ব গোপেশ্বর/আড়ানার পটতালের ধ্রুপদ 'তুঁহি সব এই ব্যাপতে হ্যায়...'। এর পর দরবারি, নটনারায়ণ— কত বিরল ধ্রুপদের সম্ভার খুলে বসলেন— নিদানবন্ধুর অপূর্ব ঠেকার সঙ্গে তন্ময় হয়ে। দুই ওস্তাদের সংগীত পরিবেশনায় কত রকম মনের কথা হচ্ছিল— আড্ডা হচ্ছিল সুর ও তালের। আমরা, যারা অত সুর অভিজ্ঞ নই, শুধু আন্দাজ করছিলাম। ওই সন্ধ্যা (১৯৯০-৯১ সাল) এখনও ভুলতে পারব না।

সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৩৬-এর ওই আসরের মধ্যমণি সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু অন্তরঙ্গ আসরের কথা দিয়ে আজকের প্রথম পর্ব শেষ করব। উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের এই সব্যসাচী শিল্পী আজ কিছুটা বিস্মৃত, তার কারণ আলোচনা করবার জায়গা এটা নয়, এটুকু বলতে পারি— আমার দেখা ও শোনা সবথেকে বহুমুখী প্রতিভা এই সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি তাঁর মহল্লায় ঘরোয়া জলসায় উপস্থিত হয়েছি। যখন ওঁর বয়স ৭৬ বৎসর, একবার স্ট্রোকও হয়ে গেছে। কিন্তু তখনও ওঁর কণ্ঠে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, বাংলা গান— যা শুনেছি, কিংবা সেতারের সেই অপূর্ব মিষ্টি টিপ। দুটো মেজরাবে বীণার স্টাইলে মৃদু আলাপের রেশ এখনও লেগে আছে। কত বিচিত্র পরিস্থিতি। আসরে তাঁর সংগীতে আবিষ্ট হয়েছি কতবার তা বলে শেষ করা যাবে না। আজ মাত্র দুটোর কথা বলছি।

শান্তিনিকেতনে গ্রীষ্মকালে (১৯৭১) একবার আমাদের বাড়িতে বেশ কিছুদিন ছিলেন। সকালে তিনি নিজে রেওয়াজ করতেন আর শেখাতেন ধ্রুপদ আমার স্ত্রী বর্ণাকে। সেতারও নিয়ে গিয়েছিলেন— রোজ সেতারও বাজাতেন— বলতেন যন্ত্রের টিপ ভালো হ'লে কণ্ঠের টিপও ভালো হয়। ওই সময়ে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সন্ধ্যাবেলায় একটা আসরের আয়োজন করা গিয়েছে। শান্তিনিকেতনের অনেক জ্ঞানী-গুণীজন আসরে হাজির ছিলেন, এঁরা হলেন— শান্তিদেব ঘোষ, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, ভি ভি ওয়াঝেলওয়ার, মোহন সিং, রণধীর রায় প্রমুখ সংগীতের লোক ছাড়াও আছেন শর্বরী রায়চৌধুরী, কে জি সুব্রমনিয়াম-এর মতো আর্টিস্ট, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, মণি মৌলিকের মতো সাহিত্যিক, এবং আরও অনেক গুণী মানুষজন। সেই সময় পাখোয়াজ বাদকদের সংখ্যা খুব কম ছিল এবং অনুষ্ঠানের দিন without notice তারাও গরহাজির। পরে শুনেছিলাম, পাক্কা ধ্রুপদের সঙ্গে বাজানোর অভ্যেস অনেকেরই চলে গেছিল— তাই এই ধরনের leave of absence অনেক আসরেই হত।

সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বহু অনুষ্ঠানের পোড় খাওয়া ওস্তাদ— কুছ পরোয়া নেই— আজ শুধু আলাপের আসর হবে বলে ধরলেন ইমন কল্যাণ-এর আলাপ। ধ্রুপদের আলাপে ওঁর এক বিশিষ্টতা ছিল যেটা আমি আগে খুব একটা শুনিনি। খুব স্বল্প মীড় দিয়ে স্বরগুলো স্থায়ী করতেন— আর দ্রুত লয়ে করবেন বীণ,

সুরকার সেতারের বিভিন্ন আলাপ বা কণ্ঠে এক অপূর্ব সমন্বয় ভাবিয়ে তোলায় কণ্ঠালাপ কি আদতে বীণাযন্ত্রের।

আলাপের অনুচর?

প্রায় দশ মিনিটের মাথায় কারেন্ট চলে গেল, ওই প্রচণ্ড গরমে সবাই গলদঘর্ম। শিল্পীকে হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন আমার স্ত্রী, ওঁর আলাপ চলতে লাগল— সুরের রেশে সবাই বসে রইলেন ওই গরম উপেক্ষা করে। ইমন কল্যাণ শেষ হল। একজন শ্রোতা অনুরোধ করলেন—উনি শুনেছেন মল্লার গাইলে নাকি বৃষ্টি নাবে— গাইবেন কি ওস্তাদ? সত্যকিঙ্কর নিজেও হয়তো তৃষ্ণার্ত ছিলেন একটু বৃষ্টি ভেজা হাওয়ার জন্যে— শুরু করে দিলেন মল্লারের আলাপ।

এখনও কানে লেগে আছে সেই মীড়, সেই গমক, আর যখন সংলাপ শেষ হচ্ছে তখন সত্যি সত্যি বৃষ্টি, আকাশে মেঘের ডাক। চা-এর বিরতি— তখন কারেন্টও চলে এসেছে— যা থেকে থেকেই এসে গেল তুমুল বৃষ্টি। কাকতালীয় হয়তো— কিংবা কে জানে? এর পর সংগীতাচার্য সেতারে বাগেশ্রীর আলাপ বাজিয়ে যখন আসর শেষ হল— তখন বৃষ্টি থেমে গেছে— স্নিগ্ধ কোমল বাতাসে ছেয়ে গ্যাছে চারিদিক।

এই গল্প আসরের কথা মনে আছে সেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনিয়াবাই আর গওহরজানের অনুষঙ্গে। রবি গুহ মজুমদার হাজরা রোড-এ সত্যকিঙ্করের বৈঠক বলে নিজের বাড়িতেই ওস্তাদি গানের আসর বসাতেন। নিজেও গুণী সমঝদার মানুষ আর ওঁর আসরে শ্রোতা হিসাবে বেশিরভাগই উপস্থিত থাকতেন গুণী সংগীত শিল্পীরা। আমাদের ভক্ত থাকত যৎসামান্যই। ১৯৭৯ সালের এক আসরে সত্যকিঙ্করবাবুর খেয়াল গান হবে। হারমোনিয়ামে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, তবলায় কে ছিলেন ঠিক মনে আসছে না। শ্রোতাদের মধ্যে মনে আছে যামিনী গাঙ্গুলি, বীরেশ রায়, সুখেন্দু গোস্বামী, মন্টু ব্যানার্জি, কল্যাণী রায় এবং আরও অনেকে। উনি বাগেশ্রী-কানাড়ায় গাইছিলেন ‘গোরে গোরে মুখ...’। আমার মনে পড়ছিল মনিয়াবাই-এর সেই সভার কথা— বঙ্কিমচন্দ্রের *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসে— সেই মুঙ্গেরের প্রাসাদে, যেখানে গানের আয়োজন হয়েছিল নেহাত একটা উপলক্ষ্য— status symbol হিসাবে। মনিয়াবাইও গাইছিলেন ‘গোড়ে গোড়ে মুখ পরা কেশর শোহে’।

সুরের অপূর্ব বিস্তার কোনও দাগ ফেলছিল না সেই দিনকার আসরের হোতা ধনী মেকি সংগীত প্রেমিকদের। কিন্তু রবি গুহ মজুমদারের ওই আসরে সেই একই গান উৎকর্ণচিত্তে শুনে যাচ্ছেন শ্রোতারা। ছোটো বৈঠকের সংগীতমনস্ক শ্রোতাদের কাছে উন্মোচিত হচ্ছে বাগেশ্রীর অন্তরতম মনের কথা, ওস্তাদের মনের কথা, যা হয়তো মনিয়াবাই ব্যক্ত করতে পারছিলেন না। এই যে বৈঠক— যা যতটা ওস্তাদদের ততটাই শ্রোতাদের— সেদিন উপলব্ধি করেছিলাম। এরপর দ্রুত খেয়ালে একটার পর একটা স্পষ্ট তালে যখন দুর্দান্ত মালা সাজাচ্ছিলেন— সুখেন্দু গোস্বামী উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন— 'বাবু সত্যবাবু, এগুলো গওহরজানের ছিল, আজ প্রথম শুনছি!'

আমি সচকিত হয়ে গেলাম— সত্যকিঙ্করবাবু বাইজিদের সঙ্গে তুলনা কীরকমভাবে নেবেন। দেখলাম উনি অত্যন্ত খুশি হয়ে মাথা নাড়লেন আর উদ্বুদ্ধ হলেন। ফুলঝুরি জ্বলে উঠল সাপাট, দুনি আর ছুটতানের।

পরে, অনেক পরে গহরজান-এর রেকর্ডে এইরকম বিজলি গান শুনে ওই আসরের কথা মনে পড়ে গেছিল— আর উপলব্ধি করলাম নতুন করে যে আর্টিস্টদের কোনও gender হয় না, class হয় না, artist, artist— ওই ছোটো পরিসরে বৈঠকের জন্যেই সম্ভব হয়েছে শ্রোতা সুখেন্দু গোস্বামীর musical response আর আমাদের সাধারণের প্রাপ্তি।

আজ এই পর্যন্ত। অনেক জমা আছে আরও। পরে কোনোদিন বসব নিশ্চয়ই।

পুরোনো কলকাতার দিশি সমাজ

অরুণ নাগ

সমাজের ইতিহাস বহমান নদী, একটি অংশকে নির্দিষ্ট, পূর্বাপর সম্পর্কবিহীন রূপে দেখানো অসম্ভব। আবার সামাজিক ঐতিহাসিকেরও বিপদ, বিশেষ অংশের আলোচনায় আনুপূর্বিক সাত কাণ্ড বলাও বাতুলতা। তাকে বেছে নিতেই হয়, সাধারণত এক গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি, যার ফল শক্তিধর ও দীর্ঘমেয়াদি। কলকাতার আদিপর্ব অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতক, দুই শতক সময়কালের মধ্যে একটি দেশীয় সমাজকাঠামোর ভাঙাচোরা, নতুন শ্রেণির উৎপত্তি ইত্যাদি।

একটা শহর গড়ে ওঠে নানা কারণে, বাণিজ্যকেন্দ্র, তীর্থস্থান, শিক্ষাকেন্দ্র— সর্বোপরি রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্ররূপে, ইংরেজিতে যাকে বলে seat of power। সব সময় যে সর্বোচ্চ ক্ষমতার কেন্দ্র হবে এমন নয়, কিন্তু ক্ষমতার প্রতিনিধিত্বের জায়গা থাকবে, যেমন— কর আদায় বা বিচার বিভাগীয় কার্যালয় আদালত ইত্যাদি।

কলকাতার আগে বঙ্গদেশের রাজধানী ওরফে ক্ষমতাকেন্দ্র ছিল মুর্শিদাবাদ, নবাবি শাসনের অন্ত ঘটলে ইংরেজদের উত্থান এবং একই সঙ্গে কলকাতা শহরের পত্তন। স্বাভাবিক ভাবেই নতুন শহরের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে, অপরদিকে মুর্শিদাবাদ হতে থাকে শীর্ণ।

নগর-ইতিহাস আলোচনার দুটি প্রধান দিক, কাঠামোগত অর্থাৎ প্রাসাদ-অট্টালিকা-বস্তি পথঘাট এক কথায় তার পরিধি প্রসারের ক্রমবৃদ্ধি, দ্বিতীয়টি, তার সামাজিক ইতিহাস।

নগরসমাজ গ্রামীণসমাজেরই বৃহত্তর পরিবর্ধিত রূপ হওয়ার কথা, সামাজিক মূল্যমান যখন এক অপরিবর্তিত রূপে থাকে। ইংরেজপূর্ব যুগে সমাজের অর্থনৈতিক ও ক্ষমতা কাঠামোর চূড়ায় শাসক নবাব, নীচে ক্রমবিন্যস্ত ভূমি ও আর্থিক ক্ষমতার অধিকারীরা, একেবারে সর্বনিম্ন স্তরে ক্ষমতাহীনের দল, দৈহিক শ্রম বিক্রি করা ছাড়া যাদের আর কোনও গতি নেই। এই ব্যবস্থা বহুলাংশে হিন্দু বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। চূড়ায় ব্রাহ্মণ, পরের শ্রেণিতে বৈদ্য ও কায়স্থ, তারপর জলাচরণীয় বা জলচল, তার নীচে জলঅচল। সর্বশেষে হাড়ি ডোম প্রভৃতি অন্ত্যজ, তাদের ছায়া মাড়ানো পাপ।

সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস এবং সেই উপলক্ষ্যে প্রাপ্য সামাজিক মর্যাদার একটা বাঁধা ছক ছিল, তার সঙ্গে আর্থিক কৌলীন্য যোগ হলে সোনায় সোহাগা। দীর্ঘকাল ধরে এই বিন্যাস অব্যাহত থেকেছে যার কারণ মূলত, সমাজ বৃহদংশে গ্রামকেন্দ্রিক এবং কৃষিনির্ভর হওয়াতে জাতনির্দিষ্ট পেশা গ্রহণ সামাজিক চাপ ও সুযোগহীনতার কারণে প্রায় অবধারিত। যার সামূহিক ফল যে-কোনও শ্রেণির পক্ষেই ঊর্ধ্বে যাত্রা বা vertical mobility-র সুযোগ অতি সীমিত। ঊর্ধ্বতন জাতের পেশা গ্রহণ সামাজিক নিয়মে দোষাবহ এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে গর্হিত। আর অভাব যতই হোক, কোনও অবস্থাতেই নিম্নতর জাতের পেশা গ্রহণ করা যাবে না। ফল অসীম জলাবদ্ধতা।

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হওয়ার প্রথম যুগেই অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকেই হিন্দু সমাজের এই অচল অটল কাঠামোয় ফাটল ধরল এবং তার সূচনা হল নতুন শহর-কলকাতায়। প্রথম লক্ষণ দেখা দিল নাগরিক অভিজাত শ্রেণি বা urban aristocracy-র সৃষ্টিতে। প্রশ্ন উঠতে পারে এ আর নতুন কী? মুর্শিদাবাদে কি নাগরিক অভিজাতরা ছিলেন না? আর ক্ষমতার কেন্দ্র স্থানান্তরিত হলে সুযোগসন্ধানীরা সেখানে গিয়ে ভিড় জমাবে সেটাই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু আমরা বলেছি কাঠামো ভাঙছিল, শ্রেণির থাকবন্দি পালটাচ্ছিল। রাজতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক সমাজে রাজ-অনুগ্রহ বর্ষিত হত মূলত বংশমর্যাদা দেখে, রাজদরবারে স্থান পাবে তারাই, যাদের বাপ-পিতামহ সেই সম্মান ভোগ করে গেছে। মনসবদারের ছেলেই মনসবদারি পাবে। ঔপনিবেশিক শাসনে সেই মৌরসিপাট্টার অবসান ঘটল। বিদেশি বণিকের কাছে মূল্য একমাত্র যোগ্যতার। যার সাহায্যে তার বাণিজ্য পরিচালনা নির্বাধ হবে, দিন দিন মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, তার জাত কী, উচ্চ পদের অধিকার তার আছে কি না, বিদেশির কাছে সে প্রশ্ন অবান্তর।

নতুন শহর-কলকাতায় প্রাসাদোপম বাড়ি তৈরি করে, ধনগর্বে যাঁরা নাগরিক নব্য অভিজাত বনলেন, তাঁদের প্রায় সকলেই ইংরেজের দেওয়ান বা বেনিয়ান, অল্প কয়েকজন স্বাধীন ব্যবসায়ী। অভিজাত বনবার প্রাথমিক শর্ত যে উচ্চকুল বা বংশমর্যাদা তা এদের কারোরই ছিল না, নতুন জমানায় তার প্রয়োজনও ছিল না, নব্য অভিজাতের খেতাব সহজেই মিলে গেল।

পুরোনো সমাজের প্রতিনিধি, বিশেষ করে সমাজের মাথারা ক্ষুব্ধ, তারা একে ছোটো জাতের উত্থান আখ্যা দিয়ে এসেছেন। হুতোম বলেছেন,

> নবাবী আমল শীতকালের সূর্য্যের মতো অস্ত গ্যালো। মেঘান্তের রৌদ্রের মতো ইংরেজদের প্রতাপ বেড়ে উঠ্‌লো। বড়ো বড়ো বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো। নবো মুনসী, ছিরে বেণে, ও পুঁটে তেলি রাজা হলো... কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, মানসিংহ, নন্দকুমার, জগৎ শেঠ প্রভৃতি বড়ো বড়ো ঘর উৎসন্ন যেতে লাগলো... টাকা বংশগৌরব ছাপিয়ে উঠ্‌লেন। রামা মুদ্দফরাস, কেষ্টা বাগ্‌দি, পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কলকেতার কায়েত বামুনের মুরুব্বী ও সহরের প্রধান হয়ে উঠ্‌লো।

সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিটুকু বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বংশমর্যাদা বা বনেদিয়ানার মূল্য আর নেই, এখন টাকাই সব। তার জোরে নীচু জাতের লোকেরা কায়েত-বামুনের মুরুব্বি হচ্ছে, উচ্চবর্ণের আধিপত্য আর থাকছে না। পুরোনো সমাজকাঠামো ভাঙছে।

কতটা সত্য অভিযোগ? ইংরেজদের দেওয়ান বেনিয়ানদের অনেকেই উচ্চবর্ণের হলেও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীরা তা নয়। রামদুলাল সরকার, মদনমোহন দত্ত, গোকুল মিত্ররা কায়স্থ হলেও বৈষ্ণবচরণ শেঠ তন্তুবায়, গোবর্ধন রক্ষিত তাম্বূলী, গৌরীচরণ সেন, নিমাইচরণ মল্লিক, সাগর দত্তরা সুবর্ণবণিক আর প্রীতিরাম মাড় কৈবর্ত।

প্রশ্ন উঠতে পারে তাতেই বা কী? এদেশে বহুকাল ধরে বৈশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যবসায়ীরা ধনাঢ্য, তারা উচ্চবর্ণ নন, কিন্তু এই আক্ষেপ তো কখনও শোনা যায়নি। শোনা যাচ্ছে, কারণ, ঔপনিবেশিক শাসকের জাতিপক্ষপাতহীন শাসনের দৌলতে তারা উচ্চবর্ণের ওপর মুরুব্বিয়ানা ফলাচ্ছে আর, মনে রাখতে হবে সব কিছু ঘটছে কলকাতায়। বলা হচ্ছে এই উঠতি বড়লোকেরা ‘সহরের প্রধান’।

এদিকে দ্রুত একটি শ্রেণি সংখ্যাবৃদ্ধি করছিল, গ্রামসমাজে যাদের অস্তিত্ব ছিল নগণ্য। এঁদের মূল পেশা চাকরি, মূল পুঁজি শিক্ষা। শিক্ষা অর্থোপার্জনের উপায় সুতরাং এঁরা পরিচিত হলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক অভিধায়। পূর্বে ভদ্রলোক শব্দটি ছিল বর্ণনির্ভর, অর্থকৌলীন্যনির্ভর, তার সঙ্গে শিক্ষাকৌলীন্যও

জুড়ে গেল। এবং তার ওজন এমনই যে বর্ণ-অর্থকৌলীন্য না থাকলেও শুধু তার জোরে ভদ্রলোক বনা যায়। 'মধ্যবিত্ত' শব্দ ব্যবহার করেছেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *কলিকাতা কমলালয়* গ্রন্থে, কলকাতার ভদ্রলোকদের আয়ের উপায় ও আর্থিক সংগতির উপর ভিত্তি করে তিন ভাগে ভাগ করেছেন— উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং তৃতীয় ভাগ, 'দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক'। লক্ষণীয়, ভবানীচরণ বর্ণ বা জাতের উল্লেখমাত্র করছেন না, এমনকি এর সঙ্গে শিক্ষিত হওয়ার আবশ্যিকতারও কোনও উল্লেখ নেই, শুধু বলা হচ্ছে যথেষ্ট অর্থবিত্ত না থাকলেও সে ভদ্রলোক। তিনি সরাসরি না বললেও পুরোনো সমাজে এই শব্দটি বর্ণনির্ভর, কয়েকটি বর্ণভুক্তরাই এই আখ্যা পেত, তাদের আর্থিক স্থিতি যাই হোক না কেন।

পূর্বে যেটুকু বলা হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণির উত্থানের পরিপ্রেক্ষিত এবং পুরোনো কলকাতার সামাজিক ইতিহাসের, যদি সবথেকে না হয়, অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আমাদের প্রচলিত ধারণা, যথা— আঠারো-উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাস মূলত ব্যক্তির অবদান, ধর্মসংস্কার, সামাজিক সংস্কারের বৃত্তান্ত মনে করা বা এক ধাপ এগিয়ে নবজাগরণ— তার সব কিছুর মূলেই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি কাজ করেছে। সমাজের ধর্মীয় সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনের রাশ ধীরে ধীরে তাদের হাতে চলে গেছে, বিশ শতকে শ্রেণিগতভাবে তারাই হয়ে উঠেছে নিয়ামক শক্তি।

মধ্যবিত্ত শ্রেণি নানা আলোচনা লেখালিখিতে বার বার উঠে এসেছে এবং তার যে নানান দ্যোতনা সেগুলিকে আমরা একবার দেখতে পারি। যেমন— এরা শিক্ষিত (মূলত ইংরেজি), চাকুরিজীবী (স্বাধীন পেশা, যেমন— আইনজীবী বা চিকিৎসক), গরিষ্ঠাংশে উচ্চবর্ণ এবং শহরবাসী। বোঝা শক্ত নয় কেন কলকাতা তাদের পক্ষে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ও গতি সম্পর্কে কয়েক কথা বলা দরকার কারণ, মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও পেশা অনেকটাই এই ভাষানির্ভর। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, ১৮৩৫-এর আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেশীয়দের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে কোনও আগ্রহ দেখায়নি, বরং প্রশাসনিক ও বিচারের কাজ পূর্বের মতো ফারসিতেই চালাবার পক্ষপাতী ছিল। অথচ দিন দিন কোম্পানির বাণিজ্য ক্রমবর্ধমান, দেশীয়দের সহযোগিতা পদে পদে দরকার। অপরদিকে ফারসির ব্যবহার কেবলমাত্র প্রশাসনিক ও বিচারের কাজে সীমাবদ্ধ।

দেওয়ান রামকমল সেন লিখছেন ১৭৭৪-এ কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠার থেকেই অনুভব করা গেল ইংরেজি শিক্ষা desirable and necessary। এই সময়ে ইংরেজি শিক্ষার দৌড় ছিল তথাকথিত spelling book পর্যন্ত, নিতান্তই কেজো বন্দোবস্ত। পরে ব্যক্তিগত মালিকানায় কয়েকটি স্কুল খোলা হয়। প্রকৃত উৎসাহ দেখায় মিশনারিরা, উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকেই অন্তত ২৩টি মিশনারি স্কুলের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, যার অনেকগুলিতেই ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হত। ইংরেজি শিক্ষার অধিকতর জনপ্রিয় দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ১৮১৭-য়, স্কুল বুক সোসাইটি ও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

ছাত্রসংখ্যা কেমন বাড়ছিল? *সমাচার দর্পণ* বলছে ১৮২৮ সালে হিন্দু কলেজে ৪০০ ও অন্যান্য স্কুলে আরও ১০০ জন ছাত্র ইংরেজি শিখছে। ১৮৩৪ অর্থাৎ মাত্র ছ-বছর পর ছাত্রসংখ্যা শুধু হিন্দু কলেজে ৩৩৮, ডাফ স্কুলে ৩৫০, চার্চ মিশনারি স্কুলে ২০০, ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ২০০ এবং কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির বিদ্যালয়গুলিতে ৩০০। মনে রাখতে হবে, এই তালিকা অসম্পূর্ণ।

বার বার ইংরেজি শিক্ষা বলায় এমন ধারণা হতে পারে, শিক্ষাক্রমটা ছিল শুধুমাত্র ভাষা শিক্ষার। ইংরেজপূর্ব যুগে দেশীয় শিক্ষার কার্যক্রম ছিল সরল ও ন্যূনতম। বাংলাভাষা পড়া ও লেখা, অঙ্ক ও মানসাঙ্ক দিয়ে প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে জমিদারি হিসাবনিকাশ ও কাগজলেখা শিক্ষা। সাধারণজনের শিক্ষা প্রথম পর্যায়েই শেষ, জমিদারি সেরেস্তা বা ব্যবসাদারের গদিতে চাকরির অভিলাষীরা দ্বিতীয় পর্যায় পর্যন্ত যেত। উচ্চমার্গীয়রা এর সঙ্গে মুনসির কাছে ফারসি শিখত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতপরিবারের ছেলেরা টোলে কাব্যব্যাকরণ পড়ত।

অন্য দিকে ১৮৪২ সালে হেয়ার সাহেবের স্কুলে দশ বছরের ছেলে পড়ছে Homer's Illiad, Murray's Grammar, Playfair's Geometry এবং Goldsmith's Rome। অনতিকাল পরে সেই ছেলেই হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণিতে পড়ছে— Pope's An Essay on Criticism, Cowper's Task, Bell's Euclid, Stewart's Geography, Keightley's India, প্রবোধচন্দ্রোদয় প্রভৃতি। শুধু চাকরি পাওয়া নয়, তাকে পাশ্চাত্য জ্ঞানজগতে প্রবেশাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

অবশ্য চাকরির সুযোগ তখন প্রচুর। ইংরেজসাম্রাজ্য ভারতে তার সীমানা বাড়িয়েই চলেছে, রাজধানী কলকাতায়, সকল প্রশাসনিক দপ্তরের হেড অফিস

সেখানে, এছাড়া তৈরি হচ্ছে রাস্তা, সেতু, বসছে রেলপথ। কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্তদের অনেক সুযোগ। উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে চিকিৎসক ও আইনব্যবসায়ীরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ছেন। *বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী* গ্রন্থে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সারা ভারতে ছড়িয়ে থাকা বাঙালি পরিবারদের যে দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন, তাদের অধিকাংশেরই বসতের শুরু উনিশ শতকে।

এবং চাকরির সেরা সরকারি চাকরি। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম ভারতীয় আইসিএস, ১৮৬৮ খ্রি.-এ ইলাহাবাদ বেড়াতে গিয়ে স্ত্রীকে লিখছেন, রামেশ্বর নামে ধনাঢ্য এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে, সে ব্যক্তি সত্যেন্দ্রনাথ সিভিলিয়ান জেনে আহ্লাদিত হয়ে নিজের ছোটো ছোটো ছেলেদের বলছে, 'আমাদের গবর্ণর কমিশনর ইঁহারা যেমন, ইনিও তাঁহাদের একজন। শুধু তো খেলিয়ে বেড়ালে হয় না, দেখ বিদ্যাতে কত করতে পারে'। সামাজিক সম্মানের চূড়ান্ত রাজপুরুষ, এবং তা হতে গেলে বংশ, অর্থ, কোনও কৌলীন্যেরই আর প্রয়োজন নেই এই জমানায়, শুধু বিদ্যার্জন করলেই হবে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বিশ শতকের গোড়ায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির চেহারাটা দাঁড়াল কী? তাতে কোন্ কোন্ বর্ণ, জাত ঠাঁই পেল, কারাই বা শিক্ষিতের কাতারে যোগ দিতে পারল? ১৯০১-এর সেন্সাস কিছুটা আলোকপাত করে। দেখা যাচ্ছে কলকাতাবাসী হিন্দুদের মধ্যে অল্প লোকই কুলবৃত্তি অনুসরণ করে, শহরে জীবিকার্জনের অন্য উপায় পেয়েছে তারা। আর সব থেকে বেশি কুলবৃত্তি অনুসরণ করে চর্মকাররা ৩৯.১%, তার পরেই ব্রাহ্মণরা, ২৪.৪%।

চামার আর ব্রাহ্মণের একই হাল— খবরটা বেশ চমকপ্রদ হলেও কারণটা বোঝা শক্ত নয়। অস্পৃশ্যতা, দারিদ্র্য আর অশিক্ষার কারণে চামারদের বৃত্তি পরিবর্তনের সুযোগ প্রায় নেই, অপরদিকে ব্রাহ্মণরা সামাজিক সম্মান ও রোজগারের সহজ পন্থা ছাড়তে রাজি নয়। কিন্তু অন্যান্য নিম্নবর্ণ? কুলবৃত্তি অনুসরণ করছে সুবর্ণবণিকদের ১৯.৫, গোপ বা গোয়ালাদের ১৮.৬, তেলিদের ৯.৫, তন্তুবায়দের ৬.২, সদ্গোপদের ৩.৫ এবং ২.৭ শতাংশ। এইসব শ্রেণির মধ্যে চাকুরিজীবীর সংখ্যা শূন্য, বেশিরভাগই ব্যবসায়ী, অন্যান্য পেশা— শ্রমিক, কুলি, রাঁধুনি, ভৃত্য ইত্যাদি। অর্থাৎ বিশ শতকের একেবারে শুরুতে শিক্ষা ও চাকুরির দৌলতে মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ প্রায় সবটাই উচ্চবর্ণের দখলে।

অবস্থাটা বদলাচ্ছিল, মাত্র দশ বছর পরের সেন্সাসেই দেখা যাচ্ছে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদের শিক্ষিতের হার বাড়ছে কিন্তু উচ্চতর বৃত্তিতে যাওয়ার হার কমছে।

কারা ভাগ বসাচ্ছিল? যেমন— গোপ, কুম্ভকার প্রভৃতি। ঝোঁকটা সুস্পষ্ট। শিক্ষার হার সব বর্ণের মধ্যেই বাড়ছে কিন্তু উচ্চতর বৃত্তিতে যাওয়ার সুযোগ উচ্চবর্ণের কমছে, অন্যদের ধীরগতিতে হলেও বাড়ছে। স্বাভাবিক ভাবেই মধ্যবিত্তের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে। উচ্চবর্ণের সমস্যা বেশি কারণ তাদের শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতি। ফল তাদের শিক্ষিত বেকারসংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

নবজাগরিত বঙ্গদেশে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে কল্পনা করা হচ্ছে জাত্যভিমানমুক্ত, পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত প্রগতিশীল এক শ্রেণি, বাস্তব ছবি ততটা উজ্জ্বল নয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণির বেশিটাই উচ্চবর্ণের দখলে, তবে বর্ণ আর বিত্তকৌলীন্যের জগতে ত্যাজ্য অনেক পেশা গৃহীত হয়েছে। তার বড়ো কারণ, চাকুরি ক্ষেত্রের সংকোচন। আগে যেখানে উচ্চশিক্ষিতের চাকরিলাভ প্রায় সুনিশ্চিত ছিল, ১৮৮১ সালে দেখা যাচ্ছে সে পর্যন্ত পাশ করা গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে সরকারি চাকরি করছে ৫২৮ জন, বেসরকারি চাকরি করছে ১৮৭ জন আর বেকার ৬৩৫ জন।

পরবর্তীকালে অন্তত বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সঙ্গে যে শব্দটি প্রায় অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে থেকেছে, তা হল বেকারি। এদিকে জীবিকার সন্ধানে গ্রাম থেকে কলকাতায় আসা মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলছিল। ১৮২৪ (Schalch), ১৮৩২ (Schalch and Princep), ১৮৫৬ (Heysham)-র কলকাতার মানচিত্রগুলিতে দেখা যায় কী হারে শহরে বসতি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নগরসীমানার ধারে নতুন নতুন বসতি এলাকা গড়ে উঠছে। ১৯০১-এর সেন্সাসে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলা হচ্ছে শহরে overcrowding-এর সমস্যার কথা।

আমরা উনিশ শতকের একেবারে শেষাংশে এসে পৌঁছেছি। এর পরের পর্ব ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ ও তৎপরবর্তী স্বদেশি আন্দোলন, যাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির যোগদান ও নির্ধারক শক্তি হয়ে ওঠার ইতিহাস সুবিদিত। নিঃসন্দেহে এই প্রাপ্তি সমাজইতিহাসের বহু উপাদানের টানাপোড়েনে তৈরি। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমার কাছে সবথেকে লক্ষণীয়, গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বপরিচয় নির্মাণকে। কী অসামান্য জীবনীশক্তি তার যে, পরবর্তী শতকের বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগের মতো দুর্বিপাকেও বেঁচে থাকতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, বাংলার বাইরে যে কয়টি স্বাতন্ত্র্যের জন্য বাঙালি বাঙালি হিসেবে পরিচিত, তা এদেরই দান। সংস্কারমুক্ত চিন্তা, রুচি ও শিক্ষা যে শ্রেণির পরিচয়, দুঃখের বিষয় আজ তা বিলুপ্তির মুখে।

কলকাতার নেশাড়ু ও পানাড়ু

কৃষ্ণপ্রিয় দাশগুপ্ত

শুরুর কথা ।। ১

‘বেশ্যালয় ও পানশালা’। এই হল লেখার বিষয়। স্থান কলকাতা। এইরকম লিখতেই অনুরুদ্ধ হয়ে শুরু করেছি এই বৃত্তান্ত। কলকাতার সেকাল না একাল, তা বলা হয়নি। তাতে ভালোই হয়েছে। এখানে লেখক আমি। কৃষ্ণপ্রিয় দাশগুপ্ত। লিখছি আমিই। ফলে পরের মুখের ঝাল খাওয়ার কোনও ইচ্ছা আমার নাই। আমিই এই দুই বিষয়ে যা যা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, তা-ই খানিক লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছি। এইটুকু হল আমার পূর্ব-ভূমিকা। এরপর আছে উত্তর-ভূমিকা।

সাধারণত, বাঙালি আমোদ-গেঁড়ে! এবং সারাক্ষণ ‘রিফ্লেক্টেড গ্লোরি’তে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। যে বিষয় নিয়ে লিখছি, তাতে তো বটেই। খালাসিটোলা আর বারদুয়ারি নিয়ে যাকেই কিছু বলতে শুনি, সেখানে অবধারিত ভাবেই প্রথমে হাজির হন ঋত্বিক ঘটক, এবং তাঁর পিছনে লম্বা লাইন পড়ে— কমলকুমার, বিনয়, শক্তি, সুনীল, উৎপল, সন্দীপন, তারাপদ, হাংরি— আরও কত সব নাম! সবাই-ই নামকরা, এবং নামকরা-ই, এবং খুব-ই নাম করা, তাই-ই— বাঙালি কেটি-বিডি নিয়ে বলতে গেলে-ই, আমুদে সোডার বোতল খুলে দেয়। তারপর গ্যাস বেরতে থাকে, সে গ্যাসে সম্পৃক্ত থাকে ওই সব নাম। কী সশব্দ সেই ঢেকুর! যেন ক্যানিং লাইনের লোকাল ট্রেনের ‘ফটাশ জল’!

কোন্ বাঙলার ঠেকে কবে জীবনানন্দ দাশের ১ম জন্মদিন পালন হয়েছিল বা অলিপাবে কোন্ কবি অন্য আরেক কোন্ কবির ৫৩-তম জন্মদিনে ২য় ‘উল্লাস’টা বলেছিলেন, তা বাঙালির নখদর্পণে। সব মুখস্থ। অসংখ্য বাঙালির

মনে-মগজে এইসব ঠাসা আছে, ছুঁচো বাজির সেই মশলা ঠাসার মতো এটা। ঢেকুরের এই চারণভূমিতে সবাই-ই হাজির ছিল বলে দাবি করে। সেই দাবির জোরেই কোনও কোনও খুবই বিখ্যাত ডাক নামও এসে পড়ে আলোচনার টেবিলে। এইরকম অনেক উদাহরণ হাজির করা যায়। আমোদের এই ঢেকুরে ঢেকুরে ছেয়ে আছে 'পানশালা'। এইসব নাম ছাড়া নেশা জমেই না। সে যতই খাও না কেন! ফলে, একটা নামাবলি লাগে। তবে, 'বেশ্যালয়' নিয়ে এত কথা হয় না।

বাঙালিবাড়িতে বউ-শালী-মেয়ে আছে তো, বিপদ আছে। এইসব ক্ষেত্রে যেটুকু ঢেকুর ওঠে, সবটাই 'শোনা কথা'। এবং এসব ক্ষেত্রে কোনও কথারই দায় নেয় না কেউ-ই। বেশ্যালয়ের হাতে গরম কোনও অভিজ্ঞতাই কেউ নিজের নামে চালায় না। ভদ্রের ভয় আছে। অমুককে বলতে শুনলাম, বা, কোথায় যেন পড়লাম— গোছের কথা শোনা যায়। চা-কফি-র আড্ডা বা বিভিন্ন লেখালেখিতে এইরকমই সমস্ত শোনা কথা আর ঢেকুরে-ঢেকুরে বাংলার 'পাবলিক কালচার' আলুলায়িত। এবং আমোদ-আহ্লাদে আত্মপ্রসাদ লাভ-ই বাঙালির একমাত্র মোক্ষ। তাই বাঙালির সুখেরও শেষ নাই। আমোদেরও শেষ নাই। কবিরা বেশ্যালয়ে যে গেলেন, কবে, কখন, কোন্ গলিতে গিয়ে কবিতা নিয়ে কী কী আলোচনা বা পরিকল্পনা করলেন, তা একেবারে ঠোঁটের ডগায়-ই থাকে বাঙালির, সবসময় থাকে, লকলক করতেই থাকে। সারাক্ষণই লকলক করে। আমি এই লাইনে যাতায়াত করি নাই এবং 'বেশ্যালয় ও পানশালা' নিয়েও কোনও গবেষণা নয় এই লেখাটা। এখানে কোনও অ্যাকাডেমিক তত্ত্ব নিরূপণেরও বিন্দুমাত্র চেষ্টা নাই আমার, কিংবা সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে এই একুশ শতকের ইতিহাস লেখারও অভিরুচি নাই। কোনও নামকরা বাঙালিও আমার পরিচিত নয়, ফলে পাঞ্চ হাউস, ট্যাভার্ন কিংবা ক্লাব, হিকস, হুতোম, নিশাচর, অমৃতলাল, শিবনাথ শাস্ত্রী বা রাজনারায়ণ বসু, মেঘনাদ গুপ্ত, ব্রজেন বাঁড়ুজ্যে, কিংবা ইদানীন্তন বঙ্গবিদ্যা চর্চার কোনও বচন বা কোনও ঢেকুর আমার এই লেখায় বিবেচ্য হয়নি। রিপোর্টারি করেছি এককালে। কাজের সূত্রে গেছি বিভিন্ন 'বেশ্যালয়-পানশালা'য়। কাজ ছাড়া গেছি। অনেকবারই গেছি। সেই সময় যেরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার, তারই সামান্য কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করেছি এই বৃত্তান্তে। ফলে, এই লেখা আমার দেখা এবং বোঝার একটা আক্ষরিক চেহারা হিসেবেই এখানে হাজির হয়েছে। আর-একটা কথা, এই লেখা 'নীরব-পর্যবেক্ষণে'র কোনও 'নিছক' বিবরণ নয়, বিপরীতে রক্ত-মাংসের শরীরটার মতোই সক্রিয় একটা বর্ণনা।

এই হল উত্তর-ভূমিকা। এবার পড়া শুরু করেন।

রাধার ঘর ।। ২

মদ যে আমার কী ভালো লাগত।

একটা মানুষ যতটা সারাজীবনে খেতে পারে, মনে হয় আমার সেই লিমিট পেরিয়ে গেছে। ফলে এখন আর পারি না। ডাক্তারেরও কড়া নিষেধ আছে মদ খাওয়া নিয়ে। কী অবস্থা! সবাই কত সুখে আছে। আমারই কেবল 'লিভার-ক্যালিবার' এক হয়ে গেল মাল খেতে খেতে। ভগবান নিষ্ঠুর! এই যে এখনও বেঁচেই আছি, তা কিন্তু 'রাম' ছাড়া। কী আর করা। তাই একটু 'ডাউন মেমোরি লেন' করছি।

তখন শীতকাল। সন্ধ্যায় প্রেস ক্লাবে গেছি। আমি আর অমিত। অমিত ধর আমার সহকর্মী। আমরা সেই সময় *আজকালে* কাজ করি। আমি হলাম রিপোর্টার, ও ফোটোগ্রাফার। দুর্দান্ত ছবি তোলে। পাক্কা আর্টিস্ট। এভাবে মনে আছে ঘটনাটা। দুপুরে অফিসে গেছি, অমিত বলল, 'তোর অ্যাসাইনমেন্ট নেই আজকে।' আমি বললাম, খাতায় লেখা নেই কিছু? ও বলল, 'তোর আজ অন্য কাজ।' আমি বললাম, মানে? তোকে কে বলল? অমিত বলল, 'আমার সঙ্গে বেরোবি তুই। আমি অশোকদাকে (অশোক দাশগুপ্ত, পত্রিকা সম্পাদক) বলে পারমিশন করে নিয়েছি। চল। গাড়ি বলা আছে।' কিছুই যে আমি বুঝতে পারছি না, তা বললাম। অমিত বলল, 'যেতে যেতে বলছি।'

তখন সবে *সান্ধ্য আজকাল* বেরিয়েছে। তার-ই বিজ্ঞাপন তৈরি হবে। অশোকদা অমিতকে ছবি তুলতে বলেছেন। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে, আমার ছবি তুলল অমিত। আমার হাতে *সান্ধ্য আজকাল*। আমি কাগজ পড়ছি। বিভিন্ন জায়গায় কলকাতার ট্রাম লাইন, বাস স্ট্যান্ড, অলি-গলিতে, ফুটপাথে, চায়ের দোকানে, অনেক ছবি তুলল। তারপর অশোকদা দেখে একটা পছন্দ করলেন। সেই ছবিটা বোধহয় বৌবাজারে তোলা হয়েছিল। সকালের *আজকালে* আর সান্ধ্যতেও বিজ্ঞাপন হয়েছিল বেশ কয়েকদিন। তখন দিনের বেলার *আজকালের* বিজ্ঞাপনের বয়ান ছিল, 'প্রভাবে প্রথম প্রচারে দ্বিতীয়'। এটাও অশোকদার তৈরি।

তো সেই ছবি তুলে সন্ধ্যায় প্রেসক্লাবে গেছি। ক্লাব তখন জমজমাট।

আবদুল আর গয়া— এই দুজন ছিল প্রেস ক্লাবের বারের দায়িত্বে। ওরাই মদ মেপে ঢেলে দিত। ফাই ফরমাশ খাটত। দুজনের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল আমার। ওরাও খুবই পছন্দ করত আমাদের। এক-একদিন অনেক রাত পর্যন্ত খেয়ে এমন হত যে, বেরোতে পারতাম না। তখন গয়া বা আবদুল, কেউ একজন আমাদের ধরে, মনোহর দাস তড়াগের সামনে দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে রাস্তা

পার করে গ্র্যান্ড হোটেলের সামনে পৌঁছে দিত। সেদিন যে তারপর কীভাবে বাড়ি ফিরতাম তা ভগবানই জানে। আমি ফিরতাম নাকতলা। অমিত ঢাকুরিয়া।

প্যাটের সঙ্গে ক্যারম খেলতে খেলতে খাচ্ছিলাম। প্যাট হলেন সুব্রত পত্রনবীশ। ইংরেজি *স্টেটসম্যান* পত্রিকার চিফ ফোটোগ্রাফার। অমিতও এদিকে ওদিকে ঘুরে খাচ্ছে। খেলছি আর রাম খাচ্ছি। এই চলল খানিকটা সময় জুড়ে। রাতও বাড়ছে। ক্লাব ফাঁকা হচ্ছে। প্যাট চলে গেল। আমি আর অমিত খেয়েই চলেছি। খুব নেশা হয়েছে। প্রেসক্লাবের মদ সস্তায় পাওয়া যায়, তাই বেশি খাওয়া হয়ে যেত। খেতে খেতে রাত অনেক হয়ে গেল। আজকেও আমাদের একই ভাবে রাস্তা পার করে গ্র্যান্ডের সামনে দিয়ে এল গয়া।

ফাঁকা কলকাতা। শীতের রাতে কে আর থাকবে রাস্তায়? আমাদের মতোই কোনও মাতাল আর বেশ্যা ছাড়া? দুজন হাঁটতে হাঁটতে মিউজিয়ামের দিকে গেলাম। সদর স্ট্রিটের মুখে ট্যাক্সি পাওয়া যেতে পারে। এই রকম ভাবছিলাম। হঠাৎ দেখি, একজন সাদা গাউনের মতো পোশাক পরা এক মহিলার সঙ্গে আর-এক মহিলার প্রচণ্ড মারামারি হচ্ছে। দুজনেই দুজনের চুল ধরে আছে। আর অশ্রাব্য গালাগালি দিচ্ছে। অন্য মহিলা শাড়ি পরা। শীতের রাতেও অমন পাতলা পোশাক পরেছে! ওদের কি ঠান্ডা লাগছে না? অমিত বলল, 'ধর ওদের।' খুব সহজ হল না বিষয়টা। সামনে গিয়ে দুজনের হাত ধরে ছাড়িয়ে দিলাম বটে, কোনও একজন আমার হাতেও খামছে দিল, অনেকটাই। ওদের আমি বললাম, মারামারি করছিস কেন?

সাদা পাতলা গাউনের মতো পরা যে মেয়েটা, সে মহিলা নয়। ট্র্যান্স জেন্ডার। আর বাকিজন খাঁটি মহিলাই। দুজনেই শরীর খাটায়। 'বেশ্যা'। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত তখন দুজনেই। কথায় কথায় জানা গেল, মেয়েটা একজন খদ্দেরকে ম্যানেজ করেছিল। সে গাড়িতে ছিল। যখন মেয়েটা গাড়িতে উঠতে যাবে, তখনই ওই কাস্টমারের নজর পড়ে সাদা গাউনের দিকে। সত্যিই, দারুণ-ই লাগছিল তাকে দেখতে। যাইহোক, মেয়েটাকে না নিয়ে, সাদা গাউনকেই গাড়িতে তুলে নিয়েছিল কাস্টমার। এসব আজকে ঘটেনি। মেয়েটা নাকি সেদিন বাকিটা সময়ে, আর কোনও কাস্টমার পায়নি। আজকে তাকে দেখতে পেয়ে ধরেছে মেয়েটা। তারপরেই মারামারি শুরু। এর মধ্যেই আমরাও এসে পড়েছি।

দুজনকে থামিয়ে সরিয়ে দিয়ে রীতিমতো হাঁপাচ্ছি তখন আমি। নেশাটাও হালকা হয়ে গেল। মেয়েটা হিস হিস করছিল। সাদা গাউন দেখলাম কাঁদছে। অমিত তাকে বলল, 'সিগারেট খাবি?' সাদা গাউন মুখই তুলল না। মেয়েটা নিল। সাদা গাউন হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল সদর স্ট্রিটের ভিতরে। সে যাবার

সময়ও খুবই কাঁদছিল। আমি মেয়েটাকে বললাম, দেখ তো, এত মেরেছিস, ও কী কাঁদছে! মেয়েটা বলল, 'ওইদিন আমিও এইরকম করে কেঁদেছি।' অমিত বলল, 'আর মারামারি করবি না।' মেয়েটা একটা সিগারেট চেয়েও নিল। তারপর পার্ক স্ট্রিট মোড়ের দিকে চলে গেল। ফাঁকা রাস্তা! লোক নেই। খুব ঠান্ডাও ছিল। একটা পুলিসের জিপ চলে গেল হুশ করে। অমিত বলল, 'পুলিশ-প্রেস-প্রস্টিটিউট, পি-থ্রি!' আমি রেডিওর শ্রাবন্তী মজুমদার হয়ে সুর করে গাইলাম, পি+পি+পি—পি-থ্রি!

অমিত বলল, 'চল রাধার ঘরে যাই।' হাঁটতে হাঁটতে চললাম ডোরিনা ক্রসিং-এর দিকে। কটা যে বাজে কে জানে? নেশা ছেড়ে গেছে। চৌরঙ্গি হোটেলের সামনে এসে একটা টানা রিকশায় উঠলাম আমরা দুজনে। অমিত বলল, 'হাড়কাটা চলো।' আমরা বৌবাজার চললাম। যেতে যেতে দেখলাম বাঁহাতে কনুইয়ের নিচে খামচির থেকে রক্ত বেরচ্ছে বেশ। রিকশার ড্রাইভারকে বললাম, খৈনি খাও তুমি? চুন আছে? সে জানাল, আছে। আমি বললাম ঠিক আছে। নেমে চুন নেব। বৌবাজার শিব মন্দিরের সামনে রিক্সা দাঁড়াল। দুজনে নামলাম। কে যে ভাড়া দিল মনে নেই। চুন নিয়ে লাগালাম। গলির মধ্যে তখনও জমজমাট। অমিত বলল, 'শালা! মাগীবাড়িতে কেউ ঘুমায় না রে।' আমরাও রাধার ঘরের দিকে চলে গেলাম।

বাইরে দেখলাম, মাসি মাছ ভাজছে। বড়ো বড়ো রুই না কাতলা যেন। আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'রাধার দরজায় ধাক্কা দাও। ভেতরে লোক আছে।' অমিত রাধার নাম ধরে ডেকে দরজায় ধাক্কা দিল। দরজা খুলে গেল। রাধা বেরিয়ে এল। অমিতকে দেখে বলল, 'এতদিন পর মনে পড়ল যে!' অমিত বলল, 'রাম আছে?' রাধা বলল, 'আগে ভিতরে এসো। রাতে থাকবে তো?' একটা লোক জামা পরতে পরতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাধা বলল, 'টাকা দাও নিয়ে আসি। তোমরা ভিতরে যাও।' আমার আর অমিতের কাছে যা ছিল, তার থেকে ওল্ড মংক-এর বোতলের দাম হয়ে গেল। তবে ব্ল্যাকে দাম বেশি। রাধা চলে গেল। ঘরের ভিতরে গেলাম।

অমিত বিছানায় শুয়ে পড়ল। একটা বড়ো সোফা ছিল। আমিও তাতে শুয়ে পড়লাম। মাসি দরজাটা টেনে দিল বোধহয়। তার গলা শুনলাম, 'মাছ ভাজা নিও কটা।'

অমিত হঠাৎ উঠে বলল, 'সিগারেট আছে তো?' আমি প্যাকেটে দেখলাম—৫/৬টা মনে হয় ছিল। বললাম আছে। অমিত বলল, 'দে তো। রাধা এলে আবার পাঠাব।' সিগারেট বার করে ওকে দিতে গিয়ে দেখি, মেঝেতে একটা

বড়ো কাঁকড়া বিছা। অমিতকে বললাম, দেখ। ও চিৎকার করে উঠল। তারপর খুব জোরে জোরে রাধাকে ডাকতে শুরু করল। সেই চিৎকারে মাসি আর রাধা একসঙ্গেই ঘরে ঢুকল। কাঁকড়া বিছাটা একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে। রাধাকে বললাম, ওই দেখ। তার সে কী হাসি আমাদের দেখে! সারা শরীর দুলিয়ে সে হাসছে। হাসতে হাসতেই বলল, 'কী সাহস বাবা! একটা বিছা দেখে চিৎকার করে সবাইকে জাগিয়ে দিল!' তারপর সে সামনের টেবিলের উপরে রাখা একটা কাঁচের গ্লাস এনে বিছেটাকে খপ করে বন্দি করে গ্লাসটা ঠেলে দেওয়ালের পাশে নিয়ে রাখল। আমি বেশ জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম, সোনার কেল্লা! রাধা বলল, 'সেটা কী?'

আমাদের আবার মদ খাওয়া শুরু হল। রাধা তিন চারটে মাছ ভাজা নিয়ে এল। মাছ আর মদ খেতে খেতে রাধা বলল, 'শোনো, যারা রাম খায় তাদের মৃত্যু নেই।' কী! বললাম আমি। ও বলল, 'এখানে একজনের পোঁদে একবার একটা কাঁকড়া বিছা কামড়ে ছিল, তারপর সে নিজেই পোঁদ উল্টে মরে গেল। যাকে কামড়াল, তার কিছু হল না। কেন তা জানো? সে রাম খায় তাই। বিষে বিষক্ষয়!' আমি এমন জ্ঞানের কথা আগে কখনও শুনিনি। খুবই মুগ্ধ হয়ে এক পেগ মতো কাঁচা খেয়ে নিলাম। তাই দেখে রাধার খুব অভিমান হল! কেন?

অমিতের সঙ্গে রাধার অনেকদিনের চেনাজানা। কিন্তু অমিত তার কাছে আজ অনেক দিন পরে এসেছে। তাতেই রাধার অভিমান। বলল, 'এই যে এখন আমার কী আনন্দ হচ্ছে, কত মনের কথা বলতে পারছি, তোমরা এলে বলেই তো।' অমিত বলল, 'তোকে সিনেমা দেখতে নিয়ে যাব।' রাধার কী আনন্দ! বলল, 'সত্যিই নিয়ে যাবে!' অমিত বলল, 'যাব।' এই ঘরের দেওয়ালে একটা ঘড়ি ঝুলছে। দেখলাম রাত একটা।

আমি বললাম, একটা সোডা নিয়ে আয় তো রাধা। ও বলল, 'আবার কী? এখন সোডা লাগবে কেন?' আমি বললাম, এটা খেতে হবে না। রাধা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি একটা সিগারেট ধরালাম। সে সময় আমার ব্র্যান্ড ফিল্টার উইলস অমিত গোল্ড ফ্লেক। আমি লাইটার ব্যবহার করি না। ওটা পছন্দ হয় না আমার। দেশলাই।

রাধার ঘরের রঙ সবুজ। টিউব লাইটের আলো। ঘরে ঢুকেই বাঁদিকে একটা নর্দমার মুখ। সামনেটা একটা করে ইট দিয়ে পাঁচিলের মতো করে ঘিরে রাখা। তার সামনে এক বালতি জল। বালতিটা লোহার তাতে একটা নীল রঙের প্লাস্টিকের মগ। তার পাশে আরেকটা ছোটো, ভাঙা, লাল রঙের, প্লাস্টিকের বালতি। এই ঘরের সবচেয়ে দরকারি জায়গা এটা। খদ্দেরদের কাজ

হয়ে গেলে, সে এবং রাধা যৌনাঙ্গ পরিষ্কার করে এখানে। এবং ওই ভাঙা বালতিতে ব্যবহৃত কন্ডোম ফেলে দেয়। ঘরে ঢুকে সোজাসুজি চৌকি। আড়াআড়ি করে পাতা। তবে বড়ো বেশ। তোশকের উপরে তেলচিটে চাদর। নীল আর গোলাপি রঙের খোপ কাটা। দুটো বালিশ, কোলবালিশও আছে একটা। চৌকির মাথার দিকের দেওয়ালে জানালা আছে একটা। শাড়ি দিয়ে পর্দা বানানো। পায়ের দিকে আছে একটা মিটসেফ। তার মধ্যে কী আছে দেখা যায় না। পাশে দেওয়ালে, টানানো দড়িতে ব্লাউজ, সায়া, শাড়ি, ব্রা ঝুলছে। এবং চৌকির গায়ে লেগে দেওয়ালে রয়েছে টিউব লাইট। তার তলায় একটা কালীঘাটের কালীর ছবি। পাশে ক্যালেন্ডার। তাতে রামকৃষ্ণের ছবি। এই দেওয়ালের বাঁ কোনায় ঝুলে আছে একটা মশারি। দরজার দিকে, ডানপাশের দেওয়ালে ঘড়ি আছে একটা। সিলিং ফ্যান আছে। এবং মেঝেটা লাল সিমেন্টের।— এই হল ঘরটা।

রাধা সোডা নিয়ে এসেছে। সঙ্গে শাল পাতায় কষা আলুর দম। আলুর মধ্যে কাঠি ভরা।

আমি একটা তুলে মুখে দিলাম। অমিতও লাফিয়ে উঠল। রাধা গ্লাসে রাম নিয়ে উঠে বসল বিছানায়, অমিতের পাশে। আমি সোফায়। মাছ ভাজা আর আলুর দম— এই হল ডিনার। কাঁকড়া বিছেটা যে গ্লাসবন্দি হয়েছিল তখন, সেই থেকে ওভাবেই সে বন্দি রয়েছে। আমি রাধাকে বললাম, এটার কী হবে? ও বলল, ‘থাকুক এখন। তোমরা চলে গেলে ছেড়ে দিয়ে আসব বাইরে।’

‘ক্লাবে কী যেন খেয়েছিলাম?’ অমিত প্রশ্ন করল। আমি মনে করতে পারলাম না। অমিতকে বললাম, কী খেয়েছিলাম বল তো? রাধা বলল, ‘চুপ! শোনো, আমি একটা গান করব এখন।’ অমিত বলল, ‘নে শুরু কর।’ রাধা গান গাইছে। আমি খাচ্ছি। আমরা খাচ্ছি। তবে— কী যে সেই গানটা আজ আর মনে নেই। কেবল এটা মনে আছে, গানটা খুবই বেসুরো ছিল।

জলছাদ ।। ৩

আজকাল থেকে বেরিয়ে, আমহার্স্ট স্ট্রিট ধরে বাঁদিকে এগিয়ে, রাস্তাটা যেখানে কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের দিকে ঘুরেছে, সেখান থেকে আরও একটু সামনে গেলেই, একটা গলির মধ্যে ছিল, একটা একতলা বেআইনি বার— ‘চাটাইদার ঠেক’। সেটা ছিল আদতে বেশ বড়ো একটা ঘর। মসৃণ মেঝে। মেঝেতে, দেওয়াল ঘেঁষে চাটাই পাতা। চাটাইয়ে বসে দেওয়ালে হেলান দিয়ে মদ খেত সবাই। বাংলা-ইংরেজি সব রকম মাল-ই পাওয়া যেত সেখানে। দুই ভাই মিলে, অতি গোপনে চালাত এই ঠেক। চাটাইয়ে বসে খেতে হত বলেই, কোনও এক মহাপ্রাণ এর নাম রেখেছিলেন, ‘চাটাইদার ঠেক’।

ঘরটার চারদিকেই বসার ব্যবস্থা ছিল। ঢোকার যে দরজাটা, তার ঠিক মুখোমুখি ছিল আরও একটা দরজা। জানালাগুলো বন্ধ থাকত। ঘরে খুব আস্তে কথা বলতে হত। চিৎকার তো একেবারেই নিষিদ্ধ। সাধারণত বয়স্ক লোকজনই আসতেন। ধুতি-পরাও অনেককে দেখেছি, মদ খেতে এসেছেন। এঁদেরই অনেকে, রেসের ছোটো ছোটো বই নিয়েও আসতেন। এবং রেসের রেসিপি নিয়ে খুব গভীর আলোচনা করতেন খেতে খেতে। ধুতি পরে মেঝেতে বাবু হয়ে বসতে সুবিধেই হত। আমি এখানে আসা শুরু করি ১৯৮৮-৮৯ সাল থেকে।

একদিন সন্ধ্যায় গেছি। আমি আরও দুজন। সেই সময় যে ছেলেটি মদ দিত, খানিকটা 'এফিমিনেট' ধরনের ছিল সে। তাকে এজন্য সবাই 'ছক্কা' বলত। এটা সে জানত। বয়স ২০/২২ বছর। আমাকে সে খুবই পছন্দ করত। কয়েকদিন পর পর না গেলেই বলত, 'তোমার কী হয়েছিল গো, এদ্দিন পরে মনে পড়ল? রোজ ভেবেছি, আজ আসবে।' তখন যারা আমার সঙ্গে থাকত, তারা খুবই হাসাহাসি করত। সে আমাকে নাকি একটু বেশি বেশি মদ দেয়, এই অভিযোগ করত তারা। অবশ্য, একদিন সে-ই মদ দিতে এসে বলেছিল, 'এট্টু বেশিই তো দিই-ই।' তাই নিয়েও হাসাহাসি হত।

সেদিন সন্ধ্যায়ও গিয়ে যথারীতি, দেওয়ালে হেলান দিয়েই বসেছি, বাঁদিকে। তিনজনই রাম। আমাদের উল্টোদিকের দেওয়ালে আরও কয়েকজন। খিদে পেয়েছিল খুবই, কী যেন একটা আনতেও বলেছি, রাম আর বাদাম দিয়ে গেল ছেলেটা। বললাম, খুব খিদে পেয়েছে। খাবারটা তাড়াতাড়ি দে। 'হ্যাঁ' বলে চলে গেল ছেলেটা। ততক্ষণে বাদাম দিয়ে খাওয়া শুরু করেছি। খেতে খেতে আমি চারদিকে দেখছি, সামনের দেওয়ালের দিকেও মাঝে মাঝে তাকিয়ে, ফের গেলাসে চুমুক দিচ্ছি।

মাংসের ঘুঘনি এনেছিল ছেলেটা। মনে হয়, তা-ই বলেছিলাম হয়তো। খেতে খেতে তিন নম্বর পেগ চলছিল আমাদের। আদা-পেঁয়াজও দিয়েছিল, তা একটু একটু খাচ্ছিলাম— রামে চুমুক দিচ্ছিলাম।

আমার সঙ্গে বাকি যে দুজন ছিল, তারা আমারই মতো সাংবাদিক। এবং আমরা সবাই এক কাগজে কাজ করতাম। বিভিন্ন জায়গায় খেয়ে বেড়াতাম। কোথায় নাকি একটা দারুণ ঠেক রয়েছে, বলছিল একজন, আমি সবে সিগারেটটা ধরিয়েছি, হঠাৎ সামনের দেওয়ালে হেলান দিয়ে যারা বসেছিলেন, তাঁদেরই একজন, হামাগুড়ি দিতে দিতে আমাদের কাছে এসে, আমার থুতনিটা ধরে, প্রচণ্ড জোরেই ঘুরিয়ে দিলেন তাঁর দিকে। তারপর চিৎকার করে উঠলেন, 'শালা

আমি ২০ হাজার টাকা খরচ করে জলছাদটা করলাম যখন, তখন পুরোটা শুনলেন। তারপর এক বর্ষায় যখন তা ধুয়ে গেল, সেটা তো আর শুনলেন না! টাকাটা কি আপনার বাপের?' গোটা ঘর থমথমে। কেউই কিছু বুঝতে পারছে না। যে ছেলেটা মদ দেয়, সে ছুটে এসেছে। আমি পুরো হতবাক! আমার সঙ্গের দুজনও।

নিস্তব্ধতা ভেঙে, ছেলেটা চেঁচিয়ে বলল, 'এটা কী! কী হয়েছে? তুমি এরকম অসভ্যতা করছ কেন?' আমার সঙ্গের একজনও বলল, 'ব্যাপারটা কী? কে আপনি? গায়ে হাত দিলেন কেন?' ততক্ষণে আমি তাঁর বাঁ হাতাটা ধরে একটা ঝটকা দিয়েছি। তাতে তিনি মেঝেতে শুয়ে পড়লেন চিত হয়ে। তাঁর সঙ্গের একজন এসে তাঁকে তুললেন। কিন্তু তখনও জলছাদের ব্যাপারটা খোলসা হয়নি। আমিও বেশ জোরেই চেঁচিয়ে বললাম, জলছাদটা কী মশাই? লোকটা আবার টান হয়ে শুয়ে পড়লেন মেঝেতে। পা ছড়িয়ে দিলেন দুপাশে। তাঁকে তুলেছিলেন যে ভদ্রলোক, তিনিও ছিটকে গেলেন। গোটা ঘরটায় তখন হাসির হুল্লোড় উঠেছে। ছেলেটা ছুটে এসে, ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে সবাইকে চুপ করতে বলে ভিতরে চলে গেল। আমি লোকটাকে বললাম, এই যে মশাই! উঠুন। জলছাদটা কী ব্যাপার বলুন। কী বলছিলেন শুনি। বলুন! দ্বিতীয়বার 'বলুন'টা খুবই চেঁচিয়ে বললাম। লোকটা তখন মিনমিন করে যা যা বললেন, তাতে পূর্বের সেই তেজ আর বিন্দুমাত্র দেখা গেল না। যাই হোক, তাঁর যা বক্তব্য ছিল, তা সংক্ষেপে এই রকম— তিনি যখন তাঁর বন্ধুকে বলছিলেন যে বৃষ্টি হলেই ঘরে জল পড়ে ছাদ থেকে, তখন নাকি আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে সেই কষ্টের সবকথা শুনেছি। তাতে, আমার উপর খুশি হয়েছেন তিনি। এবং তাঁর মনে হয়েছে যে, তাঁর মতো সাধারণ মধ্যবিত্তের, অনেক কষ্টে ২০ হাজার টাকা জোগাড় করে, তবে যে জলছাদ করতে হচ্ছে, যাতে তাঁর ছেলেমেয়েদের, বউয়ের একটু সুবিধা হয়— তা আমি অনুধাবন করতে পারছি। এবং তাতেই তাঁর আরও মনে হয়েছে, এই পৃথিবীতে এখনও 'ভালোলোক' আছে। রাতবিরেতে আর যে বৃষ্টি নামলেই, গায়ে জল পড়ে, ঘুম ভেঙে লাফিয়ে উঠে বাটি গ্লাস বা গামলা নিয়ে বিছানা আর মেঝেতে জলের তলায় পাততে হবে না— এইসবই নাকি আমি মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। তারপর ফের যখন, পরের বর্ষায়ও সেই জলছাদ থেকে জল পড়ে আবার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে, তখন নাকি আমিই আর শুনিনি সেকথা। তাতেই ভদ্রলোকের মনে হয়েছে আমি আসলে 'নিষ্ঠুর'। অতএব, আমাকে শিক্ষা দেবার জন্যই তাঁর এই 'অ্যাকশন'! ঘরভর্তি সকলে তো এই অভিযোগ শুনে হতবাক। আর আমি যে কী বলব, তা ভেবেই পাচ্ছি না। কী অদ্ভুত ঘটনা! লোকটা তখনও মেঝেতেই আধশোয়া অবস্থায়

আছেন। আমি দেখলাম, কথা শেষ করে তিনি চোখের জল মুছছেন। পুরো নেশাটাই কেটে গেল আমার। গোটা ঘরের কেউ আর স্বাভাবিক ছন্দে নেই যেন। আমরাও খানিক পরে উঠে চলে এলাম।

কী আশ্চর্য! আজকে এখন লিখতে লিখতে, মদ খাওয়ার সেইসব বিচিত্র জায়গা-মানুষের আচরণ, কথাবার্তা ভাবতে বসে আমিও যেন সেই শৈশবের বিধানপল্লি কলোনির বাড়িতেই ফিরে গেলাম এক লহমায়। একটা ঘরে আমি, বাবা, মা, দিদি আর ভাই পাঁচজন— একটা চৌকিতে। আমরা ঘুমিয়ে আছি। অনেক রাত। বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। খানিক পরেই আমাদের পাঁচজনের ঘুম ভেঙে গেল। ছাদ থেকে জল পড়ছে আমাদের গায়ে। বিছানা ভিজে যাচ্ছে। অনেক বাটি, গ্লাস এনেও জলপড়া ধরতে পারা যাচ্ছে না। ধীরে ধীরে যেন গোটা ছাদ থেকে জল পড়তে শুরু করেছে। তা আটকানোই যাচ্ছে না। বিছানার উপরে জল পড়ছে। প্রচণ্ড বৃষ্টি। ঘরে পাঁচজন আমরা যেন মাঝ নদীতে ঝড়ের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত!

মদের আসরে সেই লোকটাকে নিয়ে আমরা সবাই হাসাহাসি করছিলাম। আমিও খুব হেসেছি। অথচ, আমার মনেই পড়েনি তখন, ওইরকমই অভিজ্ঞতা ছোটোবেলা থেকে অর্জন করেছি আমিও। এতদিন পরে মদ খাওয়ার অভিজ্ঞতা লিখতে গিয়ে আমিও যেন আটকে গেলাম সেই ছাদ থেকে জল পড়ারই যন্ত্রণায়! কী সব রাত্রি গেছে এক-একটা! সেইসব রাত্রির নিদ্রাহীনতা আমি এখন উপভোগই করি। হ্যাঁ! তা করতে শিখেছি।

মীরাবুড়ি ।। ৪

কালীঘাটে যৌনকর্মীর ছেলেমেয়েদের জন্য একটা স্কুল চলত সেই সময়, আমি তখনও *আজকালেই* রিপোর্টারি করি। একটা এনজিও সেই স্কুল চালাত প্রতিদিন সন্ধ্যায়। মায়েরা খদ্দের বসালেই, তাদের বাচ্চাগুলোকে ঘর থেকে বার করে দিত। ঘরের বাইরে, বন্ধ দরজার পাশে বসে বাচ্চাগুলো খুবই চিৎকার করত। কান্নাকাটি করত। দরজায় ধাক্কা মারত। কেউ অন্যের সঙ্গে মারপিট করত। কেউ 'খারাপ' কাজে জড়িয়ে পড়ত। তাই, বিকেল থেকে সন্ধ্যা হয়ে রাত পর্যন্ত, সেই সব ছেলেমেয়েগুলিকে একসঙ্গে করে, একটা ঘরে বসে গল্প বলা বা পড়ে শোনানো, অন্যান্য কাজে তাদের ব্যস্ত রাখা, এবং পড়াশোনা শেখানো— এই ছিল সেই এনজিওর কাজ। আমি একদিন খবর করতে গিয়ে স্কুলটার খোঁজ পাই। তারপর থেকে মাঝে মাঝেই সেখানে চলে যেতাম। এভাবেই কালীঘাটের 'নিষিদ্ধ-পল্লি'র বাচ্চুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। বাচ্চু ছিল এই যৌনপল্লি'র

কোনও যৌনকর্মীর সন্তান, যে প্রথম এই মহল্লায় মাধ্যমিক পাশ করে। কালীঘাটের এই ‘বেশ্যাপাড়ার ইতিহাসে’ বাচ্চু-ই প্রথম মাধ্যমিক পাশ ‘বেশ্যার ছেলে’। ওর সম্পর্কে আমি এমনটাই শুনেছিলাম আলাপ হওয়ার আগে।

কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, বড়ো বড়ো চোখ, ছিপছিপে চেহারার এক কিশোর, বাচ্চু। আমাকে দাদা বলে ডাকত। ক্রমেই তার সঙ্গে আমার আলাপ গাঢ় হতে হতে পাকাপোক্ত হয়। একদিন বলল, ‘দাদা তোমার বাড়ি যাব। খুব দরকার আছে। কবে ছুটি থাকে তোমার?’ খবরের কাগজের ছুটি খুব ভঙ্গুর প্রকৃতির। যে কোনও সময়েই বাতিল হতে পারে। তাছাড়া কারও কোনও নির্দিষ্ট একটা ছুটির দিনও দীর্ঘকাল থাকে না। তখন আমার সোমবার না বুধবার যেন ছুটি থাকত। বললাম, আসিস। আমি সেসময়, গড়িয়ার কাছে রথতলায় থাকতাম। তখন একদিন সকালে বাচ্চু এল। এসেই বলল, ‘খেতে দাও। খুব খিদে পেয়েছে।’

আমি যে ফ্ল্যাটে থাকতাম, সেটা এনএসসি বোস রোড-এর উপরেই ছিল। ফ্ল্যাটের উলটোদিকেই ফুটপাথে ছিল একটা বড়ো চায়ের দোকান। সেখানে ঘুঘনি-আলুর দম-ডিমকষা-চা আর অবশ্যই, ‘ডিম্পারুটি’ পাওয়া যেত। আমি আর বাচ্চু গিয়ে খেয়ে এলাম। ঘরে এসে মেঝেতে বসে পড়লাম দুজনে। বললাম, ‘বল কী দরকারে এসেছিস?’ বাচ্চু বলতে শুরু করল— ‘শোনো দাদা, আমাকে একটা চিঠি লিখে দাও। আমি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাব। যারা কালীঘাটে তাদের যৌবনটা চার পাঁচটা গলির মধ্যে ছোটো ছোটো খুপরিতে খদ্দের বসিয়ে শেষ করে ফেলল, তারা এখন এই বুড়ি হয়ে গিয়ে কী করবে? খেতে পায় না তো। কালীঘাটে মন্দিরের সামনে বসে বসে ভিক্ষে করে আর জোয়ান মেয়েদের, জলের বালতিতে জল তুলে দেয়। এটা ওটা কিনে এনে দেয়। তাতে কটাই বা পয়সা পায়? কী হয় ওতে? তাতে চলে না। নানা রোগ শরীরে। কী করে বাঁচবে ওরা? রাস্তায় পড়ে পড়ে মরবে। কারও তো কোনও ঘরবাড়ি কিছু নেই। এদের সরকার দেখুক। মাসে মাসে কিছু করে টাকা দিক। যৌবনকালে দেশেরই ছেলেদের তো দিনরাত্রি সেক্স মিটিয়েছে।’

আমি বললাম, তুই যেভাবে বললি, সেভাবেই লিখে দেব? এভাবেই রাষ্ট্রপতিকে পাঠিয়ে দিতে চাস? বাচ্চু বলল, ‘সেটা ঠিক হবে না, তাই না?’ আমি বললাম, তাই তো মনে হয়। তবে তোর কথায় তো কোনও ভুল নেই। বাচ্চু বলল, ‘তাহলে?’ আমি বললাম, যাদের কথা বললি, তারা কজন? বাচ্চু বলল, ‘১০/১৫ জন তো হবেই।’ আমি বললাম, তারা সকলেই কি কালীঘাটে আছে? বাচ্চু বলল, ‘হ্যাঁ। কালীঘাটেই আছে।’ আমি বললাম, তাদের মধ্যে

ভালোভাবে গুছিয়ে কথা বলতে পারবে কে? বাচ্চু বলল, 'মীরাবুড়িমা' আছে। খুব ভালো কথা বলতে পারবে। দেখতে এখনও কী সুন্দর! বুড়িমা আর্ট কলেজের মডেল ছিল, কালীঘাটে এই লাইনে নামার আগে।' আমি বললাম, এখন গেলে দেখা হবে তার সঙ্গে? বাচ্চু বলল, 'এখন যাবে তুমি?' আমি বললাম, হ্যাঁ যাব।

বেলা হয়ে গেছে। আমরা কালীঘাটে যাচ্ছি। বাচ্চু বলল, 'বুড়িমাকে এখন মন্দিরের সামনেই পাব।' বললাম, ওখানেই চল। মন্দিরে দুপুর বেলা কালীর খাওয়া হয়ে গেলে, প্রসাদ দেওয়া হয় ভক্তদের। মীরাবুড়িমার খোঁজে বাচ্চু আমাকে মন্দিরে নিয়ে গেল। ওখানে তখন অনেক মানুষ। ফুটপাথেরই মানুষের লাইন পড়েছে। ঘরের মানুষও আছে। ভিখিরিও আছে। মীরাবুড়িকে দেখা গেল সেখানে হাতে একটা থালায় খিচুড়ি। এক কোণায়, মাটিতে বসে খাচ্ছেন। বাচ্চু তাঁর সামনে গিয়ে বসে বলল, 'খেয়ে নাও। তোমার সঙ্গে কথা আছে।' কিছু না বলে কেবল ঘাড় নাড়লেন বুড়িমা।

অপূর্ব সুন্দরী বাচ্চুর এই মীরাবুড়িমা। খুবই ফর্সা রং তাঁর (দোহাই! আমাকে আবার যেন কেউ ভুল বুঝবেন না! আমি কাউকেই অবজেক্টিফাই করছি না)। টিকোলো নাক। ডানদিকে নাকছাবি আছে। আমি মীরাবুড়িকে দেখতে দেখতে বাচ্চুর কথাটা ভাবছিলাম। সত্যিই তাই। তাই-ই তো, এই বুড়িমা যৌবনকালে দেশের ছেলেদের 'সেক্স মিটিয়েছে'। বুড়িমা যৌবনে যে কেমন ছিলেন, সে প্রমাণ তাঁর সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে এখনও। খাওয়া হয়ে গেলে আমি কথা শুরু করলাম। একটু থেমে থেমে তিনি আমার সব প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন। জানা গেল যা, মোদ্দা কথা এই—

মীরাবুড়ির বয়স এখন ৮১, কিশোরী বয়সেই তিনি কীভাবে যেন 'খারাপ' সঙ্গে পড়ে বাড়ি ছাড়া হয়ে যান। যৌবনের শুরুতে সরকারি আর্ট কলেজের মডেল হয়ে পয়সা আয় করেছেন। তখন থেকেই 'এমন' অনেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সূত্রে, 'অন্য' মেয়েদের সঙ্গে কালীঘাটের 'মাগীবাড়িতে' হঠাৎ-ই এসে পড়েন। সেই থেকেই একটানা ২৫/৩০ বছর 'বেশ্যা' হয়ে খদ্দের 'বসিয়েছেন'। সেই সময় তাঁর নিজের কোনও ঘর ছিল না। শুরুতে মাসির ঘরে, তারই 'আন্ডারে' খাটতেন। তারপর 'বাঁধাবাবু' জুটে যায়। তখন নিজে ঘর ভাড়া করেন। তাঁর সন্তানও হয়েছিল— একটা ছেলে, একটা মেয়ে— কোথায় তারা, জানেন না। বাঁধাবাবু প্রথমে যে ছিল, তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ৫/৬ বছর। তারপর তাঁর মোট আরও তিনজন বাঁধাবাবু হয়। একজনকে তিনিও খুব ভালোবাসতেন। একদিন, সকাল থেকে তারই জন্য অনেক রান্না করে

বসেছিলেন। বাবু দুপুরের পরে এসে সব খাবার খেল। তারপর সন্ধে হতে না হতেই যাব যাব করতে শুরু করল। মীরাবুড়ি তখন খেয়াল করলেন, বাবুর মনটা যেন অন্য জায়গায় পড়ে আছে। মীরাবুড়ি বললেন সে কথা বাবুকে। সে হাসল। কিছু বলল না। তিনি খেয়াল করলেন, বাবু তাকে আজ ছুঁয়েও দেখল না। সেই দিনই যে বাবু চলে গেল, আর আসেনি কোনও দিন। এই 'লাইনে' তাঁর সেই একবারই খুব দুঃখ হয়েছিল। যাকে বলে 'সত্যিকারের দুঃখ'। নইলে, মীরাবুড়ির কথা হল, 'আমরা হলাম ভাতের মতো। তুমি ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হবে না গো। যতদিন এই মাংসের তেজ ছিল, ততদিন এই মাংসের জন্যেই ব্যাটাছেলারা ছুটে ছুটে এসেছে।' তারপর একদিন 'বুড়ি' হয়েছেন তিনি। এখন মীরাবুড়ি। এবং বাচ্চুর মীরাবুড়িমা। বললেন, 'এই পাড়ায়, ব্যাটাছেলেদের সেক্স মাথায় উঠলেই ছুটে আসে। এসেই, যার যত সাধ্য, তেমন কোনও মেয়েকে নিয়েই শুয়ে পড়ে। সেক্স মাথা থেকে নামলে আর এক মিনিটও এখানে থাকে না। আমার ওই বাবুটা এমন ছিল না গো।' আমি চুপ করে তাঁর কথা শুনছিলাম।

এক বাঁধাবাবুর অনেক বই ছিল। মীরা ভাড়া ঘরে থাকতেন তখন। সেই ঘরেই বইগুলো রাখা ছিল। তা অনেকদিনই ছিল। তারপর একদিন বাবুর এক বন্ধু এসে সব বই নিয়ে গেল। বইয়ের মধ্যে একটা রবীন্দ্রনাথের 'মোটা' গানের বইও ছিল। মীরাবুড়ি সেই বই খুব যত্ন করে রাখতেন। সেই বাবুও হঠাৎ আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এভাবেই দিনের পর দিন চলে গেল। মীরা সত্যিই ধীরে ধীরে 'বুড়ি' হয়ে গেলেন। তাঁর কথায়, 'টের পেতে পেতেই শরীরটা যে কোথায় হারিয়ে গেল! এখানে শরীর গেল তো লাইনও গেল তোমার।'

অতএব, মীরাবুড়ির বর্তমান দশা— মন্দিরে ভিক্ষে করা, মন্দিরে ঘুমানো, মন্দিরের প্রসাদ খাওয়া। এর বাইরে আর কোনও জগৎ নেই তাঁর কাছে। বুড়িমা এককালে বেঁচে ছিলেন 'বন্ধ ঘরে খদ্দের বসিয়ে।' আর এখন বেঁচে আছেন, 'খোলা মন্দিরে মায়ের কাছে আশ্রয় নিয়ে।'

আমি বললাম, আপনার কিছু চাইবার নেই? দাবি নেই? বললেন, 'কার কাছেই বা কী চাইব বাবা? যেভাবে আছি, তাতেই বেঁচে থাকলে থাকব, মরে গেলে যাব। আমার নিজের বলতে যে শরীর ছিল, সেটাই তো আমার সঙ্গে থাকল না। কী চাইব? সব চাওয়াই মন্দিরের এই মায়ের কাছে। ও যা দেবে, তাতেই চলবে।' বাচ্চু বলল, 'দাদা তুমি এসব কথা লিখো না যেন।'

মীরাবুড়ি বললেন, 'কী লিখবে বাবা?'

আমি বললাম, আপনার কথা।

মীরাবুড়ি বললেন, ‘কে পড়বে?’

আমি বললাম, দেখা যাক।

বাচ্চু বলল, ‘সব জায়গায় পাঠাব। সবাই পড়বে।’

মীরাবুড়ি বললেন, ‘পড়ে কী হবে?’

বাচ্চু বলল, ‘অনেক কিছু হতেও পারে।’

আমি বললাম, আপনি চান না, লেখা হোক। মীরাবুড়ি বললেন, ‘সেই দিনগুলো কি ফিরবে?’ আমি বললাম, না। ফিরবে না।

বাচ্চু বলল, ‘তবুও তোমাকে নিয়ে দাদা লিখবে।’

তারপর—

দাবি মতো বাচ্চুর মীরাবুড়িমাকে নিয়ে চিঠি লিখে দিলাম। তাতে বাচ্চু সই করল। তলায় লিখে দিল, ‘একজন বেশ্যার ছেলে। কালীঘাট বেশ্যাপল্লির প্রথম মাধ্যমিক পাশ সন্তান।’ তার আগে আমি মীরাবুড়িকে নিয়ে *আজকালে* খবর লিখলাম। রাষ্ট্রপতির কাছে সেই চিঠি পাঠানোর সময় বাচ্চু খবরের কাটিংও সঙ্গে পাঠিয়ে দিল। বাচ্চুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক এরপর থেকেই আরও ঘনিষ্ঠ হল। মাঝে মাঝে ফোন করে খবরও দিত।

দিনিয়ার ঠেক ।। ৫

এক সময় প্রায়দিনই ভবানীপুরের গাঁজাপার্কে দিনিয়ার দেশি মদের যে ঠেক আছে, সেখানেই আমার নিয়মিত যাতায়াত ছিল। বোধহয়, টানা তিন-চার বছর হবে। তখন আমাকে গালিব খুব কষে ধরেছিলেন। তাঁর লেখা সারাক্ষণ বিড়বিড় করতাম। আগ্রায় তাঁর যে বাড়ি ছিল, সেখানেও গিয়েছিলাম। সে এক ইতিহাস। অনেক ঘটনা। অনেক স্মৃতি।

দিনিয়ার ঠেকে সে সময় আমার বেশ পরিচিতিও ছিল। সকাল সকাল চলে যেতাম সাড়ে ১১টা বা বারোটার মধ্যে। সোডা আর একটা বোতল নিয়ে বসতাম। সোডা দিয়ে গ্লাসটা ধুতাম। উড়ে পাড়ার গাড়ির মিস্তিরিরা কেমন করে দেখত আমাকে, তা এখনও মনে পড়ে। তখন সবে *আজকালের* সেই চাকরি ছেড়েছি। একেবারে বেকার। ছোলা মাখা, সেঁকা পাঁপড় এই নিয়ে বসে পড়তাম। বাংলার বোতল সঙ্গে। একটু সোডা দিয়ে, অর্ধেক গ্লাসের মতো বাংলা ঢেলে চুমুক। একটা কামড় পাঁপড়ে। ওহ! কী সুখ! কী স্বাদ!

একটা আমার বয়সী ছেলেও ওই সময়ে আসত। রোজদিন। আমি গেলেই দেখা পেতাম। সে একটা গিটার যেন গলায় ঝুলিয়ে বাজাচ্ছে, এমন শ্যাডো করত। একদিন তাকে বললাম, ওটা কী করছ তুমি? সে বলল, 'আমি বব ডিলান। গান গাইছি।' আমি বললাম, তুমি গান গাও? সে বলল, 'না। আমি গান গাইতে পারি না।' আমি বললাম, তবে কি গিটার বাজাও? সে বলল, 'না। আমি গিটার বাজাতেও জানি না।' আমি বললাম, তবে এই যে বাজাচ্ছ! বলল, 'শ্যাডো করতে গাইতে-বাজাতে জানতে হয় নাকি?' আমি বললাম ঠিক। তা ঠিক। বহুলোক বল করার ভঙ্গি করে দেখি, তারাও তো জীবনে কোনওদিনই খেলেনি। সে বলল, 'হু। এটা একটা প্যাশান।' আমি বললাম, আচ্ছা। সে বলল, 'তোমার সঙ্গে বসব?' বললাম, বসতেই পারো। সে বলল, 'ধন্যবাদ!'

আমি খাচ্ছি। সে-ও খাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর কাঁদতে শুরু করল। আমি বললাম, কী হল? সে বলল, 'আমার বাচ্চা হবে।' আমি বললাম, তা তে কাঁদার কী হল? সে বলল, 'আমি বেকার। বউয়ের চাকরি আছে। সেই মাইনেতে সংসার চলে। বাচ্চাও হচ্ছে তারই পয়সায়। আমার মদের পয়সাও সে-ই দেয়। আমি পুরো বেকার।' তার কান্না আর থামে না। আমি বললাম, নেশাটা পুরো চটকে দিলে। থামো। জল খাও। মাল খাও। সে বলল, 'থ্যাঙ্কস।' আমি বললাম, একটু আগে তো ধন্যবাদ বললে। 'তাই!' বলল সে। হাসল খানিক। তারপর বলল, 'নেশা হলে ইংরেজি বলি।' আমি বললাম ভালো। খুবই ভালো। ইংরেজি বললে মনোবল বাড়ে। লোকজন পাত্তা দেয়। সে বলল, 'তুমি কি বাংলায় কবিতা লেখ?' আমি বললম, না। বলল, 'আমি কবিতা লিখলেও কান্না পায়।' আমি বললাম, আমার এই বিষয়ে কোনও জ্ঞান নেই। আমি কবিতা লিখতে পারি না। চেষ্টাও করি না। সে বলল, 'সে কী! কেন কবিতা লেখ না? আমি লিখি।' আমি বললাম, খুব ভালো। সুখে থাকো।

দুপুর হয়ে গেছে। উড়েপাড়ার গাড়ির মিস্তিরিদের দুই এক জন করে আসছে। ওদের এটা টিফিন টাইম মনে হয়। সবার হাতে একটা করে হাফ। একটু নুন কাগজে। ছোলাও আছে কারও হাতে। একেকজন ছিপি খুলেই ঢক ঢক করে গিলে নিচ্ছে এক-একটা হাফ। তারপর একটু নুন লাগিয়ে নিচ্ছে জিভের ঠিক মাঝখানে, কেউ মুখে ছোলা ফেলছে কটা। তারপর উঠে যাচ্ছে। খানিক পরে কেউ নেই আর। যেন একটা ঝড় বয়ে গেল!

শ্যাডোপ্লেয়ার বিস্ফারিত চোখে ওদের দেখছিল। সবাই চলে যাওয়ার পর বলল, 'দেখলে? শালা! খেলে এভাবেই খেতে হয়। আমাদের কতকিছু তো লাগে। সোডা। ছোলা। জল। অবশ্য তোমার জল লাগছে না। কিন্তু সোডা লাগছে। ওরা পুরা নিট মেরে দিল।' ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই আমি বোতলের বাকিটা গ্লাসে ঢেলে ঢক করেই গিলে নিলাম। তারপর একটু মাখা ছোলা খেয়ে নিলাম। একইরকম বিস্ফারিত চোখে আমার দিকেও চেয়ে রইল শ্যাডোপ্লেয়ার। বলল, 'তুমি তো গুরু ওস্তাদ পুরো! একটুও মুখটা বিকৃত হয়নি দেখলাম। গ্রেট ম্যান!' বলেই গিটার বাজাতে শুরু করল। আমি বললাম, এখন কোন্ গান হচ্ছে? বলল না কিছু, হাসল।

এই ঠেকেই, স্থানীয় কোনও এক থানার এস আই পরিচয় দিয়ে একজন আসত। শ্যাডোপ্লেয়ার তার সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত ছিল। সে-ই একদিন আমাকে বলেছিল এই এস আই-এর কথা। তাকে একদিন আমার টেবিলে নিয়ে এল শ্যাডোপ্লেয়ার। সে বসল। বসেই বলল, 'পুলিশের সঙ্গে ভাব রাখা উচিত এসব জায়গায়।' আমি বললাম, তাহলে তো ভালোই হল। এস আই বলল, আপনাকে দেখেছি এখানে আগেই। আপনি তো মাঝে মাঝেই আসেন দেখি।' আমি বললাম, হ্যাঁ। তা আসি। তবে আজই আপনাকে প্রথম দেখলাম। এস আই বলল, 'হাঁ। আপনি কারও দিকেই তাকান না। মাল খান খুব মন দিয়ে। একদম নিঝুম হয়ে থাকেন। আমি এটা খেয়াল করেছি।' আমি বললাম, নিঝুম হয়ে থাকি হেব্বি বললেন! এস আই বলল, 'সবই আপনাদের দেখে-শুনে শেখা।' শ্যাডোপ্লেয়ার বলল, 'তোমাদের আলাপটাও হেব্বি হল!' এস আই বলল, 'আপনি আমার সঙ্গে ওপরে বসবেন।' আমি বললাম, কী? এস আই বলল, ওপরে একটা ঘর আছে। সেখানে আমি বসি। বিলিতি মাল খাই।' আমি বললাম, ও। এখানে যে বিলিতি পাওয়া যায় জানতাম না তো! এস আই বলল, 'পুলিশের জন্য সব ব্যবস্থা করতে হয়। এই দোকানের মালিক দিনিয়া। ও-ই আমার জন্য সব ব্যবস্থা করে রাখে।' আমি বললাম, খুবই ভালো ব্যাপার। শ্যাডোপ্লেয়ার বলল, 'নইলে তো ও কেস খাবে। ঝামেলা হবে।' এস আই হাসল। বলল না কিছু। আমি বললাম, আজ তো বাংলা নিয়েই বসেছেন দেখছি। এস আই বলল, 'হ্যাঁ। ও দেখতে পেয়ে নিয়ে এল আপনার কাছে। এখানে বিলেতি নিয়ে বসি না। পরদিন আমার সঙ্গে ওপরে খাবেন, ইংলিশ।' আমি বললাম, বেশ।

তারপর থেকে, গাড়ির মিস্তিরিদের অনুপ্রেরণায় 'র' বাংলা খেতে শুরু করলাম। মাঝে মাঝে এস আই ওপরে নিয়ে যেত। এবং শ্যাডোপ্লেয়ারের সঙ্গে

খুব আলাপ জমল। এর মধ্যে অ্যাকাডেমিতে আমদের গ্রুপের একটা প্রদর্শনী শুরু হল ছবির। সবই পেইন্টিং। সে সময় দিনিয়ার ঠেকে বাংলা খেয়ে, হাঁটতে হাঁটতে গ্যালারিতে যেতাম। তখন গরম কাল। দুপুর বেলা। কিন্তু আমার গরম লাগত না। বাংলা খেলে গায়ে রোদ লাগে না মনে হয়। আমার একটা খুব গভীর প্রেম ছিল সে সময়। সে আমার ছবি দেখতে একদিন এসেছে, আমি তখন সবে খেয়ে গেছি দিনিয়ার ঠেক থেকে। সারা গায়ে ঘাম। চোখমুখে জল দিয়ে গ্যালারিতে ঢুকে তাকে দেখলাম। বেরিয়ে যাবারই তাল করছিলাম। কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম। আমার কাজ ছিল নর্থ গ্যালারি আর সামনের গ্যালারিতে। যদিও প্রদর্শনীতে সব গ্যালারি জুড়েই আমাদের কাজ ছিল।

আমার গা দিয়ে এই সময় ভীষণই নাকি বাংলার গন্ধ বের হয়, তাছাড়া খুব নেশাও হয়েছিল সেদিন। তাই পালাচ্ছিলাম। সে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, তোর ছবিগুলো দেখা। কী করেছিস দেখি।' আমি মাথাটা যথাসম্ভব নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। পাঞ্জাবি পরে ছিলাম। সে আমার পাঞ্জাবিটা টেনে বলল, 'চল, ওই দেওয়াল থেকে শুরু কর।' আমি বাধ্য হয়ে দেওয়ালের সামনে, ছবির সামনে নিয়ে গেলাম তাকে। কিছু বলার মতো অবস্থা আমার ছিল না তখন। সে কিছুক্ষণ পরেই চলে গেল। কী শান্তি হল আমার! তবে, আমিও সেদিনের কোনও কথা-ই এরপর আর মনে করতে পরি না। পরের দিনও সে এসেছিল। এসে আমার পাশে দাঁড়াল। ব্যাগ থেকে একটা এনভেলাপ বার করে আমাকে দিয়ে বলল, 'এটা রেখে দে। হারাস না। আমি ছবি দেখি।' বললাম, দেখ।

ছবি দেখে সে চলে গেল। আমিও ওই এনভেলাপ ব্যাগে ভরে আবার চললাম দিনিয়ার ঠেকে। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে মনে হল, রোদ্দুর পুড়িয়ে দিচ্ছে চারদিক। ছায়ায়-ছায়ায় হেঁটে পৌঁছে গেলাম এবং একটা বোতল নিয়ে ঢুকে গেলাম। কোনার দিকে ফাঁকায় বসলাম। গ্লাসে মাল ঢাললাম। সিগারেট ধরিয়ে, এক চুমুকে অর্ধেক গ্লাস খালি করে, ব্যাগ থেকে সে যে এনভেলাপ দিয়ে গেল, সেটা বার করলাম। খুলে একটা লেখা পেলাম। পড়তে শুরু করলাম— 'মনের শরীর খুঁজতে যাবি যখন, আমাকেও সঙ্গে নিস। অনেক কাল আমিও তার খোঁজে, নতুন করে তুই মনে করিয়ে দিলি।'

এই পর্যন্ত পড়েছি সবে, শ্যাডোপ্লেয়ার হাজির হল। আমার মুখোমুখি বসে বলল, 'আবার ফিরে এলে যে! গ্যালারিতে যাওনি?' আমি বললাম, হ্যাঁ ফিরে এলাম আবার। ও বলল, 'তুমি আবার খাচ্ছো?' বললাম, হ্যাঁ। তাই তো এলাম। বলল, 'হাতে ওটা কী? কবিতা?' বললাম, হ্যাঁ। বলল, 'পড়ো না শুনি।' আমি বললাম, আমার লেখা না। বলল, 'যার-ই হোক। কবিতা তো!' বললাম,

হ্যাঁ। গিটারের তারে দ্রুত আঙুল চালাবার ভঙ্গিতে ও বলল, 'পড়া শুরু করো ওস্তাদ!' আমি পড়তে শুরু করলাম—

ওই ঠাঠা দুপুরে কেমন মাতাল হতে পেরেছিল!

একেবারে অকপট মাতাল।

তোদের ছবির প্রদর্শনী হচ্ছে।

অতবড় ঘরটাতে শুধু তুই আর আমি।

চারপাশে সারসার ছবি। রং-স্বপ্ন-বিশ্বাস।

ঘামের সঙ্গে মদের গন্ধ আর পেটের ওপরে ফুটো পাঞ্জাবি। তুই আমার এক হাতের মধ্যেই, অথচ—

কী অদ্ভুতভাবে ওই বিশাল ঘরটাতে, ঘরটার থেকে ক্রমশ বড়ো হতে হতে, হতে হতে—

আমি কিছুতেই তোকে পাচ্ছি না।

ব্যালেরিনার মতো মিহি দুটো হাতে ধরতে চেয়ে আকুল।

আমি তোকে হিংসে করি।

সত্যিকারের কষ্ট, নিটোল আনন্দ বা দুঃখ সত্যিকারের কবে শেষ পেয়েছিলাম?

আমার মনে নেই।

ভেতরটা বড্ড শুকিয়ে গেছে।

পাহাড়ের চূড়ার বারিশওয়ালার আদলটা ধীরে ধীর স্পষ্ট হচ্ছে। হয়ে উঠছে।

ওরা সবাই ছড়া কেটে কথা বলত, আমায়

ছড়া শেখাবি না?

অনেক ভেসেছি। ডানা খুলে, ডানা মুড়ে,

দুভাঁজ করে—

নিরাপদ আশ্রয় তার নিরাপত্তা হারাচ্ছে,

পাহাড়ের ঢল বেয়ে গড়িয়ে পড়া পাথরের দ্রুততায়।

এবার গায়ে গতরে ভালোবাসার দিন।

তোর নরম পেটের কাছে, হাড়গোড়হীন কুণ্ডলী পাকিয়ে, লতিয়ে, ঘাড় গুঁজে বসতে দিস।

কোনও কথা বলিস না। আমিও বলব না।

ঝুরঝুরে বরফ কুচিকে দুহাতের মুঠোয় একটু চেপে ধরলে যেমন শক্ত জমাট তুষার গোলক হয়;

সময় তেমন মৃদু আলতো হাতে চাপ দেবে, তুই আর আমি গলতে গলতে, গুঁড়িয়ে গোলক হব।

বাঁধনকে তোর সব থেকে ভয়। আমারও। তবে,

কীসের টানে আবার ফিরে ফিরে দেখা?

ফিরে ফিরে ডাকা?

পড়া শেষ করে আমি খামটা হাতেই বসে রইলাম। সব ভাবনা লোপ পেয়েছে তখন। শ্যাডোপ্লেয়ারও চুপ। কারও কোনও কথা নেই যেন। চুপচাপ দুই মাতাল মুখোমুখি বসে। খানিকক্ষণ বসেছিলাম ওভাবেই। নিস্তব্ধতা ভেঙে শ্যাডোপ্লেয়ার বলল, 'এ কী লেখা পড়লে ওস্তাদ!' বাইরে প্রচণ্ড একটা শব্দ হল। তারপর আর-একটা। দোকানের লোকেরা এসে বলল, 'বাইরে যাবে না। বোম পড়ছে।' ছুটোছুটির আওয়াজ, চিৎকার শুনছি। শ্যাডোপ্লেয়ার বাইরের দিকে গেল। কিছু পরে ফিরে এসে বলল, 'মার্ডার হয়েছে একটা। গেট বন্ধ করে দিয়েছে। গোলমাল হচ্ছে। পুলিশ আসছে।' আমি বললাম, আমি যেটা পড়ে শোনালাম, মন দিয়ে শুনেছ? শ্যাডোপ্লেয়ার অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মার্ডার হয়েছে! গেটের সামনেই প্রায়।' আমি বললাম, কী মনে হল শুনে? এটা কি একটা প্রেমপত্র? কোনও কথা বলল না ও। বসে রইলাম। সন্ধে পর্যন্ত বসেই রইলাম। একসময় দিনিয়ার লোকজন এসে বলল, এবার যাওয়া যাবে।

জল খসা।। ৬

আমি মধ্যবিত্ত বাঙালি। যে রকম পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধে বেড়ে উঠেছি, তার সঙ্গে এই 'মাগীবাড়ি'র কোনও তুলনাই চলে না। এখানে এসে আমি মেয়েদের মুখেই 'মাগীবাড়ি' এবং 'মাগী'— শব্দগুলো শুনেছি অবলীলায়। আমার প্রথম প্রথম খুবই অসুবিধে হত। তারপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আমাদের বাড়ির মেয়েরা আর এইসব 'মাগীবাড়ি'র মেয়েদের মধ্যে যে আসমান-জমিন ফারাক রয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে, এখানকার মেয়েদের ছলা-কলা-কৌশল-কপটতা আর মুখোশের আড়ালে যে মনটা লুকানো থাকে, তার সন্ধান যদি পাওয়া যায়— সে এক গভীরতম কূলকিনারাহীন অথৈ সাগর যেন! সেই মনের অল্প একটু সান্নিধ্য পাওয়াও, এক পরম পাওয়া। আমি খানিকটা পেয়েছি।

কালীঘাট-হাড়কাটা-সোনাগাছি-ওয়াটগঞ্জ-চেতলা, এইসব 'মাগীবাড়ি'-তে খুবই অনায়াস ছিল আমার যাতায়াত। অনেক মেয়ের সঙ্গেই আলাপ হয়েছে। কত যে মিথ্যে বানানো গল্প শুনেছি তার কোনও সীমা নেই। আবার কিছু কিছু এমন সত্যি ঘটনার কথাও শুনেছি বা সাক্ষী থেকেছি, যা আমাদের সাধারণ জীবনযাপনে কোনও হিসেবের মধ্যেই আসবে না। আজ অনেক বছর পর, এক-একটা ঘটনা যেন চোখের সামনে ঝুপ ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ছে। আমার দৈনন্দিনতায় সব চাপা পড়েছিল। সুসভ্য-সুভদ্র-সংস্কৃতিবান জীবনযাপন আমাদের। সেখানে এইসব কাহিনির প্রবেশাধিকার থাকে না। সামাজিক জীবন,

সাংসারিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন—কত রকমের জীবনযাপন আমাদের! সত্যি-মিথ্যার একটা সতর্ক জীবনযাপন! কোনও ফাঁক গলে কোনওটা যেন সামনে চলে না আসে, সদাই তার আবডালের ব্যবস্থা পাকা করার প্রচেষ্টা আমাদের। আমরা একে মধ্যবিত্ত, তায় ভদ্রলোক! ফলে খুবই সাবধানে থাকতে হয়। তারপর রয়েছে, যেমন আমার ক্ষেত্রে ছিল, 'অ্যান্টি-প্রতিষ্ঠান' এক জ্যাঠামশাই। 'সাহিত্যলাইনে' খুবই বেশি সংখ্যায় এঁরা বিদ্যমান। এইরকম এক পিসকে *আজকালে* কাজ করার সময় কবছর খুব কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিলাম। সারাক্ষণ জীবন নিয়ে কী ভীষণ সব জ্ঞান দিতেন! সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকতাম। কারণ *আজকালে* আমার প্রথম রিপোর্টারি করতে আসা এক অখ্যাত কলোনি থেকে। সংবাদপত্র, কোনও সাহিত্যের আড্ডা কিংবা অ্যান্টি-প্রতিষ্ঠান কোনও লেখক— এসব কল্পনাতেও ছিল না। ফলে তখন বেশ আড়ষ্ট থাকতাম। এরই মধ্যে এক রবিবারের পাতায় 'পতিতা' শব্দটা, এই পেশাটা নিয়ে, একটা বড়ো লেখা লিখেছিলাম। মনে আছে, শিরোনাম হয়েছিল, 'ওরা কবে সূর্যমুখী হবে?' ওদের কাছে যারা যায়, তাদের কি আমরা 'পতিত' বলি? এই যে পতিতাদের উদ্ধার করার নানান কাহিনি বাংলা সাহিত্যে পড়ি আমরা, কে কাকে উদ্ধার করে? কী অধিকার তার উদ্ধার করার? পতিতদের উদ্ধারের ব্যবস্থা নেই? এই রকম কিছু প্রশ্নের ফাঁকে ফাঁকে 'বেশ্যাদের জীবনের' টুকরো কিছু কিছু কথা তাতে লিখেছিলাম। কোনও সাহিত্য পড়ে লিখিনি। সবই ছিল আমার দেখা, চাক্ষুষ করার ভিত্তিতে লেখা। সেই 'অ্যান্টি-প্রতিষ্ঠান' জ্যাঠামশাই সবার সামনে আমাকে বলেছিলেন, 'কৃষ্ণপ্রিয়, তুমি কি মাগীদের পাড়ায় সন্ধে দিতে যাও নাকি!' প্রথমে চুপ করেই ছিলাম। পরে আবার তিনি একই প্রশ্ন করলেন। সে সময় বলেছিলাম, মাগীদের সায়ার দড়িতে কটা গিঁট আছে গুনতে যাই। যাবেন নাকি আমার সঙ্গে একদিন। এই উত্তর শোনার পর বাংলাসাহিত্যের জ্যাঠামশাই কেমন যেন দাঁত বার করে ক্যালানের মতো হাঁটতে হাঁটতে এডিটরের ঘরে চলে গেলেন। দেখে মনে হচ্ছিল, 'একশিরা' হয়েছে।

আজকালে আমার সহকর্মী মধুমিতা দত্ত আমাকে নিয়ে গিয়ে ডা. স্মরজিৎ জানার সঙ্গে একদিন আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। 'অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অব হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেল্‌থ'-এ কর্মরত ছিলেন তখন স্মরজিৎদা। তিনি সোনাগাছির 'যৌনকর্মী'দের নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছেন তখন। আমার সঙ্গে পরিচয় হয় ১৯৮৯/৯০ সাল নাগাদ। অনেক খবর লিখেছি আমি সেই সময়। স্মরজিৎদা সোনাগাছির মেয়েদের নিয়ে তখন খুবই গুরুত্বপুর্ণ একটা কাজ করছিলেন। তা হল, খদ্দেরদের মধ্যে কন্ডোমের ব্যবহার বাধ্যতামূলক

করা। এইজন্য প্রায় প্রত্যেকদিনই আলোচনা, বৈঠক, সভা করছেন, মেয়েদের মধ্যে বিষয়টার গুরুত্ব বোঝাবার জন্য। লাগাতার প্রচারের কাজ করছেন তিনি তখন। এবং এইজন্য তিনি প্রথমেই তিনটে সমীক্ষা করেন সোনাগাছি জুড়ে, মেয়েদের, খদ্দেরদের, এবং দালালদের ওপর সেই সমীক্ষা হয়েছিল। সোনাগাছির পুরো ব্যবসা টিকে আছে মেয়েদের সুস্থতার ওপর। তাদের যদি প্রাণঘাতী এডস রোগ হয়, তবে যে কেউ-ই পার পাবে না তা বোঝাতেই সমীক্ষাগুলো খুবই কার্যকরী ভূমিকা নেয়। দালালদের বলা হয়, খদ্দেররা কন্ডোম না পরলে দুতরফেরই রোগের সম্ভাবনা। মেয়েরা যদি আক্রান্ত হয়, তাহলে যে কেবল দোকান-ব্যবসা— সব বিপন্ন হবে, তা-ই নয়, দালালের পেটেও লাথি পড়বে। সেই সব সমীক্ষার দিনগুলোতে আমিও মাঝে মাঝেই স্মরজিৎদার কাছে চলে যেতাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত সহজ করে বিষয়টা বুঝিয়ে দিতেন। ক্রমেই তাঁর সঙ্গে আমার একটা সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। নতুন কিছু হলেই আমাকে ডাকতেন। খবর দিতেন। সোনাগাছির মেয়েদের মধ্যে কন্ডোম প্রোমোশন প্রোগ্রাম এটাই জনপ্রিয় হয় যে, হুর (WHO) প্রতিনিধিরাও দেখতে আসেন সোনাগাছিতে সেই কাজ।

একদিন মেয়েদের মধ্যে কন্ডোম বিলির একটা সভায় আমিও ছিলাম। মেয়েদেরই বলতে বলা হয়েছিল, কে কী ভাবছে, অর্থাৎ কীভাবে বাধ্য করা যায় খদ্দেরদের কন্ডোমের ব্যবহার করতে, তা নিয়ে বলুক। আমার এখনও মনে আছে একটা মেয়ের কথা। সে বলল, 'আমার একটা বুদ্ধি আছে, বলব?' স্মরজিৎদা বলতে বললেন তাকে। সেই মেয়ে তারপর যা বলল, তেমন কথা শুনতে পারা একটা চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা। সে বলল, 'খদ্দেরকে আমি বলব, একবার কন্ডোম পরে কাজ করলে, পরেরবার বিনে পয়সায় বসতে দেব।' বাকি প্রায় সব মেয়েরা একথা শুনে হাঁইহাঁই করে উঠল। 'কী বলে, বিনে পয়সায় বসবে! না না। হবে না।' তখন সেই মেয়ে বলল, একবার করা হয়ে গেলে, খদ্দের উঠে চলে যায়। কেউ থাকে না। আর আবার তার ইচ্ছে হতে চল্লিশ মিনিট, একঘণ্টা লাগে। ততক্ষণ কে থাকবে?' বাকিদের মধ্যে তখন বেশ নড়াচড়াই শুরু হল। কেউ কেউ বলল, 'হ্যাঁ, এটা ঠিক কথা।' আমি তখন বিস্ফারিত চোখে মনে হয়, মেয়েটার দিকে চেয়ে ছিলাম। স্মরজিৎদা আমায় বললেন, 'শুনলে কথাটা!' আমি বললাম, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা। এখানে না এলে কোথায় আর শুনতে পেতাম! কী মূল্যবান অভিজ্ঞতা। ওই দিনই সেই মেয়ে আর-একটা শব্দও ব্যবহার করেছিল, যা আমি এর আগে অন্য কোথাও শুনিনি। সে যখন বলছিল, প্রথমবার কন্ডোম পরার কথা, তখনই সে 'ইজাকিউলেশন' অর্থে যে

পরিভাষাটা ব্যবহার করল তা হল, 'জল খসা'! একবার তা হয়ে গেলে পরের বার 'জল' জমতে অনেক সময় লাগে— একথাই সে বলেছিল। আমি সেই শব্দবন্ধ শুনে হতবাক। এসব শব্দ অনেক ঘাম-রক্ত-মুরোদ-আমোদ ছেঁচে তবে তৈরি হয়। ঘরে বসে, ভেবে ভেবে, আবিষ্কৃত কোনও শব্দ নয় এসব।

'জল খসা' আমি আরও একবার শুনেছি এরপর। বলেছিল যে মেয়ে, তাকে আমি 'লালশাড়ি' বলে ডাকতাম। সেই মেয়ে ছিল এক 'হলবেশ্যা'। এই শব্দবন্ধ আমি আল মাহমুদের 'জলবেশ্যা' গল্পটা পড়ে লালশাড়ির উপর কায়েম করেছি। সবসময় একটা লাল রঙের সস্তার সিন্থেটিক শাড়ি, একটা লাল স্লিভলেস ব্লাউজ পরে থাকত মেয়েটা। সেই সময় মিনার্ভা সিনেমার নামটা পালটে 'চ্যাপলিন' হয়েছে। আমি তখন 'কর্পোরেশন বিট' করতাম মাঝে মাঝে। রিপোর্টারদের দৈনিক অ্যাসাইনমেন্ট হল বিট। এক-একজনের এক-এক 'বিট' হত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। কারও আবার ফিক্সড বিটও ছিল। সেই সময় *যুগান্তর*-এর বর্ষীয়ান সাংবাদিক ললিতদা, ললিত ভড়ের ফিক্সড বিট ছিল কর্পোরেশন। তিনি ছিলেন নিজেই একটা 'কর্পোরেশন ডাইরেক্টরি'। সবখবর থাকত তাঁর কাছে। ফলে, কর্পোরেশন বিট থাকলে আমার খুবই আনন্দ হত। দুপুরে প্রথমে গিয়ে নিজামের আলু রোল খেতাম। অপূর্ব! তারপর কাউন্সিলর ক্লাবের ঠান্ডা ঘরে বসে ললিতদার কাছ থেকে, যদি কোনও খবর থাকে, তা নোট করে নিয়ে আমার কাজ শেষ। তখন উলটো দিকে চ্যাপলিনের সামনে চলে যেতাম লালশাড়ির খোঁজে।

একদিন দেখেছিলাম একটা ছেলের সঙ্গে তার খুব মারামারি হচ্ছে। দুজনেই দুজনকে অশ্রাব্য গালি দিচ্ছে হিন্দিতে। লালশাড়ির চুল ধরে টেনে, তাকে রাস্তায় ফেলে মারছিল ছেলেটা। আমি ছুটে গিয়ে ছেলেটাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, এর গায়ে হাত দিবি না। ছেলেটা দুবার চেষ্টা করেছিল। তার হাতটা ধরে টেনে সরিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, যা এখান থেকে। লালশাড়ি তখন রাস্তা থেকে উঠে তার অবিন্যস্ত শাড়ি ঠিক করছে। ঠোঁটের কোনায় রক্ত। আমি বলেছিলাম, মুখটা মুছে নে। সে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল খানিকক্ষণ। তারপর চ্যাপলিনের সিঁড়িতে বসে কাঁদতে শুরু করেছিল। আমিও গিয়ে তার পাশে বসেছিলাম। সামনেই আনারস কেটে বিক্রি হচ্ছিল। তাকে বলেছিলাম, আনারস খাবি? হঠাৎ চিৎকার করে উঠেছিল লালশাড়ি। হিন্দিতে বলেছিল, 'ফোট!' আমি হেসে বলেছিলাম, তোকে মারল কেন বলবি? আনারস খাবি? শাড়ি দিয়ে মুখটা মুছে তারপর হেসে উঠেছিল সে-ও। আমি দুজনের জন্য আনারস কিনে ওর হাতে একটা শালপাতার বাটি ধরিয়ে, একটা নিজে নিয়ে

খেতে শুরু করেছিলাম। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়েছিল লালশাড়ি। তারপর বলেছিল, ছেলেটা ব্ল্যাকার। ওর কাছে লালশাড়ি ১০ টাকা পায়। টাকাটা চেয়েছিল বলেই সে মারছিল ওকে। ওই ছেলেটার সঙ্গে লালশাড়ি মাঝে মাঝে ‘শোয়’। ফলে ছেলেটা ওকে কিছু টাকা দেয়। খাওয়ায়। টিকিট তুলেও লালশাড়ির কাছে জমা রাখে। আগে যখন মিনার্ভা ছিল, তখন ‘ম্যাড্রাসি বই’ আসত হলে। তার মধ্যে ‘বুলু’ ঢোকানো থাকে, তখন টিকিট ব্ল্যাক হত বেশি দামে। যবে থেকে ‘মিনার্ভা’ উঠে ‘চ্যাপলিন’ হয়েছে, তবে থেকে ওইসব বই আর আসে না। তাতেই ব্ল্যাকের বাজার খারাপ। এই থেকেই রোজ অশান্তি। মারামারি। তাছাড়া, তারও নাকি বাজার ভালো যাচ্ছে না।— এইসব কথা সেদিন বলেছিল। আমি বলেছিলাম, তোর এখানে কীসের বাজার? সেই থেকে আমার সঙ্গে লালশাড়ির আলাপ। সেই দিন বাজার কীসের, তা বলেনি। ক্রমে আলাপটা এতই গাঢ় হয়েছিল যে, ভালো খাবার কিনলে বা কোথাও পেলে আমার জন্য রেখেও দিত। হলের সামনের সিঁড়িতে বসে তার সঙ্গে আমি অনেকদিন অনেকক্ষণ ধরে গল্প করতাম। লোকজন নাকি সেটা ভালো চোখে দেখে না, বলেছিল শালশাড়ি। সে তো ‘বেশ্যা’ সবাই জানে, তাই আমি যে তার পাশে বসে গল্প করি এটা নাকি ঠিক না। এমনটা একদিন সে বলায়, আমি তাকে বলেছিলাম, ঠিক আছে, তোর সঙ্গে আর কথা বলব না তবে। শুনে কী চিৎকার! সেদিন সে আমায় বলেছিল, ‘তোমার দিকে কেউ তাকালে তার চোখ গেলে দেব।’ বলতে বলতে দুটো আঙুল আমার চোখের দিকে এনে কী হাসি!

আমি একদিন তাকে বলেছিলাম, সিনেমা হলে কী কাজ করিস তুই? কীভাবে করিস বল তো। শুনে সে বলেছিল, ‘না। তোমাকে বলতে লজ্জা করবে।’ আমি তার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম এই কথাটা শুনে। এখন লিখতে বসে ভাবছিলাম, এই একটা লাইন, ‘তোমাকে বলতে লজ্জা করবে’— রীতিমতো ফেনিয়ে ফেনিয়ে ‘সামাজিক দলিল’ রচনা করা যাবে একটা। গল্প-উপন্যাস লেখেন যাঁরা তাঁদের হাতে পড়লে ব্যাখ্যার চোটে সর্বাঙ্গের কাপড়-চোপড় হলুদ হয়ে যাবে। কথাটা শোনার পর সেদিনও আমি লালশাড়িকে কিছু বলিনি, আজও কোনও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করব না। শুধু আমি তাকে বলেছিলাম, যেটা তোর করতে লজ্জা করে না, সেটা আমাকে বলতে লজ্জা করবে কেন? শুনে সে বলেছিল, ‘ওরা আর তুমি এক হলে?’ আমি বলেছিলাম আমি আলাদা কীসে? লালশাড়ি আমার ডান হাতটা ধরে বলেছিল, ‘তুমি আমার আপনার লোক।’ আমি বলেছিলাম, আচ্ছা বেশ। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে, বলতে শুরু করেছিল, হলে সে কী করে।

কম বয়সী আর বেশি বয়সী ব্যাটাছেলেরাই তার 'টার্গেট'। হলের সামনে, এই রকম বয়সীদের দিকে তাকিয়ে, তাদের চোখে চোখ রেখে, ঘন ঘন বুক থেকে শাড়ির আঁচলটা সরিয়ে, সে টার্গেটকে 'মাই' দেখায়। আর চোখের ইশারায় কাউন্টারের সামনে আসতে বলে। এই রকম খানিকক্ষণ করার পর একটা না একটা 'মাল' ওঠে। 'ভেড়ুয়া'র মতোই তারা কাউন্টারের সামনে আসে। লালশাড়ি কাছে চলে গিয়ে বলে, 'টাকাটা দিয়ে দাও।' বলেই সে কাউন্টারে বলে, সাইড দেখে দুটো। 'ভেড়ুয়া' টাকা কাউন্টারে দিলেই টিকিট দুটো লালশাড়ি ছোঁ মেরে নিয়ে নেয় কাউন্টার থেকে। তারপর 'ভেড়ুয়া'কে নিয়ে হলে ঢুকে যায়। দেওয়ালের পাশের সিটে বসেই, প্যান্টের জিপার খুলে আঙুল ভরে দেয় ভিতরে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই, 'মালটা'র উপর পুরো কন্ট্রোল নিয়ে নেয় সে। 'যার যেমন দম, কেউ অল্প হলেই, কেউ আবার একটুখানি সময় পর, জল খসিয়ে ফেলে।' আর এই অবস্থায় লালশাড়ি তাকে বলতে থাকে, যা আছে পকেটে বার করে দিতে, নইলে সে চেঁচাবে। 'খদ্দের' ভয়ে ভয়ে বার করে দেয়, তারপর তার জামা-প্যান্টের পকেটেও হাত ঢুকিয়ে যা পায় সব নিয়ে, হল থেকে বেরিয়ে যায় সে। এই হল তার কাজ। সে 'হলবেশ্যা'। আমি তাকে বলেছিলাম, তুই জানিস আল মাহমুদের একটা গল্পের নাম 'জলবেশ্যা'। শুনে আমার দিকে চেয়ে হেসে বলেছিল, 'এই সব তুমি কী বলো?'

তো এই হল 'জল খসা' শব্দটা আরেকবার শোনার অভিজ্ঞতা।

কুঁচো ।। ৭

কুঁচোর কথা খুব মনে পড়ে। ও আমাদের পাড়ায় রিক্সা চালাত। বয়স ছিল তখন ২৫/২৬ বছর। সারাদিন বাংলা খেয়ে থাকত। মাঝেমাঝেই আমার কাছে টাকা চাইত। অনেক গালাগালি দিতাম। চুপ করে থাকত। তারপর জড়িয়ে ধরত। আমি তখন রথতলার একটা ফ্ল্যাটের পাঁচ তলায় থাকতাম। ফ্ল্যাটের উলটোদিকেই আদিগঙ্গা। তারই ওপারে বিধানপল্লি কলোনিতে ছিল আমার মায়ের বাড়ি। কুঁচোর বাড়িও ওইখানেই। আমি বড়ো হয়েছি ওই কলোনিতেই।

যে ব্রিজ টপকে এপার ওপার করতে হত, সেই ব্রিজের এপারে, এনএসসি বোস রোডে ছিল রিক্সা স্ট্যান্ড, বাস রাস্তার গায়ে। সামনেই ছিল বান্টি সিনেমা। তারই নামে আদিগঙ্গার উপরের ব্রিজের পরিচিতি ছিল— সবাই বলত, বান্টি ব্রিজ। আমার ফ্ল্যাটটা ছিল রিক্সা স্ট্যান্ডের ৩০ মিটারের মধ্যে। এই জায়গাটা, ব্রিজ, এখন অন্যরকম হয়ে গেছে। বান্টি সিনেমা হলও বন্ধ হয়ে গেছে।

একদিন সকালে, আমি বেরচ্ছিলাম, কুঁচো এসে বলল, 'দাদা এটা দিদা পাঠিয়েছে।' আমার মাকে ও দিদা বলত। ওর হাত দিয়ে মাঝেমাঝে আমাকে

খাবার পাঠাত মা। আমি বললাম, তোকে ভাড়া দিয়ে দিয়েছে তো? কুঁচো বলল, ‘হ্যাঁ দিয়েছে। তুমিও দাও। আজ খাব।’ বললাম, তুই কোনদিন খাস না? স্বভাবসিদ্ধ ভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরল। বললাম, ছাড়। ওইভাবেই বলতে লাগল, ‘দাও। দাও। দাদা।’ আমি টাকা দিলাম। বললাম, কম খা। ও বলল, ‘তোমার ছুটি কবে?’ আমি বললাম, কেন? কুঁচো বলল, ‘তোমাকে খাওয়াব।’ আমি বললাম, কী খাওয়াবি? বলল, ‘বাংলা। পয়সা আমিই দেব। সান্টুর ঠেকে নিয়ে যাব।’ আমি বললাম, আচ্ছা। যাব। কুঁচো খুশি হয়ে চলে গেল। আমিও অফিসে গেলাম।

এরই কদিন পরে, সকালে এসে বলল, ‘আজ তো বুধবার। তুমি বলেছিলে বুধবার তোমার ছুটি থাকে অফিস। আজকে তোমাকে নিয়ে যাব।’ বললাম, কখন? কুঁচো বলল, ‘আর কটা ভাড়া মেরেই চলে আসছি, একঘণ্টা পরে। তুমি থেকো। তোমার সঙ্গে খাব আজকে।’

কুঁচোর সঙ্গে ‘সান্টুর ঠেকে’ এসেছি। সবাই তাকে সান্টুদা বলেই ডাকে। বিধানপল্লি কলোনির প্রান্তে ঊষা কোম্পানির পাঁচিলের গায়ে তার বাড়ি। খুবই গম্ভীর লোক। হাসে না। কংগ্রেস আমলে নামডাক ছিল। সবাই ভয় পেত তাকে।

ঊষা ফ্যান কোম্পানি ছিল বিধানপল্লির লাগোয়া। কলোনি আর কারখানার মাঝখানে ছিল ঊষার মাঠ। এই মাঠের এক পাশে স্কুল আর আর-এক পাশে বিরাট জঙ্গল ছিল। সেখানে অনেক বড়ো বড়ো গাছ ছিল। কারখানা বন্ধ বহুদিন। ফলে গোটা এলাকা ফাঁকা। তারই মধ্যে ওই জঙ্গলে ইট পেতে, মাটিতে বসে বাংলা আর চোলাই খাওয়ার ঠেক। কুঁচোর সঙ্গে আমি এসেছি এই ঠেকেই। ও বলল, ‘দাদা বসে যাও।’ এখন দুপুর।

দুটো বাংলার বোতল নিয়ে কুঁচোও বসল আমার পাশে। ও আমাকে একটা ছোলাভাজার প্যাকেট দিল। আমি বললাম, হিসেব রাখ। তোর সব টাকা বাড়ি যাবার সময় দিয়ে দেব। কুঁচো বলল, ‘আমি তোমাকে খাওয়াচ্ছি দাদা।’ আমি বললাম, খাচ্ছি তো। ও বলল, ‘দাম আমিই দেব।’ বললাম খা। ও বলল, ‘তোমার এই রকম ল্যাটকা মেরে বসতে কি কষ্ট হচ্ছে?’ আমি বললাম, না।

একটা বড়ো গাছের তলায় অনেকগুলি ব্যাগের মধ্যে বাংলার বোতল আর চোলাই রাখা রয়েছে। প্লাস্টিকের গ্লাস আছে। আর কিছু নেই। জলের বালাই নেই। যারা এখানে বসে খাচ্ছে সকলেই রিক্সাচালক, মিস্তিরি, মজুর। আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছিলাম, কুঁচো তা খেয়াল করে বলল, ‘দাদা তুমি একা ভদ্দরলোক। আর সবাই আমার মতো।’ বললাম, আমি ভদ্রলোক কে

বলল তোকে শুনি। কুঁচো বলল, 'আমি জানি।' বললাম, আচ্ছা। আর তুই কী? শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। বললাম, বল তুই কী? আমার বাঁ হাতটা নিয়ে ওর মাথায় রেখে বলল, 'আমি ছোটোলোক।' বললাম, আমি যা, তুইও তাই। কুঁচো বলল, তুমি কী? বললাম, তুই বললি তো। বলল, 'ভদ্দরলোক'! আমি পা দুটো সামনে টান করে দিলাম। গাছপালার মধ্যে একটু ফাঁকা জায়গায় এই ঠেক। অনেকে এমনি মাটিতেই বসেছে। জনা কুড়ি লোক আছে এখন। দু-তিনজন করে এক-একটা দল। সব লোকই মাটিতে বসে আছে। ফাঁকা জায়গায় যেন একটা বৃত্ত তৈরি হয়েছে। মাথার উপরে খোলা আকাশ এই ঠেকের ছাদ। চারদিকের গাছপালা যেন এই ঠেকের দেওয়াল। খুব ধীরে ধীরে বাতাস বইছে। বোতলের প্রায় শেষ পর্যন্ত খাওয়া হয়েছে তখন। একটু ঝিম লেগেছে শরীরে। ছোলাও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কুঁচো বলল, 'দাদা বাদাম নিয়ে আসব?' আমি বললাম, কোথায় পাবি? ও বলল, 'দাঁড়াও সান্টুদাকে জিজ্ঞেস করি, ওর কাছে থাকে মাঝে মাঝে।' ও উঠে গেল। আমি একটা সিগারেট ধরালাম।

আমি বসেছি একটা গোটা ইটের উপর। পা দুটো সামনে ছড়িয়ে দিয়েছি আবার মাঝেমাঝে আসন করে বসছি। বসাটা ঠিক জমছে না। নেশা চড়লে অবশ্য আর কষ্ট হবে না। এখানে সবাই আমাকেই দেখছে। আমি 'ভদ্দরলোক'। শালা, আমার একটা ভালো উপাধি জুটেছে, 'ভদ্দরলোক'! কুঁচোকে ওই পাশে দেখছি সান্টুদার সঙ্গে কথা বলছে। আমার দিকে তাকিয়ে হাত তুলে অপেক্ষা করতে বলে, ও কোথায় চলে গেল যেন। আমি কাঁচা কাঁচা বাংলা খাচ্ছি। সান্টুদা কয়েক টুকরো পেয়ারা আমার হাতে দিল, কাছে এসে। বলল, 'এটা খাও। এনেছিলাম।' ধন্যবাদ জানিয়ে পেয়ারাটা নিলাম। সে চলে গেল নিজের জায়গায়। আমি 'ভদ্দরলোক' বলে আমায় দিল ঠেকের মালিক। আমি এবার সকলের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে শুরু করলাম। আমার পাশের দলটায় তিনজন আছে। তারা রাজমিস্ত্রির কাছে কাজ করে। সবাই দিনমজুর। আজকে কাজ এক বেলার ছিল, সকালে। তারপর দুপুরে সবাই খেতে এসেছে। আমি এসে ওদের দেখেছি। ওদের কাছে আমি একটা বিড়ি চাইলাম। একজন দিল। তাকে আমি একটা সিগারেট দিতে গেলাম, নিল না। ঘাড় নাড়িয়ে বলল, 'ও তুমি রেখে দাও। ওই একটুকরো পেয়ারা দাও।' সান্টুর দেওয়া পেয়ারার এক টুকরো দিলাম তাকে। হাতে নিয়ে বলল, 'এখানে আজকে নতুন এলে?' বললাম, হ্যাঁ। বলল, 'কেন?' বললাম না কিছু। আবার জানতে চাইল, 'কেন?' বললাম, তুমি এখানে কেন এসেছ? তার সঙ্গের দুজন ঘুরে বসল আমার মুখোমুখি। তারই একজন আমার বাঁ পায়ে একটা প্রণাম করল। বললাম, কী হল? হেসে বলল, 'তুমি

আমাদের দেখতে এসেছ? আমরা কী করে মাল খাই দেখতে এসেছ?' নেশা হয়েছে এর, কথা না বাড়িয়ে উঠে দাঁড়ালাম। লোকটা আমার হাত ধরে টেনে বসাতে চাইল, আমি এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম। সান্টুদা এটা খেয়াল করে এগিয়ে এসে এই তিনজনকে বলল, অন্যদিকে গিয়ে বসতে। ওই লোকটা সান্টুদার পায়েও একই ভাবে একটা প্রণাম ঠুকল। সান্টুদা বলল, 'ওপাশে যা। ওপাশে।' আমি বললাম থাক। আমিই ওদিকে গিয়ে বসছি। সান্টুদা বলল, আমার কাছে ওখানে গিয়ে বসো। আমি চলে গেলাম সামনে। পেয়ারার বাকি টুকরোগুলি সঙ্গে নিয়ে নিলাম।

কুঁচো এসে আমাকে সান্টুদার সামনে দেখে বলল, 'এখানে চলে এসেছ দাদা!' আমি পেয়ারায় একটা কামড় দিয়ে, কুঁচোকে বললাম, কী এনেছিস? ওর হাতে একটা ঠোঙা। আমার দিকে এগিয়ে দিল। কী আছে? বলল, 'বাদাম আছে খাও। মাল নেবে না?' আরেকটা বোতল নিল কুঁচো। আমার গ্লাসে ঢেলে দিল। এক চুমুক দিলাম লম্বা করে। গ্লাসের মাল ফাঁকা। সান্টুদা বলল, 'আস্তে খাও।' কুঁচোও একটা লম্বা চুমুক দিল। বাদামটা ভালোই এনেছে। কয়েকটা মুখে দিয়ে আবার লম্বা চুমুকে গ্লাসটাকে ফাঁকা করে একটা সিগারেট ধরালাম। কুঁচো বলল 'দাদা ভগবান আছে?'

এই যে জঙ্গলে বসে আমরা মাল খাচ্ছি, কোনও সাবেক 'পানশালা' নয় এটা। কলকাতার পানশালার মানচিত্রে একে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কলকাতার নানা দিকে এমন অনেক মালের ঠেক আছে। তার সব খবর আমরা জানিও না। যেখানে যেখানে কোনও 'বিখ্যাত' পাবলিকের পা পড়ে, সেই স্থান নামী হয়ে ওঠে বাঙালির মুখে মুখে। মালের বা ঠেকের গুণে নয়, নামকরা পাবলিকের কোথায়, কোথায় আসা-যাওয়া আছে, তা দেখেই বাঙালির কাছে ঠেকের মাহাত্ম্য সূচিত হয়। কিন্তু 'পানশালা' বা এই রকম ঠেকগুলিকে বাঁচিয়ে রাখে সাধারণত সাধারণ মানুষেরাই। ঠেকগুলির জলজ্যান্ত বেঁচে থাকার কারণেই সেখানে ভিড় বাড়ে। আজকে এই সান্টুর ঠেকে মাল খেতে এসে কুঁচোর দেওয়া 'ভদ্দরলোক' অভিধায় চিহ্নিত হয়েছি। এই ঠেক কিন্তু আমার জন্য নয়, কুঁচোদের জন্য টিকে ছিল, টিকে থাকবে। আমি মাঝে একদিনের জন্য এসে অভিজ্ঞতা জমিয়ে গেলাম।

'ও দাদা! ভগবান আছে?' কুঁচো আবার জানতে চাইল। বললাম, কেন দেখা করতে যাবি? হেসে ফেলল কুঁচো। বলল, 'ধ্যার। বলো না।' বললাম, কী করে বলব? তোর কী মনে হয়? বলল, 'নেই মনে হয়।' আমি বললাম, জানিস তুই? বলল, 'আমার মা বলেছে।' আমি বললাম, থাকলে কী হত? ও বলল,

'টাকা চাইতাম। একটা পাকা ঘর চাইতাম। মায়ের জন্য ভালো খাওয়ার চাইতাম। শরীরটা সারিয়ে দিতে বলতাম।' আমি বললাম এইসব তো মানুষের হাতেই আছে, ভগবান কী করবে এখানে? মাথাটা প্রচণ্ড গতিতে দুদিকে নাড়াতে নাড়াতে ও বলা শুরু করল— 'না। না। না।'

আমিও ওর মাথার চলন অনুসরণ করে একবার ডানদিকে একবার বাঁদিকে দেখতে দেখতে হঠাৎ বাঁদিকে যে জঙ্গলে ঢোকার পথটা, সেদিকে দেখি, তিনজন পুলিশ আসছে। এদিকেই। আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বোতলটা কোনওরকমে ঠেসে পকেটে ঢুকিয়ে, ডানদিকে জঙ্গলের মধ্যে জোরে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা ভিতরে চলে গেলাম। কুঁচো প্রথমে বোঝেনি, একটু পরেই চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে ছুটে এল আমার কাছে। বলল, 'কোথায় যাচ্ছ, দাদা!' খুব হাওয়া দিচ্ছিল, মেঘও ছিল। জঙ্গলের মধ্যে যে জায়গাটায় চলে এসেছি, সেখানে দাঁড়িয়ে বোতল থেকে খেতে শুরু করলাম আবার। কুঁচো বলল, 'পুলিশ দেখেই পালিয়ে এলে নাকি! ওরা কিছু করে না। ভালো আছে। চলো।' আর ওখানে যাব না, বললাম। কুঁচো বলল, 'আমি আর-একটু খাব। চলো দাদা। পুলিশ কিচ্ছু করবে না। কেউ পালায়নি। সবাই আছে।' আমি কুঁচোর কাছে ধরা পড়ে গেলাম নাকি? খুব গম্ভীর গলায় বললাম, পুলিশ দেখে আমি পালাইনি। পেচ্ছাপ করতে এসেছি এখানে। কুঁচো বলল, 'এতদূরে!' বললাম, হাঁটতে হাঁটতে ঘুরে ঘুরে খেতে ভালো লাগে, তাই উঠে এসেছি। কুঁচো বলল, 'আচ্ছা। এবার চলো। আমি একটু খেয়েই চলে যাব।' ওর কথায় খানিক পরে আবার সান্টুর ঠেকের দিকেই চললাম। বোতলেও আর মাল নেই, পুরোটা শেষ হয়ে গেল।

ঠেকে চলে এলাম। বাকিরা যারা যারা এতক্ষণ খাচ্ছিল, তারা তাদের জায়গাতেই বসে খাচ্ছে। আমাদের দেখে সান্টুদার মাথা গরম হয়ে গেল। কুঁচোকে বলল, 'তোরা আজকে আর বসবি না। হবে না মাল। যা।' কুঁচো বলল,'আরে নতুন তো। জানবে কী করে? আর হবে না। বসি? বলো না, বসি?' সান্টুদা বলল, 'যা বস।'

আমি তখন দাঁড়িয়েই ছিলাম। কুঁচো আমার কাছে এসে, যেখানে বসেছিলাম, সেখানে নিয়ে গেল। আমরা বসলাম। কুঁচো বলল, 'তুমি পালিয়েছিলে কেন? সান্টুদা খেপে গেছে!' আমি বললাম কেন? আমি তো পালাইনি। কুঁচো বলল, 'ওই একই হল। বসে যাও। খাবে তো আরও?' আমি বললাম কিছু খাব। খিদে পেয়েছে। কুঁচো একটা বাদামের ছোটো প্যাকেট আর একটা ছোলার প্যাকেট বার করল হাফ প্যান্টের পকেট থেকে। আমার হাতে

দিল। ও একটা কাপড় প্যাঁচিয়েছে লুঙ্গির মতো করে। তার নীচে আছে হাফ প্যান্টটা। আমি বললাম আমার জন্য হাফ নিয়ে আয়। ও চলে গেল। প্যাকেটের মুখটা ছিঁড়ে কটা বাদাম মুখে দিলাম। কটা ছোলা হাতে ঢেলে নিলাম। কুঁচো মাল নিয়ে এসে বসল।

সান্টুদা কেন খেপে গেছে শুনলাম এবার। কুঁচো যা বলল তাতে জানতে পারলাম, এই ঠেকের একটা নিয়ম আছে। কী সেই নিয়ম? কুঁচোর জবানিতে এইরকম— 'যত জন লোক তখন খাচ্ছে, পুলিশ এসেই গুনবে আগে। তারপর মাথাপিছু পাঁচ টাকা করে দিতে হবে। পুলিশের এই টাকার মাপ সব সময় একই থাকে না। এক-একবার এক-এক কারণে রেট বেড়ে যায়। সব ওদের মর্জি। আজকে পাঁচ টাকা করেই নিয়েছে। ১২ জন ছিল, পুলিশ যখন এসেছে, তাই ৬০ টাকা নিয়েছে। পূজা এসে গেছে না। এখন রেট বাড়বে। তুমি যে ছিলে তা তো পুলিশ দেখেছে তাই পালিয়ে গেলেও গুনতিতে তোমাকে ধরেছে। সান্টুর পাঁচ টাকা তোমার জন্যও দিতে হয়েছে। তুমি পালিয়ে গেলে কেন? সান্টুর তো টাকা দিতেই হল। অপমানও হল। এই ঠেকে কোনওদিন কেউ ধরা পড়ে না। সান্টুদার ঠেকের নাম আছে। দাদা খদ্দেরদের বসিয়েই রাখে। তুমি পলিয়েছিলে বলে দাদা তাই জোর অপমান খেয়ে গেছে। আর শালা, পুলিশগুলোও বলে গেছে, তুমি ভদ্দরলোক বলেই পালিয়েছ।'

কুঁচো তো বলছেই, এরপর পুলিশগুলোও আমার মতো 'ভদ্দরলোকে'র সন্ধান পেল! ভদ্রলোকটা যে একটা বাজে কথা, এটা আগে টের পাইনি, ওখানে অতএব এই ভদ্দরলোকের পুনরায় যাওয়া হয়নি আর কোনওদিন।

সোনালির টিফিন বাটি ।। ৮

স্মরজিৎদা যখন সোনাগাছিতে কাজ করতেন, তখন সেখানে 'পলাতক' নামে একটা ক্লাবও খুব সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। ওই ক্লাব থেকেও বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে, মেয়েদের, তাদের সন্তানদের জন্য নানা রকম কাজ করা হত। তাদের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছিল। সেখানেই আমি একদিন, একটা মেয়েকে খাতা কিনে দিয়ে এসেছিলাম। তাকে বলেছিলাম, যদি সম্ভব হয়, প্রত্যেকদিন দু-চার লাইন করে হলেও, নিজের কথা যা মনে হয় লিখে রাখতে। প্রায় মাস দুয়েক পর সেই মেয়ে আমাকে সাদা খাতাটা ফেরত দিয়ে বলেছিল, 'লেখাপড়া হবে না। এখাতা তুমিই নিয়ে যাও।' অনেক বোঝালাম। শুনলই না আমার কথা। মেয়েটার হাতের লেখাটা খুব সুন্দর ছিল। পলাতক ক্লাবের উদ্যোগেই অনেকে, যারা সোনাগাছির বাইরের লোক, তাঁরাও এখানে এসে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতেন। এমন-ই একজনের কথা মনে পড়ল এখন।

আজকালে ততদিনে যৌনকর্মীদের নিয়ে বেশ অনেকগুলো খবর, ফিচার লিখে ফেলেছি, ফলে আমার তখন এসব নিয়ে লেখালেখিতে একটু নাম হয়েছে। আমি যে যৌনকর্মীদের নিয়ে লিখি, এটা অনেকেই জেনে গেছেন। যাঁরা পড়েন, তাঁরা মাঝে মধ্যে অফিসে ফোন করেন আমাকে। চিঠিও দেন। এমন-ই একটা চিঠি রিসেপশন থেকে একদিন আমাকে দেওয়া হল। খুলে পড়ে তো আমার হাত পা কাঁপতে শুরু করেছে। কী সাংঘাতিক। চিঠির বিষয়টা বলি— তখন ডিসেম্বর মাস চলছিল। তার মাঝামাঝি সময় হবে বোধহয়। চিঠি লিখে কেউ জানিয়েছেন, বড়োদিনে তিনি কইখালি-নারায়ণপুর চার্চের মধ্যে আত্মহত্যা করবেন। কেন? তা-ই সবিস্তারে বলা আছে চিঠিতে। কেষ্টপুর হয়ে নারায়ণপুরে যেতে হয়। সেখানেই কইখালিতে আছে ওই চার্চ। সেখানে ঘটবে এই ভয়ংকর কাণ্ড! কিন্তু কেন?

সোনাগাছির পলাতক ক্লাবের কাজের সঙ্গে খুবই নিবিড় ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল এক যুবক। সেই সময় সে বড়ো বাজারে এক মারোয়াড়ির গদিতে কাজ করত। সোনাগাছির একটা মেয়েকে তার ঘরে গিয়ে পড়াত তখন। প্রতিদিন কাজের শেষে, একেবারে নিয়ম করেই, সে পড়াতে যেত। এবং মেয়েটার পেশার কাজ শুরুর আগেই, বিকেলের শেষে চলে যেত। পড়ানো মানে অক্ষর জ্ঞান আর লিখতে শেখানো— এসব। ধীরে ধীরে সেই মেয়ের প্রতি যুবকের দুর্বলতা জন্মায়। মেয়েটাকে বলতে পারেনি সে তখন। এরই মধ্যে একদিন সেই মেয়ে তাকে বলে, সে বলবে, যা যা বলবে, স্যার যেন তা-ই ওকে লিখে দেয়। যুবক খুশি হয় ছাত্রীর এই প্রস্তাবে। তার ধারণা হয়, এটাই হল লেখাপড়ায় আগ্রহ।

নির্দিষ্ট দিনে শুরু হয় সেই ডিকটেশন। মেয়েটা বলে চলেছে। যুবক লিখে চলেছে। এভাবেই, লিখতে লিখতে, বলতে বলতে এক সময় শেষ হয় বলা-লেখা। যুবক বুঝতে পারে, যা সে লিখেছে, তা আসলে একটা প্রেমপত্র। যুবক ভেবে নেয়, এটা তাকে উদ্দেশ্য করেই সেই মেয়ের বলা কথা। আনন্দে সে তখন উদ্বেল! মেয়েটাও খুশি হয়। তার বলাটা একটা লৈখিক চেহারা পেয়েছে বলে।

এই হল, আত্মহত্যার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপট। এবার জানা যাক, কেন এই সিদ্ধান্ত? যুবক জানিয়েছে, সে ওই মেয়ের ডিকটেশন মতো লেখাটা শেষ করে বুঝতে পারে, এটা একটা প্রেমপত্র। সে মেয়েটার কাছে জানতে চায়, কাকে এই চিঠি লেখা হল? মেয়েটা একটা অন্য ছেলের নাম বলে। যুবকের সব ভাবনা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। মেয়েটাকে সে কিছু বলে না। শুধু বলে, '২৫ তারিখ

কেক নিয়ে আসব। এই কদিন আর আসব না। কাজ আছে।' এবং তখনই সে সিদ্ধান্ত নেয়, আর বেঁচে থাকবে না। বাড়ি ফিরে গিয়েই এই চিঠি লেখে। এবং, এই চিঠির শেষে দেখলাম, আমাকে যেটা পাঠানো হয়েছে, সেটা প্রতিলিপি। কয়েকজনকে এই চিঠির কপি পাঠানো হয়েছে। মূল চিঠি গেছে মহাকরণে, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে।

চিঠি নিয়ে এরপর আমার তৎপরতা শুরু হয়। পত্রিকার সম্পাদককে বলে, খবর করার অনুমতি আদায় করে, ফোটোগ্রাফারকে সঙ্গে নিয়ে সেদিনই বেরিয়ে পড়ি। প্রথমেই রাইটার্সে গিয়ে জ্যোতিবাবুর আপ্ত সহায়কের সঙ্গে দেখা করে পুরোটা বলি। তিনি বলেন, 'এমন চিঠি আদৌ এসেছে কিনা তার খবর নিচ্ছি।' এরপর চলে যাই কইখালির ওই চার্চে। সেখানে গিয়ে, চার্চের ফাদারের সঙ্গে দেখা করে চিঠিটা দেখিয়ে বলি সবিস্তারে। তিনি বলেন, 'লোকাল থানায় আমি এখনই সবটা বলে রাখছি।' চার্চ থেকে গেলাম বড়োতলা থানায়। সোনাগাছি ওই থানার এলাকা। সেখানে ওসির সঙ্গে দেখা করেও চিঠিটা দেখাই। চিঠিতে, ওই মেয়ের নাম, কোন্ ঘরে থাকে, তার ঠিকানা সব লেখা ছিল। থানার ওসি সবটা শুনে বললেন, 'আমাদের কাছে এসে আপনি খুব ভালো করেছেন। আমরা নজর রাখছি।'

বলে রাখি, সেদিন ছিল বোধহয়, ২৩ ডিসেম্বর। এরপর, চিঠিতে বলা সময় অনুযায়ী, বড়দিনের সন্ধের সময় একটা ২৫ পয়সা দামের কেকের টুকরো নিয়ে ওই মেয়ের ঘরে গিয়েই পুলিসের হাতে ধরা পড়ে যুবক। থানা থেকে অফিসে ফোন করে আমায় বলা হয়, থানায় আসুন। আমি গিয়ে দেখি সেই মেয়ে আর মাস্টার বসে আছে। পুলিশ তাকে জেরা করছে। ওসি আমাকে বললেন, 'আপনি চাইলে কথা বলতে পারেন। আমি কথা বলেছি। যা বুঝলাম, ও চেয়েছিল মেয়েটাকে বিয়ে করে সোনাগাছি থেকে বার করে নিয়ে যাবে, তাকে বিয়ে করে সংসার করবে, তাকে আর বেশ্যা হয়ে খাটতে হবে না। এই চাওয়াটা কোনও দিন সফল হবে না বুঝতে পেরেই আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়।' আমি বললাম, এই কথাই চিঠিতেও আছে। ওসি বললেন, 'তা-ই আবার বলেছে।'

আমি যে নাটের গুরু, তাকে আত্মহত্যা করতে দিলাম না, এই জন্য পুলিসের সামনেই আমাকে গালাগালিও দিল যুবক। একজন পুলিশ কর্মী একটা লাঠি দিয়ে মারতে গেলেন। আমি বললাম, মারবেন না প্লিজ! মেয়েটাও পাশেই বসে আছে। ওসি বললেন, 'এ-ই পড়ত মাস্টারের কাছে।' আমি তাকে বললাম,

বিয়ের কথা বলেছিল কখনও? মেয়েটা বলল, 'বিয়ের কথা কোনওদিন বলেনি আমাকে। বললেও কী? আমি এক ঘণ্টায় যা আয় করি, তার এক মাসের রোজগারও তত হয় না। ওকে বিয়ে করে কি না-খেয়ে মরব?'

মেয়ের বক্তব্য হল— শুধুমাত্র একজনের সঙ্গেই সারাজীবন থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে যে স্বাধীনতা এনজয় করে, তা বিয়ে করে সম্ভব নয়। তার এই জীবনই ভালো লাগে। কত লোকের সঙ্গে ওঠাবসা। চেনাজানা। যেমন খুশি থাকা— কাউকে কোনও প্রশ্নের উত্তরই দিতে হয় না। এসব ছাড়তে পারবে না সে। তবে, 'মাস্টার খুব ভালো লোক। খুব ভালো লোক। আমি ভালো না।' মেয়েটা শেষে এই কথাও বলেছিল।

কাজের সূত্রেই যৌনপল্লিগুলোয় খুবই যাতায়াত ছিল আমার। তারই টুকরো টুকরো স্মৃতি মাঝে মধ্যে এখনও ঝলকে ওঠে। সেখান থেকেই আমি ঝেড়ে বেছে এখানে কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করছি। এসবই মধুর স্মৃতি। 'তিক্ত ও কষায়'-ও বিলক্ষণ আছে আমারই ঝুলিতে। তবে, তা আমি ভাগ করতে চাই না। থাক সেগুলো আমারই। ওই সবই আমার এই জীবনের সম্পত্তি।

ওয়াটগঞ্জের একটা মেয়ের কাছে তার নামের খুব চকচকে ছাপানো কার্ড দেখেছিলাম। সেই মেয়েটা নেপালি ছিল। সে নাম বলেছিল জুলি। আমি এই জুলি নামটা এতজনকে বলতে শুনেছি যে, অবাক লাগে। নিজের নাম যারা গোপন করে, তারা কেন এত নাম থাকতে জুলি বলে নিজের নাম! গভীর গবেষণার বিষয় হতে পারে এটা। জানতে চেয়ে বহু মেয়েকে প্রশ্ন করেছি, কেন? সবাই হেসেছে। কেউ কেউ বলেছে, জুলি নামটা সুন্দর। তো সেই জুলি আমাকে তার নামের ছাপানো কার্ড, ঘরের ঠিকানা, একটা ফোন নম্বর লেখা কার্ড দেখিয়ে বলেছিল, 'এখানে তো জাহাজের লোক আসে। বিদেশি। খিদিরপুর ডকে ওদের জাহাজ আসে। ওরা আমাদের কাছে আসে। আবার দেশে ফিরে যায়। ওদের কাছে এই কার্ড থাকলে, ফিরে গিয়ে আর-একজনকে দিতে পারবে কার্ডটা, সেই কার্ড নিয়ে আমার কাছে চলে আসবে আর-একজন খুব সহজেই। খুঁজতে হবে না। অতদূর থেকে আসে ওরা। একা একা কোথায় খুঁজে পাবে আমাদের। তাই কার্ড থাকলে সুবিধা হয়।' আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, কার্ড দিয়ে লাভ হয়েছে? এসেছে নতুন কেউ? সে বলেছিল, '৭/৮ জন নতুন লোক এসেছে ওই কার্ড নিয়ে। আমার ঘরে বিদেশ থেকে কাস্টমার এলেই আমি তাকে কার্ড দিই।' তাকে বলেছিলাম, কার্ডের বুদ্ধি কে দিয়েছে? সেই মেয়ে বলেছিল, অস্ট্রেলিয়ার একজন।

সোনাগাছির একটা মেয়ে, তার বয়স তখন ছিল খুব বেশি হলে ২৪/২৫ বছর। আমাকে বলেছিল, দুটো বই তাকে কিনে দিতে। আমি বলেছিলাম, কী বই? সে বলেছিল, 'একটা ব্যোমকেশের গল্প। আর একটা কিরীটির।' তাকে কিনে দিয়েছিলাম। কী যে খুশি হয়েছিল!

চিৎপুরে ট্রাম লাইনের গায়ে, যে গলিগুলো দিয়ে সোনাগাছির ভিতরে যাওয়া যায়, তেমন একটা গলিতে ঢুকেই একটা বাড়ির খুব লম্বা সিঁড়ি চোখে পড়ত। এটা ৯৩/৯৪ সালের কথা। জানি না এখনও ওই বাড়িটার ওই সিঁড়িটা আছে কিনা। একদিন, সেই সিঁড়িতে দেখি, এক বৃদ্ধকে ঘিরে প্রায় ১৫/২০ জন মেয়ে কলকল করছে। তখন দুপুরবেলা হবে। শীতকাল। বৃদ্ধের হাতে একটা বড়ো ঝোলা ছিল। খুব কৌতূহল হল। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই দেখলাম, ঝোলা থেকে মুঠো মুঠো টফি বার করে মেয়েদের হাতে দিচ্ছেন বৃদ্ধ। এই মেয়েরা সবাই যৌনকর্মী। তারা সবাই অবাঙালি। পাহাড়ের বাসিন্দা। আর ওই যে টফি, ওইরকম আমি দার্জিলিং-সিকিমে খেয়েছি। এটা নাকি চমরি গাইয়ের দুধ দিয়ে তৈরি হয়, তেমনই শুনেছি। আমার স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল, কে ওই বৃদ্ধ? কেন তিনি এই মেয়েদের টফি দিচ্ছেন? বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলাম সে কথা, তিনি জানালেন, এদের অনেকেই ছোটোবেলায়, ওদের বাড়িতেই যখন ছিল ওরা, তখনও আমার কাছ থেকে টফি নিত। ওরাই অনেকে এখন কলকাতায় এই জায়গায় আছে, ওদের কথা খুব মনে পড়ে। তাই বছরে দু-একবার আমি ওদের কাছে এসেই ওদের টফি দিয়ে যাই। এবং এই জন্য কোনও পয়সাও নেন না বৃদ্ধ। মেয়েগুলোকেও দেখলাম, তারা কখনও বৃদ্ধকে জড়িয়ে ধরছে। কখনও থুতনি ধরে নাড়িয়ে দিচ্ছে। কেউ আবার, বৃদ্ধকে টফি খাইয়ে দিচ্ছে। বৃদ্ধও তাদের খাইয়ে দিচ্ছেন। তাদের খুব আদর করছেন। সে এক অসাধারণ দৃশ্য! সেই শৈশবে এদের টফি দিতেন, তাই কতদূর থেকে এখনও ছুটে আসেন এই সোনাগাছিতে এই বৃদ্ধ! অকল্পনীয় সেই দৃশ্য! কতক্ষণ যে সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে ছিলাম সেদিন।

কিছুই যেন হারিয়ে যায় না। লিখতে লিখতে আমি সে কথাই ভাবছি। ভাবছি আরও, এই যে নগরের গর্জন, মানুষের নিঃশ্বাস বা মাতালের দেয়ালা— এসব কোনও কিছুই এখন আর ছুঁতে পারছে না আমাকে এবং আমিও ঠিকই জানি, এদের না পেরোতে পারলে কেউই আমার এই লেখার শরীর, মন খুঁজেও পাবে না। এই স্মৃতি, ভিড়াক্রান্ত এই স্মৃতি ঝলকে ঝলকে উঠে আসছে, ক্লান্তিহীন। যত্ন করে তারই কিছু কিছু সাজিয়ে দিচ্ছি।

চেতলার রাখালদাস আঢ্যি রোডের যৌনপল্লির এক মেয়ে আমাকে বলেছিল, 'আমার মেয়ে জানে আমি কী করি। সে এখন ১২ ক্লাসে পড়ে। অনেক কষ্টে তাকে বড়ো করেছি। তার বাবা যে কে, ঠিক ঠাওর করতে পারি না। তবে, মেয়েকে আমি কোনও দিন আমার কাছে রাখিনি। খুব কষ্ট করেই তাকে একটা হোমে রেখে বড়ো করেছি। এখনও আমি তার সঙ্গে দেখা করি। সে-ও আসে। রাস্তায় বা কোনও হোটেলে। এখানে না। তাকে বলেছি তুমি ইচ্ছে হলে আমাকে মা বলে পরিচয় নাও দিতে পারো। সে বলেছে, চাকরি করে আমাকে নিয়ে যাবে। আমার তেমন কোনও আশাও নেই। মেয়ে বলেছে এটাই অনেক।' অবাক হয়ে কেবল শুনেছি আমি এসব কথা। কেবল শুনেছি। এক জায়গায় সব একত্র করলে, বিরাট কলেবর হবে।

অফিস থেকে বেরিয়ে বৌবাজার হাড়কাটা গলিতে একদিন গেছি, রাত হয়েছে। আমহার্স্ট স্ট্রিট ধরে এগিয়ে এসে মাংসের দোকানের পাশের গলি দিয়ে চলেছি ওদিকে। যাব মেডিকেল কলেজের দিকে। বসন্ত কেবিনের কাছে একটা দরকার ছিল। কিছুটা গিয়ে বাঁদিকে একটা বড়ো খোলা জায়গা পড়ে। তার চারদিকেই বাড়ি। যৌনকর্মীদের ঘর। সেখানে সেই খোলা জায়গায় দেখি, বোধহয় কারও ঘরে কোনও পূজা বা অনুষ্ঠান হয়েছিল, তার খাওয়া দাওয়া চলছে। খুব ভিড়। বক্স বাজছে। মেয়েরা ছেলেরা খদ্দেররা বাবুরা— সবাই নাচছে। বাচ্চারাও আছে দেখছি। কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে খাচ্ছে। খিচুড়ি দেখলাম। আবার লুচিও দেখলাম। আমি ভিড়ের মধ্য দিয়ে হেঁটে দ্রুত বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি তখন। হঠাৎ ডান হাতটা ধরে কে যেন টানল, পিছনে ঘুরে দেখি, সোনালি— এখানকারই একজন। আমি চিনি ওকে। এই নাম বলেছিল সে। আমি বললাম, কী হল? সে বলল, 'একটু দাঁড়াও। আমাদের শীতলাপূজা হয়েছে। মা খুব জাগ্রত! প্রসাদ খেয়ে যাও একটু।' আমি বললাম, তাড়া আছে। ও বলল, 'থাকুক তাড়া। যাচ্ছ যখন এখান দিয়েই, দেখেও ফেলেছি যখন, তখন খেয়ে যাও।' আমি বললাম, তোদের কাছে আসিনি। আমি শর্টকাট করছি। সে বলল, 'যা-ই কর, একটু প্রসাদ খেয়ে যাও। চলো আমার ঘরে।' বলেই আমার হাত ধরে সে টানতে টানতে তার ঘরের দরজার সামনে একটু ফাঁকায় নিয়ে দাঁড় করিয়ে বলল, 'যাবে না, আসছি।' আমি বললাম, দাঁড়িয়ে রইলাম। যা।

নাচ দেখছি। ডনের গান হচ্ছিল। সবাই নাচছিল। মদ খাচ্ছিল। খাবার খাচ্ছিল। চিৎকার করছিল। সিটি দিচ্ছিল। এ তাকে, সে ওকে হঠাৎ হঠাৎ করে জড়িয়ে ধরছিল। কেউ পড়ে যাচ্ছিল। কী আনন্দ! কী সেলিব্রেশন! প্রখর গরম

তখন। আমি ঘামছি। তবুও দাঁড়িয়েই আছি। সেই মেয়ের দেখা নেই। ভাবছি চলে যাব কিনা। আবার ভাবছি, বলে গেল থাকতে, খেয়েই যাই। দাঁড়াই। আরও খানিক পর, সোনালি এসে একটা গোলাপি রঙের প্লাস্টিকের টিফিন বক্স আমার কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'ধরো।' আমার ডান হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে ভোগের প্রসাদ নিয়ে এসেছি। বাড়িতে গিয়ে খাবে। এখানে এখন এই রকমই ক্যাঁচড়া চলবে। আমি জানি, তোমার এখন ভালো লাগবে না।' বাটিটা হাতে নিয়ে বললাম, এটা দিতে আবার কবে আসব? সোনালী বলল, 'অনেকদিন তো আস না। এটা দিতেই এসো না হয়। এখন কি তোমার সোনাগাছিতে আমার চেয়ে ভালো মেয়ে জুটেছে?' আমি বললাম, চুপ কর। আমি সারাদিন কি মাগীবাড়িতেই ঘুরে বেড়াই নাকি? কাজকর্ম কি নাই আমার অন্য কিছু? বলল, 'জানি তো। এসো।' বললাম, বাটি দিয়ে যাব।

ওই টিফিন বাটি আমি অনেকদিন যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম। পাঁচ-ছবার বাড়ি বদল করে করে, যখন আর খুঁজে পাইনি তখন একটা নতুন বাটি কিনে ফেরত দিতে গিয়েছিলাম। শুনলাম, ও আর থাকে না এখানে। কোথায় থাকে, কেউ তা বলতে পারল না। সেই নতুন বাটিটাও ছিল অনেক দিন। লিখতে লিখতে মনে হচ্ছে, সেদিন অত যত্ন করে যে ও শীতলাপূজার প্রসাদ দিয়েছিল নিজের একটা টিফিনবাটিতে করে, কেন? বাটির মধ্যেই দুটো ফুল একটা গুজিয়া আর সিঁদুর মাখা একটা বেলপাতাও ছিল।

এখন কোথায় আছে সোনালি?

দাঙ্গার কলকাতা আর ছোটা ব্রিস্টল ।। ৯

এখনও মনে আছে যেদিন বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলা হল, সেদিন আমার নাইট ডিউটি ছিল। সেটা ১৯৯২ সাল। ৬ ডিসেম্বর। দুপুরে, মায়ের কাছে ছিলাম। টেপরেকর্ডার-এ গান শুনছিলাম। ইচ্ছে ছিল একবার প্রেস ক্লাব হয়ে অফিস যাব। ঠিক দুটো খাব। নাইট ডিউটিতে সাতটা-সাড়ে সাতটায় গেলেই হয়। মা এসে বলল, অফিসের গাড়ি এসেছে। অফিসের গাড়ি কেন? আমার তো আজকে নাইট ডিউটি। এখন গাড়ি কেন? উঠে বাইরে গিয়ে দেখলাম চাচা এসেছে। চাচার বাড়ি আনোয়ার শাহ রোডে।

আমায় দেখেই বলল, 'চলো, অফিস যেতে হবে।' আমি বললাম কেন? উত্তরে যা বলল, তা হল এই, করসেবকেরা অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভেঙে দিয়েছে। দেশে খুব গোলমাল। দাঙ্গা লেগে গেছে। এখানেও শুরু হবে। কার্ফু

হবে। তাই অফিস থেকে ফোন করে চাচাকে বলা হয়েছে আমাকে গাড়িতে তুলে, ঢাকুরিয়া, গোলপার্ক থেকে আরও দুজনকে নিয়ে অফিসে চলে আসতে। শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। বাবরি মসজিদ তাহলে সত্যিই ভেঙে দিল ওরা। এত বড়ো একটা দেশে ভোটে জেতা সরকার কিছুই করতে পারল না! ঘরে গিয়েই মাকে বলে শার্ট-প্যান্ট পরে, ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। দেশ জুড়ে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। এরপর শুধু খুন আর আগুন।

সেই দাঙ্গার দিনে গোটা কলকাতা চষে বেড়িয়েছি অমিত আর আমি। রাজাবাজার কখনও। এন্টালি কখনও। কখনও ট্যাংরা, তপসিয়া, তিলজলা। সব চেয়ে বেশি গেছি গার্ডেনরিচ আর মেটিয়াবুরুজে। লালবাজার থেকে সেই সময় আমাদের কার্ফু পাস দেওয়া হয়েছিল মনে আছে। যে পশ্চিমবঙ্গে সেই সময় একটা পাড়ার ক্লাব, নাগরিক কমিটি বা স্কুল কমিটির মিটিংয়েও সরাসরি খুবই প্রত্যক্ষভাবে দলীয় রাজনীতি জড়িয়ে যেত, এবং আমরা সবাই আত্মপ্রসাদ লাভ করতাম, এরাজ্য খুবই রাজনীতি সচেতন রাজ্য— সেই রাজ্যই— পুরোটাই সেদিন মিলিটারির হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছিল। ঘরবন্দি ছিল সেইসব 'সচেতন মানুষ'।

এখানেও নারকীয় বর্বর দাঙ্গার ঘটনা ঘটার পর শান্তি মিছিল হয়েছিল। আমরা তখন ভূরিভূরি উদাহরণ টেনে গলার শিরা যতটা সম্ভব ফুলিয়েই 'মোরা একই বৃন্তে দুইটি কুসুম' গেয়েছিলাম। আর হিন্দুর বাড়ির বিয়ের মেনুতে মুসলমান পাচকের রান্না বিরিয়ানি খেয়ে সশব্দে সম্প্রীতির একখানা ঢেকুর দিয়েছিলাম। যদিও দাঙ্গার সময়, এইসব ঢেকুর তোলা পাবলিকেরেই সবটুকু রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় ঘুচে গিয়েই প্রকাশ হয়েছিল কেবল ধর্মীয় পরিচয়টাই। ট্যাংরার মুসলমান বস্তি জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য যাকে গ্রেপ্তার করা হয় সে সময়, সে নাকি নিজেকে বাম কর্মী হিসেবেও দাবি করত! গার্ডেনরিচে হিন্দু বাড়িতে আগুন দেওয়া, কেশোরাম কারখানার এক হিন্দু শ্রমিককে খুনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বলে যে মুসলমান নেতার নাম শোনা যাচ্ছিল, সেও নাকি নিজেকে একজন সমাজ-সংস্কারক হিসেবেই দাবি করত! এদেরই বরং ঘরবন্দি করে রাখতে সেদিন আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম— 'রাজনীতি সচেতন' এবং তথাকথিত আমরা— 'বাংলার মানুষ'। যাইহোক, পুলিশের দেওয়া একটা কার্ফু পাস গলায় ঝুলিয়ে, তবেই আমাকে এই শহরে সেই সময় খবর করতে ঘুরতে হত এদিক-ওদিক। সত্যি গোটা কলকাতায় একটা কাক-কুকুরও দেখিনি তখন! দুপুরবেলা ডোরিনা ক্রসিং-এ একদিন গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে, মনুমেন্টের দিকে চেয়ে কেমন যেন লাগছিল। ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভেঙে দেওয়া

হল। ৭ই এ রাজ্যে বামফ্রন্ট বনধ ডাকল, ৮ ডিসেম্বর বনধ ডাকল বামদলগুলি— দেশজুড়ে। কলকাতায় এর তিনদিন পর, ১১ ডিসেম্বর হাজার হাজার মানুষের শান্তি-সম্প্রীতির মিছিল হল। এসবের মাঝখানেই দাঙ্গা-আগুন-খুন হল। আবার কার্ফু কয়েক ঘণ্টার জন্য শিথিল হল। আমি আর অমিত শহরময় ঘুরে বেড়ালাম। ওই পাসটা গলায় ঝুলিয়ে।

এইটুকু বলতেই হত। পাঠক হয়তো মনে করছেন, 'বেশ্যালয় ও পানশালা'র সঙ্গে দাঙ্গার কী সম্পর্ক আছে? সেই জন্য একটু ধান ভানতে শিবের গীত গাইলাম। সম্পর্ক আছে। সেই দাঙ্গার সময় কার্ফু শিথিল হয়েছিল একদিন দুপুরে বোধহয় কয়েক ঘণ্টার জন্য। সেইদিন আমি আর অমিত ছোটা ব্রিস্টলে গিয়ে দেখলাম খোলা। ভিতরে ঢুকে দেখি সরগরম বার। মনেই হবে না, দাঙ্গার টাইম এখন। কার্ফুর মধ্যে কয়েক ঘণ্টা মানুষ ছাড় পেয়েছে। অমনি ছুটে চলে এসেছে। মদের নেশা কী দারুণ! দাঙ্গার ভয়, কার্ফুর ভয়— এসব পাত্তাই পায় না তার কাছে। আমাদের মতো তো এখানে সবার কাছেই নিশ্চিত 'কার্ফু পাস'ও নেই; কিন্তু মদের নেশা আছে। দাঙ্গা দূর হটো, বলে মানুষজন চলে এসেছে তাদের আদরের শ-বারে! এ এক আশ্চর্য দৃশ্য! আমরাও তো গেছি। সুতরাং, অবাক হওয়ার তো কারণ নেই কোনও। এটাই ছোটা ব্রিস্টলের আকর্ষণ। তাছাড়া, মানুষজন এইসব দাঙ্গাহাঙ্গামা, এইরকম কার্ফু মোটেও পছন্দ করে না। তারই এক জ্বলন্ত নিদর্শন এই ভিড়টা। অমিতকে বললাম এই কথাটা। শুনে ও বলল, 'কাদের এসব ভালো লাগে বল তো? সত্যি কিন্তু।' আমি বললাম, বাইরে ঘুরতে ঘুরতে যেসব দৃশ্য আমরা দেখছি, এখানে তার কি সামান্য কোনও চিহ্নও দেখা যাচ্ছে! অমিত বলল, 'চল বসি।'

এসপ্ল্যানেডের মেট্রো গলিতে এই বার। এটা মেট্রো সিনেমার পাশের গলি, তাই মেট্রো গলি— এখানে অবশ্য আর-একদিক দিয়েও আসা যায়। ওই যে টিপু সুলতান মসজিদের কাছে এ টি দাঁ-য়ের পুরোনো বন্দুকের দোকান আছে, ট্রাম লাইন টপকে, তার ঠিক উলটো দিকের গলি দিয়ে ঢুকেও এই বার-এ আসা যায়।

এখানকার কিছু নিজস্ব নিয়ম আছে। অর্ডার দিয়ে একই সঙ্গে টাকা দিতে হবে। তারপরেই মাল নিয়ে আসবে। ফ্রিতে দেবে কাঁচাছোলা, আদাকুচি, নুন। বরফ চাইলে কিনতে হবে। এক বাটি বরফ দেবে। অনেক হকার বাদাম, সল্টেড কাজু, মেটে কষা, চিলি চিকেন, চিপস, ফিশ ফিঙ্গার সঙ্গে কাসুন্দি, স্যালাড, মটন লিভার— এইসব বাইরের দোকান থেকে নিয়ে এসে এখানে বিক্রি করে।

অনেকদিন যাই না, এখনও বাইরের হকারদের ঢুকতে দেওয়া হয় কিনা, এই সিস্টেম বন্ধ হয়েছে কিনা, তা বলতে পারব না। করোনার পর থেকে হকার ঢোকা বন্ধ ছিল বলেই জানতাম। এই পানশালায় টেবিল শেয়ার করে বসতে হয়। অচেনা লোকজনের সঙ্গে বসেই খেতে হয়। তবে দু-পেগ পেটে গেলেই অবশ্য আর কাউকে চোখেই পড়ে না। ঢুকলেই যে মাছের বাজারের চিৎকার, তা তখন কে যেন 'মিউট' করে দেয়। আরও কিছু নিয়ম আছে। সন্ধে ছটার সময় ধুনো দেওয়া হয়। তারপর মিনিট পনেরোর জন্য বারের কাজ বন্ধ। তখন পুজো হয়। এ জিনিস না দেখলে বিশ্বাসই হবে না। এরপর আছে সবচেয়ে কড়া ও বাজে আর-একটা নিয়ম— কোনও মহিলাই এখানে ঢুকতে পারে না। অত্যন্তই নিন্দনীয় একটা ব্যাপার।

টেবিলে বসার পর দেখা যায় খুবই সাধারণ মানের কাচের গ্লাস একটার মধ্যে আর-একটা লম্বা করে সাজিয়ে, হাতে ধরে, কাঁধে ঠেকিয়ে নিয়ে আসে ওয়েটার। অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে সে এই কাজটা করে। এহেন এক পানশালায় দাঙ্গার মধ্যে আমরা খেতে এসেছি।

সারা দেশ জ্বলছে। আমাদের এই প্রাণের শহরও উত্তপ্ত। খুন আগুন লুটপাট চলছে। রাস্তায় রাস্তায় মিলিটারি গাড়ি। পুলিশের টহল। গোটা শহর জুড়ে অদ্ভুত একটা নিস্তব্ধতা। গুজব, প্ররোচনা, হুমকি অব্যাহত। পুলিশ-মিলিটারি অবস্থা নিয়ন্ত্রণে হন্যে হয়ে ঘুরছে। ভালো নেই মানুষ। কিন্তু ছোটা ব্রিস্টল তা বলছে না। একদম সেই চেনা ছন্দ দেখছি এই ঘরের মধ্যে।

দিনুদা আর রামুদা দুই ভাইয়ের এই পানশালা সকাল থেকেই জমজমাট থাকে এমনিতেই। শহরে এইরকম জনপ্রিয় পানশালা খুব কমই আছে। দুই ভাইয়ের সঙ্গেই অমিতের খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। অমিত ওঁদের বাড়ির অনুষ্ঠানেও নিমন্ত্রিত থাকত। আর আমি অমিতের সঙ্গে যেতাম বলে, আমাকে পছন্দই করতেন। অমিত এই বারের একটা ছবি তুলেছিল মনে আছে, সকালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে বস্তায় করে খুচরো পয়সা আসছে দোকানে। আমি সেই ছবি দেখেছি। যেমন সাবজেক্ট! ফোটোগ্রাফি তেমন। ফাটাফাটি! কাউন্টারে, দিনুদা-রামুদার মুখোমুখিই উঁচু স্টুলে বসে আমার আর অমিতের রাম খাওয়া চলত। আজকের মতো।

কোনও এক প্রাইভেট কোম্পানির উচ্চপদস্থ এক কর্মচারী আসতেন এখানে। আমি যখনি যেতাম, দেখতাম। তিনি নাকি লেখক যাঁরা, তাঁদের খুবই ভালো বন্ধু। তাঁর সঙ্গে অমিতেরও আলাপ ছিল। আমাদের সামনেও কখনও

এসে বসতেন। এসেই নানাবিধ সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের লোকজনের সঙ্গে তাঁর কত মধুর সম্পর্ক, তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন মদের আসরে কী কী হয়েছে, খুবই 'স্মরণীয়' সেই সব কথা বমি করতেন। এটা একটা রোগের মতো। রোগ-ই। 'বুদ্ধিজীবী'দের সঙ্গে মদ খেয়ে, সোল্লাসে তার গল্প বলাটা একটা সংক্রামক রোগ। অনেকেই বিভিন্ন আসরে এইরকম নানান গল্প বলতে বলতে মুহূর্তে 'শোলে'র সুরমা ভূপালি বনে যায়।

সেদিন দুপুর নাগাদ গিয়েও দেখলাম লোকটাকে, খাচ্ছেন। তিনিও অমিতকে দেখেই কাউন্টারে চলে এলেন। আমরা দুজন তখন খাচ্ছি। ওল্ড মংক। কী যে ভালো লাগত! লোকটা আমাদের সঙ্গে এবার কথা শুরু করল। বাবরি মসজিদ, দাঙ্গা, কলকাতা এবং— আমাদের কী করণীয়— লেকচার শুরু করলেন। আমরা খাচ্ছি, লোকটা লেকচার দিয়েই চলেছেন। খেয়াল করছি কথার মধ্যে বেশ একটা, গরম রসগোল্লার মতোই নরম হিন্দুত্ব ভরপুর। তা ক্রমশই বড়ো আকার ধারণ করছে। বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ছে তাঁর কথা। এরইমধ্যে সংবাদপত্রের এই সময় কী ভূমিকা হওয়া উচিত, তা-ও বলতে শুরু করলেন। অনেকক্ষণ সহ্য করার পর, এবার মাথাটা গরম হয়ে গেল। বললাম, আপনার বুকনি বন্ধ করুন। আমরা সেই ৬ ডিসেম্বর থেকেই দিনে রাতে, এই কার্ফুর মধ্যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি। কী কোথায় হচ্ছে, ঘরে বসে বসে দেখছি না। যেখানে ঘটছে, সেখানে গিয়েই দেখছি। কাজেই আপনার এইসব লেকচার বাড়িতে আত্মীয়দের কাছে গিয়ে ঝাড়ুন।

এমনিতেই লোকটাকে পছন্দ করতাম না, সেইদিন আর সহ্যই হল না। অমিত আমায় থামাল। মালটা তখনও বকে চলেছে। আমি বললাম, আপনি উঠে যান, নয়তো আমরাই চলে যাই। এত কথা শুনতে পারব না। অমিতকে বললাম, উঠবি? এখানে আর থাকব না।— একথা শুনে, চলে গেল মালটা। আর ঠিক তখনই, আর-একজন এসে আমাদের সামনেই দাঁড়াল। বলল, 'আপনাদের কথা সব শুনছিলাম। হেব্বি দিলেন।' তারপর জানতে চাইল, আমরা যে ঘুরছি, 'মিলিটারি ধরছে না?' কার্ফু পাসটা তাঁকে দেখিয়ে অমিত বলল, 'এটা আছে। পুলিশ থেকে আমাদের দিয়েছে।' হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে বললেন, 'ইশ আমার ইচ্ছে ছিল একটু খাই সময় নিয়ে, হবে না।' অমিত বলল, 'কেন হবে না?' তিনি বললেন, 'কার্ফু তো এখনি লাগবে, একটু পরে তো চালু হয়ে যাবে। তার আগে তো বাড়িতে পৌঁছতে হবে। আপনাদের তো কী সুবিধা!' কথাটা লোকটা শেষ করা মাত্র অমিত তাকে বলল, 'ওটা আপনিই রেখে দিন।'

বিস্মিত হয়ে তিনি বললেন, 'আমি!' অমিত বলল, 'আপনিই!' কী যে খুশি হলেন তিনি। হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

আমি আর অমিত নিশ্চিন্তে আরও কটা খেয়েই, কার্ফু ফের চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেলাম। গন্তব্য ছিল গার্ডেনরিচ।

তুমি আমার সাথ দেবে বলো ।। ১০

কালীঘাটে, একটা মেয়ে বাচ্চুকে দিয়ে আমাকে খবর পাঠিয়েছিল একবার। তার কাছে আসতে বলেছিল। আমি যেতেই হাত ধরে টানতে টানতে তার ঘরে নিয়ে গিয়েছিল মেয়ে। সেই ঘরে এবার আপনাদেরও নিয়ে যাচ্ছি। একটা ক্যালেন্ডার ছিল ঘরে, যেটা, আমার খুব পছন্দ ছিল। নরকে কী কী শাস্তি পেতে হবে, তার সচিত্র বিবরণ। অনেকদিনের পুরোনো সেই ক্যালেন্ডারটা। আমি চেয়েছিলাম, সে দেয়নি। তার নাম ছিল আরতি। মনে হয় নামটা সে মিথ্যে বলেনি।

ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকে, সোজাসুজি দেওয়ালে যেমন এই ক্যালেন্ডার, এর ডানদিকের দেওয়ালেই ছিল, তেমন মাপেরই একটা চকচকে তারাপীঠের তারার ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডার। এই মেয়েটার ঘরটা এখানকার গড়পড়তা ঘরের থেকে বড়ো আর বেশ পরিষ্কারও ছিল। দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেই, বাঁদিকে একটা ড্রেনের মুখ। যা এখানকার অতীব দরকারি একটা ব্যাপার। ঘরের মাঝামাঝি বরাবর দুটো দড়ি কোনাকুনিভাবে দুদিকের দেওয়ালে দুটো পেরেকের সঙ্গে আটকানো। শাড়ি ব্লাউজ সায়া প্যান্টি ব্রা গামছা— ঝুলছে তাতে। ডানদিকের দেওয়ালের গায়ে একটা তাক। তাকে, তিন-চারটে কাচের গ্লাস, একটা চায়ের কাপ, আর একটা প্লাস্টিকের জলের জগ। মেঝে সিমেন্টের। বেশ পরিষ্কার। যে দেওয়ালে তারার ছবি, সেইখানেই একটা মাঝারি মাপের আয়না টাঙানো, তার নীচেই একটা সস্তা দামের কাঠের র‍্যাক দেওয়ালে লোহা দিয়ে আটকানো। তার উপরে রয়েছে একটা ছোট্ট সেন্টের শিশি, চিরুনি, পাউডার, একটা ধূপকাঠির প্যাকেট, দেশলাই, আধপোড়া একটা মোমবাতি। তারার ছবির ঠিক নীচে, মেঝেতে একটু জায়গায় সুন্দর আলপনা। দরজার সোজা, যে দেওয়ালে, নরকে শাস্তির ক্যালেন্ডার, তারই নিচে চৌকি, বড়ো বেশ। দেওয়ালের গায়েই সেটা ঠেকানো। বিছানার চাদর টানটান বলা যায়। দুটো বালিশ আছে। বালিশের খোল একটা সবুজ, একটা নীল রঙের। চাদরটা কমলা-সাদা খোপ খোপ।

আমি চৌকিতে বসলাম। চৌকির ডানদিকে একটা ছোট্ট টেবিল আর একটা স্টুল। মেয়েটা তোশকের তলা থেকে একটা ডাইরি বার করে আমার পাশে বসল। লাল রঙের কভার। পাতা উল্টে, ভেতর থেকে একটা ছবি বার করে

আমার হাতে দিয়ে বলল, 'দেখ তো মেয়েটাকে, দেখতে সুন্দর না?' আমি ছবিটা দেখলাম। ১৯/২০ বছরের মেয়ে হবে বোধহয়। বললাম, কে? বলল, 'আমার বোন।' আমি বললাম, কী হয়েছে? ছবি দেখাচ্ছিস কেন? মেয়েটা বলল, 'ওর বিয়ে ঠিক হয়েছিল। বিয়েটা আটকে যাচ্ছিল। আমাদের পাড়ার লোকেরা শয়তানি করছে।' আমি বললাম, কেন? মেয়ে বলল, 'অনেক কথা আছে। তোমাকে তো ওই জন্য সেদিন আসতে বলেছিলাম। পুরোটা শোনো আগে। রাম খাবে? কাজু বাদামও আছে।' আমি বললাম, ঘরেই আছে? বলল, 'হ্যাঁ। দেব?' বললাম, দে। বেশি খাব না।

গ্লাস-বোতল-জল-কাজু টেবিলের উপর হাজির হল। রাম নিয়ে নরকে শাস্তির নিচে দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসলাম।

আমি চুমুক দিলাম। সিগারেট ধরালাম। মেয়েটাও একটা নিল আমার প্যাকেট থেকে। তারপর সেটা ধরিয়ে একটা টান মেরে বলতে শুরু করল তার 'অনেক কথা'।

মেয়েটা বলছে। রামের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছি। আমি শুনছি। মেয়েটা গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। সিগারেট টানছি। কাজুর একটা গোটা শরীর মুখে পুরে চিবোচ্ছি। মেয়েটা বলছে। রামে চুমক দিচ্ছি। সিগারেট টানছি। মেয়েটা ধোঁয়া ছাড়ছে। মেয়েটা বলে চলেছে। মাঝে মাঝে ওর দরজায় কেউ কেউ টোকা দিচ্ছে। ও জানিয়ে দিচ্ছে, এখন হবে না। ঘরে লোক আছে। একবার উঠে গিয়ে মাসিকেও বলে এসেছে, কেউ এলে বলে দিতে যে, আজ হবে না। আমি শুনছি। মেয়ে বলছে। এই মেয়েটা আমাকে কী বলেছিল সেদিন?

এখন ২৬ বছর তার। সত্যি কিনা জানি না। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, নিজেদের সম্পর্কে এরা ঠিক কোনও তথ্য দিতে চায় না। নামটাও ঠিক বলে না। কিন্তু ওর কথা শুনে মনে হয়েছিল, সত্যিই বলছে। সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত আরতির ঘরে বসে কথা শুনেছিলাম। শুনে খুব কষ্টই হয়েছিল। মেয়েটা খুব কেঁদেছিল। আমার সাহায্য চেয়েছিল। চেষ্টা করব সাধ্যমতো বলেছিলাম। মেয়েটা আমার হাত দুটো ধরে খুবই কাতর ভাবে বলেছিল, 'বাচ্চুদা আমাকে বলেছে, তোমাকে বলতে। বলেছে, দাদা ঠিক কিছু একটা করবে।'

এবার বলি, কী ছিল তার সেইসব কথা— আরতির বাবা বৌবাজারে একটা সোনার দোকানে কাজ করতেন। তাদের বাড়ি হুগলিতে। হুগলির কোথায়, কোনও পাড়ার নাম বলেনি সে। বাবা খুব মদ খেতেন। জুয়াও খেলতেন! ২ দিন ৩ দিন টানা বাড়িতে ফিরতেন না। মা চিন্তা করতেন। তারা দুই বোন খুবই

কান্নাকাটি করত। দিন কাটছিল। কিন্তু সংসার চলছিল না। দুই মেয়ে বড়ো হয়েছে, বাধ্য হয়ে মা একটা টেলারিং শপে কাকুতি মিনতি করে একটা কাজ জোগাড় করলেন।

বাচ্চাদের জামার কাপড় বাড়িতে নিয়ে এসে কেটে দিতেন তিনি। খুব বেশি টাকা পেতেন না। এদিকে, মাস খানেক পর একদিন আরতির বাবা নিখোঁজ হয়ে গেলেন। ৩/৪ দিন হয়ে গেল বাড়িতে ফিরলেন না। বৌবাজার গিয়েও লাভ নেই, কোন্ দোকানে কাজ করেন বাড়ির কেউই জানতেন না, পুলিসে খবর দিলেন মা। দিন কয়েক পর খবর পাওয়া গেল, তিনি মারা গেছেন। কীভাবে মৃত্যু হয়েছিল, তা জানা যায়নি। তবে, বাবা আরতির বিয়ের জন্য গয়না বানিয়ে রেখেছিলেন। একটা সোনার চেন জামাইয়ের জন্য, একটা তার জন্য। দুটো আংটি দুজনের জন্য। এছাড়াও সোমার জন্য দুটো চুড়ি আর দুল। সোমা আরতির বোন।

আরতিকে বাধ্য হয়ে কাজের খোঁজে বেরোতে হল। তার সঙ্গে ট্রেনে একদিন এক মহিলার আলাপ হয়। মহিলা তার সঙ্গে কথা বলে সব খবর নেয়। কিছুদিন পর তাকে প্রস্তাব দেয়, কলকাতায় যদি সে কাজ চায়, তবে কাজ আছে, ইচ্ছে হলেই করতে পারে। কী কাজ? মহিলা জানায়, যদি সে রাজি থাকে, তবেই বলবে। আরতিও বলে, না শুনে সে কীভাবে বলবে রাজি আছে কিনা। তখন ওই মহিলা জানায়, ফাঁকা বাড়িতে বড়োলোক ছেলেদের সঙ্গে শুতে হবে। কথাটা শুনে আরতির মেজাজ চড়ে যায়। সে মহিলাকে খারাপ কথা শুনিয়ে দেয়। মহিলা কিন্তু তাতে একটুও রাগ না করেই তাকে বলে, ট্রেনেই তো দেখা হয়। যেদিন ইচ্ছে করবে, সেদিন জানিয়ে দিলেই কাজ হয়ে যাবে। এ লাইনে নাকি খুব ভালো পয়সা আছে।

আরতির কাছে তখন, একদিকে 'ভালো পয়সা'র অফার। বিপরীতে বাড়ির অভাব। আরও কদিন চলে যায়। অবশেষে একদিন সে ওই প্রস্তাব মেনে নেয়। প্রথমে সে তিন মাস ইলিয়ট রোডের একটা বাড়িতে বাস করত। দিনে তার ৪/৫ হাজার টাকা আয় হচ্ছিল তখন। সেখানেই আরও কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে তার আলাপ হয়, তাদের একজন কালীঘাটের সন্ধান দেয় তাকে। কোনও মাসির আন্ডারে নয়। প্রথম থেকেই ঘরে নিজের মতো কারবারের সুযোগ মিলে যায়। ইলিয়ট রোডে যারা আসত, খুব অত্যাচার করত। স্বাভাবিক যৌন প্রক্রিয়ার বাইরেও তাকে বাধ্য করত অন্য কিছু করতে। ফলে, কালীঘাটে এসে সত্যিই আরতির স্বাধীনভাবে কাজের সুযোগ ঘটল।

প্রথম প্রথম কালীঘাট থেকে বিকেলেই বেরিয়ে যেত। বাড়ি ফিরত তাড়াতাড়ি। এভাবেই চলছিল। এর মধ্যে সে মাকে সেলাই মেশিন কিনে দিল। বোনকে আবার কলেজে ভর্তি হতে বলল। তাদের এলাকার স্কুলে স্কুলে ঘুরে ইউনিফর্মের অর্ডার নিল মায়ের জন্য। সে নিজে সকাল ৮টায় বেরিয়ে বাড়ি ফিরত রাত ১০টা-সাড়ে দশটায়। তার মার যতটা না চিন্তা হত তাতে, তার থেকে বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ল পাড়ার লোকেরা। কোথায় যায় মেয়ে? কী করে? চিন্তায় পাড়ার লোকেরা গোয়েন্দাগিরি শুরু করল। সাজ গোজ করে যে মেয়েটা সকাল সকাল বেরিয়ে অত রাতে ফেরে, কোথায় যায়? তার মা যে আর দোকানে বাকি করেন না, পয়সা কোথায় পান? এরই মধ্যে মায়ের এক পরিচিত, বোনের জন্য একটা সম্বন্ধ আনে। মা বলেন, বড়ো মেয়েটা আগে। আরতি মাকে বোঝায়, তার চাকরি নিয়ে সে বেশ ভালো আছে। বোনের বিয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। মা প্রথমে আপত্তি করলেও পরে তা মেনে নেন। আরতির বিয়ের জন্য যে গয়না ছিল, তা-ও বোনের বিয়ের জন্য নির্ধারিত হয়। বিয়ের কথা পাকা হয়। এরই মধ্যে আরতির পাড়ার লোকেরা তাকে ফলো করা শুরু করে। টের পেয়ে যায় সে। একদিন সে বাস থেকে হাজরা মোড়ে নেমে দুজন পাড়ার লোককে দেখতে পেয়ে, কালীঘাটের দিকে না গিয়ে, সোজা হাজরা রোড ধরে হাঁটতে শুরু করে। টের পায় পাড়ার লোক দুজনও তার পিছু নিয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে সে শরৎ বোস রোডে চলে আসে। এরপর একটা চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে, চা আর দুটো বিস্কুট কিনে খায়। খেয়ে হাঁটতে হাঁটতে শিশুমঙ্গল হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখে যে, লোকদুটো আছে এখনও। তার দিকেই চেয়ে আছে। কোনও উপায়ান্তর না দেখে আরতি এবার শিশুমঙ্গল হাসপাতালে ঢুকে যায়।

হাসপাতালের ভিতরে সে অনেকক্ষণ লুকিয়েছিল। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পর বেরিয়ে আর পাড়ার লোক দুটোকে দেখতে পায়নি সে। সেদিন কালীঘাটে না গিয়ে সোজা বাড়ি ফিরে আসে। এরপর থেকে সে, পাড়ার কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলে যে, সে নার্সের কাজের ট্রেনিং নিচ্ছে শিশুমঙ্গলে।

আমাদের সমাজে পাড়ার লোকের গুরুত্বের শেষ নেই। অতএব তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্নজনের জীবনে বিভিন্ন ভূমিকায় ঢুকে পড়ে। তার বোনের বিয়ে ঠিক হয়েছে যে বাড়িতে, সেখানেও চলে যায় পাড়ার লোক। বলে আসে, যেন পাত্রীর দিদি কী করে ভালো করে খোঁজ নিয়ে তবে, ছেলেকে ও বাড়ির মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেন তাঁরা। পাত্রপক্ষও আরতি কী করে তা দেখতে একদিন অনুসরণ করে তাকে। বিপদে পড়লে মানুষের যে মরিয়াভাব তৈরি হয়, তার

তেজ প্রখব— একবগ্গা। পিছন পিছন যে ছেলের বাড়ির লোকজন আসছে, তা বুঝতেই পারে আরতি। বুঝতে পেরেই সেদিনও সোজা চলে আসে সে শিশুমঙ্গল হাসপাতালে।

আমি এখন লিখতে লিখতে ভাবছি, সেইদিনটার কথা। আরতি তখন প্রাণপণে নিজের এই জীবনটা থেকে পালাতে চাইছে, অনুসরণকারী পিছনে তার, কী অবস্থা! এক 'বেশ্যা'র পিছনে ভদ্রলোকের এই সমাজ। যাইহোক, সেদিনও আরতিকে অনেকক্ষণ হাসপাতালের মধ্যেই আত্মগোপন করে থাকতে হয়। বেশ কিছু সময় পরে সে বেরিয়ে যায়। এবং বাড়ি চলে যায়। দুদিন সে আয়হীন হয়। অবশ্য এরপর বোধহয় ছেলের বাড়ির বিশ্বাস হয়। তারা আর কোনও গোলমাল করেনি। বোনের বিয়েটাও ওখানেই হবে ঠিক হয়। তারিখও পাকা হয়। যদিও সে খুবই আতঙ্কে থাকে। আরও বেশ কয়েকদিন কালীঘাটে না গিয়ে বাড়িতে থেকে যায়।

তো, আমি এই পর্যন্ত শুনে বললাম, আমাকে কেন আসতে বলেছিলি? এটা বলবি বলে? নাকি আর কিছু। সে বলে, 'এটা বলতামই, কিন্তু সাহায্য চাই। দুটো।' আমি বললাম কী? বলল, 'বিয়ের নেমন্তন্ন চিঠি লিখে দিতে হবে। আর আমি বোনের বিয়ের শাড়ি কিনতে যাব। আমার সঙ্গে যেতে হবে।' আমি হেসে ফেললাম। বললাম, শাড়ি কিনতে যাব আমি তোর সঙ্গে! অসম্ভব। আরতি বলল, 'কেন? আমার সঙ্গে তোমায় কেউ দেখে ফেলবে?' বললাম, ধ্যার বাল। দুনিয়ার সব লোক জেনে বসে আছে নাকি যে, তুই একজন সেক্স ওয়ার্কার। আর তাতেই বা আমার কী। আমি আসলে, দোকান বাজারে ঘুরে ঘুরে জিনিস কিনতে পারি না। আরতি বলল, 'যেতে হবে।' আমি বললাম, জুলুম নাকি? ও বলল, 'তুমি যাবে।'

শাড়ি কিনতে গেছিলাম। কলেজ স্ট্রিটে। বেনারসি শাড়ি। আমিও ওর বোনের জন্য একটা শাড়ি কিনে দিয়েছিলাম। বিয়ের আগে একদিন বোনকে নিয়ে অফিসে এসে আমাকে হাতে বিয়ের কার্ডটা দিয়ে নেমন্তন্ন করে গেছিল। বোন আমাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল। অফিসের উলটোদিকে হৃষিকেশ পার্কের বেঞ্চে বসে কথা হয়েছিল। দিদি তার বোনকে বলেছিল, 'এই মানুষটা ভালো চায় আমাদের।'

বিয়েতে আমি যেতে পারিনি। অ্যাসাইনমেন্টে বাইরে যেতে হয়েছিল। এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পর, একদিন কালীঘাটে আরতির কাছে গিয়ে দেখলাম

চেহারাটা কেমন যেন লাগছে। অসুস্থ মনে হচ্ছে। বললাম, কী হয়েছে? বলল, 'মাঝে মাঝেই কেমন লাগে। মাথা ঘোরে খুব। দুর্বল লাগে।' বললাম, এবার তুই এই কাজ ছেড়ে দে না। শুনে বলল, 'তারপর? কী করব? খাব কী? কে আমার সাথ দেবে? তুমি? তুমি আমার সাথ দেবে?' শুনে আমার হাত পা কাঁপতে শুরু করেছিল সেদিন। একেবারে চুপ করে গেছিলাম। আরতি তখন বলছিল 'এসব কথা মুখে বলা খুব সোজা। দেবে সাথ? বলো। সব ছেড়ে তোমার সঙ্গে এখনি চলে যাব, যেখানে নিয়ে যাবে।' আমি সেদিন ভয়ে পালিয়ে এসেছিলাম। তারপর আর কোনও দিন ওর কাছে যাইনি। আর কোনও দিন এই রকম কথা বলিনি কাউকে, আর কোনও মেয়েকে। আরতির কথাও কাউকে বলিনি কখনও আর। এখনও আমার ওর ওই কথাগুলো মনে পড়ে, ভয় করে।

লিখতে লিখতেও হাতটা যেন থেমে যাচ্ছে। আমার বেঁচে থাকা, কথাবার্তা, কাজকর্ম, সব তোলপাড় করে দিয়েছে ওই একটা প্রশ্ন, 'তুমি সাথ দেবে?' আমি প্রাণপণে আরতির কথাটা ভুলে যেতে চাই। ভুলতে চাই সবকিছু। আমার আশ্রয় জুটেছে, তার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে নিতে চাই আমি—

কী ভুলতে চায়? বেঁচে আছে, তা-ই ভুলতে চায়।/ শুনছো না বৃষ্টির শব্দে ঘোষণা— 'পালাও'!/ আপিশে, ফ্যাক্টরিতে, ফটকাবাজারে, বা অন্য যে কোনো/ উত্তেজনায়—যেখানে হয় পালাও।/ আর যখন সন্ধের পরে ছুটি, তখন মদ, তখন জুয়ো, বা হয়তো দাম্পত্য/ সুখের ভ্রান্তি, বা কোনো প্রতিকারযোগ্য/ দুঃখের আশ্রয়। যেখানে হোক, যে ক'রে হোক—/ পালাও, দুর্ভাগা জীব, লুকিয়ে রাখো তোমার চেতনার/ অভিসম্পাত, ডুবিয়ে দাও দিনের পর দিনের এই আবর্তন—/ এই হত্যাকারী আবর্তন!

(বুদ্ধদেব বসু। বৃষ্টির দিন)

এইরকম কবিতার পঙ্‌ক্তিতে-পঙ্‌ক্তিতে নিজেকে বেশ লুকিয়ে রাখা যায়। আমার মতো ভদ্রলোকের জীবনযাপনে এই বাড়তি সুবিধাটুকু থাকে।

কলকাতায় সাংবাদিকতা: সেকাল থেকে একাল

স্নেহাশিস সুর

কলকাতার সাংবাদিকতা নিয়ে কিছু বলতে গেলে গর্বে বুক ফুলে ওঠে বইকি! কারণ এই গোটা উপমহাদেশে সাংবাদিকতার সূতিকাগার হচ্ছে শহর কলকাতা। হিকির ইংরেজি কাগজ *বেঙ্গল গেজেট*, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের বাংলা কাগজ বাঙ্গাল গেজেটি, হরিহর দত্তের উর্দু *জাম-ই-জাহান-নুমা*, যুগলকিশোর শুক্লর হিন্দি *উদন্ত মার্তণ্ড* বা রাজা রামমোহন রায়ের ফারসি কাগজ *মিরাত-উল-আখবার*— সবই প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতায় বা কলকাতাকে ঘিরে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায়।

গোড়ার কথা

সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলায় ইংরেজ আমলে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রাচীনকালে ভারতীয় উপমহাদেশে সংবাদ সংগ্রহের কাজে রাজকর্মচারী নিয়োজিত ছিল। কৌটিল্যের তথ্য অনুযায়ী মৌর্য শাসনকালে এক শ্রেণির কর্মচারীর কাজ ছিল রাজ্যের যাবতীয় খবর রাজদরবারে পেশ করা। মোঘল আমলে প্রচলিত নিউজ-লেটার, রাজকীয় বিজ্ঞপ্তি এবং অন্যান্য লিখিত যোগাযোগের কথাও ইতিহাসবিদরা উল্লেখ করে থাকেন। এছাড়া মোঘল আমলেই প্রশাসনিক জেলায় নিয়োজিত ছিলেন অন্তত একজন ওয়াকিয়ানবিশ, যার দায়িত্ব ছিল অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিবরণ ও সংকলন রাজদরবারে প্রেরণ করা।

ব্রিটিশ বণিকের মানদণ্ড ভারতে রাজদণ্ডে পরিণত হওয়ার গোটা প্রক্রিয়া জুড়েই কলকাতা ছিল ঘটনাক্রমের কেন্দ্রস্থলে। ব্রিটিশ শাসনের হাত ধরেই ভারতবর্ষের প্রথম মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম হয় এই বাংলায়। বিদেশি পুঁজির সঙ্গে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানও এখানেই প্রথম ডালপালা মেলে। তার সঙ্গী হিসেবেই আসে সংবাদপত্র। বস্তুত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সময়কাল জুড়ে নানা ধরনের অজস্র সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের শুরু ও শেষ দেখেছে মহানগর। প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ বিদ্বজ্জন, স্বাধীনতা সংগ্রামী, বুদ্ধিজীবী, সমাজ সংস্কারক ও রাজনৈতিক নেতাকর্মী কোনও-না-কোনও পত্রপত্রিকার সঙ্গে জড়িয়ে থেকেছেন বা নিজে সম্পাদক বা প্রকাশক ছিলেন। সমাজ ও রাজনীতির বিভিন্ন মতাদর্শ ও ধারার প্রতিনিধিত্ব করেছে বিভিন্ন পত্রিকা। এর ইতিহাস এত ব্যাপক ও নাটকীয় যে তার রোমাঞ্চ একটি আলোচনায় তুলে ধরা অসম্ভব। এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য কলকাতায় সাংবাদিকতার দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা।

আধুনিক অর্থে সংবাদপত্র বলতে যা বোঝায় তা উপমহাদেশে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি কলকাতায় প্রথম চালু হয়। জেমস অগাস্টাস হিকি কর্তৃক প্রকাশিত দুই পাতার এই ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম ছিল *বেঙ্গল গেজেট বা ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভার্টাইজার*। হিকি ছিলেন মুদ্রণ ব্যবসায়ী। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতায় যে ছাপাখানা বসান, সেখান থেকেই বেঙ্গল গেজেট মুদ্রিত হত। পরবর্তী ছয় বছরে কলকাতা থেকে চারটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাগুলি ছিল *ক্যালকাটা গেজেট* (ফেব্রুয়ারি ১৭৮৪), সরকারি উদ্যোগে প্রকাশিত *বেঙ্গল জার্নাল* (ফেব্রুয়ারি ১৭৮৫), *ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন অভ ক্যালকাটা অ্যামিউজমেন্ট* (এপ্রিল ১৭৮৫) এবং *ক্যালকাটা ক্রনিক্‌ল* (ফেব্রুয়ারি ১৭৮৬)। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত একটি লক্ষণীয় প্রবণতা ছিল, কোনও পত্রিকার সঙ্গে কোম্পানি প্রশাসনের বিরোধ ঘটলে তার বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ। এই প্রক্রিয়াতেই ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে হিকির ছাপাখানা আটক করে বিক্রয় করে দেওয়া হয় এবং হিকিকে সর্বস্বান্ত করা হয়। তাঁর দেশে ফেরারও টাকা ছিল না। একটি জাহাজের ডেকে তিনি উঠতে পেরেছিলেন এবং সেই যাত্রাপথেই তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর মরদেহ সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হয়। *বেঙ্গল জার্নাল* এবং পরবর্তীকালে *ইন্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড*-এর সম্পাদক উইলিয়ম দুয়েনকে ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে গ্রেফতার করা হয় এবং ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এমনি ঘটনা ঘটেছে *বেঙ্গল হরকরা*-র স্বত্বাধিকারী চার্লস ম্যাকলিয়েন (১৭৯৮), *ক্যালকাটা জার্নাল*-এর সম্পাদক

জেমস সিল্ক বাকিংহাম (১৮২৩), পত্রিকাটির পরবর্তী সম্পাদক আর্নট (১৮২৩) এবং আরও অনেকের ক্ষেত্রে। এর থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হচ্ছে যে শুরুর সময় থেকেই সংবাদপত্র ছিল প্রতিষ্ঠানবিরোধী, তার ব্রিটিশ সম্পাদক থাকলেও। সেই বিরোধিতার জন্য অনেকের কপালেই জুটেছে শাস্তি এবং বন্ধ হয়েছে বহু কাগজ। এটা নিঃসন্দেহে একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়, কারণ শাসক এবং সম্পাদক দুজনেই ছিলেন ব্রিটিশ।

আঠারো শতকের শেষভাগ এবং উনিশ শতকের শুরুতে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির বিষয়বস্তু ছিল হিকি-প্রভাবিত। বিদেশি সংবাদ, পার্লামেন্টের বিতর্ক, ইংল্যান্ডের পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি, স্থানীয় সমাজের খবর, সম্পাদকের কাছে লেখা চিঠি, সরকারি নোটিশ, পোয়েটস কর্নার, বিজ্ঞাপন, ফ্যাশন সংক্রান্ত খবর সবকিছুতেই ছিল হিকির গেজেটের অনুকরণ। খুব ব্যতিক্রমী দুই একটি দৃষ্টান্ত ছাড়া এদেশি জনগণ এবং সমাজ সম্পর্কে বিশেষ কোনও সংবাদ থাকত না। আরও লক্ষণীয় বিষয় হল, ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতা থেকে প্রকাশিত সমস্ত পত্রিকাই ছিল ইংরেজি ভাষায় এবং ইয়োরোপীয়দের দ্বারা সম্পাদিত ও পরিচালিত।

উপমহাদেশে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে *দিগ্‌দর্শন* নামে বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। সেটা যদিও কলকাতায় হয়নি। এই মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশ করে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন। এই পত্রিকায় থাকত যুবকদের জন্যে নানান উপদেশ। একই বছর ১৮ মে শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান মিশনারিরা আর-একটি বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করে। এটি ছিল জন ক্লার্ক মার্শম্যান সম্পাদিত সাপ্তাহিক *সমাচার দর্পণ*। এটি প্রায় ২০ বছর চালু ছিল। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দেই বাঙালি মালিকানায় প্রথম সংবাদপত্র *বাঙ্গাল গেজেটি* প্রকাশিত হয়, প্রকাশক ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, কারও কারও মতে গঙ্গাধর। মাঝেমধ্যে এতে ইংরেজি ও হিন্দিতে কিছু নিবন্ধ মুদ্রিত হলেও সাধারণভাবে এর ভাষা ছিল বাংলা। হরচন্দ্র রায় ছিলেন *বাঙ্গাল গেজেটি*-র সম্পাদনার কাজে গঙ্গাকিশোরের অন্যতম সহযোগী।

তবে কোন্‌টি প্রথম বাংলা পত্রিকা এবং সংবাদপত্র তা নিয়ে মতপার্থক্য আছে। ১৮৫২ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিত সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত এবং ১৮৫৫ সালে পাদরি লং-এর লেখা *ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ অভ বেঙ্গলি ওয়ার্কস* গ্রন্থে তার স্বীকৃতি আছে। তবে একটি সংখ্যা প্রকাশের পর *বাঙ্গাল গেজেটি* বন্ধ

হয়ে যায়। অবশ্য বিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিকরা আবার এবিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। কারণ গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের *বাঙ্গাল গেজেটি*-র কোনও মুদ্রিত সংস্করণ হাতে পাওয়া যায়নি। এঁদের মতে, *সমাচার দর্পণ* হল বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র— যা ছিল সাপ্তাহিক। যদিও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং *সমাচার চন্দ্রিকা*র সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় *বাঙ্গাল গেজেটি*কেই প্রথমের আসন দিয়েছেন। *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* গ্রন্থের সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই মতই প্রকাশ করেছেন। সেসময়কার দুটি পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন এবিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮১৮ সালের ১৪ মে একটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপনে *বাঙ্গাল গেজেটি* প্রকাশিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়। আর ১৬ মে ১৮১৮-র *ওরিয়েন্টাল স্টার* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদে নতুন একটি বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের সূচনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এর থেকেই অনুমান *বাঙ্গাল গেজেটি* প্রকাশিত হয় ১৫ মে ১৮১৮ অর্থাৎ *সমাচার দর্পণ* প্রকাশের সপ্তাহখানেক আগে। সুতরাং গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যকেই প্রথম বাঙালি সম্পাদকের আসনটি দেওয়া হয়। কারণ *সমাচার দর্পণ*-এর সম্পাদক হিসেবে মার্শম্যানের নাম থাকত। তবে *সমাচার দর্পণ*-এর সম্পাদনার মূল কাজটা করতেন দুই বাঙালি— প্রথমে জয়গোপাল তর্করত্ন এবং পরে তারিণীচরণ শিরোমণি।

১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের ১ মে জেমস সিল্ক বাকিংহাম সম্পাদিত *ক্যালকাটা জার্নাল* অর্ধ-সাপ্তাহিক থেকে দৈনিক-এ রূপান্তরিত হয়। *ক্যালকাটা জার্নাল*ই ছিল উপমহাদেশের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। ভারতের প্রথম হিন্দি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল এই কলকাতাতেই। *উদন্ত মার্তণ্ড*। ১৮২৬ সালের ৩০ মে এই সাপ্তাহিকটি প্রকাশ করেন যুগলকিশোর শুক্ল। তবে এর আয়ু ছিল ২ বছরেরও কম সময়। শুধু হিন্দি নয়, ফারসি ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র *মিরাত-উল-আখবার*ও প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকেই। ১৮২২ সালের ১২ এপ্রিল এই সাপ্তাহিকটি প্রকাশ করেন রাজা রামমোহন রায়।

বস্তুত মিশনারি উদ্যোগের বিপ্রতীপে ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় প্রকাশ করেন *ব্রাহ্মণ সেবধি* পত্রিকা এবং কিছুটা পরে *সম্বাদ কৌমুদী* পত্রিকা। এই পত্রিকায় রামমোহন সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে ও অন্য সামাজিক আন্দোলনের পক্ষে লিখতেন। এর বিরোধিতা করে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করলেন *সমাচার চন্দ্রিকা*।

এ প্রসঙ্গেই চলে আসে অ্যাডাম্‌স গ্যাগের কথা। ইংরেজি ও দেশীয় পত্রপত্রিকাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল জন অ্যাডাম ১৮২৩ সালের ১৪ মার্চ একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। তাতে বলা হয়, গভর্নর জেনারেলের লাইসেন্স ছাড়া কোনও সংবাদপত্র প্রকাশ করা যাবে না। এর প্রতিবাদে রামমোহন রায়সহ কলকাতার ৬ জন বিশিষ্ট নাগরিক সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানান। তা নাকচ হয়ে যায়। এরপর রামমোহনের অনুরোধে বিলেতে তার বন্ধু বাকিংহাম প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন জানান, তা-ও নাকচ হয়। এর প্রতিবাদে রামমোহন তাঁর মিরাত-উল-আখবার পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ করে দেন। আইনটি ১২ বছর বলবৎ ছিল। এখানে যে ব্যাপারটা লক্ষ করার সেটা হল যে, সংবাদপত্র প্রকাশের পাঁচ বছরের মধ্যেই সরকার সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করার জন্যে আইন আনছেন। ১৮৩৫ সালে আর-এক অস্থায়ী গভর্নর চার্লস মেটকাফ আইনটি প্রত্যাহার করে নেন। তবে একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, এই আইন চালু থাকার সময়েই প্রায় ২০টির মতো সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে *বিজ্ঞান সেবধি* (এপ্রিল ১৮৩২, মাসিক); *বিজ্ঞান সার সংগ্রহ* (সেপ্টেম্বর ১৮৩৩, পাক্ষিক); ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যদের উৎসাহে প্রকাশিত *প্রগতিশীল জ্ঞানান্বেষণ* (জুন ১৮৩১, সাপ্তাহিক); অল্পবয়স্কদের জন্য *জ্ঞানোদয়* (ডিসেম্বর ১৮৩১); *শাস্ত্রপ্রকাশ* (জুন ১৮২৩, সাপ্তাহিক), *ভক্তিসূচক* (সেপ্টেম্বর ১৮৩৫) প্রভৃতি। দলাদলি নিয়েও একটি কাগজ প্রকাশিত হয়, যার নাম ছিল *দলবৃত্তান্ত* (১৮৩২)। তবে এসবের মধ্যে আলাদা স্থান করে আছে *সংবাদ রসরাজ*। ১৮৩৯ সালে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। প্রথমে সপ্তাহে একবার করে প্রকাশিত হলেও পরে দুবার করে প্রকাশিত হত। সম্পাদক ছিলেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। এই কাগজে নানা নিম্নরুচির রচনা প্রকাশিত হত। বলা হয়, বাংলায় হলুদ সাংবাদিকতার প্রথম নমুনা এই পত্রিকাটি।

এছাড়া বলতে হয় ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর কথা। তৎকালীন হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও ও তাঁর অনুগামীদের এই গোষ্ঠী সনাতন রীতিনীতি, কুসংস্কার, আচার-আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁদের বিভিন্ন পত্রপত্রিকাগুলিতে সেই মতামতই প্রতিফলিত হয়েছে। *বেঙ্গল স্পেক্টেটর* ছিল ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর মুখপত্র, এছাড়া ছিল *জ্ঞানান্বেষণ* পত্রিকা। তাঁদের এই পত্রিকাগুলিতে মধ্যযুগীয় অজ্ঞতার পরিবর্তে যুগোপযোগী বিজ্ঞান ও যুক্তিধর্মী জ্ঞানের সন্ধান করা হত। এগুলিতে উদার ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতির পক্ষে বক্তব্য পেশ করা হত। তুলে ধরা হত কৃষকদের সমস্যা। ১৮৩১ সালে প্রকাশিত প্রসন্নলাল ঠাকুরের *রিফর্মার* পত্রিকার কথাও এখানে উল্লেখ থাকা দরকার।

অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয় ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৯০ বছর ধরে এটি প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৪৬ সালে মৌলভী ফরিদুদ্দীন খাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত *জগদুদ্দীপক ভাস্কর* নামের সাপ্তাহিকটি ছিল পঞ্চভাষিক। প্রথম সচিত্র পত্রিকা *বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ* (মাসিক) প্রকাশিত হয় ১৮৫১ সালে, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায়। নারীদের জন্য প্রথম মাসিক পত্রিকা (১৮৫৪) বের করেন প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মেয়েদের জন্য অনেক সাময়িক পত্রিকা হয়েছিল; যেমন— *অবলাবান্ধব পত্রিকা*, *বঙ্গমহিলা*, *বিনোদিনী*, *হিন্দুললনা* ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ছিল *বামাবোধিনী পত্রিকা*। *বামাবোধিনী পত্রিকা* প্রকাশিত হয়েছিল বামাবোধিনী সভার উদ্যোগে। বামাবোধিনী সভা কেশবচন্দ্র সেন এবং ব্রাহ্ম আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ভাদ্রমাসে কলকাতায় *বামাবোধিনী পত্রিকা* আত্মপ্রকাশ করেছিল। *বামাবোধিনী পত্রিকার* প্রথম সম্পাদক ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নেতা উমেশচন্দ্র দত্ত। *বামাবোধিনী পত্রিকায়* বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হত। থাকত ভ্রমণবৃত্তান্ত, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, চিত্রকলা, বিজ্ঞান, বিশ্লেষণ,বিদেশি নারীর সাফল্য কাহিনি, স্বাস্থ্যজ্ঞান, ধর্ম আলোচনা এবং গার্হস্থ্য প্রসঙ্গ। তবে প্রধান বিষয়বস্তু ছিল তিনটি— শিক্ষার প্রয়োজন ও সার্থকতা, শিশুপালন সংক্রান্ত নিয়মাবলি এবং পরিবারে রমণীর কর্তব্য ও স্থান।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের শাসন ব্যবস্থা কোম্পানির হাত থেকে সরাসরি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অধীনে চলে যায়। ফলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটতে শুরু করে। তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিতেও। সাংবাদিকতার বিভিন্ন ধারা তৈরি হয়।

এই সময়ের সংবাদপত্রগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় *হিন্দু পেট্রিয়ট* এবং তার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথা। ১৮৪৬ সালে গভর্নর জেনারেল হিসেবে এসে লর্ড ডালহৌসি স্বৈরাচারের বন্যা বইয়ে দেন। ওই সময়ই প্রকাশিত হয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের *বেঙ্গল রেকর্ডার*। এই পত্রিকায় হরিশচন্দ্র নিয়মিত লিখতেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র এই পত্রিকা বেশিদিন চালাতে পারেননি। ১৮৫৩ সালে এই পত্রিকার প্রকাশক পালটে যায় এবং গিরিশচন্দ্র হরিশচন্দ্রকে পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করেন। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ এবং

নীল বিদ্রোহের সময় *পেট্রিয়ট*-এর নির্ভীক সাংবাদিকতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই দুই ঐতিহাসিক ঘটনার যে মূল্যায়ন হরিশচন্দ্র করেছিলেন, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কিন্তু নিজের মতামত প্রকাশে তিনি দ্বিধা করেননি। নীলকরদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁর লেখনী পেট্রিয়টকে সে-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রের মর্যাদা দান করে। *পেট্রিয়ট*-এর মতামত এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে স্বয়ং বড়োলাট লোক পাঠিয়ে *পেট্রিয়ট*-এর প্রতিটি সংখ্যা প্রথম সংগ্রহ করতেন। ১৮৫৫-১৮৬১ সময়কাল ছিল এই পত্রিকার গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। মহাবিদ্রোহ ও সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে হরিশচন্দ্রের সমর্থন না থাকলেও নীল বিদ্রোহে তাঁর ভূমিকা ছিল আলাদা। তিনি নীলচাষিদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন এবং গ্রাম বাংলায় সাংবাদিক বাহিনী গড়ে তুলেছেন, যারা সংবাদ সংগ্রহের পাশাপাশি আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করত।

এই সময়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা *সোমপ্রকাশ*। ১৮৫৮ সালের শেষের দিকে বিদ্যাসাগরের পৃষ্ঠপোষকতায় ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় পত্রিকাটি পথচলা শুরু করে। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটির বিষয় ছিল রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি। বিষয়, দৃষ্টিভঙ্গি, জনপ্রিয়তা, প্রচারসংখ্যা— সব দিক থেকে বিচার করলে *সোমপ্রকাশ* উনিশ শতকের বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুখপত্র। আন্তর্জাতিক প্রগতির ঘটনাক্রম প্রকাশের পাশাপাশি দেশের ক্ষেত্রে পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ঔপনিবেশিকতাবিরোধী ও গণতান্ত্রিক। মূলত *সোমপ্রকাশ* দ্বারা আতঙ্কিত হয়েই দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য লর্ড লিটন ১৮৭৮ সালে ভার্নাকুলার প্রেস আইন জারি করেন।

এই আইন জারির পর দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক *অমৃতবাজার* পত্রিকা শুধু ইংরেজিতে প্রকাশিত হতে থাকায় ওই আইনে তার কিছু করা যায়নি। কিন্তু *সোমপ্রকাশ* প্রায় এক বছর বন্ধ থাকে। পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হওয়ায় এত তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় যে ব্রিটিশরা দ্বারকানাথকে ডেকে বুঝিয়ে পত্রিকা চালু করতে বাধ্য হয়। ১৮৮৬ সালে দ্বারকানাথের মৃত্যু হয়। তারপরও কিছুদিন পত্রিকাটি চলেছিল।

অমৃতবাজার পত্রিকা পরাধীন ভারতে চালু হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামী পত্রিকা। এর শুরু ১৮৬৮ সালের ২০ জানুয়ারি যশোর জেলার মাগুরা পালুয়া গ্রাম থেকে হলেও ১৮৭১ সাল থেকে এটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হত। *অমৃতবাজার* ১৯৮১ সাল পর্যন্ত চলেছিল। ১৯৩৭ সালে এই সংস্থা থেকে *যুগান্তর* নামে একটি বাংলা দৈনিকও প্রকাশিত হয়। সেটিও ১৯৮১ পর্যন্ত চলে।

উনিশ শতকে বাংলা ভাষায় সংবাদপত্রের বিকাশে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাগজ হল *বেঙ্গলি* পত্রিকা। এটি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হত।

১৮৭৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে *দ্য স্টেটসম্যান*। এই পত্রিকা নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। দেশীয় লগ্নি থাকলেও পত্রিকাটির মালিকানা ছিল ইংরেজদের হাতেই। স্বাধীনতার পরও এর মালিকানা ইংরেজরা ত্যাগ করেনি। তবে মালিকানার চরিত্র যাই হোক, *স্টেটসম্যান* বিভিন্ন বিষয়ে ভারতীয়দের দাবিকে সমর্থন করত। এই পত্রিকা বঙ্গভঙ্গেরও বিরোধিতা করেছিল। প্রথম রোটারি প্রেসে সংবাদপত্র ছাপা শুরু করেছিল *স্টেটসম্যানই*।

স্বাধীনতার প্রস্তুতি

তারপর এসে গেল বিংশ শতাব্দী। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দাবিতে দেশ ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠল। তার প্রতিফলন স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ল সংবাদ মাধ্যমেও। রাজনীতির বিভিন্ন ধারা যেমন সেখানে ছাপ ফেলতে থাকল, তেমনই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও মতবাদের লোকেরা নিজেদের বক্তব্য প্রচারের জন্য নানা পত্রপত্রিকা প্রকাশ করা শুরু করল। ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত *ডন* পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মাসিক এই ইংরেজি পত্রিকাটিতে বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চমানের নিবন্ধ প্রকাশিত হত। ১৬ বছরের জীবনে *ডন* বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ছাপ রেখে গেছে। বঙ্গভঙ্গ ও কার্লাইল সার্কুলারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, জনমত গঠনে ভূমিকা রেখেছে।

এই সময় থেকেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চরমপন্থী ও নরমপন্থী এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। চরমপন্থীদের মুখপত্র হয়ে ওঠে যুগান্তর এবং নরমপন্থীদের মুখপত্র ছিল *বন্দে মাতরম্*। *বন্দে মাতরম্* পত্রিকাটি কিছুদিন শ্রীঅরবিন্দও সম্পাদনা করেছেন। এছাড়া জাতীয়তাবাদীদের আরও একটি পত্রিকা ছিল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের *সন্ধ্যা*। মেঠোভাষায় লিখিত *সন্ধ্যা* বাংলা সাংবাদিকতায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই পত্রিকার দফতরে খানাতল্লাশি হয়, পত্রিকার ব্যবস্থাপক সারদাচরণ সেন গ্রেফতার হন। গ্রেফতার হন ব্রহ্মবান্ধবও। *সন্ধ্যা* ছাড়াও ব্রহ্মবান্ধব *স্বরাজ* নামেও একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ *যুগান্তর* ও *বন্দে মাতরম্* দুই পত্রিকাতেই লিখতেন। জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর শ্রীঅরবিন্দ *কর্মযোগিন* নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন। এই সময় স্বদেশি চেতনার প্রসারে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছিল

বেঙ্গলি, *অমৃতবাজার পত্রিকা*, বিপিনচন্দ্র পালের *নিউ ইন্ডিয়া*, *ডন*, *হিতবাদী*, *সঞ্জীবনী*, *সন্ধ্যা* প্রভৃতি পত্রিকা। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠায় প্রায় সবকটি পত্রিকাই ব্রিটিশরাজের রোষের মুখে পড়েছিল। চরমপন্থী অবস্থানের জন্য তীব্র আক্রমণের মুখে পড়েছিল *যুগান্তর*ও। এর সম্পাদক ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর এক বছরের জেলও হয়। বারবার আঘাত হানা সত্ত্বেও *যুগান্তর* চলতে থাকায় শেষ অবধি পত্রিকার ছাপাখানা নষ্ট করে দেওয়া হয়। ১৯০৮ সালের ৬ জুলাই পত্রিকার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।

এইসব ঘটনার মধ্য দিয়েই ভারত তথা কলকাতার সাংবাদিকতা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। পেশা হিসেবেও সাংবাদিকতার বিকাশ ঘটছিল। সে সময় কলকাতা থেকে *ভারত মিত্র* ও *বিশ্বমিত্র* নামে দুটি শক্তিশালী হিন্দি পত্রিকা প্রকাশিত হত।

এই সময় কলকাতার সংবাদপত্রের দুনিয়ায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ১৯২৩ সালের ১ জানুয়ারি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তাঁর স্বরাজ্য দল গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজি দৈনিক *ফরওয়ার্ড* প্রকাশ করেন। সেটাই ছিল বাংলার প্রথম দলগত বা পার্টি পত্রিকা। এই কাজে দেশবন্ধুর ডানহাত ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু।

১৯২২ সালে মৃণালকান্তির ঘোষ, প্রফুল্লকুমার সরকার ও সুরেশচন্দ্র মজুমদার বাংলা দৈনিক *আনন্দবাজার পত্রিকা* প্রতিষ্ঠা করেন। সেই প্রতিষ্ঠান বহুদিন যাবৎ কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ সংবাদ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সক্রিয় রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান থেকে বহু সাময়িকী প্রকাশিত হয়। ১৯৮২ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠান *দ্য টেলিগ্রাফ* নামে ইংরেজি দৈনিকটি প্রকাশ করে চলেছে। এছাড়া টেলিভিশন মাধ্যমেও তারা বাংলায় অগ্রগণ্য। এবিপি আনন্দ তাদের সংবাদ চ্যানেল।

ফেরা যাক ইতিহাসে। ১৯৩৭ সালে নিজস্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রকাশ করেন *ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া*। ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের সাপ্তাহিক মুখপত্র প্রকাশ করা শুরু করে। নাম ছিল *জনযুদ্ধ*। সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়। বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে সিপিআই প্রকাশ করে তাদের দৈনিক পত্রিকা *স্বাধীনতা*। তার প্রথম সম্পাদক ছিলেন সোমনাথ লাহিড়ি।

স্বাধীনতার পর

স্বাধীনতার পর কেটে গেছে প্রায় ৭৫ বছর। দুনিয়া ও দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কলকাতার সাংবাদিকতাও বহু পথ পেরিয়েছে। *আনন্দবাজার, বর্তমান, এই সময়, আজকাল, প্রতিদিন*— বেশ কয়েকটি বাংলা দৈনিক, কয়েকটি ইংরেজি দৈনিক, কিছু হিন্দি ও উর্দু দৈনিক বর্তমানে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এছাড়া প্রকাশিত হয় বেশ কিছু সাময়িকপত্র। বহু সংবাদ চ্যানেল সম্প্রচারিত হয় মহানগর থেকে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এসেছে কিছু ওয়েব মিডিয়া ও ইউটিউব চ্যানেল। সেগুলি এখন পরিণত হয়ে ওঠার অপেক্ষায়।

গত ৭৫ বছরে সাংবাদিকতার নানা রকমফের দেখেছে তিলোত্তমা। এই সময়কালেই এসেছেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মতো ঋজু, দায়িত্বশীল সাংবাদিক, এসেছেন সন্তোষকুমার ঘোষের মতো আধুনিকতার বার্তাবাহক, আবার জরুরি অবস্থার প্রতিবাদ করে কারাবরণ করা গৌরকিশোর ঘোষ। পেয়েছি অসাধারণ সব প্রতিবেদককে। সেই তালিকা শেষ হওয়ার নয়। তবে এসবের মধ্যেই অন্যভাবে স্মরণীয় হয়ে গেছেন বরুণ সেনগুপ্ত। তিনিই কলকাতার একমাত্র সাংবাদিক, যিনি একটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করে তাকে সফলভাবে পরিচালনা করে স্থায়িত্ব দিয়ে গেছেন।

স্বাধীনতার আগে সাংবাদিকতার মূল ধারা ছিল প্রধানত ব্রিটিশের বিরোধিতা করা। তারপর এল বহু অভীষ্ট স্বাধীনতা। ক্ষমতায় এল নিজেদেরই সরকার। ফলে সংবাদপত্রও প্রতিবাদী রূপ ছেড়ে সাথ দিতে লাগল সরকারের নেওয়া নতুন দেশ গড়ার নানান প্রকল্পে। এ যেন এক মধুচন্দ্রিমার সময়। সাংবাদিকতা বলতে তখন মুদ্রণ মাধ্যমেরই প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশি। স্বাধীনতার আগে বাংলা সাংবাদিকতার ভাষা ছিল সাধু। জোর দেওয়া হত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নেতাদের ভাষণের প্রতিবেদনের দিকে। চলন ছিল টানা দীর্ঘ লেখার। সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশের সরকারকে দেশের সংবাদপত্র ধরে নিল মূলত নিজেদের সরকার হিসেবে।

জরুরি অবস্থা ও সংবাদমাধ্যম

ক্রমে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকতে শুরু হলে সংবাদপত্রও এই ভালোলাগা থেকে বেরিয়ে এসে সমালোচনার দিকে যেতে থাকে। সরকারের সমালোচনা হয়ে উঠছিল সংবাদপত্রের অন্যতম বিচার্য বিষয়। যার চরম পরিণতি ১৯৭৫-এর জরুরি অবস্থায়। সংবাদপত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ হল। বাধ্য করা হল শুধু

সরকারের পক্ষে লিখতে। প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন কলকাতার সাংবাদিকরা। গ্রেপ্তার হলেন সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ এবং বরুণ সেনগুপ্ত। অনেক কাগজ সেন্সরশিপে বাদ দিয়ে দেওয়া লেখার জায়গা সাদা রেখে কাগজ বের করে তার প্রতিবাদ করলেন। সারা দেশের সঙ্গে কলকাতার সাংবাদিকরাও জরুরি অবস্থার প্রতিবাদে মিছিল করলেন। স্বাধীনতার পর সারা দেশের সঙ্গে কলকাতার সাংবাদিকদের কাছে এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যার সঙ্গে সাংবাদিকরা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন একাধিক দিক থেকে। এর পরে বিহার প্রেস বিল, ডিফেমেশন বিল— এই সবের প্রতিবাদ করে কলকাতার সাংবাদিকরা। বামফ্রন্ট সরকার মহাকরণের প্রেস কর্ণার সরিয়ে দিলেও কলকাতার সাংবাদিকরা তারও প্রতিবাদ করে। আর এইসব প্রতিবাদে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সবরকম প্রতিবাদে শামিল হন কলকাতার চিত্র-সাংবাদিকরাও।

বিবর্তন

অন্যদিকে, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংবাদের ভাষা এসে গেল কথ্য-তে। লেখা হয়ে গেল আকারে ছোটো। বস্তুনিষ্ঠতা পেল সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব, আবেগ গেল কমে। খবরের কাগজের লেখা কম্পোজের পদ্ধতিতেও বদল ঘটল। লাইনো যন্ত্রের গলা সিসের বদলে এল ঠান্ডা পদ্ধতি, মানে ফটো টাইপ সেটিং বা পিটিএস। ছাপার পদ্ধতিতে এল অফসেট। জল আর কালির মিশ্রণে ছাপা শুরু হল এই পদ্ধতিতে। ছাপার যন্ত্রে নিউজপ্রিন্টের রিল পালটানোও হয়ে গেল স্বয়ংক্রিয়। দৈনিক কাগজের ছাপায় শুরু হল রঙের ব্যবহার। রঙিন শিরোনাম, রঙিন ছবি, মডিউলার বা চৌকো পৃষ্ঠাসজ্জা, উন্নত মানের দুধ-সাদা নিউজপ্রিন্টের ব্যবহারে খবরের কাগজের পাতা হয়ে উঠল অনেক বেশি আকর্ষণীয়। আরও পরে সংবাদ লেখা, ও তার সম্পাদনা ও পৃষ্ঠা সজ্জার পুরো প্রক্রিয়াটাই হয়ে গেল কম্পিউটারচালিত। ক্রমে ক্রমে খবরের কাগজের দপ্তর বা নিউজরুম হয়ে গেল কাগজশূন্য। অন্যদিকে চলিত ভাষার ব্যবহার, ছোটো মাপের লেখা, চটকদারি শিরোনাম, বিষয় নির্বাচনের বৈচিত্র্য, দেশ-বিদেশের খবর, খেলার খবর, উত্তর-সম্পাদকীয় রচনার নতুন নতুন বিষয়, জেলার খবরের আধিক্য এবং প্রাধান্য খবরের কাগজের জনপ্রিয়তা নিঃসন্দেহে বাড়াল। আর দূরদর্শনে আগের সন্ধ্যায় দেখে নেওয়া ঘটনাকে খবরের কাগজের পাতায় পরের দিন সকালে, সেই আগের সন্ধ্যার দর্শক, যে কিনা পরের দিন সকালের খবরের কাগজের পাঠকও বটে, তার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আরও

বিশদভাবে সংবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা হল। কে কী বলেছেন এর বদলে সাংবাদিকতার ভাষায় যাকে বলে কালার স্টোরি মানে পরিস্থিতির বর্ণনা, সেইসঙ্গে অন্তর্তদন্তমূলক প্রতিবেদন, বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনের সংখ্যা বাড়তে লাগল। আগেরদিনে টিভিতে দেখা খেলার ম্যাচ রিপোর্টের বদলে খেলার পাতায় এসে গেল ক্যাম্প স্টোরি।

অন্যদিকে, এক জায়গা থেকে তৈরি করা কাগজ অন্য জায়গায় ছেপে স্থানীয়ভাবে বিলি করার প্রযুক্তি। তাই বিভিন্ন জায়গার জন্য নির্দিষ্ট পাতায় স্থানীয় খবর বেশি করে দিয়ে আর বাকি পাতাগুলো এক রেখে শুরু হল মাল্টি-সিটি সংস্করণ। এতে অনেক দুর্গম জায়গায়, আগে যেখানে কলকাতায় ছাপা কাগজ ট্রেনে বা বাসে যেত দেরিতে, তা এখন পৌঁছে গেল সকালেই। আর নবসাক্ষর হওয়া মানুষ, আর্থিক দিক থেকে একটু সচ্ছলতার মুখ দেখতে পাওয়া মানুষ, রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পাওয়া মানুষ, খবরের কাগজ কেনাকে তার নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচের মধ্যে স্থান দিল। মফস্‌সলে খবরের কাগজের বিক্রি বাড়া এবং মফস্‌সলে বিভিন্ন ধরনের পণ্য তথা দামি বিলাসদ্রব্যের ব্যবহার বাড়ায়, নতুন এই বাড়তি ক্রয়ক্ষমতা হাতে আসা মফস্‌সলের নতুন ক্রেতাকুলের কাছে পণ্যের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য নির্মাতারা খবরের কাগজে আরও বেশি করে তাদের পণ্য ও পরিষেবার বিজ্ঞাপন দিতে লাগলেন। কারণ, মফস্‌সলে খবরের কাগজের প্রচারসংখ্যা ইতিমধ্যেই বেড়েছে। সুতরাং সামগ্রিকভাবে খবরের কাগজের আরও লাভ হতে শুরু হল। তাই বাংলা কাগজের প্রচার-সংখ্যা বাড়ছিল এবং এই বাড়তে থাকাটা অব্যাহত ছিল প্রায় কোভিড পর্যন্ত। পরে একদিকে কোভিড আর অন্যদিকে ডিজিটাল বা অনলাইন মাধ্যমের রমরমা ছাপা খবরের কাগজের চাহিদা তথা বিক্রি কমিয়ে দিল।

আকাশবাণী কলকাতা

কলকাতার সাংবাদিকতা কিন্তু শুধুই মুদ্রণ মাধ্যমের সাংবাদিকতা নয়। বেতার, দূরদর্শন ও অন্য বেসরকারি টিভি চ্যানেলের কথা অবশ্যই আলোচনায় আসবে। প্রথমে আসি কলকাতা বেতারের কথায়। বেতারের কথা এলেই চলে আসে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং বিজ্ঞানী শিশিরকুমার মিত্রের কথা। কলকাতার বিজ্ঞান ভবনে পরীক্ষামূলকভাবে একটি ট্রান্সমিটার বসে ১৯২৫ সালে। এই খবর পেয়ে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন বা বিবিসি পরিস্থিতি দেখার জন্য

পাঠায় মি. সি সি অয়ালিক-কে। তিনি কলকাতা হাইকোর্টের কাছে একটি সম্প্রচার স্টুডিও গড়ে তোলেন ১৯২৬ সালে। প্রচলন হল দশটাকা দামের কানে হেডফোন লাগানো বিশেষ রেডিও-র যার হেডফোন একজন থেকে অন্যজন নিয়ে শুনত। সাধারণ মানুষের মধ্যে রেডিওর জনপ্রিয়তা বাড়াবার জন্য সাহেবরা ময়দানে তাঁবু ফেলে জনগণকে রেডিওর অনুষ্ঠান শোনাতে শুরু করলেন। তার পরের বছর ১৯২৭ সালে ১ নম্বর গারস্টিন প্লেসে ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি নামে তাদের বেতার সম্প্রচার শুরু করল বিবিসি। বিভিন্ন জ্ঞানীগুণী মানুষকে ডেকে এনে অনুষ্ঠান করানো হত। ১৯৩০-এ শুরু হল সংগীত শিক্ষার আসর। ১৯৩১-এ এ দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে 'বসন্তেশ্বরী'। লেখায় বাণীকুমার, সুরে পঙ্কজকুমার মল্লিক এবং হরিশচন্দ্র বালি। এই অনুষ্ঠানটিই পরের বছর 'মহিষাসুরমর্দিনী' নামে বিখ্যাত অনুষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের বেতারের সঙ্গে যোগ ছিল খুবই। এর আগেই কিন্তু ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি দেউলিয়া ঘোষিত হয়। এবার দায়িত্ব নিল সরকারের শিল্প ও শ্রম দপ্তর। বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই আবার সংকট। শ্রোতাদের চিঠি গেল সরকার বাহাদুরের কাছে। ১৯৩৫-এ কন্ট্রোলার অভ ব্রডকাস্টিং হিসেবে ভারতে এলেন বিবিসির লিওনেল ফিলডেন। ১৯৩৬-এর ৮ জুন সংস্থার নাম হল অল ইন্ডিয়া রেডিও। স্বাধীনতার একদশক পরে কলকাতার বেতার কেন্দ্র চলে আসে গারস্টিন প্লেস ছেড়ে রাজভবনের পশ্চিমে তার নতুন ভবনে। সংস্থার নাম হয় আকাশবাণী।

আকাশবাণী কলকাতা শুরু থেকেই বাঙালির হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। কত যে স্বনামধন্য ব্যক্তি পূর্ণ বা আংশিক সময়ে এখানে কাজ করেছেন বা অনুষ্ঠান বা সংগীত পরিবেশন করেছেন তার শেষ নেই। সে তালিকা দিতে গেলে লেখার শেষ হবে না। একদিকে সংগীতের বিভিন্ন ধারা, অন্যদিকে বেতার- নাটক, কথিকা, ধারা-বিবরণী, আর সংবাদ ও সংবাদভিত্তিক সব অনুষ্ঠান শ্রোতাদের মন কেড়ে নেয়। আকাশবাণীর যুববাণী অনুষ্ঠান ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভার বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়। এফ এম বা ফ্রিকোয়েন্সি মডিউলেশন সম্প্রচার শুরু হয় ১৯৭৭-এ মাদ্রাজ বা চেন্নাইতে। তবে ২০০০ সালে এর বেসরকারিকরণ হলে এর জনপ্রিয়তা বাড়ে। গাড়িতে, অটোরিক্সায়, বাসে আর এখন মোবাইলে, বাজতে থাকে অতি উন্নত মানের সম্প্রচারে মূলত সংগীতের অনুষ্ঠান। এরও জনপ্রিয়তা একসময় খুব বেশি হয়ে উঠলেও এখন একটু কমেছে।

ধ্বনি-দৃশ্য মাধ্যম

এবার আসা যাক কলকাতায় দূরদর্শন আসা নিয়ে। ১৯৫৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ভারতে দূরদর্শন সম্প্রচার চালু হলেও কলকাতায় দূরদর্শন কেন্দ্র আসে ১৯৭৫-এর ৯ আগস্ট। এক ঝাঁক তরুণ আর আকাশবাণীর কিছু অনুষ্ঠান-কর্মী প্রথমে পুণেতে ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউটে প্রশিক্ষণে যান। কিন্তু তখন টিভির অনুষ্ঠান দেখা যেত না। ফলে তাদের দেখে শেখার সুযোগ ছিল কম। ক্রমে দূরদর্শনও জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরীক্ষানিরীক্ষা করে নানান অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা হয় এবং তা দর্শকদের মনোগ্রাহী হয়। বিভিন্ন খেলা এবং অন্যান্য বড়ো অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার মানুষকে বাড়ি বসে সেই অনুষ্ঠান চাক্ষুষ দেখার সুযোগ করে দেয়। ১৯৮২-র এশিয়ান গেমস-এর সময় থেকেই দূরদর্শন হয়ে ওঠে রঙিন। শুরু হয় জাতীয় কার্যক্রম। নানান সিরিয়াল ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, চলচ্চিত্র এবং ছায়াছবির গান বিশেষ জনপ্রিয়তা পায়। বদল হয় প্রযুক্তির। সংবাদের মধ্যে চলে আসে ঘটনাস্থল থেকে প্রতিবেদকের সরাসরি সম্প্রচার। দৃশ্যপট হয়ে আসে ভার্চুয়াল। ১৯৯২ সাল থেকে শুরু হয় আমাদের দেশে ধ্বনিদৃশ্য মাধ্যমের বেসরকারীকরণ। আসে অনেক বেসরকারি টিভি চ্যানেল। কলকাতার টেলিভিশন পরিসরও ব্যাপ্ত হয়, কী বিনোদনে, কী সংবাদে।

সংবাদ সংস্থা

আর-একটা যে বিষয়ের উল্লেখ করতেই হবে তা হল সংবাদ সংস্থার কথা। পিটিআই, ইউএনআই— দেশের এই দুই প্রধান সংস্থা কলকাতাতেও খুবই সক্রিয় এবং অপরিহার্য ছিল। আর ছিল *হিন্দুস্থান সমাচার*— যা জরুরি অবস্থার সময়ে সৃষ্টি। দেশ-বিদেশের খবর দ্রুত হাতের কাছে পাওয়ার জন্য এরাই একসময়ে ছিল প্রধান সূত্র। তবে এখন সংবাদ সংস্থার অপরিহার্যতায় ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এর কারণ টিভিতে এখন গুরুত্বপূর্ণ সবই প্রায় সরাসরি দেখা যায় আর বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে বিনামূল্যে পাওয়া যায় খবর। তবে একসময়ে সংবাদ সংস্থার দ্রুততা, বস্তুনিষ্ঠতা এবং ঘটনার পূর্বাপর তথ্য দেবার ব্যবস্থা এদের অপরিহার্য করে তুলেছিল।

কলকাতার চিত্র-সাংবাদিকরা

কলকাতার সাংবাদিকতা নিয়ে আলোচনার পরিসরে আসে চিত্র-সাংবাদিকদের অবদানের কথা, কলকাতা পেয়েছে বহু বিশিষ্ট আলোকচিত্রীকে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে তাদের সখ্য তো ছিলই,

ছিল একটা আলাদা সম্পর্ক। আগে কোনও ঘটনা, দুর্ঘটনা ঘটলে প্রতিবেদক ও অলোকচিত্রী দুজনেই ছুটতেন ঘটনাস্থলে। এখন হয়তো তা কিছুটা হলেও কমেছে নানা কারণে। তবে প্রভূত বদল হয়েছে ছবি পাঠাবার পদ্ধতিতে। আগে ছবি তুলে ভিআইপি-র হাতে বা বিমান চালকের হাতে বা কোনও বিমান যাত্রীকে অনুরোধ করে ছবির রোল পাঠাতে হত। সব কাগজ এবং টিভি চ্যানেলের রোল বা ক্যাসেট যেত একসঙ্গে বা আলাদা আলাদা। বিমানবন্দর বা রেল স্টেশন থেকে একজন কেউ সংগ্রহ করে সবাইকে যার-যার জিনিস দিয়ে দিত। তারপর এল ফোটো ফ্যাক্স। তাতে ছবি ডেভলপ করে বিশেষ ধরনের ফ্যাক্সের মাধ্যমে ছবি পাঠানো হত। তারপর ডিজিটাল ক্যামেরা, হোয়াটস্‌অ্যাপ বা ই-মেলের মাধ্যমে এখন আসে ছবি। নেট থাকলেই হল।

ডিজিটাল

আজকের দিনে কলকাতার সাংবাদিকতা নিয়ে লিখতে গেলে বর্তমানের ডিজিটাল, ওয়েব, পোর্টাল, অনলাইন, ফেসবুক চ্যানেল, ইউটিউবার, এইসব বাদ দিয়ে লেখা হয়তো উচিত নয়। কিন্তু এই প্রতিবেদনে তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা থাকছে না। তবে ডিজিটাল প্রযুক্তি আজকের দিনে সকলকেই সাংবাদিক হওয়া বা নিজের কথা অন্য অনেককে পৌঁছে দেবার সুযোগ দিয়েছে। নিজের কথা বলতে গেলে আর কোনও সংবাদ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রয়োজন নেই। এই ব্যাপারটা সাংবাদিকতার জগৎটাকে পুরোপুরি এক নতুন পরিসরে নিয়ে এসেছে। এটা অবশ্যম্ভাবী, এটাই ভবিষ্যৎ। কিন্তু এটাকে কীভাবে দেখা হবে, কীভাবে সংগঠিত করা হবে তার জবাব দেবে আগামী দিন।

কলকাতার সাংবাদিক

সাংবাদিকতার কথা তো কিছুটা হল। এবার সাংবাদিকদের কথাও একটু বলা যাক। কাগজ বা রেডিও, টিভির সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। ডিজিটাল বলে কিছু ছিল না। ফলে সাংবাদিকের সংখ্যা ছিল অনেক কম। পেশায় এলেই রিপোর্টারদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যেত অন্য কাগজের সিনিয়ার বা সমসাময়িকদের সঙ্গে। সিনিয়ারদের প্রতি জুনিয়ারদের থাকত একটা ভয় এবং ভক্তি-মিশ্রিত মনোভাব। পরে অনেকের সঙ্গেই হয়ে যেত দাদা-ভাইয়ের সম্পর্ক। রিপোর্টিং-এ মহিলাদের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। তবে আনন্দের কথা এখন এই পেশায় মহিলাদের সংখ্যা বাড়ছে। আগে পরিবেশটা ছিল অনেক ঘরোয়া। রেষারেষি

ছিল, খবরের সময় বন্ধুকে ফেলে নিজে এক্সক্লুসিভ করার প্রবণতা ছিল। কিন্তু সবের মধ্যে ছিল এক প্রাণখোলা সম্পর্ক। নেতা-মন্ত্রী বা আমলাদের কাছেও পাওয়া যেত প্রশ্রয়। এটাই ছিল রীতি। খবর লেখার সময় সমালোচনা থাকলেও ব্যক্তিগত স্তরে সবসময়ে তা আসত না। আবার কখনও কখনও বয়কট করত কোনও দল। আবার আগে থেকে সাংবাদিকদের জিজ্ঞেস করে বিভিন্ন জেলা থেকে খবর আনিয়ে রাখতেন নেতারা পরের সাংবাদিক সম্মেলনের দিন। ছিল এক অম্লমধুর সম্পর্ক। বিধানসভার লবি হয়ে উঠত বিধায়ক আর সাংবাদিকদের যৌথ আড্ডার জায়গা। তাছাড়া, মহাকরণের প্রেস কর্নারে সারা দিন কাটানোর অভিজ্ঞতাটাই ছিল একটা আলাদা প্রাপ্তি। আর প্রেস ক্লাবে বসে খোলামেলা আড্ডা আর যুক্তি-তক্কো ছিল এই পেশার একটা বিরাট পাওয়া। বড়ো কাগজ, ছোটো কাগজ, সরকারি বেসরকারি কাগজ বা চ্যানেল, এসব নিয়ে ছিল না মাথাব্যথা। একটা বৃহত্তর পরিবারের মধ্যে একটা সাদামাটা জীবন নিয়েই চলতেন কলকাতার সাংবাদিকরা। আর একসঙ্গে বাইরে কোথাও প্রেস-পার্টিতে গেলে কাজের সঙ্গে মজাও হত প্রচুর।

কলকাতার সাংবাদিকরা প্রত্যক্ষ করেছেন অনেক ঘটনা, স্বাধীনতা, দাঙ্গা, বিদেশি অতিথিদের সফর, জরুরি অবস্থা, বিভিন্ন পালাবদল, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা, সাঁই বাড়ির হত্যাকাণ্ড, মরিচঝাঁপি, দার্জিলিং-এর সমস্যা, ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল হস্তান্তর, শিল্প-বাণিজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধী হত্যা, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরবর্তী পর্যায়, গাইসাল ট্রেন দুর্ঘটনা, ভারত-বাংলাদেশ ট্রেন চলাচলের সূচনা, বিভিন্ন নির্বাচন, সুনামি, বন্যা, ঝড় ও আরও কত কিছু। শহর কলকাতার বুকে ঘটে যাওয়া কত অজস্র ঘটনার সাক্ষী কলকাতার সাংবাদিকরা। ভবিষ্যতের জন্যে তাঁরা লিখে চলেছেন বর্তমানের ইতিহাস।

এলা-দি, বালিগঞ্জ, আর ইন্টেলেকচুয়াল কলকাতার মেজাজ

সুমিত চক্রবর্তী

১

এই লেখার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথমত, গত শতাব্দীর মাঝামাঝি কলকাতা শহরের 'সেন্সিবিলিটি' বিষয়ে দু-চার কথা বলা। দ্বিতীয়ত, শহরের একটা বিশেষ 'স্পেস' বা পরিসরকে কেন্দ্র করে এই সেন্সিবিলিটির একটা প্রকাশকে ধরার চেষ্টা করা। এই যে 'সেন্সিবিলিটি' শব্দটা ব্যবহার করলাম এর তাত্ত্বিক ভিত্তিটি পাঠকের কাছে পেশ করা প্রাবন্ধিকের কর্তব্য। 'সেন্সিবিলিটি' আসলে সাংস্কৃতিক ইতিহাস বা কালচারাল হিস্ট্রির একটা বিকল্প ক্যাটেগরির সন্ধান দেয় আমাদের। অধুনা যাকে আমরা 'কালচারাল হিস্ট্রি' বলে জানি তা আদতে একরকম 'মেটিরিয়াল' বা জড়-বিষয়ের নিরিখে ইতিহাসকে চিহ্নিত করে, আর তার উপরে ভিত্তি করে একটা সময়ের এবং একটা পরিসরের সংস্কৃতির একটা ঐতিহাসিক আখ্যান আমাদের কাছে হাজির করে। এই সাংস্কৃতিক ইতিহাসের চর্চা থেকে পাঠকের কাছে প্রতীয়মান হয় 'the body as a site of cultural meaning'। সেন্সিবিলিটির ইতিহাস কীভাবে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের থেকে আলাদা এ কথা আমাদের ধরিয়ে দেন ড্যানিয়েল ভিকবার্গ তাঁর 'What is the History of Sensibilities?: On Cultural Histories, Old and New' প্রবন্ধে। ভিকবার্গ বলেন, 'the history of sensibilities focuses on the primacy of the various modes of perception and feeling, the terms and forms in which objects were conceived, experienced, and represented in the past.' অর্থাৎ, একটা বর্গের অন্তর হয়ে গেল এইখানে, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নিরিখটা খানিকটা

বদলে নিলাম আমরা—'মেটিরিয়ালিটি' থেকে 'সেন্সিবিলিটি'র দিকে। তা এই যে 'পারসেপশন' বা 'ফিলিং' বা প্রকারান্তরে 'সেন্সিবিলিটি'র কথা বলছেন ভিকবার্গ, এর যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দ কী হতে পারে সে বিষয়ে তর্ক সম্ভব। আপাতত, এই লেখার স্বার্থে আমি তাকে 'মেজাজ' বলছি।

এই প্রবন্ধে আমার বিষয় কলকাতা শহর, আর এই শহরকে কেন্দ্র করে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ভদ্রলোক সেন্সিবিলিটির একটা অসমাপ্ত খতিয়ানে নজরটান দেওয়া। 'অসমাপ্ত' বলছি কেন একটু অল্প কথায় আলোচনা করে নিই। প্রথমত, এই যে মেজাজের ইতিহাসের কথা বলছি, তার কোনও একমাত্রিক, সমসত্ত্ব চেহারা পাওয়া মুশকিল, যদিও যে-কোনও 'স্পেস'-এর ইতিহাস লিখতে গেলে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই তার একটা একমাত্রিক, সমসত্ত্ব চেহারা কল্পনা করে নিই বা আমাদের করে নিতে হয় কোনও তাত্ত্বিক প্রস্থান ব্যবহারের সুবিধার নিরিখে। তাই কোনও শহরের ইতিহাস লিখতে হলে, যদিও বা সময়ের অন্তরের বিষয়টা আমরা খেয়াল করে দেখি, শহরটাকে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই একটা সম্পূর্ণতার আঙ্গিকে বেঁধে নিয়ে কল্পনা করতে ভালোবাসি— যথা, প্যারিস, লন্ডন, কলকাতা ইত্যাদি। এই কথায় আবার ফিরে আসছি খানিক পরে। দ্বিতীয়ত, সেন্সিবিলিটি বা মেজাজের চরিত্র জটিল। কোনও একটা শহরের কোনও একটা সময়ের সেন্সিবিলিটি বলতে আমি কী বুঝি তা হয়তো কয়েকটা উদাহরণের সাহায্যে একরকম খাড়া করা যেতে পারে, যেমন লন্ডনের সন্ধ্যার শুঁড়িখানার কথোপকথন, অথবা প্যারিসের পার্কে পড়ুয়া অথবা প্রেমিক-প্রেমিকার সাহিত্যচর্চার বিষয়, নেপোলির রাস্তায় ফুটবল নিয়ে উন্মাদনা, অথবা কলকাতা শহরের বিশ শতকের আন্দোলন। কিন্তু সেন্সিবিলিটির একটা মনমতো সংজ্ঞা তার বিচিত্র চলাচলের নিরিখে খুঁজে নেওয়া খানিক কঠিন বলে বোধহয়। সেন্সিবিলিটি অথবা মেজাজের একটা ডিসকোর্স তৈরি করতে গেলে প্রতি মুহূর্তে তার বিনির্মাণ অবশ্যম্ভাবী। আদতে মেজাজের চলমানতা অ্যাফেক্ট নির্ভর, মুহূর্তের স্খলন অথবা দ্বিচারণ তার স্বভাবগতি। কোনও নির্মিতির প্রজ্ঞায় মেজাজকে ইতিহাসের সাক্ষী প্রতিপন্ন করা তাই বিপজ্জনক। সে কারণেই এই প্রবন্ধ তার প্রস্তাবেই অসমাপ্ত। তৃতীয়ত, যদি কোনও শহরকে নিয়ে লেখার টাইম আর স্পেস বেঁধে নিই, খুঁটি পুঁতে পুঁতে দেগে রাখি প্রায় একটা ডিফারেন্সিয়াল মোমেন্ট, হোমি ভাবার মতো তাত্ত্বিকের স্মরণে একটা পারফরমেটিভ মুহূর্ত মাত্রের ইতিহাস লেখার কথা ভাবি, যাকে ভাবা বলেন 'the disruptive temporality of enunciation', সেই উচ্চারণের মুহূর্তও অনিবার্যভাবে অসমাপ্ত। জাতি, ধর্ম,

বর্ণ, শ্রেণি, লিঙ্গ, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক অবস্থান, পেশা ইত্যাদি আরও বহু কিছুর মিশেলে এই অ্যাফেক্টিভ মেজাজের নির্মাণ যা কিনা একটা শহরের লিখিত ইতিহাস অথবা অভিলেখ্যাগারে সঞ্চিত দলিল বা দস্তাবেজকে ক্রমাগত একটা আখ্যানের অসমাপ্তি, ভঙ্গুরতা, বা অনিশ্চয়ের প্রতীতির দিকে ঠেলে দিতে থাকে তার কোনও নির্দিষ্ট কাঠামো ভেবে নেওয়া খানিক দুষ্কর।

এই প্রবন্ধে বিশ শতকের দক্ষিণ কলকাতার একটা ইন্টেলেকচুয়াল ভদ্রলোক গোষ্ঠীর আড্ডার কিছু দিক আলোচনায় আসবে। এই যে সময়, পরিসর, শ্রেণি সবই নির্দিষ্ট করে দিতে চাইছি তার কারণ একটু ছড়িয়ে বলি। আসলে, আমাদের সাংস্কৃতিক কল্পনার কাঠামোয় কলকাতার সঙ্গে আড্ডা সর্বদা সম্পৃক্ত। তবু, আমার মনে হয়, এই আড্ডার বিষয়ে আলোচনা করতে হলে প্রতি মুহূর্তে এই আড্ডার অসমসত্ত্বতা সম্পর্কে সচেতন থাকা আমাদের কর্তব্য। এবং আমি ঠিক কাদের কথা বলতে চাইছি এবং কেন তা দাগিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। তা নাহলে, একদিকে যেমন কলকাতার আড্ডার একটা একমাত্রিক পক্ষপাতদুষ্ট ছবি দেওয়া হয়, তেমনই অপরদিকে, লেখকের মূল বক্তব্যকে পাশ কাটিয়ে আড্ডার আলোচনায় কোন্ জনগোষ্ঠী বাদ রয়ে গেলেন এই আলোচনা হয়ে ওঠে মুখ্য। আড্ডা দেন মানুষ, আর এই মানুষের ধরন বিচিত্র। যে-কোনও শহরের মতোই কলকাতা শহরেও বহু মানুষ আড্ডা দেন। কীভাবে এই চরিত্রদের সম্বন্ধে ভাবব তার একটা আন্দাজ আমাদের দিয়েছেন জেমস ব্র্যাডবেরি আর আত্রেয়ী সেন *Contemporary South Asia* জার্নালের 'ক্যালকাটা ক্যারেক্টার্স' সংখ্যার মুখবন্ধে:

> We think of them as 'characters' in a double sense. Firstly, they are the curious personalities who give Calcutta its human scale, populating its tea stalls, small shops, coffee houses, street corners, peripheral neighbourhoods and derelict spaces. Secondly, the idea of characterization is intended to draw attention to the literary enterprise of ethnography itself—qualifying the process of representation as necessarily partial and subjective– without detracting from its real value as a form of knowing the city.

অর্থাৎ, আড্ডার স্পেসটাকে যেমন খানিকটা ছড়িয়ে দিলেন এঁরা তেমনই সাংস্কৃতিক ভূগোল নির্মাণের ক্ষেত্রে এই অসমসত্ত্ব জনগোষ্ঠীও যে আংশিক এবং ব্যক্তিগতের গণ্ডি পেরোতে অক্ষম তাও ধরিয়ে দিচ্ছেন লেখকদ্বয়। অর্থাৎ কিনা সেন্সিবিলিটি বা মেজাজের যে গল্পই আমি বলতে চাই না কেন, প্রতিবার আরও কিছু কথা বাকি থেকে যাবেই।

কলকাতা শহরের একটা দীর্ঘ এবং বিস্তৃত আড্ডার ঐতিহ্য রয়েছে। তা নিয়ে চর্চাও হয়েছে বিস্তর। আড্ডার আঙ্গিক থেকে পরিসর, আড্ডাকে ঘিরে গড়ে ওঠা বিতর্ক, গণতান্ত্রিকতা, তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা একটা শহরকেন্দ্রিক নাগরিকতার ধারণা, একটা বাক্‌নির্ভর সমাজের ধারণা, আড্ডার পরিসরে মেয়েদের ভূমিকা, মায় আড্ডার সঙ্গে ধনতান্ত্রিক আধুনিকতার সম্পর্ক এই নিয়ে দীর্ঘ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ, বহুপঠিত প্রবন্ধ লিখেছেন দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর *Provincializing Europe* বইতে। সমরেন্দ্র দাস সম্পাদিত *কলকাতার আড্ডা* (গাঙচিল: ২০০২), লীনা চাকী সম্পাদিত *বাঙালির আড্ডা* (গাঙচিল: ২০০৯) বইগুলির বিবিধ গদ্যে উঠে এসেছে আড্ডার বিচিত্র ধরন, স্থান, সময়, বিষয়বস্তু আঙ্গিকের প্রসঙ্গ [যথা, চায়ের আড্ডা, মদের আড্ডা, সাহিত্যের আড্ডা, রকের আড্ডা, ক্লাবের আড্ডা (এখানে আবার বিন্দুবাসিনী মেমোরিয়াল ক্লাব আর ক্যালকাটা ক্লাবের তফাৎ রয়েছে), বৈঠকখানার আড্ডা, সভা, মজলিস, চণ্ডীমণ্ডপ, ইত্যাদি আরও বিবিধ রকম]। এই ঐতিহ্য সম্পর্কে বর্তমান প্রবন্ধের পাঠকগোষ্ঠীর এক বড়ো অংশ যে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, তা ধরে নেওয়ার উপযুক্ত কারণ রয়েছে। তাঁদের প্রত্যাশায় কিছুটা জল ঢেলেই সবিনয়ে জানাই, এই লেখা কলকাতার আড্ডার সাংস্কৃতিক ইতিহাস বা তার কোনও গম্ভীর বিশ্লেষণ পেশ করার সারস্বত প্রকল্পের শরিক হতে নারাজ।

আগেই বলেছি, আমি একটা গোষ্ঠীর আড্ডাকে কেন্দ্র করে তার সেন্সিবিলিটি বা মেজাজের কিছু দিক তুলে ধরতে চাইছি মাত্র। বলা চলে, একটা অ্যাফেক্টের সুরকে ধরতে চাইছি স্বল্প পরিসরে, কিছু খণ্ডচিত্রের মাধ্যমে। এই অ্যাফেক্টের ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরটি থেকেই ওই সময়ে ওই পরিসরের মেজাজটার খানিক আন্দাজ পাওয়া যায়। সুতরাং, আড্ডা থাকল আমার লেখার অন্যতম এক আধার হিসেবে, কিন্তু চর্চা করতে চাইছি তার প্যারাটেক্সচুয়াল প্রসঙ্গেই। আড্ডার ভিতর থেকে আমি তুলে নিতে চাইছি এক ধরনের অ্যাফিনিটি বা ভাবনার অভ্যাসকে যার দ্বারা চালিত হত একটা নির্দিষ্ট সময়ের একটা নির্দিষ্ট পরিসরের কিছু ইন্টেলেকচুয়াল যাঁদের আধুনিক বিশ শতকের কলকাতার বাঙালি এক রকমের সাংস্কৃতিক মান্যতা দিয়েছেন বলা যায়। এই সাংস্কৃতিক মান্যতার ভিতরেই ধরা রয়েছে তার মডার্নিটি, তার রাজনৈতিক বোধ অথবা অভ্যাস, তার উত্তর-ঔপনিবেশিক ভাবনার জগতের একরকম হকিকত, অনেক ক্ষেত্রে তার যাপনের আকাঙ্ক্ষা, অথবা সমাজ, সাহিত্য, নন্দনের বোধ। দীপেশ চক্রবর্তীর প্রবন্ধের একটি বাক্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য এ প্রসঙ্গে: '... in Bengali modernity– *adda* provided for many a site for self-presentation, of

cultivating a certain style of being in the eyes of others'। এই 'certain style of being'-কে ধরতে চাইছি আমার এই লেখায়; আড্ডার সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার মূল সুরটির সঙ্গে সঙ্গত করতেই চাইছি, কিন্তু ভিন্ন বাজনার সাহায্যে। স্রেফ পদ্ধতিগত ফারাককে ভিন্ন বাজনা বলছি না, প্রবন্ধের পরবর্তী অংশের লিখনরীতি বা গদ্যশৈলীও এই ভিন্নতার সাক্ষ্য হয়ে উঠতে উৎসাহী। আড্ডার মেজাজ নিয়ে গদ্য তো আসলে আড্ডার মেজাজেরও গদ্য!

২

যে সময়ের কলকাতার কথা বলতে চাইছি এই লেখায় সে সময়ের স্মৃতি আর চর্চা এখনও দিব্য বর্তমান ওই শিক্ষিত ভদ্রলোকের মজলিসি আড্ডায়, ইন্টেলেকচুয়ালের সন্ধ্যাকালীন সাংস্কৃতিক কালোয়াতিতে, অথবা একাডেমিয়ার পেপার-চর্চিত বিভাগীয় দুপুরবেলায়। যা আর নেই তা হল ওই সময়ের মেজাজ। সে মেজাজের একটা মিঠেকড়া আদত ছিল, অলস পোষ্যর মতো একটা আদুরে অথচ তিরিক্ষি এনটাইটেলমেন্টের ভাব শহরের বিবিধ মিশ্র আঁতেল সম্প্রদায়কে মুড়ে রাখত হরবখত। মডার্নিটি, বাম রাজনীতি, আন্তর্জাতিকতা, ছোটো পত্রিকা মিলিয়ে মিশিয়ে একটা হাঁসজারু ভদ্রলোক সমাজ, পলিটিকাল কারেক্টনেসের তোয়াক্কা না করেই যেখানে আড্ডা চলত দিনভর। আর তার মধ্যমণি কতিপয় বাঙালি পুরুষমানুষ যাঁরা একে অপরকে ক্রমাগত সিংহ, শার্দূল, মূষিক সবই বলতে পারতেন এটিকেটের তোয়াক্কা না করেই। হ্যাঁ, একটা ম্যাসকুলিন সমাজ বা জনগোষ্ঠী নিঃসন্দেহে, তবু যে সমাজের কান মূলে দিতে পারতেন অনায়াসে সে সময়ের শহুরে মহিলারা। এই যেমন সমর সেনের স্ত্রী। সদ্য বিবাহিত মহিলাকে সমর নিয়ে গিয়েছেন বিষ্ণু দে'র বাড়িতে। তা ভার্যাটি সমরের থেকে বয়সে বেশ খানিক ছোটো দেখে বিষ্ণু সমরের উদ্দেশে খানিক বাঁকা বাঁকা মন্তব্য করলেন। খানিকক্ষণ শুনে সমরের স্ত্রী বলেছিলেন, 'ও, আপনি সেই বিষ্ণুবাবু যিনি ঝড়জলে ছাতা মাথায় দিয়ে অন্যদের নিন্দা করতে বেরিয়ে পড়েন?' সমর সেন নাকি সেই মুহূর্তে অন্যদিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন।

গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে সত্তরের দশকের কলকাতা। ইতিহাসের নিরিখে দেখলে মনে হবে এই তো সেদিন। অথচ, কালচারের নিরিখে বিচার করতে বসলে বারেবারে হোঁচট খেতে হবে। ওই যে বললুম মেজাজ, সে যতই মেট্রোপলিটান অ্যাংজাইটি থাক না কেন, চাদ্দিকে যত আন্দোলন আর গণ্ডগোল, শহরের দক্ষিণ দিকের ইন্টেলেকচুয়াল বাঙালির মেজাজটা ছিল চৈত্রের শেষে সন্ধ্যাবেলায় গোসলের পর যেমন বোধ হয়, তেমন, একটা ফুরফুরে নিরানন্দের

ভাব। একটা ইন্টেলেকচুয়াল ক্লাস ছিল, যারা সমাজ আর সংস্কৃতি, দেশ ও দশ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন খুবই, লেখালেখি, চর্চা, তর্ক করেছেন বিস্তর, অথচ সেই চিন্তার ছায়া তাঁদের ওই ফুরফুরে নিরানন্দময়তায় ছাপ ফেলেছে একটা অদৃশ্য ব্লটিং পেপারের উপর দিয়ে। এই বিরোধাভাসটা ব্যবহার করছি আসলে একটা দোলাচলকে ধরতে চেয়ে। লেখাপড়া জানা, শিক্ষিত, শহুরে কতিপয় বাঙালি যুবক; যুবতীও রয়েছেন কখনোসখনো। কলেজ ইউনিভার্সিটি পাশ দিয়েছেন সব, মাস্টারি, অধ্যাপনা, জজকোর্টে ওকালতি, নানাবিধ মধ্যবিত্ত চাকরি করছেন, বা করবেন করবেন করছেন। সকলেই প্রায় ইংরেজিতে সড়গড়। সকলেই দেশ বিদেশের সাহিত্য পড়েছেন, চর্চায় রয়েছেন নিয়মিত। সকলেই খুব পলিটিকাল। অনেকেই খুঁটিয়ে পড়েছেন রাজনীতির তত্ত্ব। দেশ স্বাধীনতার দিকে চলেছে, অথবা স্বাধীন হয়েছে কয়েক বছর হল। আবার কালচারাল ইম্পেরিয়ালিজম একটা নাছোড় ভাইরাসের মতো লেগে রয়েছে এঁদের প্রত্যেকের গায়ে। একদিকে রুচি, শিক্ষা, শিল্প, কলা অপরদিকে রিফিউজি, খাদ্যাভাব, মড়ক, মন্বন্তর— একটা উচিত-অনুচিতের দোলাচলে এই কলকাতার ভদ্রলোক বাঙালি ইন্টেলেকচুয়াল। একটা শৌখিন দুঃখ আর একটা সূক্ষ্ম যন্ত্রণার বোধ দুটোই মিলেমিশে রয়েছে এই ফুরফুরে নিরানন্দময়তায়। মিলেমিশে রয়েছে বললাম ঠিকই, কিন্তু পরিসরের মাফিক তাকে কেটেছেঁটে নেওয়া চলে। আলবাট্রসের মতো নয়, একটা ক্ষণিকের মনখারাপের মতো, 'ক্লাইভ স্ট্রিটে চাঁদ'-এর মতো। যেমন লিখছেন বুদ্ধদেব বসু:

> সম্মিলিত মানবতার দৃশ্য যখনই দেখি, আমার মন-খারাপ হয়ে যায়। অনেক লোক যেখানে একত্র হয়, সেখানে আমি সহজে নিশ্বাস ফেলতে পারি না। ব্যক্তিগতভাবে, প্রত্যেককে আলাদা করে দেখলে, মানুষের মধ্যে— অন্তত কোনো কোনো মানুষের মধ্যে আমরা দেখতে পাই বুদ্ধির দীপ্তি, শরীরের রেখায় সামঞ্জস্যের সুষমা, তার সংস্পর্শে পাই প্রাণের উজ্জীবন। কিন্তু যেখানে ভিড়... সেখানে ব্যক্তির সেই স্বাতন্ত্র্য যায় হারিয়ে; সব মিলিয়ে শুধু একটা বিশাল মানবতার পিণ্ড যেন কোন যান্ত্রিক কৌশলে নড়াচড়া করছে। সেই দৃশ্য দেখে শুধু ভয় হয়, শুধু ক্লান্তি আসে... যেখানে প্রাণের সঙ্গে প্রাণের বহুলতা তাল-পাকানো, প্রাণ সেখানে বাঁচে না।

প্রাণ কোথায় বাঁচে সেই কথায় ফিরছি খানিক পরে। আপাতত বুদ্ধদেবের দেখা এই 'সম্মিলিত মানবতার' দৃশ্যের কথা ভাবি। এই যে শহর কলকাতাকে কেন্দ্র করে একটা জনবিস্ফোরণ, নাভিশ্বাস ওঠা একটা পুতিগন্ধময় শহর, আর তাকে

ঘিরে গড়ে ওঠা একটা মিশ্র, অসংগঠিত জনপিণ্ড, এই ব্যাপারটা কিন্তু প্রতি মুহূর্তে ছুঁয়ে গিয়েছে এই সময়কার ইন্টেলেকচুয়ালদের। *মেট্রোপলিটান মন, মধ্যবিত্ত, বিদ্রোহ* এই বিচিত্র নামের গদ্যসংগ্রহে বিনয় ঘোষ বারবার ফিরে আসছেন এই প্রসঙ্গে। আসলে, গোটা বই জুড়েই প্রায় একটা শহরকেন্দ্রিক বর্তমানের দলিল পেশ করতে চাইছেন বিনয়। যদিও তাঁর বিরক্তির কারণ যে ঠিক কোনটি তা ঠাহর করা মুশকিল মাঝে মধ্যে। কলকাতা শহরের স্বল্প পরিসরে কসমোপলিটান মডার্নিটির ক্রমাগত ধাক্কা যে প্রতি মুহূর্তে দুঃসহ, তা-ই প্রতীয়মান তাঁর লেখায়। হতাশা আর ক্রোধের একটা নিষ্ফল ককটেল তাঁর লেখাকে ক্রমাগত একটা বিরূপাত্মক সামগ্রিকতার দিকে নিয়ে চলে। সব খারাপ, সবই কুৎসিত, চাদ্দিকে শুধুই একটা ক্লিষ্ট জনসমুদ্রের বিস্ফোরণ:

> দেবালয় থেকে টাউনহল, অ্যাসেম্বলি থেকে কর্পোরেশন, পাড়ার মুদির দোকান থেকে নগরকেন্দ্রের সমবায়িকা ও ডিপার্টমেন্ট স্টোর, সিনেমাহল থেকে খেলার ময়দান, কিন্ডারগার্টেন থেকে স্কুলকলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, বাস-স্ট্যাণ্ড থেকে রেলওয়ে স্টেশন— সর্বত্রই যেন জনকুণ্ডলীর নাভিশ্বাস উঠছে। একমাত্র শহরের রাজপথে এই জনকুণ্ডলীর স্থান সঙ্কুলান হয় কিন্তু সেখানেও হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ সংযোগের চিহ্ন নেই। অভিন্নতাবোধ আছে শুধু রাজপথের যান্ত্রিক যানবাহনের বিপুল স্রোতের সঙ্গে, যেখানে 'জনকুণ্ডলী' ও 'যন্ত্রকুণ্ডলী', ক্রাউড ও অটোমোবিল এক হয়ে 'জনযন্ত্র' হয়ে যায়। এই জনযন্ত্রের না আছে চোখ, না আছে মন, না আছে বিবেক ...

বিনয়ের লেখার ফুটনোটে আবিষ্কার করা যায় এই সময় কী বই পড়ছেন তিনি। পড়ছেন লুইস মামফোর্ডের *দ্য কালচার অফ সিটিস*, প্যাট্রিক গেদেসের *সিটিস ইন এভোলিউশন* অথবা কার্ল মানহাইমের *ডায়াগনোসিস অফ আওয়ার টাইম*। পড়ছেন রেজিস ডেব্রে বা হারবার্ট মারকুসে। শহর কলকাতার হতাশ শিক্ষিত যুবক আদতে মেট্রোপলিটান মডার্নিটির ধাঁচাটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছেন বোঝা যায়। খাদ্য আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন, ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে তীব্র গণবিস্ফোরণ এইসবের মাঝে নিজের অবস্থানটাকে একটু গুছিয়ে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি। এইসব বিদেশি তত্ত্ব পড়ে 'বিপ্লব' সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা হয়েছে বিনয়ের। বাংলার স্বনামধন্যদের সমাজকে মনে হচ্ছে আবর্জনার স্তূপ। কলমের তীব্র খোঁচায় বাংলার সংস্কৃতিকে বিদ্ধ করছেন তিনি: 'সাহিত্যসভা বা সংস্কৃতির আসরে উপস্থিত থাকা আমার কাছে ফ্যাশিস্ট নির্যাতন সহ্য করার চেয়েও মারাত্মক মনে হয়'। বোঝা যায় যে খুব ভেবে

লিখছেন না কথাগুলো, একটা অবিবর্তিত আবেগের আতিশয্য তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিচ্ছে এই বাক্য। কবিতা লেখাও এই সময়ে একটা বিশ্রী পাসটাইম বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা করে থাকা বিনয়ের কাছে: ‘‘কিন্তু ইত্যবসরে ‘বিপ্লব’ (Revolution)? ইত্যবসরে ‘বিপ্লব’ কল্পলোকে কক্ষান্তরিত। ‘বিপ্লব’ যেমন ‘ডিনার পার্টি’ নয়, তেমনি ‘বিপ্লব’ কবিতা লেখাও নয়, যা আমাদের দেশে আমরা পেট থেকে পড়েই লিখতে শিখি।’’ এইরকম ধোপদুরস্ত ক্ষোভ পাঠক চিনতে পারবেন অনায়াসে। শহরের দক্ষিণের দিক থেকে ভেসে আসা, বিলিতি তত্ত্বের ব্যঞ্জনা সঞ্জাত, মধ্যবিত্ত ইন্টেলেকচুয়ালের গুমরোতে থাকা ক্ষোভ। চোখে পড়ে না চট করে, তবু কোথাও একটা আহ্লাদী ভাব রয়েছে। দুবেলা পেটে ভাত থাকলে যেমন ফুরফুরে নিরানন্দ সম্ভব!

বিনয়ের সমসাময়িক সমর সেন অবশ্য এতটাও তিরিক্ষি মেজাজের নন। কবিতা লেখা নিয়ে এমন চূড়ান্ত বিধান দিচ্ছেন না তিনি। সে কথায় আসছি। তাঁর অগ্রজ বুদ্ধদেব বা সমবয়সি বিনয়ের সঙ্গে একই শহর কলকাতা নিরীক্ষণ করছেন সমর। বিধান দিচ্ছেন যে কলকাতা ‘is now a city without hope, a dying city’। কর্মসূত্রে কখনও থেকেছেন দিল্লিতে, কখনও লখনউ, কখনও আবার রাশিয়ায়। লিখছেন কলকাতায় ফিরতে কেমন লাগে: ‘‘You feel that you are returning to a rundown provincial town, which the lucky have left and where the impoverished are falling out among themselves and where no attempt at a facelift, economic, or cultural, succeeds. An old bitch gone in the teeth, as Pound would have said.’’ ধরে ফেলতে হবে যে এই ঘরানাটা খানিকটা আলাদা। পাউন্ড আর এলিয়ট এখানে আসবেন কথায় কথায়। কবিতার সঙ্গে কন্ট্রোলের চালের যে আদত কোনও বিরোধ নেই এই বান্দা জানেন বিলক্ষণ। দেখছেন সবই, ধাক্কা লাগছে, বেদনার সঞ্চার অবশ্যম্ভাবী। তবে সবটাই কিন্তু খানিক দূর থেকে। বার্ডস আই। এতে দৃষ্টির সীমানা প্রসারিত হয়। পাঠকের মনে পড়ে যাবে কী চমৎকার বিশ্লেষণ করেছিলেন একবার সমর বিষ্ণু দে’র সম্বন্ধে: ‘বিষ্ণুবাবুকে কখনো প্যান্ট, বুশ সার্ট পরতে দেখিনি। অনেকবার নিমন্ত্রিত হয়েও কখনো বিদেশে যাননি। সবই ভালো, সি পি আই- প্রেমটা বাদে।’ এইরকম টুকরোটাকরা মন্তব্যের মধ্যে ধরা পড়ে একরকমের মেট্রোপলিটান মন। এলিট এবং বুর্জোয়া। *Now* থেকে *Frontier*-এ যাত্রার গল্প অন্য ধাঁচের, এই লাইন ধরে খানিক এগিয়ে তারপর অন্য কথার বাঁক ধরতে হবে। উৎসাহী পাঠক এ বিষয়ে *Frontier*-এর সমর

সেন শতবর্ষ সংখ্যায় (২০১৬) অলোক মুখোপাধ্যায়ের লেখা পড়তে পারেন। তবে শহর কলকাতার যে একটা দক্ষিণী বা বালিগঞ্জি ধারা রয়েছে তার ছোঁয়াচ কিন্তু এড়াতে চাননি সমর কখনওই। হাল আমলের ধারা। এই চাদ্দিকের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আর আন্দোলন আর বিক্ষিপ্ত সামাজিক আর রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও খুঁজে নিয়েছেন স্বতন্ত্র মেজাজটুকু। সন্ধ্যাবেলার পান আর আড্ডার আসর আর কথা বলার মতো মানুষজন। পুরোনো কলকাতাকে প্রায় বাতিল করে দিয়েছেন সমর, তাঁর নিজস্ব আধুনিক কলকাতার অন্দরমহলে:

> Leave out the past on which the semi-literate thrive, the Tagore music and all that. You still have Satyajit Ray, Mrinal Sen, Utpal Dutt, Bishnu Dey and a host of others who are delightful to talk to. Satyajit is tall and aloof; Mrinal Sen peripatetic and homely, Bishnu Dey sarcastic but human, Utpal Dutt can conjure up a horde of 'liberation army' men.

এখানে একটা সম্প্রদায়ের কথা বলা আছে, কতিপয় মানুষের গোষ্ঠী, যাঁরা নিভৃত অবসরে কবিতার কথা বলবেন, লিখবেন, আলোচনা করবেন শহরের ভবিষ্যৎ বিষয়ে। সেইসব কবিতায় উঠে আসবে চৌরঙ্গি, ময়দান, ডালহৌসি, ক্লাইভ স্ট্রিট, অথবা বড়োবাজার, চিৎপুরের প্রসঙ্গ। প্রেমেন্দ্র মিত্র, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা নিয়ে চলবে বিস্তারিত নিরীক্ষণ:

বেকারের জয়যাত্রা সুরু হয় পথে।
ভস্মদেহে
ঘুরে ফেরে ভিখারীর শিশুগুলি পথে
আস্তাকুড়ে
খোঁজে যেন পরশপাথর। মেদবাহী
বারাঙ্গণা
পুণ্যস্নান শেষ করে ঘরে যায় গামছায়
ঢেকে
বিকুঞ্চিত দেহখানি। ...
মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে ময়দান দগ্ধ দগ্ধ প্রায়
গলিত পিচের পথে অগ্নিকুণ্ড জ্বলে
অনির্বাণ।
আরক্ত-বয়ানে ফেরে শ্বেতাঙ্গরা মোটরের
খোপে,
আহারের হয়েছে সময়।

চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়ের এই কবিতা উদ্ধৃত করে সমর লেখেন যে, এটা নজর করবার মতো বিষয় যে কলকাতা শহর নিয়ে কৌতূহল আর বামপন্থা হালের কবিতায় হাতে হাত মিলিয়ে চলে। এইটাকে যদি একটা কমিটমেন্টের উপসর্গ হিসেবে ধরে নেওয়া চলে, তাহলে বিনয় বিরক্ত হবেন। কারণ কালপেঁচার রম্যতা বিনয়ে নেই। বিনয় তিতকুটে। তাছাড়া, অপর লোকের রাজনৈতিক কমিটমেন্ট বিনয় ময়দানে দেখতে চান। এই প্রসঙ্গে রাজনীতি আর ময়দান নিয়ে সমরের একটা চুটকি মনে এল। এও তাঁর মেট্রোপলিটান মেজাজের অঙ্গ, উপরের তলা থেকে আলতো হাতে ছুঁড়ে দেওয়া মেজাজি ব্যঙ্গ। পেলে যে কলকাতায় এসে ভালো ফুটবল খেলেননি সে প্রসঙ্গে সমর বলছেন, 'পেলে কেন সেদিন জমকালো খেলা দেখাননি? শুনেছি যে খেলার আগের দিন নামকরা এক নেতা তাঁকে বলেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গের রণকৌশল হল কিছু না করা। কিছু না করলে আখেরে মেওয়া ফলে, অনেক ভোট পাওয়া যায়। পেলে তাই নড়াচড়া বিশেষ করেননি মোটে।' সাবেক শহরের 'কালচার্ড মিলিউ' থেকে ছিটকে আসা এই চুটকি আসলে ওই মেজাজটাকে ধরে দেয় যা খাদ্যসংকট আর মন্বন্তরের মধ্যে থেকেও এক ধরনের শ্রেণিকেন্দ্রিক মননের চর্চার সম্ভাবনাকে জিইয়ে রাখে। এই কারণেই হয়তো শহরের সেন্স অফ হিউমরটা মরে যায় না একেবারে। হ্যাঁ, অবশ্যই, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের হিউমর।

৩

লেখা শেষ করার আগে আর-একবার বুদ্ধদেব বসুর প্রসঙ্গে ফিরি। যে সময়টাকে এই লেখায় ধরতে চাইছি বলা চলে সেই সময়ের ভদ্রলোক কলকাতার গডফাদার। বালিগঞ্জের ভাড়ার ফ্ল্যাট থেকে নিরীক্ষণ করছেন শহরটাকে। সব ক্লেদ, দুর্গন্ধ, হতাশা, অনাহার সত্ত্বেও একটা মায়াকাজল মেখে নিয়ে দেখেন এই শহরকে। শহর বলতে অবশ্য দক্ষিণ কলকাতা। ওই বালিগঞ্জ আর তার সংলগ্ন এলাকা। ট্রাম নিয়ে যেমন আন্দোলনে ফেটে পড়েছে কলকাতা শহর, তেমন ট্রাম নিয়ে ভাবালু রোম্যান্টিকতার অভাব নেই বাঙালির মনে। তবু বুদ্ধদেবের মতো কাউকে যাওয়ার আর ফেরার ট্রামকে বলতে শুনিনি 'উজানের' ট্রাম আর 'ভাঁটির' ট্রাম। ভাড়া বাড়ির উঁচু বারন্দায় দাঁড়িয়ে বুদ্ধদেব দেখেন নানা রঙে, বর্ণে, চলনে ঝিলমিল একটা আস্ত শহরের ছবি। জনস্রোত আর সূর্যাস্ত একাকার হয়ে যায়, চোখের সামনে প্রতীয়মান হয় এক অনাবিল, অন্তর্লীন চিয়ারোস্কিউরো: 'একটি জ্বলন্ত সূর্য-স্রোত স্বর্গে-মর্ত্যে সেতু রচনা করে দিয়ে মুহূর্ত-পরেই মিলিয়ে যায়, কিন্তু সেই ক্ষণমিলনের মধুর রক্তিম আভায় এই মর জীবনের গতানুগতিকতা

যেন চিরকালের লীলাক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে, রাসবিহারী অ্যাভিন্যুকে মনে হয় স্বর্গোদ্যান।' এই নস্টালজিয়ায় একটা গম্ভীর মাধুর্য আছে, একটা কসমোপলিটান আধুনিক মনন রয়েছে যা একই মুহূর্তে বাঙালি আর ইউরোপীয়। এই দুঃখবিলাসে পাপবোধ থাকলেও থাকতে পারে, পাপ বিন্দুমাত্র নেই। এই পাপবোধকে সম্বল করেই বালিগঞ্জের ফ্ল্যাটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বুদ্ধদেব দেখেন রিফিউজি, নিরন্ন, অসহায় পরিবারের নিত্যদিনের আনাগোনা—

> এরাই দেশ, এরাই আমার দেশ। এরা ভিখিরি নয়, সমাজের আবর্জনা নয়, যন্ত্রতন্ত্রের মনুষ্যত্ব-নিষ্কাশিত ছিবড়ে নয়; এরাই আমাদের প্রাণ স্রোত, বাংলাদেশের হাজার-হাজার গ্রাম ভরে রেখেছে এরাই, শহরে বসে বসে এদের কথা বইয়ে পড়ি, কখনো চোখে দেখি না। এরা দরিদ্র কিন্তু ভদ্র, এরা নিরন্ন তবু মানুষ।

এদের প্রতি বুদ্ধদেবের নিবিড় মমত্ববোধ যে কিছুতেই সিমপ্যাথি থেকে এমপ্যাথিতে পৌঁছতে পারে না এই তাড়নায় বিদ্ধ হন বুদ্ধদেব। আবার শহর কলকাতার আঙ্গিক আর মেজাজে সম্পূর্ণ লিপ্ত বুদ্ধদেব কিছুতেই মনের ভিতরে একটা অবজেক্টিভ কোরিলেটিভ তৈরি করে উঠতে পারেন না যা তাঁর দেখার চোখটাকে একটা ধূসর ব্যঞ্জনায় ঢেকে দেবে কিছুটা সময়, আর মুহূর্তটা কবিতায় ঢুকে পড়তে পারবে অনায়াসে। তবু চোখ সরাতে পারেন না বুদ্ধদেব কিছুতেই। ঘোমটায় অর্ধেক ঢাকা, সিঁথিতে সিঁদুর এক গৃহবধূকে নিরীক্ষণ করেন নিবিষ্ট ভাবে:

> শিক্ষায় স্বচ্ছলতায় পরিমার্জিত হলে তার মুখটি কি সুন্দর হতে পারতো না, আর তার আপাত-অচেতন মনেও এমন শিখা কি নেই যা আলোর জন্য উন্মুখ? কিন্তু তার ঐ তালি-দেয়া অসহ্য নোংরা কাপড়টাই আমাদের চোখ থেকে তাকে আড়াল করেছে। তারই পাশে-পাশে জুতো গটগট করে চলেছেন গর্বিতা বালিগঞ্জিনী, পিছনে চাকর চলেছে মস্ত একটা অ্যালসেশিয়ানকে শিকলে বেঁধে। কুকুরকে হাওয়া-খাওয়ানোর ঐ দৃশ্যটাই আমাদের পরিচিত, জর্জেট-জড়ানো মহিলাটিকেও আপনজন বলে বোধ হয়, কিন্তু যদিও বুদ্ধি দিয়ে জানি যে দেশ বলতে এই নোংরা-কাপড়-পরা মেয়েটাকেই বোঝায়, তবু প্রাণের মধ্যে তার সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করতে পারি না। ইচ্ছা আছে, পথ জানা নেই।

এই যে সাবলীল পাপবিদ্ধ স্বীকারোক্তি, এর ভিতরেও কিন্তু ধরা রয়েছে ওই সময়ের আর ওই কতিপয় ইন্টেলেকচুয়ালের মেজাজটা। অপারগতা আর তার অন্দরে সঞ্চিত নিবিড় আত্ম-করুণার বোধও আসলে আধুনিকতার বৌদ্ধিক

চর্চার ভিতরের কথা। এর মধ্যে অকারণ অথবা কৃত্রিম কিছু নেই। আছে একটা শিক্ষা আর কৃষ্টি সঞ্জাত ক্ষয়ের উপলব্ধি, আর ব্যক্তিমানুষের প্রতি মুহূর্তের অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের প্রতীতি। যা পারলাম না, সেই না-পারাটুকু লিখে রেখে গেলাম।

প্রাণ কোথায় বাঁচে সেই কথায় ফিরে আসব বলেছিলাম। এই যেসব ভাবনার একাকীত্বের কথা বলছিলাম এতক্ষণ সেইসব ভাগ করে নেওয়ার, নোট মিলিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন কথোপকথনের। সমমনস্ক কিছু মানুষের নিভৃত সম্মেলন। সহজ কথায় আড্ডা। এই আড্ডার পরিসর বেছে নিয়েছিলেন এঁরা প্রত্যেকেই, যাঁদের কথা বললাম এই লেখায়। সব মানুষের সে সব জায়গায় প্রবেশ নেই। দক্ষিণের সেই বারান্দায় মানুষ মাত্র কজন। বুদ্ধদেব নিপুণ হাতে রচনা করে দিচ্ছেন সেই পরিসর:

> যে-কাপড় আমি ভালোবাসি আড্ডার ঠিক সেই কাপড়। ফর্শা কিন্তু অত্যন্ত বেশি ফর্শা নয়, অনেকটা ঢোলা, প্রয়োজন পার হয়েও খানিকটা বাহুল্য আছে, স্পর্শকোমল, নমনীয়। গায়ের কোথাও কড়কড় করে না, হাত-পা ছড়াতে হলে বাধা দেয় না, লম্বা হয়ে শুয়ে পড়তে চাইলে তাতেও মানা নেই। অথচ তা মলিন নয়, মাছের ঝোল কিংবা পানের পিক লাগেনি; কিংবা দাওয়ায় বসে গা-খোলা জটলার বেআব্রু শৈথিল্য তাকে কুঁচকিয়ে দেয়নি। তাতে আরাম আছে, অযত্ন নেই; তার স্বাচ্ছন্দ্য কোনোখানেই ছন্দোহীনতার নামান্তর নয়।

এই গোটা অনুচ্ছেদের যেখানে চোখ আটকে যায় তা হল ওই 'গা-খোলা জটলার বেআব্রু শৈথিল্য'। শ্রেণি সচেতন এলিটিজম যেন এই আড্ডার হৃদয়ে প্রোথিত। মেজাজটা তৈরি হচ্ছে ওই সুরটা বেঁধে দেওয়ার মধ্য দিয়ে। বিভাজিত শ্রেণির অস্বস্তিকে অনায়াসে সরিয়ে রাখছেন এরা সকলেই। একটা ক্লাস আইডেন্টিটি জারিয়ে দিচ্ছেন এই প্রায় স্বাভাবিক সামাজিকতায়। একটা আদ্যন্ত শহুরে, বামমনস্ক, বুর্জোয়া সমাজ। আড্ডার জায়গায় তারা সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ, তার কেটে যাওয়া অথবা মাত্রার এদিকওদিক হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই সেখানে: 'ও যেন বেড়াতে যাবার জায়গা নয়, ও যেন বাড়ি; কাজের শেষে সেখানেই ফিরব, এবং কাজ পালিয়ে যখন-তখন এসে পড়লেও কেউ কোনো প্রশ্ন করবে না।' বাবুদের বৃত্তান্তই বটে!

এই যে কতিপয় মেধাজীবী আর তাঁদের মেজাজের কথা আলোচনা করলাম এই লেখায়, এঁরা কিন্তু বিরল-ব্যতিক্রম নন মোটেই। এঁদের মতো ভাবতেন, এঁদের সঙ্গ করতেন এরকম আরও কত মানুষের নাম মনে আসছে এইমাত্র। তবু, এ কথা বলছি না মোটেই যে গোটা কলকাতা শহরের ইন্টেলেকচুয়ালরা

সকলে এই গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। অন্যরকমও ছিলেন অনেকেই, অন্যরকম করে ভাবতেন, অন্যরকম জীবনযাপন করতেন। এই শহর আর তার সংস্কৃতি ভিন্নজনের কাছে ভিন্নভাবে ধরা দিয়েছে। তবে আমার এই লেখায় আমি ওই সময়ের একরকম কলকাতা শহর আর শহরের একটা নির্দিষ্ট ইন্টেলেকচুয়াল ক্লাসকে ধরতে চাইলাম। লিখতে লিখতেই প্রায় সমাপতনের মতো আমার হাতে এসে পড়ল বুদ্ধদেব বসুর একফালি একটা কাব্যগ্রন্থ। *একদিন: চিরদিন ও অন্যান্য কবিতা*। প্রকাশকাল ১৯৭১। বেশিরভাগ কবিতাই এখানে কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে, একটা শহুরে আধুনিকতার বিষাদ গাথা বলা চলে। অথবা, বিক্ষত মেট্রোপলিটান মননের মনোলোগ। সব কবিতাই ওই পঞ্চাশ থেকে সত্তরের দশকে লেখা। দুটো কবিতায় কেমন চোখ আটকে গেল। প্রথমটা, 'হাওড়া স্টেশনে বিদায়'। কবি তাঁর পরিচিতদের বিদায় জানাতে গিয়েছেন স্টেশনে। ফিরতি পথে তাঁর চোখ আটকে গিয়েছে এক মধ্যবয়স্ক নারী আর পুরুষকে দেখে। একজন ট্রেনের জানালায়, আর অপরজন প্ল্যাটফর্মে। একে অপরের দিকে তাকিয়ে, নিঃশব্দে অঝোরে কেঁদে চলেছেন দুজনে। আখ্যানধর্মী কবিতার শেষে বুদ্ধদেব লেখেন:

আপনারা যে যাই বলুন,
কিছু নেই দুঃখের মত সুন্দর ও পবিত্র ও স্মরণীয়--
বিশেষত তা যদি অন্যের হয়। না কি আমাদের স্মৃতি
এক রুচিবান চালুনি, যার ফাঁকে-ফাঁকে, কোনো
অজ্ঞেয় কিমিয়ায় রূপান্তরিত হবার জন্য, আটকে থাকে
শুধু দুঃখ— তা নিজেরই হোক বা অন্যেরই হোক।

স্মৃতির পক্ষে যে রুচিমান চালুনি হওয়া সম্ভব এই প্রতীতি স্পষ্টতই উঠে আসে বুদ্ধদেবের মিলিউ থেকে। যারা তাঁর বন্ধু, পরিচিত, আপনার জন তাঁদের তীব্র শহুরে পরিশীলনের ইঙ্গিত বহন করে স্মৃতির এই বর্ণনা। আর এই শহুরে পরিশীলনের কিছু অনুষঙ্গ স্পষ্ট চোখে পড়ে 'এলা-দি' কবিতায়:

কুশান-আঁটা শিঙাপুরি বেতের চেয়ারে এলিয়ে বসেন
এলা-দি, শান্তিনিকেতনি চামড়া-বাঁধানো মোড়ায় পা রেখে।
পাৎলা তাঁর পা-দুটি, তাঁর মুখের চেয়েও ফর্শা,
নীলচে সরু শিরায় আরো সুন্দর; তাঁকে দেখার আগে

আমি কখনো ভাবিনি মানুষের পায়েরও এত রূপ হতে পারে।

আমি তাকিয়ে থাকি সেই পায়ের দিকে, যেখানে লুটিয়ে পড়ে

তাঁর শাড়ির পাড় ময়ূরের বুকের মত নীল;

তিনি সামনের দিকে একটু ঝুঁকে সিগারেট ধরান।

আখ্যান খানিক এগোলে আমরা এলা-দি'র জীবনের আরও খানিকটা জানতে পারি, তাঁর সারাটা দিন, সপ্তাহ কীভাবে কাটে তার খুঁটিনাটি:

বাড়ি সাজানো, শরীর সাজানো, বিকেলের দিকে ঘণ্টাখানেক ঘুম,

সপ্তাহে পাঁচটা-ছটা পার্টি, নানা দেশের ধনী মানী বন্ধু,

মাঝে-মাঝে গ্যাংটকে বা কলম্বোতে বা বার্সেলোনায়

বেড়াতে যাওয়া। সব শ্রম, সব কষ্ট, সব দম-আটকানো

অন্ধকূপের উত্তরে এলা-দির আলস্য একটি সুন্দর

গাছের মত ছড়িয়ে আছে, পাতায়-পাতায় অজস্র এঁর সবুজ,

রঙিন ফুল অনবরত ফুটে উঠছে, কিন্তু কখনো ফল ধরে না।

এই ফলহীন চিরযৌবনা এলা-দির বর্ণনায় এতটুকু বিদ্রূপ বা শ্লেষের চিহ্নমাত্র নেই বুদ্ধদেবের লেখায়। বরং মনে হয় কোনও একরকমের আশ্রয়ের প্রতীতি রয়েছে এই এলা-দির মধ্যে, যে কারণে ফিরে ফিরে যেতে হয় তাঁর কাছে বারবার। ধ্বস্ত শহরে ফুটে থাকা কণামাত্র এস্থেটিক ভরসা। যে মেজাজের কথা বলেছি এই লেখায় তার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। এই সময়ের কলকাতার, এই কজন মেট্রোপলিটান ইন্টেলেকচুয়াল যে চিন্তায় বাঁচেন তার একটা অসমাপ্ত আন্দাজ দেওয়ার চেষ্টা করলাম এই লেখায়।

[প্রবন্ধরচনার ক্ষেত্রে আমার ছাত্র সৌরভ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপচারিতায় উপকৃত হয়েছি। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা।]

উদ্ধৃতিঋণ

Daniel Wickberg,'What Is the History of Sensibilities? On Cultural Histories, Old and New' in *The American Historical Review*, Volume 112, Issue 3, June 2007, Pages 661-684.

Homi Bhabha, 'The Commitment to Theory' in *The Location of Culture* (London and New York: Routledge, 1994), pp. 19-39.

James Bradbury and Atreyee Sen, 'Introduction: Calcutta Characters' in *Contemporary South Asia*, Volume 28, 2020 - Issue 4: Special Issue: Calcutta Characters, pp. 427-433.

Dipesh Chakrabarty, 'Adda: A History of Sociality' in *Provincializing Europe*: *Postcolonial Thought* and *Historical Difference* (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2000), pp. 180-213.

বিনয় ঘোষ, *মেট্রোপলিটন মন, মধ্যবিত্ত, বিদ্রোহ*, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, ১৯৭৩।

বুদ্ধদেব বসু, *হঠাৎ আলোর ঝলকানি*, গুপ্তফ্রেন্ডস এন্ড কোং, ১৯৩৫।

—, *উত্তর তিরিশ*, নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৪৫।

—, *একদিন: চিরদিন ও অন্যান্য কবিতা*, কলকাতা গ্রন্থমালা ৪, ১৯৭১।

—, *আমার যৌবন*, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ, ১৯৭৬।

সমর সেন, *বাবুবৃত্তান্ত ও প্রাসঙ্গিক*, সম্পা. পুলক চন্দ, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪।

কলকাতার গিলে করা হাড় : একটি পদ্যের বেত্তান্ত

বরুণ চট্টোপাধ্যায়

যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ- সকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নীর কাছে যেমন একটা ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিন্নী পাঁচরকম জিনিস তুলে রাখে। (কেশবের ও সকলের হাস্য)

(সহাস্যে)— ''হ্যাঁ গো! গিন্নীদের ওইরকম একটা হাঁড়ি থাকে। ভিতরে সমুদ্রের ফেনা, নীল বড়ি, ছোট-ছোট পুঁটলি বাঁধা শশাবিচি, কুমড়াবিচি, লাউবিচি—এই সব রাখে, দরকার হলে বার করে। মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টিনাশের পর ওইরকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন।

(*শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত*, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ১৮৮২, ২৭শে অক্টোবর)

তখন ম্যালেরিয়া ছিল না, উপবাস করিয়াই রোগ সারিত, একটু বাড়াবাড়ি হইলে ঠাকুরমার ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড়ি খুঁজিতে হইত, বড় জোর গ্রামের হাতুড়ে কবিরাজ ডাকিলেই পর্যাপ্ত হইত।

না এ-দিক, না ও-দিক

(পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়/ *পাঁচকড়ি রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড/ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস/ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ/ ১৩৫৮)

বঙ্গদেশ চিরকাল রঙ্গে ভরা আর গত তিনশতক ধরে 'মোকাম কলিকাতা' এই রঙ্গভূমির রাজধানী। এই শহরে প্রথম পাশ্চাত্যরীতির নাটক অভিনীত হয় ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর। তবে সেটা কোনও বঙ্গসন্তানের উদ্যোগে ঘটেনি। সুদূর রুশ দেশের এক প্রাচ্যবিদ্যাপিপাসু ভাগ্যান্বেষী গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফ ছিলেন এই উদ্যোগের প্রধান কর্ণধার। তাঁকে সাহায্য করেছিলেন স্থানীয় পণ্ডিত

গোলোকনাথ দাস। অধুনা এজরা স্ট্রিটের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া ২৫নং ডোমটোলা স্ট্রিটে লেবেদেফের গড়ে তোলা পাকা স্টেজে অভিনীত এই নাটকটির নাম 'কাল্পনিক সংবদল'।[১]

প্রকরণগতভাবে প্রহসনধর্মী এই নাটকের কেন্দ্রে আছে এক ভ্রান্তিবিলাসের কাহিনি আর কাহিনির কেন্দ্রে আছে সুখময় নাম্নী এক নারীচরিত্র। নাট্যক্রিয়া ও কাহিনির প্রয়োজনে প্রায় গোটা নাটকেই তাকে দেখা যায় মোহনচাঁদ নামে এক পুরুষের ছদ্মবেশে। সুখময়ের এক সহচরী রতনমণি পর্যন্ত প্রথমে পুরুষবেশী মালকিনকে শনাক্ত করতে না-পেরে হতভম্ব হয়ে যায়। প্রাথমিক বিভ্রমের ধাক্কা সামলিয়ে রতনমণি মালকিনকে বলে—

> 'এখনকার দিনে স্ত্রীলোকসকল এমন মত্তা হইয়াছে যে কিঞ্চিৎ মর্দা আকারের মায়া হয়, তাহারাই উপযুক্ত পুরুষ হইতে।'

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগের কলকাতায় মেয়েরা কোন্ গুমরে এমন মদমত্তা হল যে তাদের কোমল দেহলতায় দেখা দিল মিনসেসুলভ মদ্দা পুরুষালি ভাব? শুধু তাই নয়, কোন্ গুণে তাদের পুরুষের চেয়ে উপযুক্ত কাজের মানুষ বলে মনে হল দাসীগোত্রীয় রতনমণির?

স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, নারীপ্রগতি ইত্যাদির ক্ষীণতম সম্ভাবনা দেখা দেয়নি তখনও, সবে কুড়ি বছরের যুবক রামমোহন এসে পৌঁছেছেন জোড়াসাঁকোর পৈত্রিক বাড়িতে, ১৭৯৬ সালে। মিসেস কুকের (উইলসন) মেয়েদের ইস্কুল তো দূরের কথা, হানা-মার্শম্যান পর্যন্ত তখনও শ্রীরামপুর এসে পৌঁছননি। অর্থাৎ বাঙালি মেয়েদের তখনও 'এ বি শিখে বিবি সেজে, বিলিতী বোল' কওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা যায়নি।

তবে কলিকালের একটা লক্ষণ যে স্ত্রীজাতির দাপট বেড়ে যাওয়া, সে কথা অনেকদিন থেকেই চালু হয়ে গেছে। অন্তঃপুরের 'অশিক্ষিত' অসূর্যম্পশ্যা যে কতটা বেপরোয়া হতে পারেন তার নমুনা পাওয়া যায় *দেবগণের মর্ত্যে আগমন*-এ বরুণের সুবাদে পাওয়া পোস্তার 'রাজা বেজেন্দরের' স্ত্রীর উক্তিতে। বাবু বিড়ালের বিয়েতে মেলা টাকা উড়িয়ে সগর্বে নিজের বাবুয়ানির বড়াই করা মাত্র ঘরণী জবাব দিলেন—

> ‘এমন লোকও আছেন যে বানরের ‘বে’-তে তোমার বেড়ালের বে-র খরচ অপেক্ষা বিশগুণ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।’ বাবু তৎশ্রবণে কহিলেন, ‘তোমার মিথ্যা কথা, সে লোক কে?’ স্ত্রী শুনিয়া কহিলেন, ‘কেন আমার শ্বশুর—তোমার ‘বে’-তে?’

এর চেয়ে জোরালো ঝাঁঝালো রসিকতাও হয়তো ঝলসে উঠেছে অনেক অন্তঃপুরিকার মুখে। *কৃষ্ণকান্তের উইল*-এ ভ্রমর বিবাহের মৌলিক আদর্শ নিয়েই প্রশ্ন তুলতে উদ্যত হয়েছিল। পোস্তার রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ (বেজেন্দর) রায়-এর পত্নীর মুখঝামটার ভাষা ও অভিপ্রায় কোনওটিই গোবিন্দলালের প্রতি ভ্রমরের অভিযোগের মতো সুগভীর ও সুগম্ভীর না-হলেও ধর্মপতিকে নিজের বিবাহের প্রসঙ্গ তুলে অপদস্থ করার এই নমুনায় নিরক্ষর মেয়েদের স্বাধিকারের চিহ্ন বেশ স্পষ্ট। তাহলে লেবেদেফের নাটকে অষ্টাদশ শতকের অন্তিম ভাগে মেয়েদের ‘মদ্দা’ হয়ে ওঠার যে ইঙ্গিত আছে তার মূলে কি এই ‘মুখরা’ হওয়ার ঝোঁকটার কথাই বলতে চাওয়া হয়েছে? অর্থাৎ ঘরের বার হবার আগে থেকেই শুধু অবদমনে নয়, অন্যতর বদনামেও আক্রান্ত হবার পরিসর তৈরি করে ফেলেছিলেন সতী-সাধ্বী অন্তঃপুরিকাদের একটা অংশ?

যারা ‘পাশকরা মাগ’ নন তাঁরা যদি সতীদাহ রদের আগে থেকেই এমন স্ফুলিঙ্গ তৈরি করে থাকেন তাহলে বলতেই হয় গুপ্তকবির ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশে একটা অব্যাপ্তি দোষ আছে।

> একা বেথুন এসে শেষ করেছে
> আর কি তাদের তেমন পাবে?
> যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে,
> কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
> তখন এ বি শিখে, বিবি সেজে,
> বিলাতী বোল কবেই কবে।
> এখন আর কি তারা সাজী নিয়ে,
> সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে?
> এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী
> গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।

ঘরের মেয়ে বেথুন 'একা' এসে শেষ করেননি, অবরোধের মধ্যে অস্থিরতার ঝোঁক স্ত্রীশিক্ষা চালু হবার আগে থেকেই ছিল। তবে যতই 'মুখরা' ও 'দজ্জাল' হন, লেখাপড়া শিখলে যে রাঁড় হতে হবে, এ ভয়টা বোধহয় বহুদিন বজায় ছিল এবং ভয়টা ছিল বলেই গার্হস্থ্য অসহিষ্ণুতা অন্তঃপুরের মাত্রা ছাড়ায়নি।

'ঘরের মেয়েগুলো' সম্পর্কে জনমানসে একটা ভীতি ও ভরসাহীনতা ছিলই। 'কেতাব' ধরার সম্ভাবনায় ষোলোকলা পূর্ণ হল। কলিযুগ শুরু হয়েছিল আগেই, কিন্তু কলির ব্যাপ্তি ও পরিণতি ঘটাবে মেয়েরাই এমনটাও কি বলা হয়ে যাচ্ছে না ওই লোকনিন্দায়? তার মানে স্ত্রীশিক্ষা কার্যকর হওয়ার আভাসমাত্রেই বোঝা গেল গোটা যুগান্তর না হক, আধা-যুগান্তর ঘটিয়ে ফেলতে পারে মেয়েরা, শুধু কেতাবখানা হাতে আসার অপেক্ষা! কুন্দমালা-ভুবনমালার পথে যখন বেশ কিছু মেয়ে লেখাপড়ার ফলটা ধরে রাখল এবং ব্যাপারটা বেথুন স্কুল পর্যন্ত গড়াল, তখন শুধু পুরুষেরা নয়, মেয়েরাও গোপনে আড়চোখে দেখে নিলেন স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখলে রাঁড় হয় এই জুজুটির কোনও ব্যবহারিক সত্যতা নেই।

কুন্দমালা-ভুবনমালা অন্তঃপুর থেকে ইস্কুলে এসে আবার অন্তঃপুরেই ফিরে গিয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ি থেকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কন্যা সৌদামিনীকে পাঠিয়ে সদিচ্ছা ও দৃষ্টান্ত স্থাপনে সচেষ্ট হয়েও শেষ পর্যন্ত খুব অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর ইস্কুল যাওয়া বন্ধ করেছিলেন।[২] কিন্তু কাদম্বিনী-চন্দ্রমুখীদের বেলায় আর সেরকম পশ্চাদপসরণের কোনও ঝোঁক রইল না— কে তাঁদের বাঁধবে তার পরোয়া না করেই তাঁরা চলতে থাকলেন সোজা সমুখপানে। চলার গতিভঙ্গিটাও ঠিক মরালগমনের মতো রমণীয় মনোহর নয়, বেশ ঋজু অকুণ্ঠিত দ্রুত পদপ্রক্ষেপেরই প্রাধান্য দেখা গেল তাঁদের চলনে বলনে। বেশ বোঝা গেল রাঁড় হবার ভয় দেখানোটা আর ব্যবহারযোগ্য নেই, এবার প্রয়োজন খরতর ক্ষুরধার বিরোধিতার।

১৮৫০-এর ৬ নভেম্বর কর্নওয়ালিস স্কোয়ারে নেটিভ ও হিন্দু মেয়েদের সুশিক্ষার জন্য বেথুন কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে একটি অশোক গাছের চারা রোপণ করেছিলেন বেথুন সাহেব। বেথুন স্কুলকে স্বরূপত বিষবৃক্ষ মনে

হয়েছিল এমন সমাজশিরোমণির অভাব ছিল না, ঈশ্বর গুপ্তের 'একা বেথুন এসে শেষ করেছে' ছড়াটিই বোধহয় তার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।

বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার মাত্র দু-বছর পর নন্দকুমার কবিরত্ন সম্পাদিত *নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা* ৩০ কার্তিক, ১২৫৯-এর এই সমাচার থেকে আন্দাজ করা যায় সমাজে নারীর নতুন অবস্থানের সম্ভাবনার প্রতিক্রিয়ার উত্তাপ কতটা প্রবল ছিল:

> স্ত্রীলোকের বুদ্ধি কদর্য্যা, তাহাতে বিদ্যাচাতুর্য্য প্রকাশ হইলে স্বাধীনা হইবে, তাহা হইলে পুরুষমাত্রকে তৃণতুল্যজ্ঞানে অনিষ্ট কর্ম্মকরণের অপেক্ষা রাখিবেক না।... স্ত্রীলোকের বিদ্যা প্রদান বিষয়ে দোষ দেখিয়া শুনিয়া অতঃপর নিরস্ত হওয়াই কল্যাণ, নচেৎ কত রঙ্গ উপস্থিত হইবে তাহার সীমা নাই।...

রঙ্গটা সত্যিই শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং এর গতিকে নিরস্ত করার আর প্রায় কোনও সম্ভাবনাই অবশিষ্ট ছিল না। স্বয়ং বেথুন সাহেব খোদ বড়োলাটকে লেখা একটি চিঠিতে কবুল করলেন এদেশের মেয়েরা সমবয়সি ইয়োরোপীয় মেয়েদের চেয়ে বেশি বুদ্ধি ও মেধার অধিকারিণী। স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রামমোহনের যুগান্তকারী চেতাবনির ফল ফলতে শুরু করল, মেয়েদের আর অল্পবুদ্ধি বলার উপায় রইল না।

স্ত্রীশিক্ষা বিরোধিতার যে বিপুল রচনাবলি বটতলা থেকে কুলীন প্রকাশক মারফত বাজারে ছড়িয়ে গেল তাতে প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছাড়াও লিখিত হয়ে গেল অন্যান্য বহু সামাজিক তথ্য, প্রবণতা ও সংকেত। স্ত্রীশিক্ষার বাহাসের এই চাপান-উতোরে তৈরি হয়ে উঠতে লাগল বঙ্গমহিলার বিভিন্ন বর্গ— আক্ষরিক অর্থেই ইতর থেকে ভদ্র পর্যন্ত।

মহারানীর হাতে ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড যাওয়ার পর থেকে ক্রমশ সংহত হচ্ছিল ভদ্রমহিলা নামের বর্গটি। অসংখ্য নজির এক্ষেত্রে অত্যন্ত সুলভ, এখানে স্মরণ করা যাক কেশবচন্দ্র সেন পরিপোষিত বামাবোধিনী সভার প্রধান উদ্যোক্তা ও *বামাবোধিনী* পত্রিকার বিশ্রুত সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত *বামারচনাবলী (FEMALE COMPOSITIONS)*।[৩] সংকলনের লেখিকাদের কয়েকজনের আত্মপরিচয়ে 'ভদ্র' বিশেষণের প্রয়োগ:

বামারচনাবলী হা দেশাচার/ বারাসতস্থ কোনো ভদ্র কুলবালা, পৃ.৩৫

বিদ্যা ব্যতীত স্ত্রীলোকের মন কি প্রকার// বর্দ্ধমানস্থ কোনো ভদ্র কুলবালা, পৃ.৬০

অল্প-বিদ্য (স্বপ্নাবস্থা)// বর্দ্ধমানস্থ ভদ্রমহিলা ৬৩

স্ত্রীশিক্ষা হিতৈষীগণের প্রতি// দত্তপুকুরস্থ কোনো ভদ্র কুলবালা// ৭৫

ব্যাপারটা যে রীতিমতো ব্যতিক্রমী তা অনুধাবন করা যায় অন্য ধরনের কয়েকটি উদাহরণ মনে রাখলে। যেমন— গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর প্রথম বই ছাপা হয়েছিল শুধু *জনৈক হিন্দুমহিলার পত্রাবলী* (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২) নামে।

৭৫ সংখ্যা, কার্তিক বঙ্গাব্দ ১২৯৬, ৫ম ভাগ *বামাবোধিনী* পত্রিকায় 'বামাবোধিনী ও বামাগণ' রচনার লেখিকার নামস্থানে পাওয়া যাচ্ছে শুধু 'ব্রাহ্মিকা', নিবাস কলুটোলা। ১২৭২ সালে শিবপুর থেকে প্রকাশিত 'উর্বশী নাটক' ছাপা হয়েছিল 'দ্বিজতনয়া' নামে। যদিও:

> কিন্তু ইঁহার পরবর্তী পুস্তক 'বালা বোধিকা'য় (ইং ১৮৬৮) 'উর্ব্বশী নাটক রচয়িত্রী শ্রীমতী কামিনীসুন্দরী দেবী প্রণীত' মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্গমহিলাদের মধ্যে কামিনীসুন্দরীই প্রথমে নাটকরচনায় হস্তক্ষেপ করেন।[৪]

ফলত নিজেদের ছদ্ম পরিচয়ে 'ভদ্র' শব্দটির আশ্রয় নেওয়া যথেষ্ট তাৎপর্যময় এ বিষয়ে সংশয় না-থাকার কথা।

বিপরীত বক্তব্য খুব প্রবল বিতর্ক হিসেবে উঠে আসতে আরও কয়েকদশক লাগলেও তথাকথিত 'স্ত্রীশিক্ষাবিরোধপন্থী' বলে খ্যাতিমান কয়েকজন স্ত্রীশিক্ষার এই পত্তনকালের মধ্যেই আরও মেঘমন্দ্র গগনবিদারী 'ভাঙনের জয়গান' অভ্রান্তভাবে শুনতে পেয়েছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপারটা অন্তত নাগরিকবর্গের উচ্চ ও উচ্চমধ্যবিত্ত স্তরে রীতিমতো সরকারি চাপরাশ পেয়ে গেছে একথা হাড়ে হাড়ে বুঝে নেওয়ার পর তাঁরা আরও তিনপরত বিরোধিতার খসড়া পাকা করে নিলেন।

প্রথম পরতে রইল স্ত্রী ও পুরুষের পাঠক্রমের প্রভেদের প্রয়োজনীয়তার 'হিতাকাঙ্ক্ষা', দ্বিতীয় পরতে উচ্চশিক্ষার বিরোধ এবং তৃতীয় পরতে শিক্ষালব্ধ যোগ্যতার ভিত্তিতে পেশাদারিত্ব, বৃত্তিগ্রহণ ও রোজগারের মারণলক্ষণ অপনয়নের প্রয়াস।

এবং খুব আশ্চর্যভাবে এই তিন কিসিমের বিরোধপ্রকল্পের মধ্যেই উপমা ও খতিয়ানে নানান বিভঙ্গে উঠে আসতে লাগল শারীরবৃত্তীয় হরকিসিমের

অতি, অব ও অপব্যাখ্যা। এবং এবার আর ব্যাখ্যা, বিধান ও নিদান খোঁজার কাজটি কেবল সংস্কৃত সনাতনী সংহিতা ও স্মৃতিশাস্ত্রের আশ্রয়ে নয়, ছানবিন চলতে লাগল পাশ্চাত্য বা 'সাহেবি' পুথিপাটার মধ্যেও ছড়ানো-ছেটানো সমাচার ও বিধানাবলির মধ্যেও।

প্রথম নজিরটি ভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *বেদব্যাস* পত্রিকার বৈশাখ ১২৯৬ সংখ্যা থেকে:

> প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষাও নারীর পক্ষে অমঙ্গলের কারণ। কেননা ইহার দ্বারা নারীর পুত্র প্রসবোপযোগিনী শক্তিগুলির হ্রাস হয়। বিদুষী নারীগণের বক্ষদেশ সমতল হইয়া যায়, এবং তাঁহাদের স্তনে প্রায়ই স্তন্যের সঞ্চার হয় না, এতদ্ভিন্ন তাহাদের জরায়ু প্রভৃতি বিকৃত হইয়া যায়।... বিদ্যা নানারূপে আমাদের মঙ্গলের কারণ হইলেও নারীগণের পরম শত্রু। আমেরিকার অনেক বড় বড় ডাক্তার ও দার্শনিক স্পেন্সার এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।

দ্বিতীয় উদাহরণটি চয়ন করা হল ১৫ ভাদ্র, ১২৯২ বঙ্গাব্দের *সমাজদীপিকা* থেকে:

> তুমি মেডিকেল কলেজ যাইয়া, কতদিনে পড়িয়া শুনিয়া জানিলে 'This and that, make poison' অমুক অমুক দ্রব্যে মিলিত হইলে বিষ হয় কিন্তু তাহারা অনেক দিন হইতে জানিয়াছে যে, অর্দ্ধভুক্ত অন্নে ঘৃত ভক্ষণীয় নহে, আদায় কাঁচকলায় ভাল তরকারি হয় না, অলাবু ও মাষক যুগপৎ খাদ্য নহে। তুমি মিডুইফারির (midwifery) কি জান, ডেলিভারির (Delivery) সময় কিরূপে অঙ্গযষ্টি রাখিলে সুপ্রসব হয়, তাহা তুমি স্থির করিতে পার না, কিন্তু তাহারা প্রবীণা ঠানদিদির কাছে সমস্তই শিখিয়াছে।... সকল ধর্মশাস্ত্রের মতেই স্ত্রীলোকের ঈশ্বরের বাম কক্ষ হইতে উৎপত্তি। উহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল উহাদের পুরুষ বশ্যতার পরিচায়ক। ধর্মশাস্ত্রের কথা হয়ত, আধুনিক মার্জ্জিতবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের অনুমোদিত হইবে না। এজন্য আমাদিগকে বিজ্ঞানের ও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের আশ্রয় নিতে হয়। স্ত্রীগণের জরায়ু নামে যে একটী অঙ্গ আছে পুরুষের সহায়তা ব্যতীত আর তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে না। সুতরাং স্ত্রীগণের পুরুষবশ্যতা অবশ্যম্ভাবী, পুরুষের নহে। (স্বপন বসু ৩৪৪-৪৭)

বঙ্কিমের বই বাজার মাত করে দিয়েছিল যে কালপর্বে, তখনই ১৮৭৬ সালে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (২৭.১০.১৮৪৯ - ১০.১০.১৯২২) পঁচিশ বছর বয়সে স্ত্রীবিয়োগজনিত ঘনঘোর বিষাদযোগে রচিত *উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম* নামে একটি বিচিত্র রমন্যাস প্রকাশ করলেন। উনিশ শতকের শেষ তিন দশক, এমনকি বিশ

শতকের গোড়ার দিকেও এ বইয়ের বিক্রি অনেক কেতাবি রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিল। এই প্রথিতযশা গ্রন্থকারের আর-একটি কীর্তি হল *স্ত্রী-চরিত্র* নামক একটি সন্দর্ভ।

নিজের কৈফিয়ত মোতাবেক তাঁর প্রেরণাই হলেন স্পেনসার:

> হার্বার্ট স্পেন্সারের সমাজতত্ত্বাধ্যয়ন নামক গ্রন্থ পড়িয়া স্ত্রীচরিত্র[৫] সম্বন্ধে আমার কিছু লিখিবার ইচ্ছা হয়।... বাধার ক্লেশ, অপমানের যাতনা, নির্য্যাতনের মর্ম্মপীড়া তাহাদিগকে অনেক সহিতে হইয়াছে। অনেক দিন আপনি অনাহারে বা অল্পাহারে থাকিয়া স্বামী-পুত্রের সেবা করিতে হইয়াছে। অনেক সময়ে, যখন স্বামী যুদ্ধে বা বন্য জন্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আহত হইয়াছে, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া স্বামীর রুগ্নশয্যার পার্শ্বে বসিয়া ধাত্রী এবং চিকিৎসকের কার্য্য প্রাণপণে করিতে হইয়াছে। নিজের শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য, সাংসারিক সুবিধা-অসুবিধাসকল ভুলিয়া সেই স্বামীর সঙ্গে রোগী হইতে হইয়াছে।

গ্রন্থের পরবর্তী অংশে নারীপ্রগতি বিষয়ে প্রতিক্রিয়াটা আর নৈতিক তর্কের আওতায় নেই, তাতে এসে পড়েছে শারীরবৃত্তীয় সালিশি। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় তাঁর ঈপ্সিত 'সেকালিনী' বা 'চিরকালিনী' নারীকে 'ধাত্রী ও চিকিৎসকের কার্য' করানোর পক্ষপাতী, কিন্তু তা শুধু 'আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া স্বামীর রুগ্নশয্যার পার্শ্বে বসিয়া'। পেশাদার ধাত্রী বা চিকিৎসক হিসাবে নারীকে স্বীকার তাঁর পক্ষে অসম্ভব। *সমাজদীপিকা* যে পত্নীর সেবাময়ী রূপকে ধাত্রীবিদ্যার পাঠক্রমে তালিমপ্রাপ্ত পেশাদার মহিলার থেকে স্বতন্ত্র করে নিচ্ছেন তার প্রকট নজির midwifery, Delivery শব্দগুলি ইংরেজি ভাষায় উদ্ধৃত করায় এবং মেডিকেল কলেজে যাওয়ার মাহাত্ম্য পুরোপুরি খারিজ করে সাব্যস্ত করছেন ইস্কুলে-না-যাওয়া মেয়েরা 'প্রবীণা ঠানদিদির কাছে সমস্তই শিখিয়াছে।'

সমাজদীপিকা-র এই মন্তব্যের মধ্যেই এই নিবন্ধের শিরোনামে প্রতিশ্রুত ছড়াটির মূল নিহিত আছে।

কোবরেজি-টোটকা-অবধৌতিক ওষুধ বিষয়ে তত না হোক যেসব খলিফা পাঠক মানবীবিদ্যা বিষয়ে আগ্রহী এই লম্বা ছড়াটির অংশবিশেষের উদ্ধৃতি তাঁদের কোনও না কোনও প্রসঙ্গে চোখে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। অনেকটা যেমন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিষয়ে তেলে-বেগুনে চটা এবং তাঁর প্রতি অসূয়া-হরিৎ গ্রন্থকাররাও উৎস না জেনে 'না জাগিলে ভারত ললনা' পংক্তির উদ্ধৃতি খচিত

করে যুক্তি ফাঁদতেন, তেমন করেই এই ছড়াটির বহু অংশ লেখকের নাম ও পরিচয় না জেনে বহুল পরিমাণে অন্যদের রচনায় উদ্ধৃত হয়েছে। এমন কিছু শব্দবন্ধ চরণগুচ্ছ আছে যা স্বগুণে ধীরে ধীরে রচয়িতার জীবৎকালেই আওয়ারা হয়ে যায়, ব্যক্তির বিশিষ্ট টিপছাপ থাকলেও প্রবাদ-প্রবচনের মতো সমাজমনের হাওয়াবাতাসে তুলোবীজ ওড়া-উড়িতে বয়ন করা বাক্যের মতো হয়ে যায়—বুঝতে হয় একটি ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা স্বতঃপ্রকাশ হয়ে ওঠার মতো কিছু প্রবল আবদেনময় গুণাবলি সেগুলির আছে।

যেমন রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদের পদ্যটি বেমালুম চলে গেছে শচীন্দ্রনাথ সেন নামের আর এক গ্রন্থকারের নামে। তবে তাতে ঠিক অন্যের মাল নিজের নামে চালিয়ে দেওয়ার ইতরতা নেই, কারণ এই চিকিৎসক ও প্রযুক্তিরসিকের অতি অল্প কিছু কবিতা লেখা হয়েছিল তিনি দৃষ্টিহীন হয়ে যাওয়ার পর। সন্তানসন্ততিদের কেউ কেউ বিচ্ছিন্নভাবে টুকরো কাগজে সেগুলি লিখে নিয়েছিলেন তাৎক্ষণিকভাবে অগ্রপশ্চাৎ তেমন বিবেচনা না করে। এইভাবেই হয়তো দৃষ্টিহীন বৃদ্ধের স্মৃতিতাড়িত জবানের উচ্চারণকে তাঁর নিজের রচনা বলেই সাব্যস্ত করে ফেলেছিলেন আত্মীয়পরিজন কোনও অনুলেখক।

রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ (১৮৬২-১৯০২; কুমারখালি, নদিয়া) তাঁর সমকালে খুব অচেনা লেখক ছিলেন না, এবং লেখালিখি ছাড়াও বহুবিধ সামাজিক তৎপরতা ছিল তাঁর। ১৮৯৬ সালে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের কর্নওয়ালিস স্ট্রিট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি প্রকাশিত রামচন্দ্রের *আয়ুর্বেদ-সোপান* রীতিমতো জনপ্রিয় হয়েছিল। সিমলা অঞ্চলে কবিরাজিতে রীতিমতো খ্যাতি ছিল তাঁর। প্রবেশিকা, এফ.এ. এবং সংস্কৃত ও আয়ুর্বেদশাস্ত্রীয় পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রেও তাঁর দক্ষতা ও রোগনির্ণয়ে অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কলকাতায় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা শুরু করেন। সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল। চাণক্য শ্লোকের বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ করে খ্যাতি অর্জন করেন। *ঋষি* মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন (আষাঢ় ১৩০৫)। *হিতকথা, প্রকৃতির শিক্ষা, নীতিস্তবক, দ্রব্যগুণ-বারিধি, আয়ুর্বেদ চিকিৎসা* প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

ছোট ঔষধে বড় গুণ

কাল পড়েছে কেমন ধারা, সব কাযেই ইংরাজি চাল,
সেকেলে ভাব উল্টে গেল, হ'লো দেশের একি হাল।
সারটী গেল রৈল ছায়া, আহার ব্যাভার সকল দিকে,
উপর উপর দেখতে ভাল, ভিতর পচে মর্চ্চে লোকে।
বসন ভূষণ যাউক তাতে, নাইকো তত মনের জ্বালা,
ডাল-ভাতের শরীরে এত, বিলাতী বিষ কেন ঢালা।
সে-কালের সব বুড়ো-বুড়ী, জান্ত এমন শেকড়-পাতা,
যোল-টাকা, ভিজিট-খেকো, ডাক্তার সাহেব লাগেন কোথা।
ঘরে কারো অসুখ হ'লে, এমনি টোটকা দিতেন বুড়ী,
কোথাকার রোগ কোথায় যেত, লাগতো নাকো বৈদ্যের কড়ি
সে সব খবর রাখেন নাকো, আজকালকার গৃহ বধূ,
কথায় কথায় ডাক্তার আনো, নিজে পড়েন নভেল শুধু
কি বোলে কে প্রেমের চিঠী, লিখেছিল কবে কাকে,
নভেল-পড়া বধূদিগের, সেগুলি বেশ মনে থাকে।
খোকার সদি হোলে, কি হবে তাই ভেবে খুন,
কোন জন্মে জানেন নাকো, তুলসী-পাতার কিবা গুণ
বাঙ্গালী-গৃহস্থের মেয়ে, যদি একটু রাখেন খোঁজ,
দেখতে পাবেন কত ওষুধ, নাড়েন তিনি প্রতিরোজ।
পান সাজা ডাবরের মাঝে, চূণের ভাড় আর মশলা হাঁড়ি, —
রান্নাঘরের কুলঙ্গীতে, কত ওষুধ ছড়াছড়ি।
চূণ কর্পূর মৌরী খএর জৈত্রী এলাচ, পান সুপারি,
লবণ জীরে হলুদ গুঁড়ো, সবই রোগে উপকারী।
আদা মরিচ লঙ্কা ধনে, লবঙ্গ আর দারুচিনি,
ঘরের ঝুল, উননের মাটী, চালুনির জল, লেবু-চিনি।
উঠানধারে দূর্বাগুলি, খিড়কিপাশে সিউলী গাছ,
বাগানে ঐ বেলের পাতা, তুলসী আছেন হাতের কাছ
যেদিক দেখ সবই ওষুধ, ছড়িয়ে আছে চারিধার,
কোন জিনিসটী কি গুণ ধরে, জানলে লাগে চমৎকার।

— কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ কবিভূষণ।

ডাক্তার শ্রীসত্যকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত *চিকিৎসক ও সমালোচক মাসিক পত্র*-র[২] ২য় খণ্ড/ আষাঢ় শ্রাবণ ১৩০৩, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যায় (পৃ: ১৭৪-১৭৫) প্রকাশিত হয়েছিল এই পদ্য।

'ঘরে কারো অসুখ হ'লে, এমনি টোটকা দিতেন বুড়ী,'

এই পদ্যের এই পঙ্ক্তির ফুটনোট হিসেবে ধরা যেতে পারে এমন একটি বিস্মৃত খাজানার কথা যা এখানে পেশ করা যেতে পারে। জিনিসটি হল 'ন্যাতা-ক্যাঁতার হাঁড়ি'— পরমহংসঠাকুর অনন্য উপমাবলে যেটিকে 'সৃষ্টি-নাশের পর' মা ব্রহ্মময়ীর 'সৃষ্টির বীজসকল' কুড়িয়ে রাখার আধার বলেছেন। যদিও জিনিসটি বড়োই মৃত্তিকালগ্ন, প্রাকৃত, গেরস্থালির অঙ্গ— যাতে 'গিন্নী পাঁচরকম জিনিস তুলে রাখে'।

আয়ুর্বের্বদ পত্রিকায় বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বিস্তারিত লিখেছিলেন এই বিস্ময়কর খাজানার কথা।[৭]

> অজীর্ণ রোগে ডাক্তার ডাকিতে ছুটিতাম না। তখন আমাদের ডাক্তার ছিল ঘরে ঘরে। এক দিকে যেমন পল্লীর শ্যামল ক্ষেত্রে লক্ষ্মীশ্রী ঢেউ খেলিত, গ্রাসাচ্ছাদনের অভাবের অভাবে পল্লীবাসী অতিথি-তত্ত্বও দরিদ্রের প্রতি দয়াবান ছিল, অন্যদিকে সেইরূপ পল্লীবাসীর সুস্থ দেহশ্রীতে পল্লীপথ সমুজ্জ্বল ছিল, পল্লীর বকুলতলা তরুণের ব্যায়াম-ক্রীড়া ও বৃদ্ধের গল্প গুজবে মুখরিত থাকিত। তখন পল্লীবধূ আপন পুত্র কন্যার যত্ন করিতে জানিত এবং প্রবীণা গৃহিণী ছিলেন গৃহচিকিৎসক। নানা স্থান হইতে কুড়াইয়া তিনি তাঁহার গৃহচিকিৎসার বাক্সে প্রকৃতিপ্রদত্ত অসংখ্য ঔষধ, বিনামূল্যে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন এবং গৃহমধ্যে কাহারও কোনও পীড়া হইলে তিনিই রোগ-নির্ণয় ও ঔষধ নির্বাচন করিতেন।
>
> এই গৃহ-চিকিৎসার বাক্সের নাম ছিল ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড়ি। এই হাঁড়ির মধ্যে থাকিত একখানি শতগ্রন্থ পুরাতন কাপড়—সেই কাপড় বা নাতার (সংস্কৃত 'নেত') নাম হইতে হাঁড়ির নাম হইয়াছে নাতাকাতার হাঁড়ি। এই কাপড়ের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে, বাঁধা থাকিত অসংখ্য, অমূল্য ঔষধ। এই সকল ঔষধ সাধারণতঃ প্রসূতি ও শিশুর চিকিৎসার উপযোগী ছিল। তাই বলিয়া যে সাধারণ রোগের ঔষধ থাকিত না তাহা নহে! ইহাতে থাকিত—
>
> ১। শুষ্ক পল্‌তা
>
> ২। আদা

৩। শুঁঠ
৪। পিঁপুল
৫। যব
৬। সমুদ্রফেন
৭। অহিফেন
৮। জোয়ান
৯। সৈন্ধব লবণ
১০। ফটকিরি
১১। তুঁতে
১২। গোসাপের মাথা
১৩। রক্তচন্দন
১৪। গেরিমাটি
১৫। কাপাস
১৬। গোরোচোনা
১৭। কর্পূর
১৮। বকুল বীজ
১৯। ঘেঁচিকড়ি
২০। গাঁট হলুদ
২১। সিদ্ধি
২২। চা-খড়ি
২৩। ময়ূরপুচ্ছ
২৪। মৃগচর্ম
২৫। হরিণের শিঙ
২৬। বাঘনখ
২৭। ভালুকের লোম
২৮। নাগেশ্বর ফুল (শুষ্ক)
২৯। রসমাণিক
৩০। রসসিন্দুর
৩১। মুচুকুন্দ ফুল (শুষ্ক)
৩২। রশুন
৩৩। কৃষ্ণ তিল
৩৪। গঙ্গামাটি
৩৫। শিল-মাটি (শিলাবৃষ্টির শিলার ভিজা মাটি)

৩৬। জলুই

৩৭। বচ

৩৮। মুসব্বর

৩৯। গন্ধক

৪০। মেটে সিঁদুর

৪১। জাতি হরীতকী

৪২। বাঘের জিভ

৪৩। রাত চোরা পাখির হাড়

৪৪। বংশলোচন

৪৫। সোমরাজ

৪৬। ইসবগুল

৪৭। গর্ভ খরসরে (যে খরগোশের পেটে বাচ্চা মারা যাইত, সেই মৃত বাচ্চার মাংস শুকাইয়া টুকরা টুকরা করিয়া রাখা হইত।)

এই সকল ঔষধ লইয়া ঘরের প্রবীণা গৃহিণী নানা রোগের চিকিৎসা করিতেন। ইহা ছাড়া বহু সহজপ্রাপ্য ঔষধ তিনি রান্নাঘর, উঠান ও পুকুরপাড় হইতে সংগ্রহ করিতেন। মধু ও গব্য ঘৃত সকল গৃহের বাড়িতেই থাকিত। তুলসী, দূর্বা ও কলাপাতা প্রভৃতি আরও কত ঔষধ উঠানে, পুকুরপাড়ে ও নানা স্থানে পাওয়া যাইত। এইসকল ঔষধ জর্মনী বা আমেরিকা হইতে ইম্‌পোর্ট করাইতে হইত না। নির্বাচন (prescription) বা মিশ্রণের (compound) জন্য কোনও খরচ হইত না। গৃহিণীর আদেশে বধূগণ compounder-এর কাজ করিতেন এবং হাতে-কলমে বাক্স ব্যবহার করিতে শিখিতেন।

এই ছিল সেকালের অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতালোক প্রকাশিত হইবার পূর্ব যুগের বঙ্গবাসীর আত্মনির্ভরশীলতার একটা উদাহরণ। তখন স্বাবলম্বন ও জ্ঞানের প্রভাবে পল্লীগৃহে চিকিৎসকের শুভাগমনকালে কস্মিন হইত। আর এখন? ভাই বঙ্গবাসি! একবার তুলনা করিয়া দেখুন, আমরা এখন কোনপথে চলিতেছি? উন্নতি না অধঃপতন?

রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ তাঁর পদ্যে সেকালিনীর শ্রেষ্ঠতা শুধু নয়, একালিনীদের অপকৃষ্টতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভদ্রমহিলা বর্গ গড়ে ওঠার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইস্কুলে-না-পড়া শাস্ত্র-সংহিতা ইত্যাদিতে নিবেদিতপ্রাণ প্রাচীনাদের শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ বিতর্কের এক প্রবল বিভঙ্গ হিসেবে দেখা দিয়েছিল।

রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ কবিভূষণের ‘ছোট ঔষধে বড় গুণ’ পদ্যটির মধ্যে এই প্রতিতুলনাত্মক বাখানটি ধরা পড়েছে চিকিৎসাবিদ্যার সেকাল ও একালের দ্বন্দ্বকেও আত্মসাৎ ও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে।

ভদ্রমহিলা নামক বর্গ গড়ে ওঠার কালপর্বে প্রাচীনার নতুন ভাষ্যনির্মাণের প্রকল্পে সতীর সহিষ্ণুতা, পতিভক্তি, ইত্যাদির সঙ্গে একটা অত্যন্ত বহুপরতের জটিল নকশাও তৈরি হয়ে উঠেছিল নব্য ও বিগতপ্রায় চিকিৎসা-সংস্কৃতিকেন্দ্র করে। ইতি টানা এই প্রকল্পের একটি চমৎকার নজির দিয়ে। *বঙ্গবাসী*-সম্পাদক ও *মডেল-ভগিনী*-র লেখক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু তাঁর *বাঙ্গালী চরিত* নামে চরিত্রচিত্রশালায় এঁকেছিলেন এক ঠাকুরমার ছবি:

ঠাকুরমার কথা

আজ আমার ঠাকুরমায়ের কথা শুন দেখি। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বের কাহিনী। ঠাকুরমা বৃদ্ধা। বয়স ৬৫ বৎসরের কম নহে। হেঁগা, এ পৌষমাসে বৃদ্ধার শীত লাগে না কি? ঠাকুরমা, গাছপালায় রাত থাকিতে থাকিতে, কাক ডাকিবার পূর্ব্বেই উঠেন। কি আশ্চর্য্য গায়ে ফ্লানিলের জামা কৈ? পায়ে এষ্টাকিন কৈ? হাতে দস্তানা কৈ? এ আবার কি? ঐ যে বুড়ী ঠাণ্ডা জলে গোবর গুলে উঠানে ছড়া দিতে লাগিল।...

...বেলা হইল। ঠাকুরমা এবার ছেলেপিলের চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন জনের সর্দি, কাহারও পেটের অসুখ, কেহ বা খোসে পঙ্গু। তিনি কবিরাজের উপদেশ এবং নিজ বহুদর্শিতা গুণে, নানা অনুপান সংগ্রহ করাইয়া ছেলেদিগে ঔষধ খাওয়াইলেন। গাই দোহাইয়া টাট্‌কা দুধ গরম করিয়া, একটি ছেলেকে তিনি খাইতে দিলেন। নিমপাতা গরম করিয়া, একটি ছেলের খোস ধোয়াইতে লাগিলেন।

এমন সময় একজন প্রতিবেশিনী বালিকা, বৃদ্ধাকে ডাকিতে আসিল ‘ঠাকুমা, মা তোমাকে ডেকেছেন খোকার জ্বর হয়েছে, তোমাকে হাত দেখিতে হইবে।’

ময়না বৌ আসিয়া বৃদ্ধাকে ধরিল, ‘মা, আমি অর্দ্ধেক সুদ দিতে পারিব না—আমাকে সুদ ছেড়ে না দিলে, ছেলে পিলে খেতে পাবে না।’

ঠাকুমা। তোদের আবার টাকার ভাবনা কি? নদীর জল যতদিন না শুকুচ্চে, ততদিন তোর ছেলেপিলের কষ্ট হবে না।

> গোয়ালিনি হাসিল। বলিল— ‘মা, আমি তোমাকে কথায় পারি কি? তোমার পায়ে পড়ি মা— আমাকে সব সুদ দিতে হ’লে, আমি মারা পড়বো।’
>
> ঠাকুমা। ‘আসলের সব টাকা নিয়ে আসিস তোকে সিকি সুদ ছেড়ে দিব।’
>
> এই কথা বলিয়া ঠাকুরমা রোগী দেখিতে অগ্রসর হইলেন। ছেলের হাত দেখিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, এ জ্বর কিছু নয়, একটা পাচন দিলেই ছেড়ে যাবে।
>
> ঠাকুমা চিকিৎসা বিদ্যায় সুনিপুণা বলিয়া পাড়ায় প্রসিদ্ধা। তবে কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে তাঁহার বচসা হইত। ঠাকুমা কবিরাজের কথা না শুনিয়া, সময়ে সময়ে নিজের মতলব মত পাঁচনাদির ব্যবস্থা করিতেন।...
>
> ষাট বৎসর বয়স্কা সেই লক্ষ্মীরূপিণী ঠাকুরমার এইরূপই দিন-লিপি ছিল।...
>
> বৃদ্ধা বধূগণকে উপদেশ দিতেন— ‘‘প্রত্যহ প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া পতিকে প্রণাম করিবে। কারণ পতি দেবতা। পতিকে কখন অপ্রিয় কথা বলবে না। যে স্ত্রী সোয়ামীর সঙ্গে সদা-ঝগড়া করে, সে নরকে যায়।’’
>
> ঠাকুরমা ৮০ বৎসরে জীবন লীলা শেষ করেন। বৃদ্ধার সংক্ষিপ্ত সোজা কাহিনী শিক্ষিত নরনারীর ভাল না লাগিতে পারে— একটু কুরুচিময় বোধ কিন্তু ইনিই হিন্দুর গৃহলক্ষ্মী ছিলেন।

‘ভদ্রমহিলা’ রূপটি গড়ে ওঠার সন্ধিকালে এই ‘গৃহলক্ষ্মী’রূপের প্রতিষ্ঠার ঘাতপ্রতিঘাত বেশ জমে উঠেছিল চিকিৎসার ঘরোয়া-প্রাতিষ্ঠানিক, দেশি-বিদেশি, শাস্ত্রীয়-অর্বাচীন এমন একাধিক পরিসরে; তা যথেষ্ট জটিল হলেও সেগুলিকে সুপাচ্য সুস্বাদু করে বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর কাছে পেশ করার দায় পড়েছিল— তার এক উমদা নজির বিদ্যাবিনোদ কবিভূষণের এই পদ্য।

তথ্যসূত্র

১. দুর্গাচরণ রায় (দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত *কল্পদ্রুম* হইতে উদ্ধৃত), *সচিত্র দেবগণের মর্ত্তে আগমন*, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩২১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬২৪

২. **সৌদামিনী দেবী** (১৮৪৭-১৯২০): মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা। জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে স্ত্রীশিক্ষার রেওয়াজ ছিল। গোঁসাই মেয়েরা পরিবারের স্ত্রীকন্যাদের প্রাথমিক লেখাপড়া শিখাইতেন। ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ১৮৪৯, ৭ই মে, কলিকাতা বালিকা বিদ্যালয় (পরে ‘বেথুন স্কুল’) স্থাপন করেন। তখন প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে

বালিকাদের প্রেরণের রীতি উচ্চ ও মধ্য-স্তরের হিন্দু পরিবারে প্রচলিত ছিল না। বেথুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর হইতে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে মেয়েদের পড়াইবার রীতি সমাজে চালু হয়। ১৮৫১ সনের মাঝামাঝি দেবেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠা কন্যা পঞ্চম বর্ষীয়া সৌদামিনীকে এই স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। এই ঘটনাটির কথা তখন সাময়িক পত্রের সংবাদ-স্তম্ভেও প্রকাশিত হইয়াছিল। জুলাই ১৮৫১ সংখ্যা 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার' লেখেন:

"One of the most influential natives in Calcutta, Debendernauth Tagore, has added his own daughter to the long list of eighty female children already receiving instruction in the Institution, and the Raja Sri Krishna Bahadur, who occupies the prominent position in Hindu Society in the metropolis has accepted the office of its president."

দেবেন্দ্রনাথ ৮ই জুলাই ১৮৫৯ তারিখে রাজনারায়ণ বসুকেও এই বিষয়টির কথা এক পত্রে এইরূপ লিখিলেন, "আমি বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয়ে সৌদামিনীকে প্রেরণ করিয়াছি, দেখি ও দৃষ্টান্তে ফল কি হয়।" (পত্রাবলী, প. ৪১)। সৌদামিনী দেবী 'পিতৃস্মৃতি'তেও (প্রবাসী—ফাল্গুন ১৩১৮) বলিয়াছেন যে, তাঁহার পিতৃদেব তাঁহাকে এবং তাঁহার খুড়তুতো বোনকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন।

[সরলা দেবী চৌধুরাণী, *জীবনের ঝরাপাতা*, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ (১৩৬৪ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২০৭]

৩. The Hare Prize Fund Essay.
FEMALE COMPOSITIONS.
PART 1.
বামারচনাবলী।
প্রথম ভাগ।
কলিকাতা বামাবোধিনী সভা হইতে
প্রকাশিত।
১১ মাঘ ১২৭৮ সাল।
CALCUTTA.
PRINTED AT J. G. CHATTERJEA & Co's PRESS.
115, AMHERST STREET.
1872.

৪. *বঙ্গসাহিত্যে নারী*, পৃ. ১৫

৫. স্ত্রী-চরিত্র,
শ্রী চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

"If God had designed woman as man's master, He would have taken her form his head; if as his slave, He would have taken her from his feet; but as He designed her for his companion and equal, He took her from his side." – St. Augustine De Civilate Dei.

কলিকাতা,—১২৭ নং, মজীদবাড়ী ষ্ট্রীট হইতে সমুন্নত সাহিত্য প্রচারী কোং কর্তৃক প্রকাশিত,

CALCUTTA:

PRINTED BY B. N. NANDI AT THE VALMIKI PRESS,

100/1, MECHHOOABAZAR ROAD,

১২৯৭।

পৃ. ৮-৯

৬. A Monthly Journal of Medicine, Surgery Hygiene, Published from Chikitsaka O Samalochake Office, 19-1 Nayan Chand Dutt's Street, Chaitanya Press, Printed by N. C. Dhur, 68 Nimtollah Street

৭. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এল, এ/ নাতা-কাতার হাঁড়ি (বা সেকালের গৃহচিকিৎসার বাক্স), *আয়ুর্ব্বেদ* ৬ষ্ঠ বর্ষ, বঙ্গাব্দ ১৩২৯---শ্রাবণ, ১১শ সংখ্যা, পৃ. ৩৭৭-৩৮১

উনিশ শতকের কলকাতায় বটতলার বই

অর্ণব সাহা

ক্ষমতার চোখ পেরিয়ে

> সাহিত্যের বাজার দেখিলাম। দেখিলাম, বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণ অমৃত ফল বেচিতেছেন; বুঝিলাম ইহা সংস্কৃত সাহিত্য। দেখিলাম, আর কতকগুলি মনুষ্য নিচু পীচ পেয়ারা আনারস আঙুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল বিক্রয় করিতেছেন— বুঝিলাম, এ পাশ্চাত্য সাহিত্য। আরও একখানি দোকান দেখিলাম— অসংখ্য শিশুগণ এবং অবলাগণ তাহাতে ক্রয়বিক্রয় করিতেছে—ভিড়ের জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না— জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ কিসের দোকান?' বালকেরা বলিল, 'বাঙ্গালা সাহিত্য'। বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম—খবরের কাগজ জড়ানো কতকগুলি অপক্ক কদলী।
>
> (বড়বাজার, *কমলাকান্তের দপ্তর*; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সম্পা. ক্ষেত্র গুপ্ত, কলকাতা, ১৯৯২)

আফিমখোর কমলাকান্তের দিব্যদর্শনে উনিশ শতকের জনপ্রিয় বাংলা সাহিত্যের বাজার মূলত বালক ও মহিলাপাঠ্য অসার, অত্যন্ত নীচু মানের বইপত্রের জঞ্জাল। এই দৃষ্টিকোণ এবং কণ্ঠস্বরের নেপথ্যে কাজ করছে 'সাহিত্যসম্রাট' বঙ্কিমের এলিট উন্নাসিকতা। কিন্তু রামমোহন-মাইকেল-রঙ্গলাল-বিদ্যাসাগরের ধারাবাহিকতায় যে উন্নত উঁচুদরের সাহিত্যিক উৎকর্ষের সাধনা বঙ্কিমের, উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই মুদ্রণপুঁজির বিস্তার তার পাশাপাশি অন্য এক বিপুল সাহিত্যসম্ভারের জন্ম দেয়। বস্তুত, সমকালের এই বিপুল সাহিত্যিক উপাদানগুলিই ছিল সেদিনের মেইনস্ট্রিম সাহিত্য। গদ্য-পদ্যে রচিত কাহিনিধর্মী

বই, ধর্মীয়, বিনোদনমূলক, তথাকথিত আদিরসাত্মক, পোলেমিক্যাল, ধাঁধা-হেঁয়ালি, রহস্যকাহিনি, সমসাময়িক চটজলদি বিষয়, নাটক-প্রহসন, নভেল থেকে হাতে-কলমে শিক্ষার বিচিত্র জাতের এইসব নিদর্শন আজ আমাদের সামাজিক ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রথাগত সংজ্ঞায় এদের নাম 'বটতলার বই', যারা উনিশ শতকীয় সমাজের বহুবিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাত, লক্ষণ এবং দিক্‌নির্দেশকে আমাদের সামনে হাজির করে। কৃতবিদ্য গবেষকেরা এইসব বইপত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, সাম্প্রতিক সমাজ-ইতিহাসের চর্চায় আজ বটতলার বই ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এই লেখা সেই তথ্যের বিবরণী নয়। বরং বটতলার বই সেদিন হয়ে উঠেছিল বৃহত্তর জনসমাজের আত্মানুসন্ধান ও আত্মপরিচিতির ক্ষেত্র। আর সেই আইডেনটিটি নির্মাণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল ঔপনিবেশিক সমাজ-পরিসরে ক্ষমতার রাজনীতি। বটতলার বহুধাবিচিত্র টেক্সট আসলে সেই রাজনীতির যুক্তি-তক্কো-গপ্পোকেই উপস্থাপিত করে। এবং এই গল্প কখনোই কোনও সরলরৈখিক পথ ধরে এগোয় না। এর ভিতরে হাজারো ভাঁজ। এর ভিতরে ঘাতপ্রতিঘাত, লেনদেনের বিচিত্র তরিকা কাজ করেছে। কোনও একটি আধিপত্যের ধরন এর নিজস্ব কাঠামোর অগ্রগতি বা চরিত্রকে পুরোটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে আমরা তার দুয়েকটা দিক ছুঁয়ে যাবার চেষ্টা করব।

উনিশ শতকের গোড়া থেকেই পাশ্চাত্যবাহিত জ্ঞান-যুক্তি-আলোকায়নের প্রভাবে ঔপনিবেশিক ভদ্রলোকের জীবনযাপন, সাহিত্য-সংস্কৃতি, নৈতিক অবস্থান সর্বত্রই এক বিশেষ ধরনের এনলাইটেন্‌ড মান নির্ধারণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি এই নতুন স্ট্যান্ডার্ডাইজ্‌ড প্রক্রিয়ার বাইরে রয়ে যাওয়া সব ধরনের সাংস্কৃতিক উপাদানকেই নীচু নজরে দেখতে থাকে। দেশীয় জনসমাজের রুচি, আবেগ, ভাষা ব্যবহার, শ্লীলতা-অশ্লীলতার ধারণা থেকে ভিক্টোরীয় বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণির সচেতন দূরত্ব তৈরি হয়। 'বটতলার বই' সেদিনের এই পাশ্চাত্যপ্রভাবিত নিজেদের খানিকটা আলাদা করে রাখা ভদ্রলোকসমাজের বাইরে বৃহত্তর জনরুচির বহিঃপ্রকাশকে ধরে রাখে। ছাপাখানার প্রসার বাংলা মুদ্রিত অক্ষরের ব্যাপক 'গণতন্ত্রীকরণ' ঘটায়। ফলে, মুষ্টিমেয় ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালির নব্য 'পরিশীলিত' রুচির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা শহর-গ্রামের বিরাটসংখ্যক অল্পশিক্ষিত জনসাধারণ, মেয়েমহলের পাঠকগোষ্ঠী, মুসলমান সম্প্রদায়, এমনকি 'শিক্ষিত ভদ্রলোক' শ্রেণিরও এক বৃহত্তর অংশ, যারা চাকরি বা অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠার দিক থেকে ততটা

সাফল্যের মুখ দেখেনি অথবা সামাজিকভাবে সফল হয়েও দেশীয় অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর জনসমাজের বিস্তৃত রুচির সঙ্গেই জড়িয়ে রেখেছে নিজেদের, তাদের কাছে 'বটতলার বই'ই হয়ে ওঠে মূলধারার সাহিত্য। তাদের হাসি-কান্না, আমোদ-আহ্লাদ, উৎকণ্ঠা-আকাঙ্ক্ষা, মতামত-অভিব্যক্তি ধরে রেখেছে বটতলার বই। অথচ ঔপনিবেশিক প্রশাসন, দেশীয় উচ্চবর্গ, খ্রিস্টান মিশনারির নৈতিক কর্তৃত্ব এদের অবজ্ঞা করেছে, বিরোধিতা করেছে, এমনকি চেয়েছে এই বিপুল সাহিত্যকর্মকে নিশ্চিহ্ন করতে। বটতলার বই-এর উপর উনিশ শতকের গোড়া থেকেই জারি থেকেছে আধিপত্য ও নজরদারি, সামাজিক ক্ষমতার হিমশীতল চোখ, প্যান-অপটিক্যান। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে শুরু করে উনিশ শতকের একদম শেষদিক, এমনকি বিশ শতকের গোড়ার দিক অব্দিও এই বিশিষ্ট ধারার বইপত্রই ছিল বাংলা প্রকাশনার মূলধারা। অথচ, বটতলার বই নিয়ে বিশেষ দৃষ্টিকোণ-সঞ্জাত গবেষণা শুরুর আগে অব্দি, এই ধারাকে তথাকথিত 'শিষ্ট' আধুনিক উনিশ শতকীয় উচ্চকোটির সাহিত্যের 'অপর' হিসেবে চিহ্নিতকরণের কাজ জারি থেকেছে। হালের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা, যে 'অপরীকরণের' পদ্ধতিকেই বিশেষভাবে 'সমস্যায়িত' করে চলেছে। তবে একথা স্পষ্টই বলা যায়, উনিশ শতকের প্রথমার্ধের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যনির্ভর এলিট প্রকাশনা যেমন, 'সংস্কৃত প্রেস', 'তত্ত্ববোধিনী প্রেস' ইত্যাদির বাইরে বটতলা প্রকাশনা এক বিপুল বইপত্রের জন্ম দিয়েছিল, যা দীর্ঘদিন অব্দি কোনও নির্দিষ্ট 'জঁর' অথবা প্রাক্‌নির্ধারিত ট্যাগলাইন ধরে নিজের আত্মপ্রকাশ ঘটায়নি। সাম্প্রতিক গবেষকের ভাষায় এই লেখালেখি আসলে— 'is a material medium– non-ideological in itself. It can be initially conceptualized as a neutral domain which gains an ideological status later'. (*ট্রান্সলেশন রিকন্সিডার্ড : কালচার, জেনার অ্যান্ড দ্য কলোনিয়াল এনকাউন্টার ইন নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি বেঙ্গল*, [চন্দ্রানী চ্যাটার্জি, ২০১০: কেমব্রিজ স্কলারস পাবলিশিং]।

জার্মান গবেষক হান্স হার্ডার উচ্চকোটির বাইরে এধরনের জনসমাজে প্রচলিত বিপুল লেখালেখিকে কয়েকটি নির্দিষ্ট সূত্রে ধরতে চেয়েছেন। (দ্র. *দ্য মডার্ন বাবু অ্যান্ড দ্য মেট্রোপোলিস: রিঅ্যাসেসিং আর্লি বেঙ্গলি ন্যারেটিভ প্রোজ (১৮২১-১৮৬২)*, হান্স হার্ডার, *ইন্ডিয়া'জ লিটেরারি হিস্ট্রি: এসেজ অন দ্য নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি*, সম্পা. স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্ন ও বসুধা ডালমিয়া, নিউ দিল্লি, ২০০৪) এই সূত্রায়ন-প্রক্রিয়া বটতলার বইয়ের ক্ষেত্রেও অনেকটাই গ্রহণযোগ্য। তাঁর মতে, এই টেক্সটগুলিকে নিছক 'প্রত্ন-আধুনিক' (early modern), শিষ্ট সাহিত্যের মান স্পর্শ করতে-চাওয়া অথচ ব্যর্থ, 'অপরিশীলিত'

রচনা হিসেবে দেখলে এদের নিজস্বতা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়। এই বইগুলির একটি প্রধান লক্ষণ 'আত্মবীক্ষণ'। উপর্যুপরি সামাজিক সংঘাত, নতুন-পুরোনোর দ্বন্দ্ব সদ্য গড়ে-উঠতে থাকা বাঙালি ভদ্রলোকশ্রেণির অ-স্থিতিশীল, ভঙ্গুর, অন্তর্বর্তী চরিত্রটিকে প্রকট করেছিল। নতুন-পুরোনোর সহাবস্থানের ফলে উদ্ভূত আত্মপরিচয়ের সঙ্কটই একধরনের বিদ্রূপাত্মক, খুঁত-ধরা দৃষ্টিকোণের জন্ম দিয়েছে এই সাহিত্যে। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই বইগুলির দেশজ, অ-সান্দর্ভিক (non-discursive) চরিত্র। প্রাক্-ঔপনিবেশিক বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের ধারাবাহিকতা ও প্রতিসরণ এধরনের বইতে গভীরভাবে লক্ষণীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'প্রাক্-আধুনিক' সমাজের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ন্যারেটিভগুলি প্রাক্-মুদ্রণযুগের হুবহু উপাদানসমেত বজায় থেকেছে এইসব বইতে। কলকাতা ও আশেপাশের অঞ্চলগুলি থেকেই পুথি সংগ্রহ করে নতুন মুদ্রণ ব্যবস্থায় ছাপিয়ে বই আকারে বাজারজাত করা হচ্ছিল দেদার। এই নতুন ছাপা বইয়ের প্রচলন বাংলার সমাজে দৃঢ়মূল হবার পরও এমন অনেক পাঠকগোষ্ঠী রয়ে যায়, যারা পূর্ববর্তী মৌখিক সাহিত্য এবং পরবর্তী লিখিত সাহিত্য এই দুয়ের মাঝামাঝি স্তরে অবস্থান করছে। কুমকুম সাঙ্গারি এই ঐতিহ্যের সঙ্গে একাত্ম, নতুন পাঠাভ্যাসের সঙ্গে ততোটা মানিয়ে নিতে না-পারা অংশটিকে 'অন্তর্বর্তী মৌখিক স্তরের' মানুষজন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। (দ্র. *পোলিটিকস অফ দ্য পসিবল : এসেজ অন জেন্ডার, হিস্ট্রি, ন্যারেটিভস, কলোনিয়াল ইংলিশ*, কুমকুম সাঙ্গারি, লন্ডন, ২০০৪)। এই পাঠকগোষ্ঠীর মানুষেরা সমাজের একাধিক স্তরে ছড়িয়ে ছিলেন। এর ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও এই নিজস্বতা ধরা পড়ে। মধ্য উনিশ শতক বা তার আগে থেকেই যে মান্য, পরিশীলিত বাংলা গদ্য ও পদ্যের ভাষা গড়ে উঠতে থাকে, এই বইপত্রের ভাষা তার চেয়ে ঢের বেশি আকাঁড়া, দেশজ চলতি বুলি ও তথাকথিত শিষ্ট, মার্জিত রীতির বাইরে থাকাই এদের নিজস্ব লক্ষণ। কিন্তু কোনও প্রাক্-নির্ধারিত ভাষাগত স্ট্যান্ডার্ডের সাপেক্ষে এই বইগুলিকে পড়তে চাওয়াই ভুল হবে। কারণ, বাস্তবতার যেসব মাত্রা তথাকথিত 'উচ্চকোটির' সাহিত্যে উপেক্ষিত, এইসব বই সেই অপেক্ষাকৃত অবহেলিত অংশে আলো ফেলেছে। ফলত, এদের ভাষাগত বহিঃপ্রকাশও অনেকাংশে সেই বাস্তবতার সাপেক্ষে নিয়ন্ত্রিত। বইগুলিতে লেখক-পাঠক-উপভোক্তাদের চেতনার নিজস্বতা এই ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ধরা পড়ে। আর সেকারণেই, ঔপনিবেশিক সমাজের মুষ্টিমেয় দেশি-বিদেশি ক্ষমতাবান অংশ, যাঁরা এই বইগুলিকে হয় ছাপার পরিসর থেকে বের করে দিতে চেয়েছিলেন, অথবা এই পাঠ্যবস্তুকে স্যানিটাইজ্ড করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের

‘ক্ষমতার চোখ’ পেরিয়ে বটতলার বইয়ের বিবর্তন ও প্রসার বজায় থেকেছে গোটা উনিশ শতক ছাপিয়ে বিশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত।

গ্রহণ-বর্জনের রাজনীতি

বটতলার বইকে দমন-নিয়ন্ত্রণের বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করার পিছনে প্রাচ্যের অধিবাসীদের উপর ইউরোপীয় অধিবাসীদের ‘সিভিলাইজিং মিশন’-এর প্রকল্পটি কার্যকর ছিল। ১৮৫২ সালে পাদ্রি জেমস লং তাঁর প্রথম বাংলা বইয়ের তালিকাটি তৈরি করেন। তাতে *আদিরস*, *বেশ্যারহস্য*, *কুঞ্জরীবিলাস*, *প্রেমবিলাস*, *রসমঞ্জরি*, *প্রেমরহস্য*, *প্রেমতরঙ্গ*, *প্রেমনাটক*, *রসতরঙ্গিণী* বইগুলিকে নিছক কাহিনি, নীতিকাহিনি, কাব্য হিসেবে গোত্রভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ঠিক এই বইগুলিকেই ১৮৫৫ সালে তাঁর অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত তালিকা *Descriptive Catalogue of Bengali Works*-এ তিনি erotic আখ্যা দিলেন। সরাসরি আক্রমণ করলেন *হেমলতা রতিকান্ত*, *কামশাস্ত্র ১৮২০*, *লক্ষ্মীজনার্দনবিলাস*, *শৃঙ্গারতিলক ১৮৫৭*, *সম্ভোগরত্নাকর* (১৬ টি চিত্র সম্বলিত), *রতিশাস্ত্র*, *স্ত্রীচরিত্র* প্রভৃতি বইকে। ১৮৫৪ সালে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে লেখা চিঠিতে লং জানাচ্ছেন এই বইগুলির উপর সরকারি নজরদারির প্রয়োজনীয়তার কারণ হল— ‘effective measures being taken to create a healthy literary taste among the people by sound vernacular education’। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত লং-এর তৃতীয় তালিকায় এই বইগুলি সম্পর্কে মন্তব্য ‘so radically corrupt that it ought to be abolished’। যে *বিদ্যাসুন্দর* ১৮৫৫-র ক্যাটালগে ছিল ‘mostly popular tale in Bengal’, সেটাই ১৮৫৯ সালের তালিকায় হয়ে দাঁড়ায় ‘cleverly written but indecent amatory tale’। এই প্রক্রিয়ায় ক্রমশ ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ, খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের লাগাতার প্রয়াস এবং দেশীয় ইংরেজিশিক্ষিত ও ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছাকাছি থাকা উচ্চবর্গের একাংশের উদ্যোগ একই বিন্দুতে এসে মিলে যায়। ১৮৭৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর টাউন হলে ‘অশ্লীলতা নিবারণী সভা’র প্রথম অধিবেশনের পরেই আসরে নেমে পড়লেন ব্রাহ্ম বাবু কেশবচন্দ্র সেন। এর আগে ১৮৫৬ সালে গভর্নর জেনারেলের উদ্যোগে অশ্লীলতা আইন পাশ হলে বটতলার বই-বিক্রেতাদের উপর পুলিশি ধরপাকড় শুরু হয়। *সুলভ সমাচার* পত্রিকায় কেশবচন্দ্র সেন লেখেন— ‘যাহারা *কি মজার শনিবার* ইত্যাদি কতকগুলি বাজে পুস্তক লিখিয়া বাহাদুরী প্রকাশ করিতে চাহেন, বটতলা যাঁহাদের বিদ্যাপ্রচারের স্থান, স্কুলের বালকদের সর্বনাশ করা যাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য এবং আপনাদের মনের দুর্গন্ধ পঙ্ক যাঁহারা ঘরে বাহিরে ছড়াইতে ভালোবাসেন,

সেই অসাধারণ ভদ্রলোকদিগের চরিত্র আর আমরা লুকাইয়া রাখিতে পারি না। বিচারপতি ও কারারক্ষকদের সঙ্গ পাইতে তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ অধিক ঘনিষ্ঠতা জন্মে এই আমাদের সরল কামনা'। এইসময়েই পুলিশ বটতলার প্রকাশকদের ঘরে হানা দিয়ে *বিদ্যাসুন্দর*-এর প্রায় ৩০,০০০ কপি বাজেয়াপ্ত করে।

কিন্তু এই মতামত দেশীয় শিক্ষিত উচ্চবর্গের এক ক্ষুদ্র অংশের হলেও বৃহত্তর শিক্ষিত সমাজে বটতলার বই সম্পর্কে গ্রহণযোগ্যতা এবং উৎসাহ আগ্রহে কোনও ঘাটতি ছিল না। বরং বলা যেতে পারে, খানিকটা অসংগঠিতভাবে জন্ম নেওয়া, বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকে বিপুল আকর্ষক এবং কোনওরকম প্রাক্-নির্ধারিত রুচিবোধের আওতায় বড়ো না-হওয়া বটতলার বই সমাজের অপেক্ষাকৃত অগ্রসর উচ্চবর্গের দ্বারা ক্রমশই 'অ্যাপ্রোপ্রিয়েটেড' হতে থাকে। এর একটি প্রমাণ, মধ্য-উনিশ শতকের আগে থেকেই সামাজিক অন্যায়-অব্যবস্থার বিরুদ্ধে একধরনের নৈতিক অবস্থান গ্রহণ, খানিকটা সমাজসংস্কারমূলক উদ্দেশ্যে রচিত যে কাহিনি-প্রহসন-কাব্যের সূচনা, যার বিপুল বিস্তার ঘটল একটা সময়ের পর থেকে, সেইসব বইয়ের লেখক-পাঠক উভয়েই কম-বেশি নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত অংশ। ধরা যাক, সেযুগের দুই কৃতবিদ্য ব্যক্তি প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার ১৮৫৪ সালে বের করছেন মাসিক পত্রিকা। এর প্রথম সংখ্যায় বলা হচ্ছে— ''এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষত স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাহাদিগের নিমিত্ত এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই। প্রতি মাস এক এক নম্বর প্রকাশ হইবেক, তাহার মূল্য এক আনা মাত্র''। অর্থাৎ আমরা বটতলার বইয়ের যে বৃহত্তর পাঠকসমাজের কথা গোড়াতেই বলেছি, সেই 'অন্তর্বর্তী শ্রেণির লোকজন', তাদেরই একাংশ অর্থাৎ মূলত মহিলা পাঠকের উদ্দেশ্যে এই পত্রিকা বেরোচ্ছে। *মাসিক পত্রিকা*-তেই বেরোয় প্যারীচাঁদের বিখ্যাত লেখা *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮), যেটিকে দীর্ঘদিন অব্দি অত্যন্ত ভুলভাবে বাংলার প্রথম উপন্যাস রচনার প্রয়াস বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই টেক্সটের ভূমিকায় প্যারীচাঁদ লিখছেন— ''এই বইতে সঠিক শিশুশিক্ষার ঘাটতি, বিকৃত পারিবারিক ইন্ধন, ভুল শিক্ষাব্যবস্থা কীভাবে হিন্দু সমাজের সামগ্রিক অবক্ষয় ডেকে আনছে, তা দেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য। নব্য ধনী বাবুরাম বাবুর সন্তান মতিলাল কীভাবে অল্প বয়সেই কুশিক্ষা ও নৈতিক নিয়ন্ত্রণের অভাবে বখে গেল, এই বইতে তা দেখানো হয়েছে। ''বটতলার বই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মাত্রেই জানেন নব্য ধনী, উচ্ছন্নে যাওয়া অসাংস্কৃতিক শ্রেণিকে নিয়ে অভিযোগ, উৎকণ্ঠা, তাদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ

ছিল বটতলার বইয়ের চালু বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্যারীচাঁদ মিত্র সম্পর্কে লিখেছেন— 'আলালের ঘরের দুলাল বাংলা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন, কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের দ্বারা বাংলা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোনও বাংলা গ্রন্থ দ্বারা সেইরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কিনা সন্দেহ।' (বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান, *বঙ্কিম রচনাবলি*, প্রবন্ধ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৯)। বঙ্কিমের চোখে এই বইটির প্রধানতম গুরুত্ব ছিল এর সর্বজনবোধ্য ভাষা। কিন্তু বঙ্কিম যা উল্লেখ করেননি, তা হল, এই বইয়ের ভাষা ও বিষয়বস্তু কোনওটাই নতুন ছিল না। পূর্ববর্তী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্রয়ীবিলাস কাব্য (*নববাবুবিলাস*, *দূতীবিলাস* ও *নববিবিবিলাস*) ছাড়াও পত্রপত্রিকায় এধরনের অসংখ্য লেখা বেরোচ্ছিল। কাঙ্ক্ষিত নতুন হিন্দু সমাজের গড়ন ও চলন কীরকম হওয়া উচিত, এই বিষয়টি সেদিন বটতলার লেখকেরাও তুলে ধরছিলেন অজস্র লেখায়। সবটা মিলিয়ে একে বলা যেতে পারে সেদিনের প্রাধান্যমূলক 'ডিসকার্সিভ ন্যারেটিভ প্যাটার্ন', যার আওতায় জনসাধারণের বটতলা আর উচ্চবর্গের কণ্ঠস্বর একটাই জায়গায় এসে মিশছিল। এটাই বটতলাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করার প্রক্রিয়া। আমাদের মতে, এই কাম্য সামাজিক গড়ন তৈরির আকাঙ্ক্ষা আসলে ভবিষ্যতের জাতীয়তাবাদী অভীপ্সার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।

বঙ্গদর্শন-এ 'অশ্লীলতা' প্রবন্ধে বঙ্কিম এই বটতলার জনসাহিত্য সম্পর্কে উষ্মা প্রকাশ করলেও রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী, বিপিনচন্দ্র পাল, মনোমোহন বসু কিংবা রাধামাধব কর-এর স্মৃতিকথায় বটতলার বই বা সমকালীন পপুলার সাহিত্য সম্পর্কে যথেষ্ট সহনশীলতাই দেখা যায়। জয়ন্ত গোস্বামীর সুবৃহৎ গবেষণাগ্রন্থে যে অর্ধসহস্র বটতলার প্রহসনের বিবরণ রয়েছে তার বৃহদংশের লেখক কিন্তু অখ্যাত অথবা স্বল্পখ্যাত শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির ভদ্রলোক। সে যুগের প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিকথায় সরাসরি বটতলা সাহিত্যের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন—''বটতলা কি মরেছে? বটতলা মরেনি, বটতলার কবিও মরেনি। সেই গদ্যে পদ্যে বা শুধু পদ্যে 'কি মজার শনিবার', 'কি মজার রবিবার', 'কি দুঃখের সোমবার', 'ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ', 'অসৈরণ সইতে নারি' প্রভৃতি চটি বই যা ১ বা ২ পয়সা করে বিক্রি হত, তার একখানি পাবার জন্য আমি আজ ৩০ বছর ধরে হয়রান হয়েছি......সে বায়রন নয়, ব্রাউনিং নয়, শেলি নয়, সুইফট নয়, হেম নবীন রবীন্দ্র সত্যেন্দ্র নয়, কিন্তু সেই সব বইয়ে একটা ভাষা ভাব ছন্দ রস ছিল যা তার নিজস্ব।'' (*অমৃতলাল বসুর*

স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি, ড. অরুণকুমার মিত্র সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৮২)। উনিশ শতকীয় ভদ্রলোক সমাজকে আসলে বাস্তবিকই উচ্চমার্গীয় কুলীন সংস্কৃতি বনাম জনসমাজে প্রচলিত নীচু মানের সংস্কৃতি-জাতীয় দ্বিকোটিক বিভাজনে ধরা যায় না। এই দুয়ের মাঝেও ছিল অনেক ধূসর এলাকা, যেখানে এই দুই রুচিপছন্দই একে অপরের সঙ্গে মিলে মিশে রয়েছে। এদের সম্পূর্ণ দুটি আলাদা বর্গবিভাজনে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে সমাজের ক্ষুদ্র অগ্রণী এলিট অংশের সামাজিক আধিপত্য বজায় রাখার প্রক্রিয়াই জারি থাকে। যা বটতলার বইকে তার সামগ্রিকতায় বুঝতে দেয় না। এটা বোঝা দরকার, এইধরনের বইয়ের পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যে যেরকম ছিল মৌখিক সাহিত্যধারায় অভ্যস্ত সদ্য অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকজন, তেমনই ছিলেন উচ্চবর্গীয়, কিছুটা ইংরেজি-জানা পেশাজীবী মানুষজনও। আবার হাই লিটারেচারে আসক্ত মানুষজনের মধ্যে অনেকের কাছেই এর আকর্ষণ ছিল অদম্য। বাংলার বৃহত্তর জনপরিসরে বটতলার বইয়ের বিপুল গ্রহণযোগ্যতা ফুটে ওঠে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের *পল্লীবৈচিত্র্য* বইয়ের গ্রাম্য মেলার জীবন্ত ছবিতে— ''দুই-তিনখানা বটতলার বইয়ের দোকানে অনেক খুঁট-আখুরে ক্রেতা জড়ো হইয়াছে। কেহ 'এবার পূজায় বাঁচা ভার বউ চেয়েছে চন্দ্রহার' কেহ 'হায় রে মজার শনিবার' প্রভৃতি চটি কদর্য রসিকতাপূর্ণ ছত্রগুলি বানান করিয়া পড়িতেছে, সর্বত্র ভাবগ্রহ হইতেছে না, কিন্তু তাহাতেই যে রস পাইতেছে, তাহা তাহাদের সন্তোষের পক্ষে অনেক অতিরিক্ত'' (দীনেন্দ্রকুমার রায়, *রচনা সংগ্রহ*, আনন্দ, ২০০৪, পৃ. ১৬৩)। আবার এই বইয়ের প্রতি রসরাজ অমৃতলালের পক্ষপাতও আমরা দেখলাম। অর্থাৎ বৃহত্তর সমাজজীবনে যে বটতলার বইয়ের চাহিদা বিপুল তাকে কেন্দ্র করে উনিশ শতকের বাঙালিজীবনে দেখতে পাই ক্ষমতার টানাপোড়েন, প্রকট হয়ে ওঠে একধরনের গ্রহণ-বর্জনের রাজনীতি। এবং পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই বটতলার বইয়ের প্রভাব এতটাই বেশি যে পূর্বোক্ত বইতে চন্দ্রানী চ্যাটার্জি বলেছেন— 'the contest between the popular and the elite thus continued to facilitate the traffic, negotiation and translation that have shaped the modern Bengali literary taste' (*পূর্বোক্ত*, চন্দ্রানী চ্যাটার্জি, পৃ. ৮৪)।

'অপর সাহিত্য'

১৮৫৫ সালে প্রকাশিত নিমাইচাঁদ শীল রচিত *কামিনী গোপন ও যামিনী যাপন* কাব্যে নায়িকা নিরুপমা বিলাসগৃহে শারীরিক ছলাকলায় উত্তেজিত করছে স্বামীকে:

থমকে থমকে থমকে ধনী।
তালে তালে নাচে চমকে মণি।।
কভু খুলে দেয় বুকের বাস।
প্রমদা পুরায় পতির আশ।।
সুখের নাচের কেমন ছটা।
নিতম্ব দোলনে কেমন ঘটা।।
যৌবনে বিশাল নিতম্বদ্বয়।
হেলিছে দুলিছে স্থির না রয়।।
পতি জানু মাঝে জঘন দিয়া।
সঘন নাড়িছে মদন প্রিয়া।।
প্রাণেশ প্রাণেতে প্রফুল্ল মনে।
কাঁপায় জঘন নিতম্ব সনে।।

১৮৫৫-র ক্যাটালগে জেমস লং যে-যে ধরনের বইপত্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন ‘these works are beastly, equal to the worst of the French school’, উক্ত বইটি লং-এর তালিকা অনুযায়ী নিশ্চয়ই সেই গোত্রভুক্ত। বটতলার বই মানেই শিষ্ট কুলীন সংস্কৃতি থেকে খাটো মাপের, ভদ্রলোকের সংস্কৃতির চিহ্নিত ‘অপর’— এই ধারণা কিন্তু উপরোক্ত বইটির ভূমিকা পড়লে খাটে না। ধনী ব্যক্তির সঙ্গে সহচারিণীদের মিলনের উতরোল বর্ণনা যে বইয়ের বিষয়বস্তু তার শুরুতেই রয়েছে কোলরিজ-এর কাব্যপঙ্‌ক্তি:

All thoughts– all passions– all delights
Whatever stirs this mortal frame
Are all ministers of love
And feed his sacred flame

অর্থাৎ এই বইয়ের লেখক তথাকথিত ‘অশিক্ষিত’ সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। সম্প্রতি গৌতম ভদ্র দেখিয়েছেন কীভাবে বটতলার উপন্যাসের ভাষাভঙ্গি ব্যবহৃত হয়েছে বঙ্কিমের লেখায়। (*ন্যাড়া বটতলায় যায় ক’বার?*, কলকাতা, প্রকাশনা ২০১১)। মাইকেলের *একেই কি বলে সভ্যতা* আর *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ* প্রহসন দুটির সঙ্গে বটতলার প্রহসনের ভাষাভঙ্গির মিল আজ আর অচেনা নয়। এই উদাহরণগুলি থেকে এটাই বোঝা যায়, শিষ্ট/ অশিষ্ট সাংস্কৃতিক বৈপরীত্য নয়, আসলে একটাই সামগ্রিক যুগবৈশিষ্ট্যের পরিসর পুষ্ট করে চলেছিল পাশাপাশি বয়ে চলা হাই লিটারেচার এবং বৃহত্তর জনসমাজে প্রচলিত এই

বটতলার সাহিত্য। উনিশ শতকীয় জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় পরিবার-দাম্পত্য-যৌননৈতিকতা, ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষার কাম্য সীমানা, সংসারে নারীর কাম্য নৈতিক ভূমিকা, সমাজসংস্কার ও দেশজ রক্ষণশীলতার টানাপোড়েন, ঐতিহ্যকে বরণ করা ও অতিক্রম করার পরিণাম— এমন বহু বিষয়েই সে যুগের উচ্চকোটির সাহিত্য আর বটতলার সাহিত্য আশ্চর্যজনকভাবে একই ভাবধারার বাহক। বিশেষত উনিশ শতকের শেষদিকে নব্য হিন্দু উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে যে নয়া রক্ষণশীল পুরুষবাদী দৃষ্টিকোণ বড়ো হয়ে উঠতে থাকে, বটতলার বই সেই ভাবাদর্শকেই মোটের উপর মেনে চলেছে। এক্ষেত্রে একটা কথা মাথায় রাখা জরুরি। বহুক্ষেত্রেই সামাজিক অন্যায়-অব্যবস্থার বিরুদ্ধে একরকম নৈতিক প্রতিবাদী অবস্থান নেয় বটতলার বই। কিন্তু কোনও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পক্ষে সওয়াল করে না। বরং সনাতন সামাজিক স্থিতাবস্থা ও হায়ারার্কিকেই অটুট রেখে দিতে চায় সে। বটতলার টেক্সট তাই মুখ্যত রক্ষণশীল। দীর্ঘদিন অব্দি এই সাহিত্যকে মান্য সাহিত্যের 'অপর' হিসেবে পড়ার যে পদ্ধতির সঙ্গে আমরা পরিচিত, তা সম্পূর্ণ সঠিক নয়। বস্তুত, ভাষাগত প্রয়োগের ক্ষেত্রেই খানিকটা সাবভার্সিভ এই বইগুলি, অন্যত্র নয়।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন যে নির্দিষ্ট বইটিকে আক্রমণ করেছিলেন, সেই *কি মজার শনিবার* ছিল একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় টেক্সট। ঔপনিবেশিক প্রশাসন যে নতুন আঁটোসাঁটো কর্মসংস্কৃতি, ঘড়ি-সময় (clock-time), অল্প মাইনের কেরানির চাকরি, গ্রামসমাজ থেকে কাজের বাজারকে উপনিবেশের প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় স্থানান্তরিত করার প্রক্রিয়া নিয়ে এল, তা বাংলার ভদ্রলোক জীবনে একধরনের প্যারাডাইম শিফট ঘটাল। এই নতুন সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় কী কী ঘটছে, তার সকৌতুক বিবরণ রয়েছে এই বইতে। চন্দ্রকান্ত শিকদারের লেখা এই বইটি বেরোয় ১৮৬৩-তে। দাম, এক আনা। গোটা সপ্তাহের দম-আটকানো ঔপনিবেশিক নাগরিক জীবনের শেষে উইক-এন্ডের মজাদার হাঁফ-ছেড়ে-বাঁচার কিছু খণ্ডচিত্র এই বই। এই কৌতুকপূর্ণ বর্ণনার সঙ্গে সংগতি রেখেই যেন এই টেক্সটের রাগিণী 'ক্রোড়প্যাঁক', তাল 'ডঙ্কফোঁস'। বলাই বাহুল্য এরকম কোনও রাগ-তালের অস্তিত্ব আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্রে নেই। আসলে লেখক তো এক বিদ্রূপাত্মক রাগ-তালের জন্ম দিচ্ছেন এই বইতে। শুরুতেই কলকাতার বিখ্যাত ও সর্ববৃহৎ বেশ্যাপট্টি সোনাগাছিতে উইক-এন্ড জমজমাট:

> ধন্য কল্কেতার সহর ধন্য শনিবার।
>
> বোতল ধরে আচ্ছা করে দিচ্ছে ক্যাবাহার।।
>
> সোনাগাজি উড়ছে ধ্বজা, বড় ধুম পুড়ছে।
>
> গাঁজা মদ খেয়ে করছে করছে মজা, মেছুয়া বারবার...

হাড়কাটা হেসে খেলে, গ্লাস ধরে মুখে ঢেলে।

অবশেষে বল্‌ছে বুলি, ক্যায়ছা মজেদার।।

এই সমবেত জনতার আমোদ উদ্‌যাপনের ছবি শিষ্ট এলিটের কাছে একেবারেই কাঙ্ক্ষিত নয়। এতে শহরের পাঁচপাবলিকের যে হুল্লোড়ের বাস্তব ছবি— 'আসিয়াছে শনিবার, নাশিয়াছে দুঃখ।/রসিয়াছে মধুরসে, মাতালের মুখ'।।, তা উচ্চবর্গের নৈতিক মানের সঙ্গে যায় না। ঠিক একারণেই কেশব সেনদের আতঙ্ক ও উদ্বেগ। পাশাপাশি এই চটি বইতেই শহরের 'নতুন অবতার'-এর আবির্ভাব-বিবরণ। এই 'অবতার'ই হলেন 'বাবু'। সাধারণের চোখে এই 'বাবু' হলেন এক বিদ্রূপের, খিল্লি করার মতো চরিত্র। লোকে মনে করত, এরা অল্প ইংরেজিশিক্ষিত হয়েই নিজের দেশীয় সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন, সাবেক হিন্দু ধর্মকর্মে এদের মতি নেই, এরা সম্পূর্ণ সুযোগসন্ধানী, ইংরেজের চাটুকারিতা করে নিজেদের আখের গোছাতে তৎপর, শিকড়বিচ্ছিন্ন এক শূন্যগর্ভ নব্য সম্প্রদায়। আবার সত্যিকারের উচ্চকোটির কাছেও এরা গ্রহণযোগ্য নয় এদের শিক্ষার নীচু মান, নৈতিকতার ছাপহীন বেলেল্লাময় জীবনযাপন, এদের কিম্ভুত পোশাকআশাক, এলিটের সমতুল্য হবার লক্ষ্যে হাস্যকর অনুকরণসর্বস্ব আচরণের কারণে। এই বইতে 'বাবু'র যে বিবরণ, তা রীতিমতো হাসির উদ্রেক ঘটায়:

চরণে দিয়াছে কেহ, চিনের বিনামা।

গায়েতে কামিজ কোট, বনাতে জামা।।

মস্তকেতে কমফোর্ট, রহিয়াছে আঁটা।

ডানি বাঁয় কত তায়, বাঁকা সিঁতা কাটা।।

ধোলাই দোলাই গায়, কাহার বা লাল।

এষ্টাকিন ছাড়া কিন্তু, নহে তিলকাল।।

পায়েতে বার্নিস জুতা, গরাণ হাটার।।

দেখিলেই বোধ হয়, নব অবতার।।

তিথি ভট্টাচার্য তাঁর *ইন দ্য নেম অফ কালচার: রিথিংকিং দ্য পোলিটিক্যাল ইকোনমি অফ দ্য ভদ্রলোক ইন বেঙ্গল* প্রবন্ধে (তথ্যসূত্র: www.sociology.ed.ac.uk/sas/papers45 htm) খুব স্পষ্টই দেখাচ্ছেন, উনিশ শতকের 'বাবু'কে কোনও সমসত্ত্ব বর্গের আওতায় ধরা যায় না। এই বর্গের ভিতর পরস্পরবিরোধী নানা গোষ্ঠীর অবস্থান, তাই তাদের একে অপরকে

দেখার ও ব্যাখ্যার চোখও আলাদা। আমজনতা এদের যে চোখে দেখে, কেশবচন্দ্র সেন অথবা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এদের সেই একই চোখে দেখেন না। কিন্তু উভয়ের চোখেই এই 'বাবু' কিছুটা অধঃপতিত, নীচু অবস্থানের লোক, যে সামাজিক সুস্থিতিতে অস্বস্তির কারণ।

আমজনতার চোখে বিদ্রূপের আরেক লক্ষ্য নতুন ইংরেজি ধাঁচের স্কুলে চাকরি করা নব্যশিক্ষক শ্রেণি। এরাও নব্য 'বাবু'। *কি মজার শনিবার*-এ অবাধ্য, শনিবারের উইক-এন্ডে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠা স্কুলের ছাত্রেরা শিক্ষকের শাসন মানছে না। তাদের নিজেদের ভিতর চরম আদিরসাত্মক হাসিঠাট্টার বন্যা বইছে। আবার একজন ছাত্র দুষ্টুমি করে শিক্ষককে 'শৃঙ্গার' শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করছে। শিক্ষক মহাশয় ইংরেজিনবিশ, অথচ দেশজ 'শৃঙ্গার' শব্দ সম্পর্কে অনবহিত। এটাও এই নকলনবিশ, দেশীয় শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন শ্রেণিকে দাগিয়ে দেবার কৌশল। এই নতুন অবতারেরা নিজেদের কেরিয়ারে উন্নতির জন্য ইংরেজি বুলি শেখে, সংস্কৃত জানে না। এরা মদ্যপ, নারীসঙ্গলোলুপ। এদের রুচিহীন লালসাই বেশ্যাপট্টিতে এদের ভিড় জমাতে নিয়ে যায়:

এদিকেতে শিক্ষকেরা, ছাড়িতেছে বোল।
কারু সিস্ কারু ঈস্, ভয়ানক গোল।।
কেহ কন পঞ্চানন, টেমকিওর সিট।
কমিয়ার রামচাঁদ, কিপ্‌কোয়াইট।।
ছেলেরাতো ছেলে নয়, বুড়াদের বাবা।
পান খেয়ে এ উহার, গালে দেয় চাবা।।
কেহ গিয়া মনোসুখে, খুলে কারু কাছা।
বলে বাবা বেঁচে থাক, খুব তোর পাছা।।
ফাঁসি ফুঁসি করি কেহ, এ কানে ও কানে।
পণ্ডিতে জিজ্ঞাসা করে, শৃঙ্গারের মানে।।
পণ্ডিত দণ্ডিত প্রায়, মগ্ন মনোদুঃখে।
কহেন কি কহ ছিছি, মম অভিমুখে।।
ছোঁড়ারা হাসিয়া বলে, বুঝেছি মশায়।
পড়িয়াছ দায় বড়, পড়িয়াছ দায়।।
শৃঙ্গার শব্দের অর্থ নারিলে কহিতে।
আমাদের তাইতে এসেছ শিক্ষা দিতে।।

গ্রাম থেকে চাকুরিসূত্রে কলকাতা শহরে আসা বাবু, শনিবার গ্রামে ফিরে যায়। তাদের সতীসাধ্বী স্ত্রীরা, যারা শহুরে বারোইয়ারি বেশ্যাদের ঠিক উলটো, তাদের স্বামী ঘরে ফেরার আনন্দও বর্ণিত এই চটি বইতে। আবার গ্রামের যে বউরা উপপতির সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে লিপ্ত, তারা স্বামীর কলকাতা থেকে ঘরে ফেরার দিনটিতে আতঙ্কিত। শহরে নারীর ছেনালি-ভরা হাবভাব, পোশাক পরার ধরন যে মেয়েরা নকল করে, তারা শাশুড়ি-ননদের বক্রদৃষ্টিকে তোয়াক্কা না করে স্বামীর মনোযোগ পাবার আশায় উগ্র সাজে সজ্জিত করছে নিজেদের— 'বেহায়ার একশেষ, লজ্জা নাই মোটে।/ ভাশুর শশুর দেখি, ঘোমটা না ওঠে।।/ কাপড় পরেন যত, কাপড় তো নয়।/ উহাপেক্ষা উলঙ্গ হইলে ভালো হয়।।/একে শান্তিপুরে তায়, অতি সুচিকন।/ অনায়াসে সর্ব অঙ্গ, হয় নিরীক্ষণ।।' এর উল্টোদিকেই আছেন আদর্শ স্বামীসেবী গৃহিণীরা:

পল্লীবাসী নারীগণ, শনিবার পেয়ে।
প্রাণেশের আশে আছে, আসাপথ চেয়ে।।
কতক্ষণে যাবে দিন, হইবে রজনী।
নিকটে পাইবে নিজ, নিজ গুণমণি।।...
কুলের কামিনী যারা, কলুষ বিহীন।
শ্বশুর আলয়ে বাস, করে চিরদিন।।
তাহাদের কুচ নয়, উচতর বোধ।
পরণে বসন হেন, দৃষ্টি করে রোধ।।...
তদন্তর হলে পরে, পতির ভক্ষণ।
ভোজন করিয়া নারী, মদনে মগন।।
এমতে বঞ্চন হয়, সুখে শনিবার।
বিরচিল দ্বিজ চন্দ্রকান্ত শিকদার।।

উনিশ শতকের শেষদিকে আদর্শ হিন্দু দাম্পত্য, আদর্শ স্ত্রী, সন্তানপালন ও অন্তঃপুর সংক্রান্ত অসংখ্য বই ও প্রবন্ধ লেখা হতে থাকবে বাংলায়। শিক্ষিত বাঙালির চেতনায় যে কাল্পনিক জাতিরাষ্ট্রের অংশিদারিত্বের ভাবনা ততদিনে জাগরূক হয়েছে, সেখানে 'আদর্শ গৃহের অভ্যন্তর'-সংক্রান্ত চেতনা দানা বাঁধতে শুরু করেছে। এই 'পবিত্র দম্পতিপ্রীতি'র পক্ষে ইংরেজিশিক্ষিত রক্ষণশীল হিন্দু থেকে আরম্ভ করে ব্রাহ্মসমাজের উচ্চবর্গীয় প্রতিনিধিরা সকলেই থাকবেন। কিন্তু ১৮৬৩-তে প্রকাশিত অখ্যাত হিন্দু ব্রাহ্মণ চন্দ্রকান্ত শিকদারের লেখা *কি*

মজার শনিবার বইতে ওই আদর্শ দাম্পত্যের একটি অপটু ছবি আঁকার চেষ্টা থেকে বোঝা যায়, বাঙালি হিন্দুর ভবিষ্যৎ জাতীয়তাবাদী গৃহকল্পনার আগাম আভাস ইতিমধ্যেই আসতে শুরু করেছে। যা ওই শতকের শেষদিকে পৌঁছে *গৃহলক্ষ্মী*, *দাম্পত্যবিজ্ঞান* জাতীয় ডিসকার্সিভ ন্যারেটিভ-সম্বলিত বইপত্রের জন্ম দেবে। এই দিক থেকে দেখলে বটতলার বই আদৌ উচ্চকোটির শিষ্ট সাহিত্যের 'অপর' নয়। বরং যেকথা আমরা আগেই বলেছি, একটাই সাধারণ সান্দর্ভিক জাতীয় বয়ানের অন্তর্গত এই টেক্সট, যাকে কোনও মতেই 'অপরত্বে'র ছাপ দিয়ে আলাদা করা যায় না।

আদৌ 'অশ্লীল'?

যৌনতা এমন একটি বিষয়, যাকে কেন্দ্র করে সামাজিক ক্ষমতা, অবদমন, আধিপত্য আর ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা পরস্পর মুখোমুখি হয়। যৌনতাকে কেন্দ্র করেই সামাজিক প্রতিষ্ঠান তার ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধতা খুঁজে পায়, প্রশাসনিক-রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ভূমি তৈরি করে। ১৮৭৩ সালে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় প্রকাশিত 'অশ্লীলতা' প্রবন্ধে বলা হয়েছিল— ''এখন, এমন অনেক সম্বাদপত্র ও পুস্তক দেখিতে পাই, যে তাদৃশ অশ্লীল পত্র বা পুস্তক পাঁচ সাত বৎসর পূর্বেও দেখা যাইত না। এসকল পত্র বা পুস্তক অবশ্য অনেকের দ্বারা পঠিত হয়, নচেৎ লুপ্ত হইত''। এর ভিতর সেই সামাজিক ক্ষমতার কণ্ঠস্বর প্রতিফলিত হয়, যা চায় মুদ্রণ-সংস্কৃতিকে শরীর-যৌনতার উচ্চারণ থেকে মুক্ত রাখতে। চায় এইসব টেক্সটকে স্যানিটাইজড করতে। অথচ, লং-এর ক্যাটালগে উল্লিখিত 'ইরোটিক' অভিধাপ্রাপ্ত বইগুলি আদৌ 'পর্নোগ্রাফি' নয়। বিশ শতকের চল্লিশের দশকের আগে বাংলা মুদ্রিত পর্নোগ্রাফির আধুনিক চেহারার অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। আসলে বঙ্গদর্শন যেসব লেখাপত্র নিয়ে চিন্তিত, সেগুলি মূলত প্রাক্-ঔপনিবেশিক কামসাহিত্যেরই উনিশ শতকীয় ধারাবাহিকতা, যাতে নতুন যুগের উপযোগী প্রতিসরণ ঘটেছে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নববাবুবিলাস*, *দূতীবিলাস*, *নববিবিবিলাস* (১৮২৩, ১৮২৫, ১৮৩১) বা হরকালী মজুমদারের *অনঙ্গবিলাস* (১৮৬০) বইগুলির আদল ভারতচন্দ্রের *বিদ্যাসুন্দর* থেকেই নেওয়া। *দূতীবিলাস* কাব্য উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কলকাতার এক ধনী যুবকের লাম্পট্য, পরস্ত্রীসম্ভোগ এবং বহুনারীগমনের কেচ্ছাপুরাণ, যেখানে সংস্কৃত ও আরবি-ফারসি প্রণয়কাব্যের দূতীপ্রকরণকে নতুন যুগের নগর কলকাতার বাস্তবতায় স্থাপন করা হয়েছে। প্রাক্-উনিশ শতকীয় যৌননৈতিকতাই এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় পরপুরুষ-সংসর্গের মাধ্যমে

গর্ভোৎপাদনকে বংশরক্ষার তাগিদে অনুমোদনের মাধ্যমে। যৌনক্রীড়ার বর্ণনাও এখানে অনেকাংশে *কামসূত্র* ও *রতিমঞ্জরী*-র অনুসারী। যেমন, *বিদ্যাসুন্দর*-এর 'বিপরীত বিহারে'র অবিকল প্রতিরূপ *দূতীবিলাস*-এর 'পঞ্চম মিলনে খেলাচ্ছলে বিপরীত শৃঙ্গার' অংশটি। এবং এই শৃঙ্গার কোনওভাবেই পাশ্চাত্য পর্নোগ্রাফির সঙ্গে তুলনীয় নয়। যদিও *সম্বাদ রসরাজ*-এ প্রকাশিত কিছু রিপোর্তাজ বা *কলিকৌতুক* বইতে খোলামেলা যৌনবিহারের কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। তবে মোটের উপর যৌনক্রীড়ার খোলাখুলি বর্ণনা বটতলার বইতে অপেক্ষাকৃতভাবে কম।

অজ্ঞাতনামা রচিত *স্ত্রীজাতির দুরাচরণের কথা* (১৮৪০) বইটির কাহিনি মহাভারত থেকে নেওয়া। *আদিরস* (১৮৬১) বইটি কালিদাসের *শৃঙ্গারতিলক* অবলম্বনে ছোটো ছোটো কবিতার সংকলন। উনিশ শতকের ইরোটিক সাহিত্যের সিংহভাগই পূর্বতন কামসাহিত্যের নবরূপায়ণ। এছাড়াও ইসলামি রোম্যান্সধর্মী সাহিত্যের অসংখ্য নিদর্শন মেলে বটতলায়। এদের 'দোভাষী সাহিত্য'ও বলা হয়েছে। যেমন, গরিবুল্লাহ রচিত *সোনাভানের কেচ্ছা*। উনিশ শতকীয় হিন্দু ও মুসলিম জাতীয়তাবাদী ভাবনায় যৌনতার ধারণাটি পরিবার, সন্তান উৎপাদন, নারীপুরুষের আদর্শ নৈতিক চরিত্র, প্রজননের সক্ষমতা প্রভৃতি বহু বিষয়ের সঙ্গে জড়িত। যে বিষয়গুলির সাপেক্ষে যৌনতাকে উৎপাদনশীল শক্তি হিসেবে সংরক্ষণ করার কথা ভাবা হয়। সে কারণেই বাধাবন্ধনহীন অন্ধ কামনাকে সামাজিক ক্ষমতার সাপেক্ষে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ, পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশিত হতে শুরু করে। বটতলার বই কিন্তু মোটের উপর এই উপযোগবাদী যৌনতার চেনা ফ্রেম ছেড়ে খুব একটা কখনোই বেরোয়নি। উদাহরণ স্বরূপ একটি বইয়ের কথা উল্লেখ করা যায়। রামকৃষ্ণ সেন প্রণীত *বৃদ্ধা-বেশ্যা তপস্বিনী* (১৮৬৩) পুস্তিকাটির বিষয়বস্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আরম্ভ করে বিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত অসংখ্য বইতে এসেছে। কৌলীন্যপ্রথা নামক সামাজিক অভিশাপ কীভাবে এক বালিকার সঙ্গে বৃদ্ধ কুলীনের বিবাহ ঘটায়, বালিকার যৌবনোদ্গম-কালে বৃদ্ধ স্বামীর শারীরিক মিলনে অক্ষমতা ও কুটনি দাসীর কৌশলে সৌদামিনী নামের মেয়েটি কীভাবে ঘর ছাড়ে ও বেশ্যায় পরিণত হয়, তা এখানে বর্ণিত। যতদিন যৌবন ছিল, শরীরের দৌলতে সৌদামিনী বিপুল অর্থ উপার্জন করে, যৌনসুখের তীব্রতায় তার জীবন তখন পরিপূর্ণ। সেই উতরোল শারীরিক সুখের বিবরণও আছে এই বইতে:

এত বলি কোলে বসাইল লোয়ে মোরে।
অমনি অনঙ্গে অঙ্গ আতঙ্গে সিহরে।।...
বাসনা হইবে পূর্ণ দিলে ঘৃতাহুতি।
কহিনু স্বরূপ কথা শুন রসবতী।।
এত বলি কুচপদ্মে কর পদ্ম দিল।
পূজা বলি মদনের স্নান করাইল।।
পরে পুনঃ পালঙ্গেতে বসিয়া দুজন।
তাম্বুলাদি আনন্দেতে করিনু ভক্ষণ।।...
তাহাতে বৈভব মোর হইল বিস্তর।
বিখ্যাত হইনু ক্রমে তাবৎ সহর।।
যতেক লম্পটগণ মোর নাম করি।
আসেন আশার আশে দিবা বিভাবরি।।...
নিত্য নিত্য নব রস রসিকের সঙ্গ।
প্রবল হইল মনে সুখের তরঙ্গ।।

কিন্তু সৌদামিনীর এই সুখভোগ দীর্ঘস্থায়ী হল না। রূপ-যৌবনে ভাঁটা পড়তেই আস্তে আস্তে প্রণয়ীদের অন্তর্ধান ঘটল। সৌদামিনীর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষিত হল। অবশেষে সন্ন্যাসী হয়ে সে উপস্থিত হল বারাণসীতে। সেখান থেকেও চুরির অভিযোগে তাকে পালিয়ে আসতে হল। কাহিনি আরম্ভ হচ্ছে, তপস্বিনী বৃদ্ধা বেশ্যা সৌদামিনী ঘটনাচক্রে তার এক প্রাক্তন প্রেমিক 'চূড়ামণি নামক প্রসিদ্ধ লম্পট'-এর গৃহে উপস্থিত হয় ও নিজের জীবনের যাবতীয় ভ্রান্তি নিয়ে বিলাপ করতে থাকে। সেই বিলাপেই এই কাহিনির পরিসমাপ্তি—"পোড়া কাযে কি বালাই/ বেশ্যার মুখেতে ছাই/ বেশ্যা পথে পথিক যে জন।/ বিফল যৌবন তার/ বহিতে পাপের ভার/ বৃথায় খোয়ায় এ জীবন।।/ অতএব নারীগণ/ শুন মম নিবেদন/ যদি চাও আপন মঙ্গল।/ থাকো নিজ ২ পদে/ মাজো না কুক্রীড়া হ্রদে/ এড়াইবে যাতনা সকল"।। এই বিলাপ আসলে সামাজিক থাকবন্দের সামনে এক নারীর শারীরিক স্বাধীনতার চাহিদার বিফলতাকেই তুলে ধরে। এভাবেই সামাজিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক চেহারাটি পুনঃস্থাপিত হয় এবং একইসঙ্গে উনিশ শতকীয় সমাজসংস্কারের বিবিধ বিষয়, যেমন— কৌলীন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ, অসম বিবাহ প্রভৃতিকেও এখানে নিয়ে আসা হয়। এটি কামসাহিত্য নয়। বরং সামাজিক নৈতিকতার কাছে কামের আত্মসমর্পণই এর উপজীব্য।

বিষয়টি আরও ভালো বোঝা যায় বটতলা থেকে প্রকাশিত বিবিধ সেক্স ম্যানুয়াল ও দেশীয় কামশাস্ত্রগুলি খুঁটিয়ে পড়লে। অন্নদাচরণ খাস্তগীর-এর *মানবজন্মতত্ত্ব, ধাত্রীবিদ্যা, নবপ্রসূত শিক্ষা ও স্ত্রীজাতির ব্যাধিসংগ্রহ* (১৮৭৮), সূর্যনারায়ণ ঘোষের *বৈজ্ঞানিক দাম্পত্যপ্রণালী* (১৮৮৪), ক্ষেত্রমোহন ঘোষের *ধাতুদৌর্বল্য*, যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের *জীবনরক্ষা* (১৮৮৭), কেদারনাথ সরকারের *ঋতুরক্ষা* (১৮৯২), অথবা দেশীয় কামশাস্ত্র হিসেবে রাখালদাস কবিরত্নের *দাম্পত্যবিজ্ঞান* (১৮৮৭), অজ্ঞাতনামা রচিত *সচিত্র লজ্জতন্নেছা* অর্থাৎ *মহব্বতে দুনিয়া*, কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন সংগৃহীত *সচিত্র শিবোক্ত রতিশাস্ত্র* (১৮৯৭)— সবকটি বইতেই যৌনতার পরিমিত, প্রয়োজনবাদী, অতিরেকবর্জিত চরিত্রকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এতদ্সত্ত্বেও এদের উপর অশ্লীলতার তকমা এঁটে দেওয়া আসলে সামাজিক ক্ষমতাপ্রয়োগের একটি কৌশল মাত্র।

কলিযুগ ও অন্তর্ঘাত

জয়ন্ত গোস্বামী উল্লিখিত অর্ধসহস্রাধিক বটতলার বইয়ের ভিতর অন্তত ৩৩টি বইয়ের শিরোনামে 'কলিযুগ'-প্রসঙ্গ রয়েছে (*সমাজচিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন*, কলকাতা, ১৯৭৪)। একইভাবে মুসলমানি দোভাষী বটতলার সাহিত্যেও আছে 'আখেরি জমানা' বা 'কেয়ামতে'র কল্পনা। 'কলিযুগ' সেই অধঃপতিত সময়কাল, যখন কাম্য ও কাঙ্ক্ষিত সামাজিক গড়নের চূড়ান্ত অবক্ষয় দেখা যাবে। বটতলার বইতে কলিযুগের মূল লক্ষণ— ম্লেচ্ছ বিদেশি রাজা, অধঃপতিত অনাচারী ব্রাহ্মণ, উদ্ধত দুর্বিনীত শূদ্র, মেয়েদের স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনতা ও ব্যভিচার, স্বামিকে বশ করে রাখা, যুক্তিবাদের প্রভাবে সনাতন ধর্মের অবক্ষয়, অর্থগৃধ্নু স্বার্থপর দম্পতির কারণে যৌথ পরিবারের ভাঙন, সর্বোপরি বিদেশি সরকারি বা বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত অতিসামান্য আয়ের চাকরিজীবী কেরানিদের চূড়ান্ত আর্থিক দুরবস্থা ও মানসিক সংকট। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক বাংলাদেশে দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনের ফলে যেসব দৃশ্যমান পরিবর্তন ঘটে চলেছিল, নতুন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ততটা মানিয়ে-নিতে-না-পারার ফলে সমাজের এক বৃহদংশের হতাশা, উৎকণ্ঠা, পশ্চাৎপদ রক্ষণশীলতায় নতুন করে আস্থা খুঁজতে চাওয়ার মধ্যে এই বিশেষ লক্ষণগুলিকে সর্বজনীন করে তোলার ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। মুসলমানি বইতেও কলিযুগ-সুলভ কল্পনার নিদর্শন পাওয়া যায়। বিশ শতকের গোড়ার দিকে আমজাদ আলি ও আস্মাৎ আলি নসীরাবাদি রচিত *মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বলক্ষণ* (ঢাকা, ১৯২১)

পুস্তিকাটিতে বলা হয়েছে, কিয়ামত অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের আগে 'স্বামী স্বীয় ভার্যার বেজায় তাঁবেদারী হইবে। সন্তানগণ পিতামাতার অবাধ্য হইবে... যাহারা দুশ্চরিত্র, স্বার্থপর ও লোভী তাহারাই সরদার হইবে' (দ্র. *কলিযুগের কল্পনা ও ঔপনিবেশিক সমাজ*, সুমিত সরকার, *ইতিহাস অনুসন্ধান-৪*, নভেম্বর, ১৯৮৯)। ১৮৬০ সালে প্রকাশিত শ্রীহরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রচিত *কলির রাজ্যশাসন* বইতে কলিরাজার প্রভাবে যে ভয়াবহ সামাজিক অনাচারসমূহ সংঘটিত হবে, তার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। কলির যোগ্য সহচর এখানে কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ, যাৎসর্য প্রভৃতি রিপু। ব্রিটিশ তথা ইউরোপীয় রাজশক্তির প্রভাবেই যে আমাদের হিন্দুসমাজের নিজস্ব স্থিতিশীলতা নষ্ট হতে বসেছে, সেকথা বোঝাতে লেখক ব্যবহার করেছেন কয়েকটি অদ্ভুত গল্প। স্বয়ং 'লোভ' 'অহিফেন' বা 'আফিম' রূপ ধারণ করে এবং 'মোহ' চরসরূপ ধারণ করে দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়েছে আর 'কাম' 'মদ'রূপ ধারণ করে কালাপানি পেরিয়ে ব্রিটিশ জাতিরও সর্বনাশ করছে। নারায়ণ চট্টরাজ প্রণীত *কলিকুতূহল* (১৮৫৩) বইতে কলি তাঁর নতুন রাজধানী নির্মাণ করেছেন 'কলিকাতা' তথা কলকাতায়:

ধন্য ধন্য কলি তোরে করি নমস্কার।
যত কিছু বিঘটন সকলি তোমার।।
তোমার প্রতাপে এইসব প্রজাগণ।
করিতেছে সবে বহুবিধ অকারণ।।
পতি জায়া প্রভৃতি যেন ব্যবহার।
তব রাজ্যে হয়েছে তা কি বর্ণিব আর।।

পুরাণেই আছে 'কলির বিশেষ স্থান স্ত্রী চরিত্রে' (দ্র. *কলিযুগের কল্পনা ও ঔপনিবেশিক সমাজ*, সুমিত সরকার, *ইতিহাস অনুসন্ধান-৪*, নভেম্বর, ১৯৮৯, পৃ. ৮)। স্বেচ্ছাচারী, দাম্পত্যে অনাগ্রহী, লোভী, কামপরায়ণ স্ত্রীলোক কলির সবচেয়ে বড়ো অবদান। উনিশ শতকের শেষদিকে অসংখ্য বটতলার বইতে শিক্ষিতা, অহংকারী, ব্রাহ্মসমাজ-ঘেঁষা, পরিবার-স্বামী-শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে উদাসীন মেয়েদের আর্কেটাইপ গড়ে ওঠে। রাধাবিনোদ হালদারের *পাসকরা মাগ* (১৮৮৮), দুর্গাদাস দে-র *বড়দিনের পঞ্চরং*, *মহিলা মজলিস*, রাখালদাস ভট্টাচার্য প্রণীত *সুরুচির ধ্বজা*, *অবলাব্যারাক*, প্রফুল্লনলিনী দাসীর *ষষ্ঠীবাঁটা প্রহসন*, গোঁসাইদাস গুপ্ত-র *বৌবাবু*, *মিস বিনো বিবি বি.এ*, *নভেলনায়িকা বা শিক্ষিতা বউ*, *ল-বাবু*, প্রভৃতি বই তার প্রমাণ। সবকটি বইতেই উচ্ছৃঙ্খল,

দুর্বিনীত স্ত্রীচরিত্রেরা শেষ অব্দি নিজেদের ভুল বুঝতে পারে এবং সনাতন রক্ষণশীল হিন্দু ধর্ম ও পারিবারিকতায় আস্থা ফিরে পায়। অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক হায়ারার্কির চেনা চেহারাটি পুরোদস্তুর বজায় থাকে। আসলে পরাধীন ঔপনিবেশিক জাতীয়তাবাদ সাংস্কৃতিক পরিসরে যে সবল পৌরুষের কল্পনা করছিল, তার সূত্রেই পরিবার, দাম্পত্য সম্পর্ক, শিশুপালন, শিশুর শিক্ষা, সর্বোপরি জাতিগঠনের উপযোগী নারী-পুরুষ চরিত্রগঠনের ভাবধারা গড়ে ওঠে। উচ্চকোটির সাহিত্যে এর একরকম বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আর, ততটা পরিশীলিত লিখন নয়, এমন পপুলার বটতলার বইপত্রে তার চেহারা আরেকরকম দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে জাতির আহত অহং তার পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতাপ্রয়োগের কৌশলটিই নতুনভাবে প্রকাশ করেছে।

বটতলার বইয়ের সবচেয়ে বড়ো সাবভার্সন ভাষা। যে পৌরুষব্যঞ্জক, শিষ্ট, শুদ্ধ সাধু সংস্কৃতানুসারী বাংলা ঔপনিবেশিক শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গদ্যসাহিত্যের মান্য ভাষা হয়ে উঠল ক্রমশ, তার বাহ্যিক কাঠামোটি বজায় রেখেই বটতলার বই নিজের শরীরে ঢুকিয়ে দিয়েছে স্ল্যাং, মেয়েলি ডায়লেক্ট, জ্যান্ত উল্লাসের ভাষা। পূর্বোক্ত *কলিকুতূহল* বইতে এক বৈষ্ণব অপর শাক্তকে বলছে— ‘‘আমি তন্ত্র শুনিয়াছি, পণ্ডিতসমাজেও বাস করিয়াছি কিন্তু মাদারচোত তন্ত্র কখন শুনি নাই’’। তারকচন্দ্র চূড়ামণির *সপত্নী নাটক*-এ হরমণির উক্তি— ‘‘মুখের পানে চেয়্যে কত শাস্তরের কথা শুনি এত কি ঢল্‌য়ে থাকি?’’। শ্যামাচরণ দে-র *বাসরকৌতুক নাটক*-এ ঠাকুরানীদিদির উক্তি— ‘‘ওলো তোরা শালার কান দুটো বেস্ করে মোলে দেনা গো তা না হলে রস বেরুবে কেন’’? এধরনের শব্দ প্রয়োগ বটতলার বইকে বিশিষ্ট করেছে, উল্টোদিকে উচ্চবর্গের সমাজ প্রভুদের চোখে এদের ভিতর ‘অশ্লীলতা’র খোঁজ হয়ে উঠেছে অবশ্যম্ভাবী। পপুলার সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষণই হল বিদ্যমান সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাবাদর্শকে বহন করা। একইসঙ্গে সামাজিক ক্ষমতাকাঠামোকে স্বীকার করে নিয়েই তাকে প্রশ্ন করা। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সীমায় সেই প্রশ্নগুলিকে আবদ্ধ রাখা। ফলে ক্ষমতাতন্ত্রের সঙ্গে সমঝোতা করেই সে নিজের অন্তর্ঘাত প্রবণতা জারি রাখে। এটাই ক্ষমতার সঙ্গে তার লুকোচুরি খেলা। উনিশ শতকের বটতলার বই সেই চাপানউতোরের সার্থক নিদর্শন।

কলকাতার ফিল্ম সোসাইটি : ইতিহাসের অবসান?

পরিচয় পাত্র

১

ইতিহাসের অবসান ব্যাপারটা এমনভাবেই ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার খ্যাতি ও অখ্যাতি দুইই কুড়োনো রচনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে যে, এর ব্যবহার মাত্রেই ফুকুয়ামা ও বিশ্বায়ন প্রসঙ্গ মনে আসা স্বাভাবিক। সেটা ভেবেচিন্তেই এই রচনার নাম দেওয়া হয়েছে, কেননা ফিল্ম সোসাইটির ইতিহাস, বিবর্তন আর তার ক্ষয় এই তিন ঘটনার সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে স্বাধীনতা-উত্তরকালের ভারতের ইতিহাস যা বিশেষ সুখপাঠ্য নয়। কলকাতার ফিল্ম সোসাইটি (বা ফিল্ম সোসাইটি বস্তুটি) সম্পর্কে আলোচনায় দুটো আপাত-পৃথক বিষয় একত্রে মেশে, একটা আর্কাইভ ও ইতিহাসের শুকনো তথ্য, অন্যটা যাপিত অভিজ্ঞতা যদি লেখকের ফিল্ম সোসাইটির সঙ্গে অতীত সংযোগ থেকে থাকে। এই রচনাটিতে দুরকমই থাকবে।

প্রথমেই অনেকগুলো প্রশ্ন তৈরি করতে চাইব যেগুলোর উত্তর সন্ধানের মধ্যেই ফিল্ম সোসাইটির ইতিহাসের একটা বিন্যাস খুঁজে পাওয়া যাবে। সেগুলোকে আনুপূর্বিক সাজিয়ে নিলে এইরকম দাঁড়াতে পারে।

ফিল্ম সোসাইটির ধারণার মধ্যেই কি 'আর্ট সিনেমা'-র সঙ্গে তার সংযোগের বীজটি নিহিত?

'আর্ট সিনেমা'-র ধারণা গ্লোবাল সাউথে কি মুখ্যত ইয়োরোপের অবদান?

ফিল্ম সোসাইটির মুখ্য উদ্দেশ্য কি কেবল ছবি দেখানোই ছিল? দর্শক নির্মাণ বাদে ফিল্ম সোসাইটির গুরুত্বপূর্ণ অবদান কোন্ গোত্রের?

ভারতে, বিশেষত কলকাতায় ফিল্ম সোসাইটির ইয়োরোপের সঙ্গে সংযোগই কি মুখ্য? অন্যান্য গ্লোবাল সাউথ অঞ্চলের ছবি, এমনকি ভারতের অন্য নানা প্রদেশের ছবির চর্চা ফিল্ম সোসাইটিতে হত কি?

দক্ষিণ ভারতে ফিল্ম সোসাইটি থেকেই ফিল্ম কালেক্টিভের উত্থান এবং যৌথ ছবি বানানোর চেষ্টা হয়েছে। অনুরূপ প্রয়াস কলকাতায় দেখা যায় না কেন?

ফিল্ম সোসাইটি কি উত্তাল সত্তর দশকে ক্রমেই বামপন্থী চেহারা নিয়েছিল? তার প্রমাণ কি স্ক্রিনিং এর ইতিহাসে মেলে?

ফিল্ম সোসাইটি পাবলিকেশনের প্রসঙ্গ এলে যে প্রশ্নটি উঠবেই সেটি হল ফিল্ম সোসাইটি-জাত ক্রিটিকদের দ্বারা কি ফিল্ম ক্রিটিসিজমের কোনও নির্দিষ্ট ধারা গড়ে ওঠা সম্ভবপর হয়েছিল?

ফিল্ম স্টাডিজ নামক ইউনিভার্সিটি ডিসিপ্লিন আসার পরে ফিল্ম সোসাইটির সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন হল?

ডিজিটালের আবির্ভাবই কি ফিল্ম সোসাইটির পতনকে তরান্বিত করেছে?

ফিল্ম সোসাইটির নতুন চেহারা কেমন হতে পারে?

ফিল্ম ক্লাবের প্রথম প্রতিষ্ঠা ফ্রান্সে, ১৯০৭-এ, আবার ব্রিটেনে ফিল্ম সোসাইটির স্থাপনা ১৯২৪-২৫-এ। অর্থাৎ ইয়োরোপে, স্বাভাবিকভাবেই, ফিল্ম সোসাইটির ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। কিন্তু গ্লোবাল সাউথের অন্য নানা অংশে সিনে ক্লাব বা ফিল্ম সোসাইটির আবির্ভাবের সঙ্গে কোল্ড ওয়ার এবং তার রাজনীতির সম্পর্ক খুবই স্পষ্ট। এক ধরনের আর্ট সিনেমা বিষয়ক মতামত ফিল্ম সোসাইটির সঙ্গে অবিভাজ্য হয়ে ওঠাও এরই অংশ। রিয়েল নাভিতস্কি লাতিন আমেরিকার ফিল্ম সোসাইটি প্রসঙ্গে তাঁর *ট্রান্সআটলান্টিক সিনেফিলিয়া* শীর্ষক গবেষণাকর্মে দেখিয়েছেন কীভাবে সিনে ক্লাব, আর্কাইভ, ফেস্টিভ্যাল এবং ফিল্ম স্কুলের আবির্ভাব একদিকে যেমন একটি বিশেষ শ্রেণির (যথা নাগরিক মধ্যবিত্ত) কথা বলে তেমনই ফ্রান্সের প্রবল সাংস্কৃতিক প্রভাবের পরিচয় হয়ে ওঠে। বিশ্বযুদ্ধে দীর্ঘসময় অকুপেশনের মধ্যে থাকা ফরাসি দেশের 'সফট পাওয়ার' স্পষ্ট হয় এ থেকেই। নাভিতস্কির আলোচ্য দেশ এখানে মুখ্যত কলম্বিয়া, কিন্তু অনুরূপ মডেল অন্য নানা অঞ্চলেও প্রযোজ্য হতেই পারে।

ভারতে ফিল্ম সোসাইটির ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ১৯৪৭ সালে কলকাতায় ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির পত্তনের কথা

দিয়েই প্রায় সব ইতিহাস শুরু হয়। গৌতমন ভাস্করন তাঁর আদুর গোপালকৃষ্ণনের জীবনীগ্রন্থে বম্বেতে ১৯৩৭ (কোনও কোনও মতে ১৯৩৯) সালে প্রতিষ্ঠিত 'অ্যামেচার সিনে সোসাইটি'কেই দেশের প্রথম ফিল্ম সোসাইটি আখ্যা দিয়েছেন। এটির প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন স্ট্যানলি জেপসন, *ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়া*-র তৎকালীন সম্পাদক (কোনও কোনও রচনায় ওঁকে *টাইমস অব ইন্ডিয়া*-র সঙ্গে যুক্ত বলা হয়েছে)। কয়েক বছর পরে কয়েকজন তথ্যচিত্র নির্মাতা বম্বে ফিল্ম সোসাইটি নামে আরেকটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্রুত ফিল্ম আর্কাইভিস্ট পি কে নায়ার ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত বম্বে ফিল্ম সোসাইটিকেই ভারতের প্রথম ফিল্ম সোসাইটি বলে দাবি করেছেন।

অ্যামেচার সিনে সোসাইটির প্রথম ফিল্ম সোসাইটি হিসাবে গৃহীত হওয়ার দাবিকে সমর্থন করেছেন বিজয়া মূলে। এটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ফেরেন্সে বোরকা, একজন হাঙ্গেরীয় চিত্রগ্রাহক যিনি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। ভি কে চেরিয়ান তাঁর ফিল্ম সোসাইটির ইতিহাসে পি কে নায়ার ও বিজয়া মূলেকে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, ফেরেন্সে বোরকা ফিল্ম সোসাইটির রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন ১৯৪৩এ, সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট অব বোম্বে মোতাবেক।

কলকাতায় ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি বা সিএফএসের প্রতিষ্ঠা ১৯৪৭-এ, এ তথ্য সবারই জানা। তবে এই প্রতিষ্ঠার কথায় সত্যজিৎ রায়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, হরিসাধন দাশগুপ্ত প্রমুখের কথা যতটা উল্লিখিত হয় সব রচনায় ততটা বলা হয় না অপেক্ষাকৃত স্বল্পখ্যাত মেম্বারদের কথা, যেমন মনোজেন্দু মজুমদার বা পূর্ণেন্দু নারায়ণ। মনোজেন্দু ছিলেন ফিল্ম সোসাইটির প্রথম কোষাধ্যক্ষ, এবং পথের পাঁচালীর শুটিং বোড়াল গ্রামে হওয়ায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ফিল্ম সোসাইটির সংখ্যা এরপর ক্রমেই বাড়তে থাকে, সারা দেশেই তা ছড়িয়ে পড়ে, বাংলা ও কেরালায় ফিল্ম সোসাইটির বিশেষ প্রচলন দেখা যায়, যাতে বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভূমিকা ছিল।

কলকাতায় ফিল্ম লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা, ফিল্ম সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বইপত্রের হাতবদল, ফিল্ম পত্রিকার প্রকাশ ইত্যাদিরও দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। সেগুলিকে ফিল্ম সোসাইটির ইতিহাস থেকে আলাদা করে দেখা চলে না, কোনও কোনওটি ফিল্ম সোসাইটি পত্তনের আগে থেকে বিদ্যমান। ১৯২৯-এ চিত্তরঞ্জন ঘোষ

সম্পাদিত *ফিল্ম ল্যান্ড* পত্রিকার সূচনা, ১৯৩১-এ সিনেমা লাইব্রেরি তৈরি হওয়া ইত্যাদির উদাহরণ দেওয়া চলে। রাম হালদারের ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং সত্যজিৎসহ অন্যান্য সদস্যদের আইজেনস্টাইন, পুদোভকিন, রেনে ক্লেয়ার প্রমুখের বইপত্র যোগাড় করে দেওয়া এখানে স্মর্তব্য। রাম হালদার তাঁর লেখাপত্রে ফিল্ম সোসাইটির সেই আদিপর্বের ইতিবৃত্ত, ছবিপ্রাপ্তির হাল হকিকত, সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ার অনেক গল্প শুনিয়ে গেছেন, তাঁর 'প্রসঙ্গ ফিল্ম সোসাইটি' রচনায় তা দ্রষ্টব্য।

ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা, তাতে সত্যজিৎ রায়ের ভূমিকা, ইন্দিরা গান্ধীকে তার সঙ্গে যুক্ত করা এবং ইন্দিরার সক্রিয় সাহায্য ও সমর্থন লাভ ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। ফিল্ম সোসাইটি স্ক্রিনিং সরকারি উদ্যোগে করমুক্ত করা হয়। ফেডারেশন ভারত সরকারের আর্থিক সহায়তা পায়, যা নরেন্দ্র মোদী সরকার ২০১৪-য় ক্ষমতায় আসা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার এই সহায়তা, স্বাভাবিকভাবেই, বন্ধ করেছে।

কোন্ ধরনের ছবি দেখানোর সুযোগ পেত ফিল্ম সোসাইটিগুলি?

বহু ফিল্ম সোসাইটি কর্মীর রচনায়, সাক্ষাৎকারে এবং ফিল্ম সোসাইটি পত্রিকাগুলির আলোচনায়, স্ক্রিনিং-এর ছড়িয়ে থাকা তালিকায় যা দেখা যায় তা স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের বিদেশনীতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। সোভিয়েত ছবি এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ছবি দেখানো হত প্রচুর, কেননা এই দূতাবাসগুলি ছবি সরবরাহ করত যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে এবং অনেক সময় নিখরচায়। নেহরুর জোটনিরপেক্ষ রাজনীতি এবং উদারীকরণের পূর্বে, সোভিয়েতের পতনের আগে পর্যন্ত ভারতের সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ঘনিষ্ঠতার প্রতিফলন এখানে হয়েছে। অন্যদিকে লাতিন আমেরিকান ছবি খুব কমই দেখানো সম্ভব হত বড়ো ফেস্টিভ্যাল ছাড়া। মনে রাখা যেতে পারে কীভাবে সাম্প্রতিক নানা গবেষণায় দেখা যাচ্ছে সোভিয়েত রাষ্ট্রের 'বন্ধু' রাষ্ট্রগুলির ফিল্মমেকারদের স্কলারশিপ পেয়ে মস্কোর বিখ্যাত ফিল্ম স্কুলে (VGIK) পড়ার ইতিহাস এবং অন্যদিকে লাতিন আমেরিকার র‍্যাডিক্যাল ফিল্মমেকারদের সঙ্গে সোভিয়েতের সুসম্পর্ক না থাকার ইতিহাস। আবার পঞ্চাশ থেকে সত্তরের দশকের দিকে যেতে গিয়ে ভালো ছবি দেখানো, উন্নত দর্শক তৈরি ইত্যাদি

থেকে ক্রমে ক্রমে সরে এসে ছবির রাজনীতি, কিউরেশনের রাজনীতির উত্তাল সত্তরে বড়ো ভূমিকা নেওয়ার যে ইতিহাস তার নানা ইঙ্গিত মেলে।

রোচনা মজুমদার তাঁর গবেষণায় ফিল্ম সোসাইটির স্ক্রিনিং-এর এই জটিল ইতিহাস ধরে রেখেছেন, বহু তথ্যে বিন্যস্ত করেছেন তাকে। তদুপরি একটা বিশেষ ধারণায় তিনি পৌঁছেছেন। তাঁর মতে, ফিল্ম সোসাইটির পত্রিকা, লেখাপত্রের সংকলন আদতে এক বিকল্প আর্কাইভের নির্মাণ, যা রাষ্ট্রীয় ফিল্ম আর্কাইভ থেকে নিজের এক পৃথক অস্তিত্ব তৈরি করে। সেই জগতের অনেকটাই জুড়ে থাকে ভালো ছবি/খারাপ ছবির ধারণা, ছবির নান্দনিক গুণাগুণ বিষয়ে আলোচনা। অভিজা ঘোষ ফিল্ম সোসাইটি সম্পর্কিত গবেষণায় বিশদে লিখেছেন ব্যক্তি সিনেফিলের, সংগঠকের সংযোগ, স্মৃতি, নস্টালজিয়ার প্রসঙ্গ, যেটা বাদ রেখে ফিল্ম সোসাইটি সম্পর্কে আলোচনা করা চলে না।

ফিল্ম সোসাইটি শুধুই কলকাতা শহরকেন্দ্রিক ছিল না, বহরমপুর বা উত্তরপাড়ার যথেষ্ট সমৃদ্ধ ফিল্ম সোসাইটির কাজকর্ম তার প্রমাণ। অভিজা ঘোষের পূর্বোক্ত গবেষণায় দেখি কর্ণাটকের হেগগোড়ুর ফিল্ম সোসাইটি বা জামশেদপুরের সেলুলয়েড চ্যাপ্টার সম্পর্কে আলোচনা। জামশেদপুর সেলুলয়েড চ্যাপ্টার একাধিক অতি গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশ করেছেন, ভারতীয় সিনেমার ত্রিশের দশকের কলাকুশলীদের রচনার একটি সংকলন, লাতিন আমেরিকান সিনেমা বিষয়ক আরেকটি বই যেমন।

কলকাতায় অনেকগুলি ফিল্ম সোসাইটি যথেষ্ট সক্রিয় ছিল, আমার ফিল্ম সোসাইটি জীবনের অভিজ্ঞতায় তার অস্তগামী সময়ের কিছুটা স্বাদ পেয়েছি। ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি, সিনে সেন্ট্রাল, নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি, সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা এদের মধ্যে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা থেকেই শক্তি বসু ও শুভেন্দু দাশগুপ্তের সম্পাদনায় *ফিল্ম পোলেমিক্স*-এর মতো অত্যন্ত জরুরি সংকলন প্রকাশিত হয় যেখানে কলকাতার পত্রপত্রিকার ফিল্ম সংক্রান্ত নানা সুপরিচিত-স্বল্পপরিচিত বিতর্ক এক মলাটে ধরা রয়েছে। সত্যজিৎ-মৃণাল সেনের আকাশ কুসুম নিয়ে বিখ্যাত বিতর্কেরও স্থান এখানে হয়েছে। নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি এই সময়েও প্রকাশনার ধারা বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন এবং সুবর্ণরেখা ও কোমল গান্ধার বিষয়ে তাঁদের বিশেষ সংখ্যাগুলি এক্ষেত্রে উল্লেখের দাবি রাখে।

অভিযোগের দিকে আসা যাক। কালেক্টিভ নির্মাণ ও ছবি তৈরিতে যে ভূমিকা দক্ষিণ ভারতের ফিল্ম সোসাইটিগুলির, যথা আদুর গোপালকৃষ্ণনের চিত্রলেখা বা জন আব্রাহামের ওডেসার মতো সংগঠনের ক্ষেত্রে দেখি তার সমতুল্য কোনও ভূমিকা কলকাতার ফিল্ম সোসাইটিগুলিকে পালন করতে দেখা যায়নি। শুভেন্দু দাশগুপ্ত ছবি তৈরির ক্ষেত্রে তাঁদের চেষ্টা, ছবি প্রদর্শনের নানা বিকল্প স্পেস নিয়ে ভাবনার কথা বলেছেন এবং চেষ্টা করেও যে ছবি তৈরিতে তাঁরা তেমন কোনও ভূমিকা নিতে পারেননি সে বিষয়ে আক্ষেপও করেছেন। দেশে সুপার-৮ মুভমেন্টের পুরোধা যে মানুষটি সেই সৌমেন গুহের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে জেনেছি আশির দশকে পশ্চিমবঙ্গে সুপার-৮ ছবি, ওয়ার্কশপ করতে গিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠিত 'আর্ট সিনেমা'র প্রতিনিধি বা ফিল্ম সোসাইটি কর্মীদের কাছে কোনও সহায়তা পাননি।

আমি যখন ফিল্ম সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত, মোটামুটি ২০০৩ থেকে ২০১১, সেটাই তার যথেষ্ট ক্ষয়িষ্ণু পর্ব। এরপরে ক্রমশ প্রবীণ সিনেফিল-কর্মীরা প্রয়াত হয়েছেন, তরুণতরদের সেই জায়গা নিতে বিশেষ দেখা যায়নি। কিন্তু ফিল্ম সোসাইটির পতনের ইতিহাসে আরও কিছু আন্তর্জাতিক বিষয় রয়েছে, সেগুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই।

ফিল্ম স্টাডিজ নামক ইউনিভার্সিটি ডিসিপ্লিন এদেশে আবির্ভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ফিল্ম সোসাইটির সঙ্গে, বিশেষ করে কলকাতায় (যেহেতু এটির সূচনা হয়েছিল কলকাতাতেই, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে), এর একধরনের দ্বন্দ্বময় সম্পর্কের কথা শোনা যেতে থাকে। সারা পৃথিবীতেই ফিল্মের পঠনপাঠন ইউনিভার্সিটি-কেন্দ্রিক হয়ে ওঠার আগে ফিল্ম ক্রিটিসিজমের যে দীর্ঘ ঐতিহ্য অ্যাকাডেমিক বিদ্যায়তনের বাইরে কায়েম ছিল তার মধ্যে ফিল্ম স্টাডিজ সম্পর্কে সন্দেহ এবং প্রশ্ন ছিল, এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। পরে এই দুই জগতের বিচ্ছিন্নতা পুরোপুরি বজায় থাকেনি, অনেকে এদুটির মধ্যে যাতায়াত করেছেন অবাধে। কিন্তু কলকাতায় এদুয়ের মধ্যে কোনও সংযোগ প্রায় দেখাই যায় না। আবার ফিল্ম সোসাইটি পাবলিকেশনের ইতিহাসে কিছু বিশিষ্ট ক্রিটিক থাকলেও তাঁদের রচনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব যতটা চলচ্চিত্রের ইতিহাস বা তত্ত্বের চর্চায় তদনুরূপ ভূমিকা তাঁদের নিতে দেখা যায়নি।

ডিজিটালের আগমনের পরে ফিল্ম সোসাইটির আবশ্যকতা আছে কিনা এই প্রশ্নই এই মিতায়তন রচনার শেষ জিজ্ঞাসা। ডিজিটালের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে আরও নানা উপাদান যেগুলিকে ফিল্ম সোসাইটির সঙ্গে মেলানো চলে না। যেখানে কালেক্টিভ ছবি-দর্শনের, তার রাজনীতির জায়গা ফিল্ম সোসাইটির সঙ্গে জড়িত, ডিজিটাল সেখানে অনেক বেশি ব্যক্তিগত ছবি দেখার পরিসর। মালয়ালি ফিল্মমেকার কে আর মনোজ তাঁর ১৬ মিমি মেমরিজ, মুভমেণ্ট অ্যান্ড আ মেশিন (২০০৮) ছবিতে এই বৈপরীত্য, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার পতন ও দেশে উদারীকরণের পরে ফিল্ম সোসাইটির যৌথ সিনে-যাপন সরে গিয়ে ব্যক্তিগত সিনেফিলিয়ার প্রাদুর্ভাবকে ধরেছেন। আজকের দিনে সমস্যা আরও প্রবল কেননা একজিবিশন স্পেস অনেকাংশে চলে গেছে ওটিটির (বা, আন্তর্জাতিক পরিভাষা ব্যবহার করলে, ভিওডি বা ভিডিও অন ডিমান্ড) দখলে। সেখানে প্রায় একাধিপত্য নেটফ্লিক্স বা আমাজন প্রাইমের মতো গ্লোবাল কর্পোরেট দৈত্যের। সেখানে রুচিকে শনাক্ত, নিয়ন্ত্রণ এবং (নব)নির্মাণ করার দায় নিয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অ্যালগরিদম এবং তার অন্তর্গত বায়াস বা পক্ষপাত। মুবির মতো যে প্ল্যাটফর্ম মুখ্যত গ্লোবাল আর্ট সিনেমার চর্চা করতে চেয়েছিল এবং নিজস্ব কিউরেশন মডেল গড়ে তুলেছিল তাকেও একসময় কিউরেশনের বদলে অ্যালগরিদমের পথেই হাঁটতে হয়েছে প্রতিযোগিতার বাজারে। মাতিয়াস ফ্রে নেটফ্লিক্স আর মুবি দুইয়ের ক্ষেত্রেই এই সর্বগ্রাসী বাজারের আধিপত্যকে দেখিয়েছেন তাঁর গবেষণায়। প্রশ্ন হল এই যে এই সময়ে দাঁড়িয়ে ফিল্ম সোসাইটি বা সম্মেলক ছবি দেখা-চর্চা-আলোচনা কি টিকে থাকতে পারবে?

আশার কথা এই যে, ফিল্ম সোসাইটির বহতা ধারা সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়নি। নানা নতুন চেহারায় তার কিছুটা বজায় আছে, কলকাতার অনেক প্রাচীন ফিল্ম সোসাইটি অনেকটা ম্রিয়মাণ বা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলেও কলকাতার উপকণ্ঠে তার অস্তিত্ব, তাতে তরুণদের অংশগ্রহণ, উল্লেখযোগ্য পাবলিকেশন ইত্যাদি হয়ে চলেছে। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ উত্তরপাড়া ফিল্ম সোসাইটির নিয়মিত স্ক্রিনিং এবং বুলেটিন প্রকাশ। এই বুলেটিন বাংলাদেশের সিনেফিল মহলেও সমাদৃত হয়েছে, আন্তর্জাতিক সংযোগ তৈরি করতে পেরেছে। বহরমপুর ফিল্ম সোসাইটি তার একজন প্রধান কর্মীর মৃত্যুতে অনেকটাই নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে, কিন্তু বহরমপুরের স্থানীয় চলচ্চিত্রমোদী মানুষের উদ্যোগে ছবি দেখানোর কাজ কিছু কিছু হচ্ছে। তাই ফিল্ম সোসাইটির ভবিষ্যৎ আগামীদিনে হয়তো শহর কলকাতার চৌহদ্দির বাইরেই।

গ্রন্থসূত্র

Basu, Sakti, and Shuvendu Dasgupta. *Film Polemics*. Cine Club of Calcutta, 1992.

Bhaskaran, Gautaman. *Adoor Gopalakrishnan: A Life in Cinema*. Viking, 2010.

Cherian, *V. K. India's Film Society Movement: The Journey and Its Impact.* Sage, 2017.

Frey, Mattias. *Mubi and the Curation Model of Video on Demand*. Palgrave Macmillan, 2021.

—*Netflix Recommends: Algorithms, Film Choice, and the History of Taste.* University of California Press, 2021.

Ghosh, Abhija. *Celluloid in Transit: Film Society Cultures in India*. Jawaharlal Nehru University, MPhil Dissertation, 2012.

Halder, Ram. "Prosongo Film Society." *Chitrabhavna: Film Society Andoloner 50 Bochor,* edited by Premendra Mazumder and Anjan Das Mazumdar, Federation of Film Societies of India, 2022, pp. 191-214.

Majumdar, Rochona. *Art Cinema and India's Forgotten Futures: Film and History in the Postcolony*. Columbia University Press, 2021.

Navitski, Rielle. *Transatlantic Cinephilia: Film Culture between Latin America and France, 1945-1954*. University of California Press, 2023.

খেলার কলকাতা, কলকাতায় খেলা

শুভ্রাংশু রায়

কলকাতা বা ক্যালকাটা। জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে যতই বিতর্ক থাক, এটা মনে হয় কেউই অস্বীকার করবেন না যে, শহর হিসেবে কলকাতার বেড়ে ওঠা, প্রসিদ্ধিলাভ পুরোটাই ঔপনিবেশিক আমলেই। বাঙালির ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে এই শহর। ঔপনিবেশিক আমলের বড়ো সময় ধরে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী, পরবর্তী সময় বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির রাজধানী এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সাড়ে সাত দশক জুড়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী ও দেশের প্রধান চারটি মেট্রো সিটির অন্যতম হিসেবে কলকাতা কখনওই মর্যাদা ও গুরুত্বের দিক থেকে পিছিয়ে পড়েনি। শহরটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য সাংস্কৃতিক আভিজাত্য এবং খেলার দুনিয়ায় এক বিশাল অবদান। বৌদ্ধিক দুনিয়ায় খেলাধুলা সংক্রান্ত বিষয়কে অনেকেই সাংস্কৃতিক ঘরানার বৃত্তের মধ্যে রাখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে ক্রীড়া বিষয়ক আলোচনা একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র পরিচয় বহন করে। আমরা এই দ্বিতীয় ধারণার ওপর ভিত্তি করে ক্রীড়া চর্চার বিষয়টিকে একটি নিজস্ব পরিসর হিসেবে ধরেই আমাদের আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।

কলকাতা শহরে ঔপনিবেশিক আমলের একদম শুরুর দিকে শ্বেতাঙ্গ ও স্থানীয়দের খেলার জগৎটি সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। সদ্য গড়ে ওঠা ইংলিশ ক্লাবগুলিতে স্থানীয় জনতার প্রবেশাধিকার ছিল না। স্থানীয় মানুষজনের, বিশেষত অল্পবয়স্কদের মধ্যে যে ধরনের দেশজ খেলার চল ছিল, সেগুলি কার্যত ধারণার বাইরে ছিল শ্বেতাঙ্গদের।

মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) পর থেকে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্রগত দিকের শুধু পরিবর্তন ঘটেছিল তা নয়, মৃণালিনী সিনহা দেখিয়েছেন, ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যে ভারতীয় বিশেষত নতুন গজিয়ে ওঠা বাঙালিবাবু ও পশ্চিমি শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালিদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ফারাক চলে এসেছিল। আবার কোথাও মধ্যবিত্ত বাঙালির মন থেকে ব্রিটিশ শাসনের সেই মোহ ধীরে ধীরে খসে পড়তে শুরু করেছিল।[১]

যদিও এমনটি হয়নি যে, প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই পরিবর্তনের ছাপ শহরের শ্বেতাঙ্গ ও স্থানীয় মানুষজনের সম্পর্কের মধ্যে আচমকা ছেদ টেনে দিয়েছিল। ব্যবসায়ী এবং সিভিলিয়ন শ্বেতাঙ্গদের ব্যবসায়িক ও অন্যান্য সামাজিক কারণে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে সর্বজনীন পরিসরে যোগাযোগ রাখতেই হয়েছিল। এদেশে পশ্চিমি শিক্ষার প্রসারের পর স্কুল কলেজে শ্বেতাঙ্গ শিক্ষকরা ক্লাস চালু রেখেছিলেন এবং মিশনারিদের কাজকর্মেও তেমন ঢিলে পড়েনি। সোজাসাপটা কথায় সর্বজনীন পরিসরে কলকাতার স্থানীয়দের সঙ্গে ইংরেজদের লেনদেনে তেমন ফারাক পড়েনি। যদিও বসবাসের ক্ষেত্রে সাহেবপাড়ার সঙ্গে স্থানীয় মানুষজনের দূরত্ব রয়েই গিয়েছিল।

হিন্দু কলেজ (১৮১৭; পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্সি কলেজ), স্কটিশ চার্চ কলেজ (১৮১৮), সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪), ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ (১৮৩৫) এবং সর্বোপরি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৮৫৭) প্রতিষ্ঠা পশ্চিমি শিক্ষার প্রসারে নতুন গতি আনে। পাশাপাশি মিশনারিদের উদ্যোগে জেভিয়ার্স কলেজ ও প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৬০)। দ্রুত কলকাতা ও কলকাতা-সংলগ্ন অংশে এক নতুন পশ্চিমি শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উদ্ভব ঘটে যাঁরা সংখ্যায় নেহাত কম ছিলেন না।

এই পর্বে কলেজ এবং স্কুলগুলির পাঠ্যসূচির মধ্যে ভিক্টোরিয়ান মূল্যবোধের অংশ হিসেবেই ফিজিক্যাল এডুকেশনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে কিছুটা পাঠ্যক্রমের অংশ হিসেবেই পশ্চিমের খেলাগুলির সঙ্গে স্থানীয় ছাত্র-যুবদের পরিচিতি ঘটে। সরকারি স্কুল-কলেজের পাশাপাশি মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শরীর চর্চা বিশেষত পিটি ও বিভিন্ন পশ্চিমি খেলার প্রচলন শুরু হয়ে যায়।

জে এ ম্যাঙ্গনের মতো সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, ব্রিটেনের 'গেমস এথিকস'-এর ধারণা তথা পশ্চিমি খেলাগুলি ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষার মাধ্যমে

ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, যার আসল উদ্দেশ্য ছিল এদেশের মানুষদের সভ্য করে তোলা।[২] আর যেহেতু কলকাতা ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী; স্বভাবতই এই তৎপরতা এখানে অনেক বেশি প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল। ইতিমধ্যে 'মেকলে মিনিটস' (১৮৩৫) প্রকাশিত হয়েছিল, সে-কারণে বলাই বাহুল্য ভারতীয়দের 'কৃষ্ণাঙ্গ ব্রিটিশ' বানানোর প্রক্রিয়ার গতিপ্রাপ্তি আমাদের খুব একটা আশ্চর্য করে না। যদিও ততদিনে শহরের শ্বেতাঙ্গরা নৈশ ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিলেন, তেমনি ধীরে ধীরে বেশকিছু ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানও তাঁদের উদ্যোগে শহরের বুকে তৈরি হতে শুরু করে। বেশ কিছু সামাজিক ক্লাবও একইসঙ্গে ক্রীড়াচর্চার প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয়দের মেম্বারশিপের তেমন সুযোগ ছিল না।

কলকাতার এমন একটি ক্লাবের নাম ক্যালকাটা র‍্যাকেট ক্লাব, যার প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৯৩। এটি বিশ্বের প্রাচীনতম স্কোয়াশ ক্লাবগুলির অন্যতম। জওহরলাল নেহরু রোডে অবস্থিত সাতটি আন্তর্জাতিক স্কোয়াশ কোর্ট সম্পন্ন ২৩১ বছরের এই স্কোয়াশ ক্লাব স্বমহিমায় বিদ্যমান। একসময় এই ক্লাব কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গদের জন্য খোলা থাকলেও স্বাধীনতার পরে ভারতীয়দের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়। এশিয়ান গেমস ও কমলওয়েলথ গেমসে সোনা ও রুপো জয়ী প্রথম ভারতীয় স্কোয়াশ খেলোয়াড় কলকাতাবাসী সৌরভ ঘোষাল-এর খেলার সূত্রপাত এই ক্লাবেই।[৩] ঠিক আগের বছর, ১৭৯২ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ক্যালকাটা ক্রিকেট অ্যান্ড ফুটবল ক্লাব (সিসি অ্যান্ড এফসি)। শ্বেতাঙ্গদের উদ্যোগে গঠিত এই ক্লাব প্রাথমিকভাবে ক্রিকেট খেলার জন্য তৈরি হলেও পরবর্তীকালে ফুটবল ও রাগবি খেলাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৮৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত 'কলকাতা ফুটবল ক্লাব' আসলে ছিল একটি রাগবি খেলার ক্লাব। রাগবি খেলার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির প্রয়াসও এই ক্লাব থেকে শুরু হয়। কিন্তু কয়েক মাসের প্রচেষ্টায় এই খেলার খুব সামান্য অগ্রগতি সম্ভব হয়। ক্যালকাটা রাগবি ক্লাব সংগঠনে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁরা হলেন জি এ জে রথনি, এইচ জে চ্যান্ডলি, এইচ জে ই শর্ট, ডব্লিউ কে এডিস, জে এইচ আর হার্ট, জে ই টাইলর, এইচ জে ফ্রু, এইচ এস সায়ার।

রাগবির প্রথম রেকর্ডেড ম্যাচটি হয়েছিল ১৮৭২ সালের ক্রিসমাসের দিন সিএফসি বা ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের মাঠে।[৪] ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড,

আয়ারল্যান্ড এবং ওয়েলসের সম্মিলিত দলের মধ্যে খেলা হয়েছিল। এই ম্যাচের পর খেলাটি ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে শুরু করেছিল, ক্লাবের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

প্রথম দিকে যে-সমস্ত ক্লাবের মধ্যে ম্যাচগুলি আয়োজিত হত, সেগুলি হল কলকাতা এফসি ও কলকাতা ভলান্টিয়ার, কলকাতা এফসি ও দ্য মিলিটারি, পাবলিক স্কুল ও দ্য রেস্ট, স্কটিশ এবং আইরিশ ও ইংলিশ এবং ওয়েলস, মার্চেন্ট এবং ব্রোকার ও দ্য রেস্ট এবং গ্রিফস। প্রথম থেকেই ক্যালকাটা ক্লাব রাগবি ইউনিয়নের সমর্থক ছিল, ১৮৭৪ সালে ক্যালকাটা ক্লাব রাগবি ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়। শুরুতে বছরের দু'টি সময়ে এই রাগবি খেলা আয়োজিত হত একবার শীতকালে অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি এবং অপরটি জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বরের শেষের দিক পর্যন্ত।[৫]

১৮৭৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ৩য় বাফ (3rd Buff) নামে পেশাদার রাগবি টিমের আগমন রাগবির বিস্তারে উদ্দীপনার সঞ্চার করে। কারণ এই দলের বেশিরভাগ অফিসার রাগবি খেলায় আগ্রহী ছিলেন। এই শহরে ৩য় বাফ গ্যারিসন করলে তারা শুধুমাত্র প্রতিযোগিতার আয়োজনই নয়, রাগবি খেলার মাঠ তৈরি এবং প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করেছিল।

১৮৭৬ সালে বাফরা চলে গেলে রাগবি খেলার ক্ষেত্রে একটা শূন্যস্থান পরিলক্ষিত হয়। যদিও তাদের প্রত্যাগমনের পর কিছু কিছু খেলার আয়োজন করা হলেও ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে লন টেনিস এবং পোলো খেলার ব্যাপক প্রচলন হলে কলকাতায় রাগবি খেলা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে ওঠে।

১৮৭৭ সালে ক্লাবটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে তৎকালীন ক্লাব সেক্রেটারি, কোষাধ্যক্ষ এবং ক্যাপ্টেন জি এ জি ডটনি, যিনি একাধারে এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যও ছিলেন, ক্লাবের তহবিলের গচ্ছিত অর্থ দিয়ে ভারতীয় কারিগরদের অলংকৃত একটি কাপ বানিয়ে, সেটিকে লন্ডনে অবস্থিত রাগবি খেলার বিশ্বব্যাপী মূল সংস্থা আরএফইউ (RFU) বা রাগবি ফুটবল ইউনিয়নকে উৎসর্গ করার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে ক্লাবের কর্তৃপক্ষ সহমত পোষণ করলে কলকাতা ফুটবল ক্লাবের পক্ষ থেকে ডটনি সাহেব ১৭ ডিসেম্বর ১৮৭৭ সালে, রাগবি ফুটবল ইউনিয়ন-এর সেক্রেটারি ও কোষাধ্যক্ষ জে এ গ্রাহামকে পত্রযোগে প্রস্তাবটি পাঠান। এই প্রস্তাব আন্তর্জাতিক রাগবির নিয়ামক সংস্থার তরফে মেনে

নেওয়া হয় এবং জানানো হয় যে, ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের বার্ষিক প্রতিযোগিতার সময় 'ক্যালকাটা কাপ'টি বিজয়ী দলের হাতে তুলে দেওয়া হবে। রুপোর তৈরি এই ক্যালক্যাটা কাপের পুরো নকশাটি ভারতীয় কারিগররা তৈরি করেছিল এবং আজও এই আন্তজার্তিক প্রতিযোগিতাটির সঙ্গে এই শহরের নাম অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।[৬]

এদিকে কলকাতায় ১৮৯০ সাল থেকে ক্যালকাটা রাগবি ইউনিয়ন চ্যালেঞ্জ কাপ টুর্নামেন্ট শুরু হয়। একটি রুপোর কাপ তৈরি করা হয়, যেটির নামকরণ করা হয় 'দ্য ক্যালকাটা কাপ'। এই কাপে অংশগ্রহণের জন্য সারা ভারতের সমস্ত ক্লাব এবং সিলনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এরপর নিয়মিত না হলেও সামান্য বিরতিতে কলকাতায় রাগবি খেলা চলতে থাকে। যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জনের পর্বে কলকাতা ময়দানে রাগবি বন্ধ হয়ে যায়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ক্যালকাটা গ্রাউন্ড, আর্মেনিয়ান্স ও পুলিশ মাঠে রাগবি খেলা শুরু হলেও সেই ধরনের জনপ্রিয়তা অর্জনে খেলাটি ব্যর্থ হয়। যদিও একটা পর্যায়ে বিশেষত সত্তরের দশকে আর্মেনিয়ান ক্লাবের সাফল্য ছিল নজরকাড়া। তবে কলকাতা শহর থেকে রাগবি কিন্তু একবারে মুছে যায়নি। বর্তমানেও শহরে রাগবির তিনটি টুর্নামেন্ট আয়োজিত হয়। এগুলি হল ক্যালকাটা চ্যালেঞ্জ কাপ, সেন্টেনারি কাপ এবং জয় নন্দন মেমোরিয়াল ট্রফি। প্রথম দুটি টুর্নামেন্ট সিসি অ্যান্ড এফসি এবং শেষেরটি কলকাতা পুলিশ আয়োজন করে।[৭] সাম্প্রতিক সময়ে কলকাতা পুলিশের রাগবি দল যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। এছাড়া স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হোপ ফাউন্ডেশন শহরে স্কুলপড়ুয়াদের মধ্যে রাগবিকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করছে।

কলকাতা ময়দানে সবচেয়ে বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে রেস কোর্স। ১৮২০ সালে এই রেস কোর্স কলকাতায় স্থাপিত হয়। প্রাথমিকভাবে ১৮১২-তে ব্যারাকপুরে একটি রেস কোর্স থাকলেও কলকাতা ময়দানে প্রতিষ্ঠিত হলে এটি শুধু ব্রিটিশ ভারত নয়, এশিয়ার সবচেয়ে বড়ো রেস কোর্সে পরিণত হয়। ১৮৪৭ সালে ঘোড়দৌড় পরিচালনার জন্য শহরের বুকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে দ্য রয়্যাল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব।[৮] বর্তমানেও কলকাতা রেস কোর্সের যাবতীয় দৌড় প্রতিযোগিতা এই ক্লাবের তরফে করা হয়। প্রাথমিকভাবে কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গরা এই ক্লাবের সদস্য হতে পারলেও ব্রিটিশ আমলে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ভারতীয়দের জন্য এই ক্লাবের দরজা খুলে দেওয়া হয়। বছরের নির্দিষ্ট কিছু

সময় এই রেস কোর্স পোলো খেলার জন্য নির্দিষ্ট থাকে। ঘোড়দৌড় সাধারণত নির্দিষ্ট মাসের শনিবারগুলিতে অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ ঘোড়দৌড় 'ডার্বি' হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে কলকাতার 'ক্যালকাটা মনসুন ডার্বি'র খ্যাতি আন্তর্জাতিক মহলে যথেষ্ট স্বীকৃত।

কলকাতায় শিলচরের পরে বিশ্বের প্রথম পোলো ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৩ সালে। ক্লাবের নাম ক্যালকাটা পোলো ক্লাব।[৯] যদিও মধ্যযুগে ভারতে চৌঘান নামে ঘোড়ার ওপর একটি খেলার চল ছিল কিন্তু পোলো খেলার আদি রূপ আমরা মণিপুরেই দেখতে পাই।

১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ক্যালকাটা পোলো ক্লাবের স্যুভেনির থেকে জানা যায়, কাছাড় ও বার্মার মধ্যে অবস্থিত একটি ছোট্ট রাজ্য মণিপুরে ষোড়শ শতক থেকে বা ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দের কিছু আগে থেকেই পোলো খেলার চল শুরু হয়। মণিপুরে খেলাটির দেশজ নাম ছিল 'সাগল কানজাই'।[১০]

ক্যালকাটা পোলো ক্লাবটি প্রতিষ্ঠা করেছিল মূলত কলকাতার বণিকরা। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে কাছাড় যেত। তাদের মধ্যে এক জনপ্রিয় নাম হল ববি হিল। আধুনিক পোলোর সূচনা থেকে ১৫০ বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। খেলার নিয়মকানুনকে সময়োপযোগী করে তুলতে একাধিকবার পুনর্নবীকরণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রত্যেক দলে চারজন করে খেলোয়াড় থাকেন। ব্রিটেনের তুলনায় বরাবরই কলকাতায় পোলো খেলা কম খরচের ছিল, কারণ ঘোড়ার দাম এবং রক্ষণাবেক্ষণের খরচ ভারতে অনেক কম। ১৮৯২ সালে ইন্ডিয়ান পোলো অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত পোলো খেলা মিলিটারি রেজিমেন্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তী সময় দেশীয় মহারাজাদের এই খেলায় অনুপ্রবেশ ঘটে। কলকাতায় ক্যালকাটা পোলো ক্লাবের অধীনে প্রধানত তিনটি কাপের আয়োজন করা হয়। যাদের মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো ছিল এজরা কাপ (১৮৮০)। এছাড়া ছিল কারমাইকেল কাপ (১৯১০) এবং দ্বারভাঙা কাপ (১৯০৭)।[১১] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় বিভিন্ন অনিশ্চয়তার কারণে কলকাতায় পোলো খেলা কিছুদিন বন্ধ থাকার পর আবার পুরোদমে ১৯৬০-এর দশকে শুরু হয়। এই সময় কলকাতা পুলিশ কমিশনার রণজিৎ গুপ্ত এবং পি কে সেনের উদ্যোগে মাউন্টেড পুলিশ ক্লাব পোলোতে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে মূলত শীতের সময় কলকাতা রেস কোর্সে পোলো টুর্নামেন্টগুলি আয়োজিত হয়।

সাধারণভাবে একথা শুনলে হয়তো অনেকেই অবাক হবেন গ্রেট ব্রিটেনের পরে পৃথিবীর পুরোনো গলফ ক্লাবটি কলকাতা শহরে প্রতিষ্ঠিত। রয়্যাল ক্যালকাটা গলফ ক্লাব বা সংক্ষেপে আরসিজিসি। প্রতিষ্ঠা সাল ১৮২৯। প্রাথমিক পর্বে বর্তমান কলকাতা বিমানবন্দরের নিকটে এই ক্লাবটি (তখন নাম ছিল ক্যালকাটা গলফ ক্লাব) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৯৫ সালে এখানে দেশের প্রথম গলফ টুর্নামেন্ট আয়োজন করে এই গলফ ক্লাব। ১৯১০ নাগাদ টালিগঞ্জে ১৬০ একর জমিতে ক্লাবটি স্থানান্তরিত হয়। ১৯১১ কলকাতা সফরের আগে কিং পঞ্চম জর্জ ও কুইন মেরি এই ক্লাবের আগে রয়াল শব্দটি ব্যবহারের অনুমতি দেন।[১২] এই ক্লাব ইন্ডিয়ান অ্যামেচার চ্যাম্পিয়নশিপ, অল ইন্ডিয়া লেডিস চ্যাম্পিয়নশিপ এবং টাটা ইন্ডিয়ান ওপেন নামে কয়েকটি প্রতিযোগিতা আয়োজন করে। বর্তমানে আরসিজিসি ছাড়াও কলকাতায় আরও কয়েকটি গলফ ক্লাবের অস্তিত্ব রয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ দুই দশক থেকেই এই ক্লাবগুলি ভারতীয় অভিজাতদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। শিবশঙ্কর প্রসাদ চৌরাসিয়া এই ক্লাবের সদস্য, যিনি বর্তমানে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একজন প্রতিষ্ঠিত গলফার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল জয়ের ১৩ বছর আগে কলকাতায় অলিম্পিক মেডেল চলে এসেছিল ১৯০০ সালে কলকাতায় বসবাসকারী সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ব্রিটিশ ছাত্র নরম্যান প্রিচার্ড-এর মাধ্যমে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্যারিস অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করলেও অ্যাথলেটিক্সে জেতা দুটি রুপো আন্তর্জাতিক অলিম্পিক সংস্থার সিদ্ধান্তে আসে ভারতের ঝুলিতে।[১৩] এরপর ১৯২০-তে বেলজিয়ামে অলিম্পিকের আসরে প্রথমবারের জন্য ভারতীয় দল পাঠানো হলে সেই দলের পতাকা বাহক ছিলেন মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের অ্যাথলেট পূর্ণচন্দ্র ব্যানার্জি।[১৪] স্বাধীনতার পরে ১৯৪৮ লন্ডন অলিম্পিকে শহরের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান। যাঁদের মধ্যে ফুটবলে শৈলেন মান্না, সন্তোষ নন্দী, মহাবীর, ধনরাজ মেওয়ালাল আহমেদ খান (শেষের চারজন কলকাতা নিবাসী না হলেও সেই সময় কলকাতার ক্লাবে খেলতেন), হকিতে লেসলি ক্লডিয়াস, কেশব দত্ত, যশোয়ান্ত সিং রাজপুতদের পাশাপাশি ওয়াটার পোলো এবং বক্সিংয়ে কয়েকজন খেলোয়াড় কলকাতা থেকে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন লাগে ১০ জনের ভারতীয় ওয়াটার পোলো দল (৯ জনই ছিলেন বাঙালি) গঠিত হয়েছিল গোরাচাঁদ শীল, সমরেন্দ্র চ্যাটার্জি, সুহাস চ্যাটার্জি, অজয় চ্যাটার্জি, দ্বারকা দাস মুখার্জি, দুর্গা দাস, জহর আহির, যামিনী দাস এবং শচীন নাগ। অলিম্পিকে

চিলির বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ভারত ৭-৪ গোলে জয়লাভ করেছিল। এই ম্যাচে ভারতের হয়ে ৪টি গোল করেছিলেন শচীন নাগ।[১৫]

বক্সিংয়ে যে দুজন কলকাতা থেকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, তাঁরা হলেন রবিন ভট্ট এবং বিনয় বসু।[১৬] ১৯৫১-য় প্রথম এশিয়ান গেমসে সুইমিংয়ে এখনও অবধি ব্যক্তিগত ইভেন্টে দেশের একমাত্র সোনাজয়ী খেলোয়াড় কলকাতারই শচীন নাগ। ওই গেমসে ওয়াটার পোলোতে ভারত সোনা জিতেছিল, যে-দলে দুজন বাঙালি খেলোয়াড় ছিলেন জহর আহির এবং গণেশ দাস। বাংলা তথা কলকাতার ক্রীড়া ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অদ্ভুত কারণে এই নামগুলির উল্লেখ খুঁজে পাওয়া যায় না।[১৭]

১৯২০-তে কলকাতার বুকে স্থাপিত ক্যালকাটা সাউথ ক্লাব বিশ্বের নিরিখে লন্ডনের পরে দ্বিতীয় টেনিস ক্লাব। এই সাউথ ক্লাবেই দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৫টি ডেভিস কাপের আন্তর্জাতিক ম্যাচ বা টাই অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার মধ্যে ১৯৬৬ সালে ইন্টার জোনাল সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল ম্যাচও ছিল। সে-বছর ভারত ডেভিস কাপের ফাইনালে ওঠে ব্রাজিলকে হারিয়ে।[১৮] এই ক্লাবের অনেক কৃতী প্লেয়ারের মধ্যে প্রেমজিৎ লাল, নরেশ কুমার, জয়দীপ মুখার্জি, আখতার আলি এবং অবশ্যই লিয়েন্ডার পেজের নাম করতে হয়। এই লিয়েন্ডারের হাত ধরে আটলান্টা অলিম্পিকে (১৯৯৬) দীর্ঘদিন পরে ব্যক্তিগত ইভেন্টে ভারত পদক (ব্রোঞ্জ) জয় করতে সমর্থ হয়।

১৯৫২-য় হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে কলকাতার দুই কিশোরী ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। এঁরা হলেন অ্যাথলেট নীলিমা ঘোষ এবং সাঁতারু আরতি সাহা। সে-বছরের অলিম্পিকে ওয়াটার পোলোতে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে পাঁচ জন ছিলেন বাংলার বীরেন্দ্র বসাক (গোলকিপার) ও শম্ভু সাহা, কেদার শা, শচীন নাগ এবং মনু চ্যাটার্জি।[১৯] ১৯৭০-এ ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত এশিয়াডের ফাইনালে জাপানের বিরুদ্ধে ৪-২ গোলে হারের ফলে রুপো নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল ভারতকে। রুপো জয়ী আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খেলা সেই ভারতীয় দলে বাঙালি খেলোয়াড়দের প্রাধান্য ছিল। দলে ছিলেন তরুণ গোস্বামী, অশোক বিশ্বাস, পীযূষ মিত্র, বেণীমাধব তালুকদার, আব্দুল মতলিফ।[২০] ওয়াটার পোলোতে ভারতের শেষ পদক (ব্রোঞ্জ) এসেছিল ১৯৮২ দিল্লি এশিয়াডে। সেই দলে কলকাতার প্রতিনিধি ছিলেন রাহুল মিত্র, রমেন দাস এবং কানাই রায়।[২১]

১৯৫৯ সালে কলকাতার কিংবদন্তি সাঁতারু মিহির সেন প্রথম এশীয় হিসেবে ইংলিশ চ্যালেন অতিক্রম করেন। পরের বছর উত্তর কলকাতার আরতি সাহা প্রথম এশীয় মহিলা সাঁতারু হিসাবে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন।[২২] শুধু তাই নয়, ১৯৬০ সালে ভারত সরকারের তরফে প্রথম ভারতীয় মহিলা ক্রীড়াবিদ হিসাবে তিনিই পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন।

এই কলকাতা শহরের বুকে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন হকি প্রতিযোগিতার সূত্রপাত ঘটেছিল। প্রতিযোগিতার নাম বেটন কাপ (১৮৯৫)।[২৩] বর্তমানে এই প্রতিযোগিতা ১২৬ বছর (২০১৭, ২০১৯ এবং ২০২০-তে প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়নি) অতিক্রম করেছে। ভারতের দিকপাল হকি খেলোয়াড়রা কলকাতার এই ঐতিহ্যশালী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন। এখনও অবধি এই বেটন কাপের খেতাব সর্বাধিক (১৪ বার) ঘরে তুলেছে মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব। ১২ বার বেটন কাপ জয় করতে সমর্থ হয়েছে ক্যালকাটা কাস্টমস ক্লাব।[২৪]

কলকাতায় ১৯৭৫ সালে উদ্বোধন হয়েছিল দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইন্ডোর স্টেডিয়াম নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম। বিশ্ব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজনের মাধ্যমে এই ক্রীড়াঙ্গনের পথচলা শুরু। এই স্টেডিয়ামে ১৯৭৭ সালে ২৫তম সিনিয়র ন্যাশনাল ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলার মেয়েরা দ্বিতীয়বারের জন্য জাতীয় খেতাব জয় করে এবং সেই বছর পূর্ব রেল প্রথমবারের জন্য মেয়েদের ভলিবলের পাঁচ খেলোয়াড় রেলে নিয়োগ পান।[২৫]

১৮৬৪-তে কলকাতায় ক্রিকেটের নন্দন কানন ইডেন গার্ডেন্স-এ বাইশ গজে বল গড়াতে শুরু করে। বাংলায় ক্রিকেটের প্রাণপুরুষ ছিলেন সারদারঞ্জন রায়। তাঁর উদ্যোগে অবিভক্ত বাংলায় প্রাথমিকভাবে ক্রিকেটের প্রসার ঘটে। ১৯২৮ প্রতিষ্ঠিত হয় ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল বা সিএবি, যা আজও পশ্চিম বাংলার ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। এখনও অবধি এই ইডেন গার্ডেন্সে ৪২টি টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। লর্ডসের পরে (১৯৭৫, ১৯৭৯, ১৯৮৩-এর ক্রিকেট বিশ্বকাপ) কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে প্রথমবারের জন্য একদিনের আন্তর্জাতিক বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও এই স্টেডিয়ামে ১৯৭৮ এবং ১৯৯৭ সালের মহিলা বিশ্বকাপসহ ১৯৯৬, ২০১১ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা ঘরোয়া ক্রিকেটে রাজ্যস্তরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দুবার (১৯৩৮-৩৯ এবং ১৯৮৯-৯০)। রানার্স হয়েছে সর্বমোট ১৩ বার।

শেষবার ইডেন গার্ডেন্সে বাংলা যে বছর রঞ্জি ট্রফি জয় করে, সে-বছরই ফাইনালে অভিষেক হয় এক তরুণ ক্রিকেটারের। নাম সৌরভ গাঙ্গুলি। পরবর্তী সময় ক্রিকেট দুনিয়ায় 'দাদা' হিসেবে বিখ্যাত সৌরভ গাঙ্গুলির লর্ডসের মাটিতে সেঞ্চুরি দিয়ে শুরুর পরে বিশ্ব ক্রিকেটে নিজেকে অন্যতম সফল অধিনায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের হয়ে তিনিই প্রথম বাঙালি হিসেবে শত টেস্ট খেলার সম্মান অর্জন করেছেন (১১৩টি)। একদিনের ম্যাচ খেলেছেন ৩১১টি। দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ৪৯টি টেস্ট এবং ১৪৬টি একদিনের ম্যাচে। 'প্রিন্স অফ ক্যালকাটা' সৌরভের এই উত্থান ও সাফল্যের পর্ব শুধু কলকাতা শহর নয়, বাংলার ক্রীড়া ইতিহাসে যেন এক অন্য রূপকথায় জন্ম দিয়েছে।

তবে প্রথম বাঙালি ক্রিকেট অধিনায়ক হিসেবে রেকর্ড বুকে নাম রয়েছে আর-এক কিংবদন্তি ক্রিকেটারের। তিনি পঙ্কজ রায়। ১৯৫৯-এ লর্ডসের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হিসেবে টস করতে মাঠে নেমেছিলেন তিনি।[২৬] ১৯৫১-৬০ মধ্যে ভারতের হয়ে মোট ৪৩টি টেস্ট খেলেন তিনি। ভারতের হয়ে বাংলার তরফে তৃতীয় সর্বোচ্চ টেস্ট খেলার সম্মান অর্জন করেছেন ঋদ্ধিমান সাহা। তাঁর খেলা টেস্টের সংখ্যা ৪০। বাংলার হয়ে রঞ্জি খেলা এবং ভারতীয় টেস্ট দলে প্রতিনিধিত্ব করা অন্যান্য খেলোয়াড়ের মধ্যে অন্যতম হলেন দিলীপ দোশি (৩৩), অরুণলাল (১৬)। এছাড়াও বাংলার হয়ে রঞ্জি খেলা ডান হাতি বোলার মহম্মদ শামি ইতিমধ্যে ভারতের হয়ে ইতিমধ্যে ৬৪টি টেস্ট ও ১০১টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে ফেলেছেন।

কলকাতার ইতিহাসে ঔপনিবেশিক আমল থেকে অনেকগুলি পশ্চিমি খেলার সূত্রপাত বা কিছু দেশজ খেলার আধুনিক রূপ দেখা গেলেও একথা অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই যে, ফুটবলের মতো জনপ্রিয়তা কোনও খেলা অর্জন করতে পারেনি।

হিন্দু মেলার মাধ্যমে ফিজিক্যাল কালচার বা শরীরচর্চার সংস্কৃতির সূত্রপাত ঘটলেও হিন্দু মেলায় মূলত কুস্তি প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হত এবং সেখানে বাঙালি কুস্তিগিরদের সঙ্গে মূলত অবাঙালি উত্তর ভারতীয় কুস্তিগিরদের লড়াই হত, যা কোথাও বাঙালির পৌরুষ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খুব একটা কার্যকর ছিল না।[২৭] ঘটনাচক্রে বাঙালি মধ্যবিত্তের সামনে ফুটবল সেই সম্ভাবনার সুযোগ এনে দেয়, যেখানে বাঙালি যুবকদের সরাসরি শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবকাশ তৈরি করে। অবশ্য বিষয়টি খুব একটা সহজ ছিল না, কারণ ফুটবলের নিয়ম সহজ হলেও ফুটবল খেলতে গেলে যে ধরনের নৈপুণ্য

এবং শারীরিক সক্ষমতা প্রয়োজন হয়, বিশেষত গোরা দলগুলির বিরুদ্ধে সে-সব আয়ত্ত করতে যথেষ্ট অনুশীলন ও সময়ের প্রয়োজন ছিল। রাখাল ভট্টাচার্যের *কলকাতার ফুটবল* বইটি পড়লে বোঝা যায় যে, প্রাথমিক পর্বে মূলত কলেজ পড়ুয়ারাই ফুটবল খেলতে শুরু করেছিল নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর নেতৃত্বে।[২৮] নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী প্রতিষ্ঠিত বয়েজ ক্লাবই ছিল এদেশে প্রথম ফুটবল ক্লাব। এই পর্বে সূত্রপাত হয়েছিল বেশ কিছু প্রতিযোগিতামূলক খেলার আসর। ট্রেডস কাপ নামক ওপেন প্রতিযোগিতায় (১৮৮৯ সালে শুরু) ১৮৯০-এর দশকের শুরুতেই ইস্ট সারে রেজিমেন্ট নামে একটি ব্রিটিশ দলকে হারিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছিল শোভাবাজার ক্লাব। এই ক্লাবেরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী। ১৮৯৩ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ফুটবলের একটি সর্বভারতীয় নিয়ামক সংস্থা, যার নাম ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।[২৯] সেই বছরই শুরু হয়েছিল নকআউট প্রতিযোগিতা আইএফএ শিল্ড, যাতে ভারতের সেরা ব্রিটিশ ফুটবল দলগুলি অংশ নিত। স্থানীয় একটি বা দুটি দল শিল্ডে খেলার সুযোগ পেত। ১৯০৬ চন্দননগর স্পোর্টিং প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে প্রাথমিক রাউন্ড পেরিয়ে শেষ পর্বের এক ধাপ আগেই অভিযান শেষ করেছিল। শোভাবাজার প্রথম দিকে সাফল্য না পাওয়ার পরে শেষ পর্যন্ত ১৯০৯ মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব (১৮৮৯ সালে মোহনবাগান স্পোর্টিং ক্লাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত) শিল্ড খেলার সুযোগ পায়। আর তৃতীয় বছরে অর্থাৎ ১৯১১-য় ঘটে যায় সেই যুগান্তকারী ঘটনা। সেন্ট জেভিয়ার্স ও তারপর চারটি মিলিটারি দলকে হারিয়ে আইএফএ শিল্ড জিতে নেয় সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। ২৯ জুলাই ১৯১১, রেফারি পুলারের শেষ বাঁশি বাজার পরে যে বিশাল ভিড় খেলোয়াড়দের কাঁধে নিয়ে স্বতস্ফূর্ত বর্ণাঢ্য মিছিল সহকারে ক্লাবের প্রতিষ্ঠাস্থল মোহনবাগান লেনে পৌঁছে দিয়েছিল, তা এক কথায় ছিল অভূতপূর্ব।[৩০] ঔপনিবেশিক আমলে শাসক মিলিটারি দলের পরাজয়ে এত বড়ো উল্লসিত ভিড় কেউই এর আগে দেখেনি।

সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্বদেশি যুগে এই জয় সমগ্র বাঙালি জাতির আত্মবিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিল। এই জয়ের খবর দেশে দেশান্তরে যেমন পৌঁছে গিয়েছিল, তেমনি গোরা পল্টনদের খেলা হয়ে উঠেছিল বাঙালির।

বাঙালি মধ্যবিত্ত মননে জাতীয়তাবাদের প্রতীক হিসেবে ফুটবল প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯১৬-য় মোহনবাগানকে কলকাতা লিগে রানার্স হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ১৯২০-তে দ্বিতীয় ভারতীয় দল হিসেবে আইএফএ শিল্ড ফাইনালে উঠে

কুমোরটুলি হেরে যায়। ১৯২৩-এ বিতর্কিত শিল্ড ফাইনালে মোহনবাগানও হেরে যায়। ফলে কোথাও যেন একটা শূন্যতা তৈরি হচ্ছিল। ১৯২০-তে কলকাতা ফুটবল লিগে দ্বিতীয় ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন হয়েও কুমোরটুলি প্রথম ডিভিশন খেলার সুযোগ পেল না এক অদ্ভুত নিয়মের কারণে। আইএফএ তখন নিয়ম ছিল কেবলমাত্র দুটি স্থানীয় দল খেলার সুযোগ পাবে। সেই দুটি দল ছিল মোহনবাগান ও এরিয়ান্স। কিন্তু ১৯২৪ সালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সামনে প্রথম ডিভিশন লিগে খেলার সুযোগ এলে ক্লাব কর্তারা মরিয়া চেষ্টা চালান এবং এই কালা কানুন রদ করে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে প্রথম ডিভিশনে খেলার ছাড়পত্র আদায় করে নেন। এই পর্বে মোহনবাগান ও এরিয়ান্সের কর্তাদের তরফে ইস্টবেঙ্গলের দাবির স্বপক্ষে দাঁড়াতে দেখা যায়নি।[৩১] এটাই ছিল মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের বিবাদের আদি কারণ। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দুই ক্লাবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতির জীবনে এক অন্য আমেজ তৈরি করেছে। শতবর্ষ পেরিয়ে (প্রথম দুই দলের দেখা ১৯২১ সালের ৮ আগস্ট কুচবিহার কাপে।)[৩২] দুই দলের বড়ো ম্যাচ আজ কলকাতা ডার্বি হিসেবে পরিচিত। দেশভাগের কারণে ইস্টবেঙ্গলকে কেন্দ্র করে যে ধরনের উন্মাদনা ও সমষ্টিগত আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল নিঃসন্দেহে তা সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাসের নিরিখে আরও বৃহত্তর গবেষণার দাবি রাখে।

এর পাশাপাশি আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, কলকাতা লিগ ও শিল্ডে ইয়োরোপীয় টিমগুলির আধিপত্যের অবসান ঘটিয়েছিল ১৮৯১-এ প্রতিষ্ঠিত মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ১৯৩৪-৩৮ টানা পাঁচ বছর কলকাতা লিগ জয় কিংবা ১৯৪০-৪১-এ ফের কলকাতা লিগ ও প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে ১৯৪১-এ ডুরান্ড কাপ জিতেছিল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, যা ভারত ও কলকাতায় মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব।[৩৩]

মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের দ্বন্দ্ব শুধুমাত্র খেলার মাঠে আটকে থাকেনি, বাঙালির ব্যক্তিজীবনেও প্রবেশ করেছে। বাংলা উপন্যাস, গল্প, সিনেমা এমনকি নাটকে এই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিতা উপজীব্য বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। কলকাতা লিগ রোভার্স ডুরান্ড ছাপিয়ে জাতীয় লিগ, আই-লিগ, এমনকি আইএসএলেও দুই প্রধানের ডার্বি হয়ে ওঠে শহরের আলোচনার বিষয়। সমগ্র উপমহাদেশে দুটি ফুটবল টিমকে নিয়ে এত দীর্ঘস্থায়ী উন্মাদনার নজির আর মেলে না। সর্বভারতীর ফুটবলে ক্ষেত্রে চারটি অলিম্পিকের ভারতীয় দলের অধিনায়ক

ছিলেন কলকাতার খেলোয়াড় ৪৮-এর লন্ডন অলিম্পিকের অধিনায়ক টি আও আদতে নাগাল্যান্ডের মানুষ হলেও খেলতেন কলকাতায়, মোহনবাগান দলে। পরবর্তী অলিম্পিকগুলিতে ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন শৈলেন মান্না, সমর (বদ্রু) ব্যানার্জি ও প্রদীপ ব্যানার্জি। ১৯৫১ ও ১৯৬২-তে এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী ভারতীয় দলের অধিনায়কের আর্ম ব্যান্ড ছিল যথাক্রমে শৈলেন মান্না এবং চুনী গোস্বামীর হাতে। সর্বভারতীয় রাজ্য টুর্নামেন্ট সন্তোষ ট্রফিতে রেকর্ড ৩২ বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজির রয়েছে পশ্চিমবাংলার।[৩৪]

কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ময়দানে বর্তমানে অসংখ্য ক্লাবের টেন্ট রয়েছে, তার মধ্যে বেশকিছু ক্লাব টেন্ট শতবর্ষ পেরিয়ে গেছে। কলকাতা শহরের দুটি ঐতিহ্যশালী কলেজ প্রেসিডেন্সি (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) ও আশুতোষ কলেজের টেন্ট যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেন্ট ও মাঠ যেগুলিতে ফুটবল মরশুম শুরুতে অসংখ্য ফুটবলারকে অনুশীলন করতে এবং ম্যাচ খেলতে দেখা যায়। ময়দানের শেষ প্রান্তে দেখা মেলে ক্যালকাটা রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের তাঁবু। রয়েছে ক্যালকাটা স্পোর্টস জানার্লিস্ট ক্লাবের তাঁবু।

সাম্প্রতিক সময়ে পুরুষ ভারতীয় দলে বাঙালি খেলোয়াড়ের স্বল্পতা নিয়ে শোরগোল উঠেছে বটে। নিঃসন্দেহে বিষয়টির ওপর নজর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তবে এই বিষয়টি আমাদের মাথায় রাখা উচিত গত মরশুমে জাতীয় স্তরের চারটি বড়ো প্রতিযোগিতা আইএসএল শিল্ড লিগ, ডুরান্ড, আই-লিগ এবং সুপার কাপ কলকাতার তিন প্রধানই জয় করতে সমর্থ হয়েছে। কলকাতা লিগে আমরা সাম্প্রতিক সময়ে নতুন দলগুলিকে দেখতে পাচ্ছি, যারা সাফল্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। পিয়ারলেস, ইউনাইডেট স্পোর্টস, ডায়মন্ড হারবার এফসি, সুরুচি সংঘ, কালীঘাট এমএস-এর মতো টিমে বেশ কিছু স্থানীয় প্রতিভাবান ছেলের খেলা আমরা টিভির পর্দায় বা স্টেডিয়ামে দেখতে পাচ্ছি। ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে একদিকে যেমন সন্তোষপুর কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনের খোলনলচে পালটে জাতীয় স্তরের স্টেডিয়াম বানিয়ে ফেলা হয়েছে তেমনি নৈহাটি, দমদম ও ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে কলকাতা লিগের গুরুত্বপূর্ণ খেলা হচ্ছে, যা আগামীদিনে রাজ্যস্তরে ফুটবলের জনপ্রিয়তাকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করবে এই মর্মে আশাবাদী হওয়াই যায়।

পাশাপাশি উল্লেখ করা প্রয়োজন, মহিলা ফুটবলের ক্ষেত্রে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কন্যাশ্রী কাপ নতুন উদ্দীপনা জুগিয়েছে গত এক দশকে। জঙ্গলমহলে

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তরফে স্থানীয় মেয়েদের মধ্যে ফুটবল প্রসার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার সুফল বাবদ কলকাতায় কন্যাশ্রী কাপে ২২টি দলের মধ্যে বেশ ভালো সংখ্যক জেলার আদিবাসী মহিলাকে খেলতে দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন রাজ্য ও জাতীয় পর্যায়ে দাপটের সঙ্গে খেলছেন। কারও কারও জন্য সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় দলের দরজাও খুলেছে। সত্তর-আশির দশকে শান্তি মল্লিক, কুন্তলা ঘোষদস্তিদার, মিনতি রায়দের সময় জাতীয় স্তরে ফুটবলে বাংলার মেয়েদের যে দাপট দেখা যেত, এখন দেখার বিষয় সেই সম্মান বাংলার মেয়েরা কতখানি পুনরুদ্ধার করতে পারে।

কলকাতার ফুটবলের জনপ্রিয়তার প্রশ্নে ১৯১১-র পর থেকে সেই অর্থে খুব বড়ো ধরনের ভাটা পড়েনি। তবে আশির দশকের শুরুতে ইডেনে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ১৬ জন ফুটবলপ্রেমীর মৃত্যু, নেহরু কাপে বিদেশি দলগুলির খেলা দেখে ভারতীয় ফুটবলের মান সম্পর্কে মোহভঙ্গ, টিভিতে বিশ্বকাপ ফুটবল ম্যাচের সরাসরি সম্প্রচার, ডার্বি-সহ গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলি ময়দান থেকে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সরে যাওয়া, ক্রিকেটে সৌরভ গাঙ্গুলির উত্থান ইত্যাদি বিষয়গুলি বাঙালি মননে ফুটবলের ক্ষেত্রে সামান্য হলেও অবিসংবাদিত জনপ্রিয়তায় প্রশ্নচিহ্ন তুলেছিল। কিন্তু ১৯৯৭-এর ১৩ জুলাই ফেডারেশন কাপ সেমিফাইনাল কলকাতা ডার্বিতে লাখো মানুষের স্রোত ফুটবলকে শহরের জনপ্রিয়তম খেলার মর্যাদায় যেন পুনঃপ্রতিষ্ঠা দিয়েছে।[৩৫] ২০১৭ সালে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলের (অনূর্ধ্ব-১৭) গ্রুপ পর্যায়ের, সেমিফাইনাল এবং সর্বোপরি ফাইনাল ম্যাচটি সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত করার ফলে কলকাতাকে আন্তর্জাতিক ফুটবলের মানচিত্রে স্থান করে দেয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনার প্রভূত প্রশংসা করে ফিফা। আইএসএলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা এফএসডিএলের তরফে ২০২৩-২৪ মরশুমের আইএসএলের শিল্ড লিগ এবং আইএসএল কাপের ফাইনাল বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আয়োজিত হয়। মোহনবাগান এবং মুম্বাই সিটি এফসি-র মধ্যে অনুষ্ঠিত উভয় ফাইনালে টিকিট নিয়ে হাহাকার ও দর্শক-ভর্তি মাঠ কলকাতায় ফুটবলের জনপ্রিয়তা আর একবার প্রমাণ করে দেয়।

কলকাতায় খেলাধুলার ইতিহাস ঘাঁটলে একটি বিষয় বোঝা যায় শহরের ইতিহাসের সঙ্গে খেলাধুলার এক অদ্ভুত প্রাণের যোগ রয়েছে। এই যোগসূত্রের কারণেই কলকাতার ক্রীড়া ইতিহাস চর্চা করতে বসলে একদিকে যেমন শহরের ঔপনিবেশিক আমলের নগর জীবনের বিভিন্ন টানাপোড়েন ধরা পড়ে, তেমনি

স্বাধীনত্তোর সময়ের শরণার্থী সমস্যা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত সাফল্য, রাষ্ট্রীয় নীতি, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রাবল্য সবই চলে আসে মাঠ-ময়দানের গল্প প্রসঙ্গে। আশির দশক থেকে বাংলা ও কলকাতা শহরের খেলাধুলার ইতিহাস বিষয়ে অ্যাকাডেমিক গবেষণা শুরু হয়েছে। বর্তমানে এই গবেষণার ধারা অনেকটাই সমৃদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে একাদশ শ্রেণির পাঠক্রমে বাংলার ঐতিহ্যশালী ক্লাব ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে তিনটি বড়ো ক্লাবের লনে স্পোর্টস লাইব্রেরি স্থাপিত হয়েছে। ইতিমধ্যে কলকাতায় সোস্যাল স্পোর্টস ফাউন্ডেশন উদ্যোগে ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিস অফ ইন্ডিয়া ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক ক্রীড়া চলচ্চিত্র উৎসব সফলভাবে আয়োজিত হয়েছে টানা তিন বছর। নিঃসন্দেহে এই উদ্যোগ শহরের ক্রীড়া সংস্কৃতির বিকাশে উল্লেখযোগ্য দিক। তবে এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, ক্রীড়াক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, উপযুক্ত চর্চার অভাবে অতীতের আস্তরণে ঢাকা পড়ে রয়েছে। শহরে পূর্ণাঙ্গ ক্রীড়া গ্রন্থাগার ও আর্কাইভ না থাকায় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হতে চলেছে অনেক প্রামাণ্য নথি।

তথ্যসূত্র:

১. মৃণালিনী সিনহা, কলোনিয়ান ম্যাস্কুলিনিটি: দ্য ‘ম্যানলি ইংলিশম্যান’ অ্যান্ড দ্য ‘এফিমিনেট বেঙ্গলি’ ইন *দ্য লেট নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি*, ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি প্রেস, ম্যানচেস্টার ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৫

২. জে. এ. ম্যাঙ্গান, *দ্য গেমস অফ এথিক অ্যান্ড ইম্পিরিয়ালিজম: আসপেক্টস অফ দ্য ডিফিউশন অফ অ্যান আইডেল*, ফ্রাঙ্ক ক্যাস পাবলিশার্স হার্টনল্ডসওর্থ, ১৯৮৬

৩. অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ ক্যালকাটা র‍্যাকেট ক্লাব, ২০১০

৪. সুজয় গুপ্ত, *সেভেনটিন নাইন্টি টু: এ হিস্ট্রি অফ দ্য ক্যালকাটা ক্রিকেট এন্ড ফুটবল ক্লাব*, সি সি অ্যান্ড এফ সি, কলকাতা, ২০০২

৫. তদেব

৬. টনি কলিংস, *এ সোশ্যাল হিস্ট্রি অফ ইংলিশ রাগবি ইউনিয়ন*, রাউটলেজ, লন্ডন, ২০০৯

৭. সুস্মিতা দাস, *বাংলায় ঔপনিবেশিক ও উত্তর ঔপনিবেশিককালে অজনপ্রিয় খেলাগুলির বিবর্তনের ইতিহাস (১৮৬০-এর দশক থেকে ১৯৬০-এর দশক)*, অপ্রকাশিত এম ফিল সন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ডায়মন্ড হারবার উইমেন’স ইউনিভার্সিটি, ২০২৪

৮. অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ রয়াল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব ২০০০

৯. দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষে ক্যালকাটা পোলো ক্লাবের তরফে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ, কলকাতা, ১৯৮৭-৮৮

১০. তদেব

১১. সুস্মিতা দাস, তদেব

১২. জয়ন্ত চক্রবর্তী, গলফ, কলকাতার গলফ, দ্রষ্টব্য যুগান্তর সাময়িকী, ১০ এপ্রিল, ১৯৭৭

১৩. www.olympics.com (দেখা হয়েছে ০৫.০৭.২০২৪)

১৪. শুভ্রাংশু রায়, ১৫ আগস্ট, ১৯২০ বাঙালির প্রথম অলিম্পিকে অংশগ্রহণ এবং মোহনবাগান দ্রষ্টব্য *স্মৃতি সত্তায় মোহনবাগান* (সম্পাদনা শান্তনু চক্রবর্তী ও শুভ্রাংশু রায়) উর্বি প্রকাশন, কলকাতা, ২০২৪

১৫. যুগান্তর, ২৩ জুন ১৯৪৮

১৬. সৌম্য দাশগুপ্ত, অ্যান ইনহ্যারিটেন্স ফ্রম ব্রিটিশ; দ্য ইন্ডিয়ান বক্সিং স্টোরি, দ্রষ্টব্য '*স্পোর্টস ইন সাউথ এশিয়ান স্টাডিস, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ দ্য হিস্ট্রি অফ স্পোর্টস*, ভলুম ২১, নম্বর ৩/৪, লন্ডন, জুন-সেপ্টেম্বর ২০০৪

১৭. যুগান্তর ১২ মার্চ, ১৯৫১

১৮. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৬৬

১৯. যুগান্তর, ১২ জুলাই, ১৯৫২

২০. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭০

২১. দ্য স্টেটসম্যান, ২৯ নভেম্বর ১৯৮২

২২. নির্মলকুমার সাহা, *ক্রীড়াঙ্গনে বিস্মৃত তারকাদের গল্প*, উত্তরণ পাবলিশার্স, ডায়মন্ড হারবার, ২০২১

২৩. এস কে গাঙ্গুলি, অল ইন্ডিয়া বেটন কাপ (১৮৯৫...) দ্রষ্টব্য *১০০ ইয়ার্স অফ অল ইন্ডিয়া বেটন কাপ* (বেটন কাপের শতবর্ষ উপলক্ষে বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশন তরফে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ), কলকাতা, ১৯৯৫

২৪. www.hockeybengal.org/beightoncup (দেখা হয়েছে ০৮.০৭.২০২৪)

২৫. ১৯৭৭ চ্যাম্পিয়ন বাংলা দলের খেলোয়াড় ও পরে রেলের হয়ে জাতীয় স্তরে প্রতিনিধিত্বকারী দীপ্তিকণা মল্লিকের (বসু) সঙ্গে সাক্ষাৎকার, কল্যাণী, ১৮.০৭.২০২৪

২৬. গৌতম ভট্টাচার্য, *পঙ্কজ: বঙ্গ ক্রিকেটের বিস্মৃত মহানায়ক*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০২০

২৭. যোগেশচন্দ্র বাগল, শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, *হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত*, তালপাতা, কলকাতা, ২০০৯

২৮. শিবরাম কুমার সম্পাদিত *আরবির কলকাতা ফুটবল*, প্রভাবতী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০২

২৯. কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয় ফুটবলের জনক; উপনিবেশিক বাংলায় খেলা, সংস্কৃতি ও আধুনিকতা, দ্রষ্টব্য *খেলা যখন ইতিহাস-সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি*, সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৯

৩০. পরেশ নন্দী, *মোহনবাগান* ১৯১১, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৬

৩১. রূপক সাহার সাক্ষাৎকার, কলকাতা, ১২.০৭.২০২৪

৩২. দ্য স্টেটসম্যান, ৯ আগস্ট, ১৯২১

৩৩. সৌমেন মিত্র, *কলোনিয়াল কলকাতার ফুটবল: স্বরূপের সন্ধানে*, কলকাতা: দাশগুপ্ত কোং, ২০১৮

৩৪. www.sportstar.the hindu.com (দেখা হয়েছে ১৫.০৭.২০২৪)

৩৫. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ জুলাই, ১৯৯৭

কলকাতার বিনোদন

পিনাকী রায়

১

ইংরেজির 'এন্টারটেইনমেন্ট' কথাটি এসেছে লাতিন থেকে ফরাসি হয়ে (McDonald, 1999, p. 127)। ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে তা ইংরেজি ভাষাতে ব্যবহার করা হচ্ছে (Burchfield, 1971, p. 213-14)। 'বিনোদন' শব্দটি বাংলায় মধ্যযুগ থেকে চলে আসছে। ফলে বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে বিনোদন ব্যাপারটা যে একেবারে আনকোরা নতুন কিছু, তা কিন্তু একেবারেই নয়! ইতিহাস বলছে যূথবদ্ধ মানুষের দল সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে যখনই কোথাও একত্রিত হয়েছে, সেখানেই বিনোদনের আয়োজন বা প্রয়োজন দেখা দিয়েছে (Kassing, 2013, p. 22)। বিনোদন মানুষের সংস্কৃতির প্রবহমানতার ধারক বা বাহক।

বাংলার বিনোদন জগতে কলকাতার একটি বিশিষ্ট জায়গা তৈরি হয়েছে এই শহরের শুরুর সময় থেকেই। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হিসাবে বাংলার সাংস্কৃতিক ভরকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল কলকাতা। ফলে কলকাতা যে সারা ভারতের বিনোদন জগতের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ 'প্যারাডাইম' হিসেবে গণ্য হবে, সেটা বলাই বাহুল্য।

আজকের ডিজিটাল পৃথিবীতে যদি কলকাতার বিনোদনের একটা চালচিত্র আমরা দেখে নিতে চাই, তার জন্য বিশেষ কষ্ট করতে হবে না। মোবাইল বা কম্পিউটারের একটা বা দুটো বোতাম চাপাই যথেষ্ট। কী নেই এই কলকাতায়! বন্ধ হতে বসা সিনেমা হলের পাশাপাশি অসংখ্য মাল্টিপ্লেক্স, বিনোদন পার্ক

থেকে আধুনিক সভ্যতার যতরকম আয়োজন তার সবই এই শহরের যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই অনন্য মহানগরীর ৩৩৪ বছরের ইতিহাসে বিভিন্ন রকম বিনোদন কেন্দ্র স্থাপনের প্রচুর উদাহরণ আছে। এমনকি এও শোনা যায় যে, বর্ধমান জেলার আউশগ্রামের কাছে সেই বিখ্যাত ভালকিমাচানে ভালুক-শিকারের অভিজ্ঞতা থেকে দক্ষিণবঙ্গের জনাকয়েক শাসক কিছু সময়ের জন্য কলকাতাতে 'বিয়ার বেইটিং'-এর মতো 'এন্টারটেইনমেন্ট'-এর পেছনেও দৌড়েছিলেন (ঘোষ, ২০২০)। দ্বাদশ শতাব্দীর বিলেতে শ্বেতাঙ্গদের চালু করা যে কুখ্যাত খেলার কথা সাহিত্যপ্রেমীরা উইলিয়াম শেক্সপিয়রের *দ্য মেরি ওয়াইভস অফ উইন্ডসর* (১৬০২) এবং *ম্যাকবেথ* (১৬০৬) নাটকগুলিতে খুঁজে পেতে পারেন, তার কিছু এখানেও ছিল।

নাচ-গান-আবৃত্তি-সাহিত্য চর্চা-নাটক-চলচ্চিত্র-খেলাধুলা-বাদ্যযন্ত্র-খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতিসহ আরও নানান সংস্কৃতির শিল্প-চেতনায়-সমৃদ্ধ মানুষের অংশগ্রহণে ঋদ্ধ হয়েছে এই তিলোত্তমা, সেরকম ভারতবর্ষের আর কোনও মহানগরী হয়েছে কিনা, তা অনুসন্ধানসাপেক্ষ! কলকাতার বিনোদন জগৎকে ঘিরে রয়েছে হাজার-হাজার মানুষের আবেগ আর ভালোবাসা! সেখানে হয়তো পেশাদারিত্বের চাইতে আবেগের আতিশয্য অনেক বেশি গুরুত্ব পায়। ১৯৭৬ সালে লেখা সত্যজিৎ রায়ের বোম্বাইয়ের বোম্বেটে-তে লালমোহন গাঙ্গুলী ফেলুদাকে বলছেন, 'মানি' হলো গিয়ে বম্বেতে, আর 'মান' হলো কলকাতায়!" ঠিক এই কথাটিই কিন্তু কলকাতার বিনোদন জগতের সমর্থক/ দর্শক/ শ্রোতাদের স্বভাব-চরিত্র বোঝার জন্য একদম 'পারফেক্ট' উদাহরণ! কোনও কিছু পাওয়া যাবে না জেনেও, প্রবল শীতের রাতে ছোটো-ট্রাক ভাড়া করে নিজের প্রিয় দলকে খেলার মাঠে সমর্থন করার জন্য পতাকা নাড়তে নাড়তে যাওয়ার পাগলামি, বা রাত-জেগে 'নন্দন'-এর টিকিট-লাইনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা, 'ভালো' নাটক দেখতে প্রচুর টাকায় 'ব্ল্যাক' হওয়া টিকিট নির্দ্বিধায় কেনা, সৌরভ গাঙ্গুলিকে মুম্বাইতে অপমান করা হলে প্রচণ্ড গরমে ধর্মতলায় বিশাল প্রতিবাদ-মিছিল বের করা, বইমেলায় গিয়ে অনায়াসে নিজের মাস-খরচের পুরো টাকায় বই কিনে ফেলা, প্রিয় গায়কের গান শোনার জন্যে ভয়ংকর ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে ছাতা-মাথায় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা, আবার কলেজ স্ট্রিটে গেলে নিজের শত ব্যস্ততার মধ্যেও 'কফি হাউস'-এ একবার ঘুরে আসা— এ সবই কলকাতার বিনোদনের চরিত্র! এই শহরের বিনোদন বরাবরই একটি অন্য মাত্রার! এটা এতটাই বিচিত্র এবং বিস্তৃত যে তা গবেষণার বিষয় হয়ে উঠতেই পারে!

'বিনোদন' শব্দটির একটি (তথাকথিত) না-বাচক অর্থের ওপর আলোকপাত করে এই পর্যালোচনাটি শুরু করা যেতে পারে। আমরা, সাধারণ মানুষেরা, মনোরঞ্জন 'গ্রহণ' করতে উন্মুখ! অথচ, আমরা ভুলে যাই যে, আমাদের 'এন্টারটেইনমেন্ট'-এর জন্য যাঁরা নিজেদের 'উৎসর্গ' করে দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অনেককেই এই বিনোদনের জগতকে নিতান্তই পেটের টানে বেছে নিতে হয়েছে! কল্লোলিনীর গভীরে থাকা 'কোঠাবাড়ি'গুলির বাসিন্দারা জনসাধারণের কাছে নিছকই 'বিনোদনের ভোগ্যপণ্য'! কলকাতার ঝাঁ-চকচকে বহু তারকাচিহ্নিত হোটেলগুলির 'সফিস্টিকেটেড এসকর্ট গার্লস' ছাড়াও মহানগরীর 'নিষিদ্ধ' বিনোদনের জগৎ জুড়ে রয়েছেন সোনাগাছির ১৬,০০০ যৌনকর্মী, যাঁরা প্রতি রাতে বহু মানুষের 'এন্টারটেনমেন্ট'-এর ব্যবস্থা করে থাকেন (Chakraborty, ২০২০)। আধুনিক কলকাতায় 'এন্টারটেইনমেন্ট' পূর্ণাঙ্গভাবে 'ইনস্টিটিউশনালাইজড' হওয়ার বহুদিন আগে থেকেই এই ধরনের তথাকথিত 'নিষিদ্ধ' বিনোদন কেন্দ্রগুলো সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ইংরেজদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের সময় প্রায় ২৫০ বছর আগে উচ্চবিত্ত এবং শিক্ষিত বাঙালি সমাজের একটি অংশ 'বাবু-সংস্কৃতি'-তে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। সেই 'বাবু-সংস্কৃতি'-র একটি অভিন্ন অংশ ছিলেন গণিকা-রক্ষিতা-বাইজিরা। 'বিনোদন'-এর নামে উচ্চবিত্ত 'বাবু'-দের লাম্পট্যের কথা মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, শিবনাথ শাস্ত্রীরা বিভিন্ন লেখায় ধরে রেখেছেন। কিশলয় জানার মতে বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্রে এই 'বাবু'-দের সংস্পর্শে এসে ১৭৭৫ সাল নাগাদ ইংরেজরা কলকাতায় রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করতে উদ্যোগী হন (জানা, ২০২১, পৃ. ৪৮)।

গবেষক McLean, Hurd এবং Anderson-এর মতে বিশ্বে যত ধরনের বিনোদন আছে, তার মধ্যে যৌনতা-কেন্দ্রিক বিনোদন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে সেই আদিকাল থেকেই (McLean, Hurd, and Anderson, 2017, p. 251)। ভারতবর্ষে পাকাপাকিভাবে ঘাঁটি গাড়ার পরে ইংরেজরা এই 'যৌনতা-কেন্দ্রিক বিনোদন'-কে নিজেদের শাসন ব্যবস্থাকে মজবুত করতে ব্যবহার শুরু করেন। খিদিরপুর বন্দরে আগত ইংরেজ নাবিকদের মনোরঞ্জনের জন্য উত্তর কলকাতার জানবাজারে প্রথম একটি বড়ো গণিকালয় গড়ে উঠেছিল। মৃণালিনী সিংহ উল্লেখ করেছেন যে, পরবর্তী সময়ে এই গণিকা এবং বাইজি গমনের মাধ্যমে ইংরেজ শাসকরা শিক্ষিত এবং ধনী ভারতীয়দের সামনে নিজেদের 'অজেয় অতি-পুরুষ' হিসেবে তুলে ধরতে শুরু করেন (Sinha,

1995, p. 2-3)। ইতিহাসবিদদের মতে, চিৎপুরের কাছে যে বড়ো গণিকালয় ছিল, তার মালিক ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর (Bhattacharya, 2008, p. 276)। তাঁর এবং আরও নানান প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রশ্রয়ে পুরোনো কলকাতার 'নিষিদ্ধ বিনোদন' একটি নতুন মাত্রা পেয়েছিল। উনিশ শতকের বিভিন্ন লেখা থেকে জানা যায় যে, এই গণিকাপল্লিগুলিতে সমাজের উচ্চবিত্ত এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়মিত যাতায়াত ছিল।

বিনোদনের সঙ্গে 'স্টারডম' কিন্তু অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত! নায়ক-নায়িকার উপস্থিতি এই জগতের একটি অন্যতম 'ফেনোমেনন'। তাই, পুরাতন কলকাতার বিনোদন জগতের যিনি 'স্টার', তাঁর কথা অবশ্যই উল্লেখ্য। তিনি লক্ষ্ণৌয়ের নবাব মির্জা ওয়াজিদ আলি শাহ (১৮২২-৮৭)। কলকাতার বিনোদন জগতে আমূল পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে এই নবাব একটি নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন। ইংরেজের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ১৮৫৬ সালে মেটিয়াব্রুজের গার্ডেনরিচে চলে আসেন নবাব। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তৎকালীন কলকাতার সাংস্কৃতিক এবং বিনোদন জগতে একটি চিরস্মরণীয় নাম হয়ে ওঠেন! খাদ্যের মধ্যে 'বিরিয়ানি' এবং আরও নানান মোঘল-ঘরানার খাবারকে তিনি জনপ্রিয় করে তোলেন। নবাব 'কত্থক' নৃত্যকলাকে এই বঙ্গে চিরস্থায়ীভাবে নিয়ে আসেন। 'জনপ্রিয় গান' হিসেবে তিনি 'গজল' এবং 'ঠুমরি'-র প্রচলন করেন। পাশাপাশি, কলকাতায় 'হিন্দুস্তানি থিয়েটারের জনক' হিসেবে তাঁকে অভিহিত করলেও খুব একটা ভুল হবে না! এর পাশাপাশি প্রচুর সাহিত্যকর্ম তিনি সৃষ্টি করে গিয়েছেন। সত্যজিৎ রায় (১৯২১-৯২) তাঁর 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি'-তে (১৯৭৭) কলকাতার-বিনোদন-জগতের অবিসংবাদী এই 'তারকা' নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের ব্যক্তিত্বকে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ওয়াজেদ আলির হাত ধরে কলকাতার বিনোদন জগতে হঠাৎই প্রবেশ করেন বাইজিরা। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রে এই বাইজি সংস্কৃতি অনেকদিন ধরেই জনপ্রিয় ছিল। নবাবের আমন্ত্রণে লক্ষ্ণৌ থেকে অনেক বিখ্যাত বাইজি পুরোনো কলকাতায় পাড়ি দেন। মোঘল ঘরানার (?) নৃত্য-গীত পরিবেশনের মাধ্যমে তাঁরা সে সময়ের কলকাতার বিনোদন জগৎকে অনেকটাই বদলে দিয়েছিলেন। পরিচিত দেহোপজীবিনীদের 'কোঠা'-য় যাওয়া 'নিষিদ্ধ বিনোদন' হিসেবে গণ্য করা হলেও, বাইজি বাড়িতে যাওয়াটা কলকাতায় কিন্তু সচরাচর 'নিষিদ্ধ' হিসেবে ধরা হত না। ১৯১৭ সালে প্রকাশিত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *দেবদাস* উপন্যাসে উনিশ শতকের কলকাতার বিনোদন জগতে

বাইজিদের বিশেষ গুরুত্বের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা আছে। অন্যদিকে, ২০২২ সালে প্রকাশিত ব্রাত্য বসুর *অদামৃতকথা*-তে আমরা পাই পুরোনো কলকাতার সম্ভ্রান্ত সমাজে বিভিন্ন নাটকের মহিলা কুশীলবদের রক্ষিতা করে রাখার প্রথার কথা। সেটাও এক ধরনের 'এন্টারইটেনমেন্ট'-ই ছিল তবে তা ধনী মানুষদের ক্ষেত্রে!

ইতিহাসবিদদের মতে, পুরোনো কলকাতায় পুতুলনাচের জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। ৪,০০০ বছর আগে ভারতবর্ষের উত্তরদিকে শুরু হওয়া পুতুলনাচের কথা খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে শোনা যায় তামিল সাহিত্যকর্ম *শিলাপ্পাদিকরম্*-এর পাতায় (Puppet Forms- C.C.R.T.– 2024)। পরবর্তী সময়ে তা ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব এবং উত্তরপূর্ব ভারতে। তিলোত্তমা মহানগরীর গোড়াপত্তনের সময় থেকেই কোনও না কোনও ধরনের পুতুলনাচ বিনোদনের উপাদান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পুতুলনাচের মাধ্যমে পুতুলনাচ আয়োজকরা নিজেদের জীবন এবং সমাজ দর্শনের বার্তা উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেন। বাংলা তথা কলকাতায় পুতুলনাচের ক্ষেত্রে মূলত তিন ধরনের পুতুল দেখা যেত/যায়: 'বেনি পুতুল' (যার প্রচলন হয়েছে ১০০ বছর আগে), 'ডাং পুতুল' (চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রথম শুরু হয়) এবং 'সুতোর পুতুল' (যার ব্যবহার প্রায় ১০০ বছর আগে রাজস্থানে প্রথম শুরু হয়) (মজুমদার, ২০১৯)। বিভিন্ন পৌরাণিক (যেমন *রামায়ণ* এবং *মহাভারত*-এর বিভিন্ন অংশ), সামাজিক (মূলত কৃষিভিত্তিক) এবং পারিবারিক বার্তা এই পুতুলনাচগুলি বহন করে চলে। এছাড়াও দেখানো হয় সহস্র-এক আরব্য রজনী বা গ্রাম-বাংলার কল্পনাশ্রিত গল্পের ওপর তৈরি করা পালা। একুশ শতকেও কলকাতায় পুতুলখেলা দেখানোর প্রথা বন্ধ হয়ে যায়নি। 'ধূমকেতু পাপেট-থিয়েটার' (ট্যাংরা), 'ডলস থিয়েটার' (সেলিমপুর), 'বঙ্গ-পুতুল পাপেট প্যাশন' (বারুইপুর), 'বিদিশা পাপেট- থিয়েটার' (সল্টলেক), এবং 'পাপেট শো' (গঙ্গানগর)-এর মতো কিছু সংস্থা এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পেশাদারিত্বের সঙ্গে পুতুলনাচ শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রাখতে। বিভিন্ন পেশার মানুষেরা— যাঁরা 'পারফরমেন্স' দেখতে সচরাচর থিয়েটার হাউজে যান না তাঁরা পুতুলনাচের দর্শক। 'অবৈধ সম্পর্ক', 'লাইলা মজনু', 'কলিকালের ছাত্র', 'রূপবান কন্যা', বা 'হাস্য-কৌতুক' এই ধরনের পুতুলনাচের বিভিন্ন 'এপিসোডস' তাঁদেরকে দ্রুত-বদলে-যাওয়া-সমাজকে নিয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। তবে, কালের ক্ষয়িষ্ণুতার শিকার হয়ে কলকাতার পুতুল নাচ শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ 'টার্ফ অফ পারফরম্যান্স' হয়ে দাঁড়িয়েছে উচ্চবিত্ত-

মানুষদের জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকীর অনুষ্ঠানগুলি! এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড এলাকায় ১৯৮৪ সালে 'ইন্ডিয়ান পাপেট থিয়েটার' চালু করা হয়েছিল। বলা যেতে পারে যে, কলকাতায় আনুষ্ঠানিকভাবে পুতুলনাচ প্রদর্শনের জন্যে বর্তমানে এই একটিই 'রঙ্গমঞ্চ' রয়ে গেছে!

পুতুলনাচের মতোই পুরোনো কলকাতার বিনোদন জগতের আর-একটি অংশ অধিকার করেছিল (এবং এখনও রয়েছে) যাত্রা। নাটক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, 'প্রাচীন' পৌরাণিক যাত্রাপালার রীতি থেকে সরে এসে উনিশ শতকের মাঝামাঝি—আনুমানিক ১৮৪০ সালে কলকাতায় ধর্মনিরপেক্ষ 'নতুন' যাত্রা শুরু হয় (Varadapande, 1992, p. 198)। সেই অপেশাদারি স্তরে মঞ্চস্থ করা ধর্মনিরপেক্ষ যাত্রার কুশীলবরা মূলত উচ্চবিত্ত পরিবারের সদস্য হলেও, যাত্রাপালাগুলির দর্শক ছিলেন সাধারণ মানুষ। কলকাতার মানুষ যাত্রার প্রতি ক্রমশ আগ্রহ হারিয়ে ফেলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় যাত্রা উৎসব পালন করা শুরু করে। রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় কলকাতার মানুষ যাত্রাকে বিনোদনের এক মাধ্যম হিসেবে আবার বেছে নিতে পেরেছেন। 'জীবন এক জলসাঘর', 'বদলা নিতে বৌ হয়েছি', 'খুকু আজও বাড়ি ফেরেনি', 'আসামী স্বামীর রংবাজ বৌ', 'লাঠি হাতে নতুন বৌ', বা 'মরণের সাথে সিঁদুর খেলা', ইত্যাদি যাত্রাপালাগুলি মানুষকে সামাজিক অবক্ষয় থেকে সাবধান করার দায়িত্ব পালন করে থাকে। আগের দিনের মতো 'অপেরা কোম্পানি'-গুলোর জৌলুশ আর নেই; নেই স্বাধীনতা-পূর্ব কলকাতার মাটিতে বিপ্লবীদের যাত্রাপালার আয়োজন করে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার কোনও প্রয়োজনীয়তা; কিন্তু এখনও বিনোদনের উপাদান হিসেবে যাত্রা যে কলকাতায় রয়ে গিয়েছে, সেটাই একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।

মঞ্চের পাশাপাশি খেলার মাঠও আজকের কলকাতার বিনোদনপ্রেমী মানুষদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাঠকেন্দ্রিক বিনোদনের একটি উপাদান হল 'ঘোড়দৌড়'। যদিও ঘোড়দৌড় যে আপামর কলকাতাবাসীর কাছে বিনোদনের প্রিয় একটি মাধ্যম তা নয়। কলকাতার সাধারণ মানুষেরা যদি পছন্দ করে থাকেন ফুটবলকে—১৩৫ বছরের যুবক (অধুনা) 'মোহনবাগান-সুপার জায়েন্ট' ক্লাব, ১৩৩ বছরের 'মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব', বা ১০৩ বছরের 'ইস্ট বেঙ্গল ফুটবল ক্লাব'-কে—তবে মহানগরীর আর্থিকভাবে সংগতিপন্ন মানুষরা অনেকেই পছন্দ করেন ঘোড়দৌড়ের 'টার্ফ'। ১৮৪৭ সালে স্থাপিত 'রয়্যাল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব'-এর তত্ত্বাবধানে নিয়মিত পরিচালিত হয় বিভিন্ন 'হর্স-রেসিং ইভেন্ট';

লক্ষ-লক্ষ টাকার বাজিও ধরা হয়। মূলত হেস্টিংসে অবস্থিত 'কলকাতা রেস কোর্স'-এর মাঠে এই ঘোড়দৌড়ের আয়োজন করা হয়। কলকাতার ঘোড়দৌড় বিনোদনের অঙ্গ হিসেবে এতটাই জনপ্রিয় যে, বিভিন্ন 'বলিউড' এবং 'টলিউড'-এর ছায়াছবিতে এটা দেখানো হয়ে থাকে। ইংরেজরা নিজেদের বিনোদনের জন্য এই ঘোড়দৌড় চালু করেছিল, যেহেতু তাদের সেনাদলের সিংহভাগটাই অশ্বারোহী ছিল। পরবর্তী সময়ে তা দ্রুত ভারতীয়দের মধ্যে একটি 'প্রাতিষ্ঠানিক বিনোদন'-এর জায়গা লাভ করে। রেসের মাঠে জুয়াখেলা পছন্দ করতেন না বলে বাংলার পঞ্চম গভর্নর-জেনারেল রিচার্ড ওয়েলেসলি ১৭৯৮ থেকে ১৮০৩ পর্যন্ত ঘোড়দৌড়ের বিনোদন বন্ধ করে দেন। কয়েক বছর পরে তা আবার চালু হয়। ইংরেজরা মনে করত যে 'হর্স রেসিং'-এর পাশাপাশি 'পোলো' খেলাটিও 'নর্ডিক' 'শ্বেতাঙ্গ সংস্কৃতি'-র একটি প্রতীক (লিখিত ইতিহাস অবশ্য বলে যে, আজ থেকে প্রায় ৮,০০০ বছর আগে ইরানিরা মধ্যপ্রাচ্যে 'পোলো' খেলা চালু করেছিল)। তাই, ১৮৮০-র দশক থেকে 'কলকাতা রেস কোর্স'-এর মাঠে বারবার 'পোলো' খেলার আয়োজন করা হত। ১৮৬২ সালে স্থাপিত 'ক্যালকাটা পোলো ক্লাব' এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচাইতে পুরোনো পোলো ক্লাব হিসেবে তকমা পেয়েছে। সেই ক্লাবের নিজস্ব ময়দানে তিরন্দাজরাও অনুশীলন করতে পারেন।

কলকাতার 'ক্রীড়া বিনোদন'-এর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সাঁতার। উত্তর, দক্ষিণ এবং মধ্য কলকাতায় সাঁতার শেখার ক্লাবের বা সুইমিং পুলের কোনও অভাব নেই। এছাড়াও, ক্রীড়া-বিনোদনপ্রেমী 'অ্যামেচার রাইফেল শুটার'-দের অনুশীলনের জন্য রয়েছে 'নর্থ ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাব', 'সাউথ ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাব', 'বেলেঘাটা রাইফেল ক্লাব' (বেলেঘাটা), 'জয়দীপ কর্মকার শুটিং একাডেমি', 'প্রো-স্পোর্টস শুটিং একাডেমি', 'টেনেক্স শুটিং ইনস্টিটিউট', 'মহর্ষি দধীচি শুটিং একাডেমি' ইত্যাদি। কলকাতার 'শুটার'-রা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়ও উল্লেখযোগ্য ফল করেছেন।

কলকাতায় বিনোদনের আর একটি জায়গা জুড়ে রয়েছে গল্ফ। টালিগঞ্জের 'রয়্যাল ক্যালকাটা গল্ফ ক্লাব' স্থাপিত হয়েছিল ১৮২৯ সালে। এটি আজও সক্রিয়। 'ফোর্ট উইলিয়াম গল্ফ কোর্স', লর্ড সিনহা রোড-সংলগ্ন 'ক্যালকাটা লেডিজ গল্ফ ক্লাব' এবং রিজেন্ট পার্কের 'প্রো-টাচ্ গল্ফ একাডেমি' গল্ফপ্রেমীদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। সমগ্র কলকাতা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে দাবা খেলোয়াড়দের

জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। তেমনই ‘জয়দীপ মুখার্জি টেনিস একাডেমি’ থেকে শুরু করে ‘মহেশ ভূপতি টেনিস একাডেমি’, এবং আরও নানান ‘টেনিস-একাডেমি’ রয়েছে টেনিস খেলোয়াড়দের জন্যে। ব্যাডমিন্টন খেলার প্রশিক্ষণের জন্য মহানগরীতে রয়েছে নানান সুবিধে।

তবে, এটা উল্লেখ করতেই হয় যে, ক্রীড়া বিনোদন জনপ্রিয়তার নিরিখে কলকাতার অন্য কোনও খেলার ফুটবল এবং ক্রিকেটকে অতিক্রম করা কঠিন! কলকাতার ফুটবল ইতিহাসের হিসেব অনুযায়ী ১৪৭ বছর পুরোনো; ক্রিকেট ২৩২ বছর! কলকাতা মহানগরী জুড়ে অনেক সুপরিচিত ক্রীড়াঙ্গন রয়েছে। ৬৮,০০০-দর্শকাসন যুক্ত ‘ইডেন গার্ডেন্‌স’ থেকে শুরু করে ‘সল্টলেক স্টেডিয়াম’, ‘গীতাঞ্জলি স্পোর্টস কমপ্লেক্স’, ময়দান, ‘কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন’, ‘রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম’, ‘নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ইনডোর স্টেডিয়াম’, ‘মোহনবাগান স্টেডিয়াম’ এবং ‘ইস্ট বেঙ্গল গ্রাউন্ড’-এ নিয়মিত আন্তর্জাতিক এবং জাতীয়-স্তরে ক্রিকেট এবং ফুটবল খেলা হয়ে থাকে। তাছাড়া সুপরিচিত মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল দ্বৈরথ তো রয়েইছে! এই একবিংশ শতাব্দীতে তার জৌলুস বিন্দুমাত্রও কমেনি। আগেই বলেছি, এখনও খেলার দিনগুলিতে, দুপুর হোক বা রাত, গ্রীষ্ম হোক বা বর্ষাকাল, নিজেদের প্রিয় দলকে সমর্থন করতে এবং উৎসাহ জোগাতে ছোটো-ছোটো ট্রাক ভাড়া করে, দলীয় পতাকা উড়িয়ে গর্জন করতে করতে স্টেডিয়ামে হাজির হয়ে যান হাজার, হাজার মানুষ! এছাড়াও, উত্তর কলকাতার বিভিন্ন অলিগলিতে ‘পাড়ার ক্রিকেট’ খেলার যে প্রচলন রয়েছে, ভবিষ্যতের জন্যে ভালো ক্রিকেটার তৈরির ক্ষেত্রে তার ভূমিকাও যথেষ্ট।

সময়ের সঙ্গে পাল্টে গিয়েছে ‘কলকাতার বিনোদন’-এর সংজ্ঞা! আসলে ‘বিনোদন’-এর মতো একটি ‘আমব্রেলা টার্ম’-কে ক্ষুদ্র পরিসরে আটকে রাখাই মুস্কিল। একুশ শতকে ‘বিনোদন’ একটা বিরাট ব্যাপার: কোটি কোটি টাকা নিয়মিত খরচ করা হচ্ছে ‘এন্টারটেইনমেন্ট’-এর পেছনে। এর ফল হিসেবে, কলকাতার বিনোদনের জগতে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে বিভিন্ন ‘পার্ক’ এবং ‘অ্যামিউজমেন্ট পার্ক’। সাধারণ পার্কে শহরে জীবনযাপনে দীর্ণ মানুষ হাঁটতে যান, ব্যায়াম করেন, এবং একটু বুকভরে নিঃশ্বাস নিয়ে থাকেন। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের হিসেব অনুযায়ী মহানগরীতে এই মুহূর্তে ৫০ একরের অধিক জমি নিয়ে গঠিত ‘লার্জ আর্বান-পার্ক’-এর সংখ্যা ৬টি; ‘মিউনিসিপ্যাল পার্ক’ এবং ‘স্মল আর্বান-পার্ক’ ৭টি। তার মধ্যে রয়েছে

১৮৬০-এর দশকে (মূলত ইংরেজ সেনাদের কুচকাওয়াজের জন্য চালু করা মধ্য কলকাতার) 'ময়দান', নিউ টাউনের ইকো পার্ক, ঢাকুরিয়ার রবীন্দ্র সরোবর, সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্ক, মধ্য কলকাতার মোহরকুঞ্জ, উত্তর কলকাতার মিলেনিয়াম পার্ক, দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্ক, ইত্যাদি। রয়েছে শিবপুরে অবস্থিত ২৩৭ বছরের পুরনো 'আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ইন্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন' এবং আলিপুরের 'জুলজিক্যাল গার্ডেন', ১৮৭৩ সালে তৎকালীন বোম্বাই মহানগরীর গভর্নর রিচার্ড টেম্পল যেটা স্থাপন করার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেপ্টেম্বর ১৮৭৫-এ এই চিড়িয়াখানা চালু হয়। নিউ টাউনে হরিণালয় মিনি-জু-ও রয়েছে।

এছাড়াও, মহানগরীর বিখ্যাত অ্যামিউজমেন্ট পার্কগুলির মধ্যে আছে নিক্কো পার্ক (বিধাননগর), নলবন ওয়াটার পার্ক (বিধাননগর), অ্যাকুয়াটিকা (রাজারহাট), সায়েন্স সিটি (তপসিয়া), এবং স্নো পার্ক (নিউ টাউন)। কলকাতার বিনোদনের উপাদান হিসেবে এই 'পার্ক'গুলির নাম অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন।

তবে, কলকাতার মানুষ ক্লান্তি দূর করতে আরও একটি জায়গায় যান: এপ্রিল ১৮৭৬-এ তৈরি হওয়া বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিটের 'ইন্ডিয়ান কফি হাউস'। কত অসংখ্য বাঙালি বুদ্ধিজীবী যে বছরের পর বছর এখানে এসেছেন, তার কোনও হিসেব নেই! প্রবোধচন্দ্র 'মান্না' দে তাঁর ১৯৮৩ সালে গাওয়া 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই' (গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুরকার সুপর্ণকান্তি ঘোষ) গানে বুদ্ধিজীবী বাঙালির এই বিনোদনের জায়গাটি চিরস্মরণীয় করে রেখে দিয়েছেন। আর রয়েছে ধর্মতলার কাছে ১৮১৪ সালে স্থাপিত 'ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম' এবং ১০৩ বছর আগে তৈরি করা 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল'। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চারপাশের বাগানে ঘুরতে গিয়ে যে কত প্রেমিক-জুটি এবং সাহিত্যিক নিজেদের 'ইন্সপিরেশন' খুঁজে পেয়েছেন, তার হিসেব কে রেখেছে!

কলকাতার 'ক্রীড়া বিনোদন'-এর পাশাপাশি বিশেষভাবে উল্লেখ করা উচিত 'সাংস্কৃতিক বিনোদনের' কথা। এই বিনোদনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের নানান মহানগরী এবং শহর থেকে তর্কাতীতভাবে কলকাতা অনেকটাই এগিয়ে। তিলোত্তমার সাংস্কৃতিক বিনোদনের মধ্যে রয়েছে গান-বাজনা, নাটক, চলচ্চিত্র, কুইজ, বিতর্ক, এবং বিভিন্ন সাহিত্য-সভা।

কলকাতার বিনোদনের জন্য (বার্ষিক) 'কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল' এবং 'কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'— দুটোই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে 'কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল' শুরু হয়েছিল ১৯৯৫ সালে। তার পর থেকে, পথ চলতে চলতে, সপ্তাহব্যাপী এই উৎসব পৌঁছে গিয়েছে ২৯তম পর্বে। কলকাতার টালিগঞ্জে অবস্থিত বাংলা 'ইন্ডাস্ট্রি' থেকে প্রতি বছর যে ছায়াছবিগুলি মুক্তিলাভ করে এবং মহানগরীতে যেসব স্বনামধন্য 'ফিল্ম মেকার' এবং অভিনেত্রী-অভিনেতারা রয়েছেন, তাঁদের প্রতিভার স্বীকৃতি দেওয়া হয় এই উৎসবে। জনপ্রিয় বিনোদন মাধ্যম হিসেবে এই বাংলায় চলচ্চিত্র খুবই প্রসিদ্ধ। ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, সত্যজিৎ রায় থেকে শুরু করে আজকের অঞ্জন দত্ত, গৌতম ঘোষ, বা কৌশিক গাঙ্গুলিদের মতো বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্দেশকরা আপন সৃষ্টিসুখের উল্লাসে নির্মাণ করেছেন কালজয়ী এক একটি ফিল্ম। স্বল্প-দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র বানানোতেও তিলোত্তমার অনেক নির্দেশক/নির্মাতা আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতি বছর যে চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করে, তাতে যোগ দিতে আসেন অসংখ্য দেশবিদেশের মানুষ। সাহিত্যকে যদিও 'মেইনস্ট্রিম এন্টারটেইনমেন্ট'-এর অংশ বলাটা ধৃষ্টতা, তবুও এটা বলতেই হয় যে, কলকাতার 'কালচার'-এর সর্ববৃহৎ প্রদর্শনী এশিয়ার সর্ববৃহৎ 'ইন্টারন্যাশনাল কলকাতা বুক ফেয়ার'-ও বিনোদন জগতে ঢুকে পড়েছে।

মহানগরীর এই দুই পৃথিবী বিখ্যাত উৎসবকে সামনে রেখে এখন শুরু হয়েছে 'কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল কুইজ ফেস্টিভ্যাল' পালন। বিনোদনের জগতে এই 'কুইজ' প্রতিযোগিতাও বর্তমানে খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তেমনই 'যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি', 'কলকাতা ডিবেটিং সার্কেল' এবং 'আই.আই.এম ডেবসক'-এর মতো বিতর্কপ্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার তামিল দেওয়া 'সোসাইটি'গুলি মহানগরীর যুবক-যুবতীদের কাছে খুবই জনপ্রিয়।

কলকাতার বিনোদনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আরও দুটি উপাদান হল এই মহানগরীর সংগীত এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে 'পারফরম্যান্স'-এর আয়োজন এবং, অবশ্যই, থিয়েটার। কিন্তু তার আগে বলা উচিত যে কলকাতার চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মঞ্চগুলিরও মহানগরীর বিনোদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ১৯০৭ সালে কলকাতায় ব্যাবসায়িক ভিত্তিতে ছায়াছবি প্রদর্শন শুরু হয় জামসেদজি ম্যাডানের উদ্যোগে। তাঁর তৈরি করা 'এলফিনস্টন পিকচার

প্যালেস'-এর নাম ১৯৮০-র দশকে 'মিনার্ভা সিনেমা হল' থেকে পরিবর্তিত হয়ে 'চ্যাপলিন' হয়ে যায় এবং তা ২০১৩ পর্যন্ত মানুষদের ছায়াছবি দেখার আনন্দ দিতে থাকে। এটা অবশ্য উল্লেখ্য যে, প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার হীরালাল সেন তাঁর কাজের ইন্সপিরেশন পেয়েছিলেন 'স্টার থিয়েটার' থেকে। 'চ্যাপলিন' ছাড়াও কলকাতার জনপ্রিয় 'মুভি হল'-গুলির মধ্যে রয়েছে 'বিজলী', 'গ্লোব', 'মেট্রো', 'নিউ এম্পায়ার', 'প্যারাডাইস', 'প্রিয়া', নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পদধূলি-ধন্য 'রক্সি' এবং 'এলিট'। বেশ কিছু 'মাল্টিপ্লেক্স সিনেমা হল'-ও আছে কলকাতায়। আর, তাছাড়া, সেই সুবিখ্যাত পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র কেন্দ্র 'নন্দন' প্রেক্ষাগৃহ তো রয়েইছে সেই ১৯৮৫ সাল থেকে।

এই ২০২৪ সালে তো 'ও.টি.টি.' আর 'ডি.টি.এইচ.'-এর দাপটে 'ট্র্যাডিশনাল' প্রেক্ষাগৃহ প্রায় উঠেই গিয়েছে। কিন্তু ১৯৭০ এবং ১৯৮০-র দশকে, এমনকি তার আগের দশকটিতেও, এই সিনেমা হলগুলিতে টিকিটের আশায় লাইন দিতেন শয়ে শয়ে মানুষ। আধুনিক কলকাতার ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছিল এই প্রেক্ষাগৃহগুলি। সেগুলোর বাইরে কোনওমতে পৌঁছে, লাইনে দাঁড়িয়ে, প্রচুর টাকা খরচ করে, 'ব্ল্যাক'-এ টিকিট কেটে নিজেদের পছন্দের ছায়াছবিগুলি দেখতে কোনও কার্পণ্য লক্ষ করা যেত না এই মানুষগুলির মধ্যে! যে মহানগরী থেকে উঠে আসবেন প্রমথেশ বড়ুয়া, সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, তরুণ মজুমদার, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, অপর্ণা সেন, গৌতম ঘোষ, ঋতুপর্ণ ঘোষ-এর মতো সুবিখ্যাত চলচ্চিত্র-নির্দেশকরা, সেখানে যে চলচ্চিত্রের একটি 'ভাইব্রান্ট কালচার' থাকবে, তা বলাই বাহুল্য!

নাচ-গান-বাদ্যযন্ত্র পরিবেশনের নিরিখে কলকাতার থেকে উঠে এসেছেন একঝাঁক চিরস্মরণীয় নক্ষত্র! সেই তালিকায় কে আছে, আর কে নেই! গানের জগতে শচীন দেববর্মণ, দেবব্রত বিশ্বাস, মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, পুলক বন্দোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে হৈমন্তী শুক্লা, ঊষা উত্থুপ, রশীদ খান (সদ্য প্রয়াত), কবীর সুমন, শ্রীকান্ত আচার্য, রূপঙ্কর বাগচী, শুভমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌশিকী চক্রবর্তী...মহানগরীর গায়ক-গায়িকার তালিকাটি উল্লেখযোগ্যভাবে সুবিস্তৃত। মহানগরীর সুবিখ্যাত বাদ্যযন্ত্র শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন পান্নালাল ঘোষ, রাধিকামোহন মৈত্র, বিষ্ণু গোবিন্দ জোগ, ভিস্তাস আর্দেশির বালসারা, নিখিলরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশাত খান, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, তন্ময় বসু, বিক্রম

ঘোষ, দেবজ্যোতি মিশ্র এবং আরও অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। বিখ্যাত নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন অমলাশঙ্কর, গোবিন্দন কুট্টি, থাঙ্কমণি কুট্টি, তনুশ্রীশঙ্কর, মমতাশঙ্কর, মালবিকা সেন, ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। মহানগরীতে প্রায় প্রতিটি সন্ধ্যায় যে বিভিন্ন নাচ-গান এবং বাদ্যযন্ত্র পরিবেশনের আসর বসে, তাতে বিনোদনপ্রেমী মানুষদের ভিড় হয় চোখে পড়ার মতো! 'কলকাতা বইমেলা' বা 'কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব'-এর মতই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে বার্ষিক 'ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্স'। প্রতি বছর শীতকালে নজরুল মঞ্চে আয়োজিত এই গান-বাদ্যযন্ত্র 'পারফরমেন্স'-এর অনুষ্ঠান একত্রিত করে হাজার হাজার সংগীতপ্রেমী মানুষকে।

কলকাতার বিনোদনের ক্ষেত্রে যে নাম সর্বাগ্রে করতে হয়, তা হল 'কলকাতার থিয়েটার'-এর। বর্তমানে কলকাতার থিয়েটার আন্তর্জাতিক স্তরে সবচাইতে সমাদৃত 'পারফরম্যান্স মিডিয়াম'-গুলির মধ্যে একটি।

সঠিক অর্থে বলতে গেলে, কলকাতার রঙ্গমঞ্চে নাট্যকার এবং নটের কোনওদিনই কোনও অভাব ছিল না। ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে মঞ্চ কাঁপিয়েছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি, অমৃতলাল বসু থেকে শুরু করে শিশিরকুমার ভাদুড়ী, বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত এবং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার, একবিংশ শতাব্দীর কলকাতা নাট্যজগতে বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, নবেন্দু সেন থেকে শুরু করে দেবাশিস মজুমদার, হর ভট্টাচার্য, তীর্থঙ্কর চন্দ, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, চন্দন সেন, ব্রাত্য বসু এবং সুমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবাদপ্রতিম হয়ে গিয়েছেন। এঁদের রচনার কথা বলতে গেলে, প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের মূল উপাদান এবং বিষয় যদি হয় লোকগাথা, গ্রামীণ গল্পগুচ্ছ, বিশ্বাস এবং সামাজিক সমস্যা, নাট্যকার ব্রাত্য বসুর নাটকের অভিমুখ সাধারণত বিভিন্ন চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিকে। কলকাতায় 'কালিন্দী ব্রাত্যজন', 'নান্দীকার', 'অন্য থিয়েটার', 'বহুরূপী', 'স্বপ্নসন্ধানী', 'চেতনা' বা 'পঞ্চম বৈদিক'-এর মতো নাটকের যে দলগুলি রয়েছে, তাদের কলাকুশলীরা 'থিয়েটার' নামক 'আর্ট'-কে সম্পূর্ণ একটি অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছেন। নাটক নিয়ে এঁরা একের পর এক যুগান্তকারী 'এক্সপেরিমেন্ট' চালিয়েছেন। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে নাট্যকারের নিজেকে ভেঙে নতুন করে আবিষ্কার করার বাসনা। ব্রাত্য বসুর *বোমা* এবং *মীর জাফর* ও অন্যান্য নাটক বইগুলির মধ্যে লক্ষ করা যায় সমান্তরাল ইতিহাস বা 'প্যারালাল হিস্ট্রি'-র উপস্থিতি!

কলকাতার মাটিতে যেমন রচিত হয়েছে একের পর এক কালজয়ী নাটক (‘বিসর্জন’, ‘নবান্ন’, ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’, এবং ‘ব্যারিকেড’ থেকে শুরু করে ‘নীল রঙের ঘোড়া’, ‘রুদ্ধসঙ্গীত’, ‘মীর জাফর’, ‘বিল্বমঙ্গল কাব্য’), তেমনই সেগুলি বিনোদনপ্রেমী মানুষের সামনে মঞ্চস্থ করার নাট্যমঞ্চেরও কোনও অভাব নেই এই মহানগরীতে। ‘মধুসূদন মঞ্চ’, ‘মহাজাতি সদন’, ‘স্টার থিয়েটার’, ‘রবীন্দ্রসদন’, ‘শিশির মঞ্চ’, ‘গিরিশ মঞ্চ’, ‘মোহিত মৈত্র মঞ্চ’, ‘একাডেমি অফ ফাইন আর্টস’, ‘তপন থিয়েটার’, ‘মিনার্ভা থিয়েটার’ এবং ‘জ্ঞান মঞ্চ’ সুপরিচিত এই থিয়েটার হাউস-গুলি ছাড়াও ছোটো ছোটো আরও নানান নাট্যমঞ্চ রয়েছে কলকাতা জুড়ে। কলকাতার বিনোদন জগতে এদের ভূমিকা বারবার উল্লেখ করা উচিত!

পরিশেষে বলা যায় যে, ‘কলকাতা’ এবং ‘বিনোদন’এই শব্দ দুটি একত্রিত হয়ে সত্যিই যেন ‘এন্টারটেইনমেন্ট’-এর জগতে একটি ‘ম্যাজিক’ তৈরি করেছে! মহানগরীর ব্যস্ত জীবনযাপনে যখন এর ১ কোটি ৫৩ লক্ষ বাসিন্দা দিনশেষে চূড়ান্তভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তাঁদেরকে ‘রিজুভিনেট’ করে তোলে মহানগরীর বিনোদনের এই বিভিন্ন উপাদানগুলি। এছাড়াও, আন্তর্জাতিকস্তরে কলকাতার যে ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে, তারও একটি অংশের দাবিদার কল্লোলিনী তিলোত্তমার এই বিনোদন জগৎ। আশার কথা এই যে, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার এই অশান্ত সময়েও কলকাতার বিনোদন জগতকে কোনও হিংস্রতা স্পর্শ করতে পারেনি। বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সৃষ্টির মাধ্যমে নিরন্তর তা নিজের কলেবর বৃদ্ধি করে প্রশংসা কুড়িয়ে চলেছে।

তথ্যসূত্র

কিশলয় জানা, *উনিশ শতকের সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বাবু*। কলকাতা: জয়শ্রী প্রকাশনী, ২০২১।

রিঙ্কি মজুমদার, ‘সে এক রূপকথারই দেশ, সে দেশ গিয়েছে হারিয়ে’। *জিও বাংলা*, ০৭.০৮.২০১৯: https://www.jiyobangla.com/bn/news/the-story-of-the-bengals-putul-nach#google_vignette.

সম্বিত ঘোষ, ‘করোনার আবহে শীতের ছুটির নির্জন আকর্ষণ হতে পারে অরণ্যসুন্দরী ভালকি’, *ওয়ান ইন্ডিয়া*, ১৬.১২.২০২০: https-//bengali.oneindia.com/travel/valkimachan-is-on-of-the-dense-beauty-of-west-bengal-118643.html.

Bhattacharya, Debraj, *Of Matters Modern- The Experience of Modernity in Colonial and Post-colonial South Asia*. Kolkata: Seagull Books, 2008.

Birchfield, Robert, *Oxford English Dictionary*. Vol. I. Oxford: Oxford University Press, 1971.

Chakraborty, Ananya, "After fall in Business amid Lockdown– Experts say Sex Workers from Kolkata's Sonagachi have gone 'Missing'". *News 18*, 03.09.2020: https://www.news18.com/news/india/after-fall-in-business-sexworkers-from-kolkatas-sonagachi-goes-missing-claims-expert-2846607.html.

"Entertainment", Wikipedia. https-//en.m.wikipedia.org/wiki/Entertainment (retrieved on 21.06.2024).

Kassing, Gayle, et al. (eds.), *Introduction to Recreation and Leisure*. Champaign: Human Kinetics, 2013.

McDonald, Fred (ed.), *Folens Dictionary.* Dublin: Folens Publishers, 1999.

McLean, Daniel, Amy Hurd, and Denise Anderson (eds.), *Kraus's Recreation and Leisure in Modern Society*. Burlington: Jones and Barlett Learning, 2017.

"Puppet Forms", C.C.R.T. https://ccrtindia.gov.in/puppet-forms/ (retrieved on 21.06.2024).

Sinha, Mrinalini. *Colonial Masculinity*: The '*Manly Englishman*' and the '*Effeminate Bengali*' in the *Late-Nineteenth Century*. Manchester: Manchester University Press, 1995.

Varadpande, M.L., *Indian Theatre – Lok Ranga: Panorama of Indian Folk Theatre*. New Delhi: Abhinav Publications, 1992.

অমর
একুশে

অরূপ সেনগুপ্ত, মহাধ্যক্ষ, বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক বিকাশ ভবন, অষ্টম তল (ইস্ট ব্লক), কলকাতা-৯১ থেকে প্রকাশিত এবং
সরস্বতী প্রেস লিমিটেড, কলকাতা - ৭০০ ০৫৬ থেকে মুদ্রিত

বিনিময় : ৩০০ টাকা